

লোহাগড়া কাহিনী

(কলিকাতা গভর্ণমেণ্ট সংস্কৃত কলেজের দর্শন-শাস্ত্রের অধ্যাপক শ্রদ্ধাস্পদ ডাক্তার শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ সরকার এম, এ; পি এইচ, ডি, কর্ত্তৃক অবতরণিকা ও "যশোহর-খুলনার ইতিহাস" প্রণেতা, দৌলতপুর কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সতীশ চন্দ্র মিত্র মহাশয়ের ভূমিকা সম্বলিত)

শ্রীহীরেন্দ্র নাথ মজুমদার বি, এল।

প্রথম সংস্করণ

শারদীয়া সপ্তমী, ১৩৩৭

[মূল্য ৩৲ টাকা

"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"।

"পেয়েছি যা কিছু কুড়ায়ে তাহাই
তোমার কাছে মা এসেছি ছুটি,
বাসনা তাহাই গুছায়ে যতনে
সাজাব তোমার চরণ দু'টি।
চাহি নাক কিছু, তুমি মা আমার,—
এই জানি শুধু নাহি জানি আর,
তুমি গো জননি হৃদয় আমার,
তুমি গো জননি আমার প্রাণ!"

দ্বিজেন্দ্রলাল।

প্রাপ্তিস্থান
বৈশ্যপত্রিকা কার্য্যালয়
যশোহর,
মজুমদার ব্রাদার্স, লোহাগড়া
ও
কলিকাতার প্রধান প্রধান পুস্তকালয়

প্রকাশক—
শ্রীহরেন্দ্রনাথ মজুমদার বি, এ,
১০১।২ উল্টাডাঙ্গা মেন রোড,
কলিকাতা।

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস,
প্রিণ্টার—সুরেশচন্দ্র মজুমদার,
৭১।১নং মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
৫৬৬।৩০



স্মৃতি-অর্ঘ্য ।

স্বর্গত পূজনীয় নরেন্দ্রনাথ মজুমদার মেজদাদার স্মরণে—

মেজদাদা ! যে পল্লীর শ্যামল ক্রোড়ে আমরা ফুটে উঠেছিলাম, যার শীতলচ্ছায়ায় জীবনের কৈশোরের খেলা এবং যৌবনের স্বপ্ন আমাদের সৌভ্রাত্রকে মধুময় ক'রে তুলেছিল, সেই পল্লীর সুখের দুঃখের কথা, উন্নতির-অবনতির কথা গ্রথিত করিয়া একটি স্মৃতিস্তবক লইয়া তোমার নিকট উপনীত হইতেছি।

চিরকুমার ছিলে তুমি, পুষ্পের ন্যায় ছিল তোমার চরিত্রের সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য, যাহা আজও জীবনের নানা অবস্থার ভিতর আমাদিগকে উজ্জল ও পবিত্র করিয়া তুলিতেছে। পরপারে গিয়াও তুমি অরূপ-রূপে এখনও দেখা দিয়ে জীবন-দেবতার ন্যায় আমার ভবিষ্যৎ জীবনপথ আলোকবর্ত্তিকায় সমুজ্জল করিতেছ, ইহাতেই বুঝিয়াছি ইহকাল ও পরকালের মধ্যে কোন ব্যবধান নাই।

ক্ষুদ্র মনুষ্যাকার শরীরের ভিতর বিরাট ছিল তোমার সত্ত্বা; তুমি তোমার পরিবারের, তোমার দেশের, তোমার সমাজের উন্নতির কথা ধ্যানমগ্নচিত্তে ভাবতে—সেই সমাজ এবং সেই পল্লীর ইতিহাস আজ তোমার স্মৃতিতে অর্পণ করিয়া ধন্য হইতেছি।

আমি জীবনের এপার হ'তে এই তর্পণাঞ্জলি প্রেরণ করি, আর তুমি পরপার হ'তে আমার এই মানসীপ্রতিমাকে গ্রহণ ক'রে আমাকে ধন্য কর।

বিরহকাতর

—হীরেন্দ্রনাথ—

অবতরণিকা।

জাতীয় জীবনের জাগরণের সহিত প্রত্যেক জাতি তাহার ধর্ম্ম-কর্ম্মকে ভাল করিয়া বুঝিতে চেষ্টা করে। জীবনের উদ্দীপনার সহিত আত্মশক্তি ও আত্মসামর্থ্যের জ্ঞান চিত্তে উদ্ভাসিত হয়। ইতিহাস শুধু ঘটনার সন্নিবেশ নহে, ইতিহাস জাতীয় জীবনের অভিব্যক্তির ধারা। মানব-সমাজের সামান্য ঘটনাও কার্য্যকারণতত্ত্ব ভিন্ন অন্ধভাবে সংঘটিত হয় না। জীবনের মূলে যে শক্তির প্রস্রবণ বিদ্যমান থাকিয়া জীবনের সৃষ্টি ও পুষ্টি সাধন করিতেছে, জীবনের সমস্ত ঘটনা সেই শক্তির অভিব্যক্তি। সৃষ্টিতে অন্ধশক্তির তাণ্ডবলীলা কোথাও নাই। সৃষ্টি জ্ঞানের বিকাশ—চৈতন্যের আত্মকাহিনী।

এই দৃষ্টিতে জগতের তুচ্ছ ঘটনাও তুচ্ছ নহে—বিরাটের মধ্যেও ক্ষুদ্রের স্থান আছে। তারকা-খচিত অনন্ত গগন যেমন চিত্তে বিস্ময় উৎপাদন করে, তেমনি বিহগ কূজন মুখরিত শস্য-শ্যামলা পল্লী আমাদের চিত্তে স্বপ্ন-লোকের আনন্দে পূর্ণ করে। বাঙ্গালীর নিকট বাঙ্গলার ঘাট, বাঙ্গলার মাঠ, বাঙ্গলার হাট ও বাট শৈশবের ছায়াময় স্মৃতিতে পূর্ণ, কৈশোরের মধুর স্বপন স্মৃতিতে আচ্ছাদিত, যৌবনের সুখ-স্বর্গের সুষমায় সুরভিত ও বার্দ্ধক্যের তপস্যায় সমুজ্জ্বলিত।

বাঙ্গালীর নিকট পল্লীগ্রাম তীর্থবিশেষ। বাঙ্গালীর নিকট তাহার বাস্তুভিটা এখনও সর্ব্বতীর্থসার। বাঙ্গলার নদী-নহার গঙ্গা-যমুনার ন্যায় পূতসলিলা, অনন্তশক্তির প্রস্রবিণী, মুক্তিদায়িনী। বাঙ্গালীর নিকট তাহার জন্মভূমি যৌবনের উপবন—বার্দ্ধক্যের বারাণসী।

বাঙ্গালীর চোখে জন্মভূমির ইতিবৃত্ত তীর্থসলিলের ন্যায় পবিত্র। তাহার জন্মভূমির কথা তাহার নিকট মৃতসঞ্জীবনী মন্ত্র। শত দৈন্যের ভিতর, কর্ম্মজীবনের উল্লাস ও বিষাদের ভিতর, তাহার জন্মভূমির ছোট ছোট কথা তাহার নিকট যে অমৃত পরিবেশন করে—সে অমৃতের ধারা বাঙ্গালী বিশ্বে কোথাও পায় না।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত ফ্রান্সে গিয়াও পল্লীর কথা ভুলিতে পারেন নাই। দুর্গোৎসবের সময় হইলেই তাঁহার মনের অগোচরে তাঁহার চক্ষু শত ধারায় বিগলিত হইত। বাঙ্গালী মাতৃ-উপাসক, তাঁহার পল্লীমায়ের স্নেহাঞ্চলাবৃত ক্রোড়ের মাধুর্য্য তাহার জীবনের স্তরে স্তরে সন্নিবেশিত হইয়া থাকে।

বাঙ্গালীর নিকট তাই পল্লীর কথা যত আদরণীয় এমন বোধহয় আর কিছুই নাই। বিশেষতঃ বড় বড় ইতিহাসে জীবনের বড় বড় কথাই স্থান পায়, কিন্তু মানুষের জীবনটা যাঁহাতে সুখ পায় সেই দৈনন্দিন স্নেহ-ভালবাসার কথা ইতিহাসে স্থান পায় না। যাদের আশীর্ব্বাদ হাতভ'রে মাথায় নিয়ে বাঙ্গালী ধন্য হয়, যাদের সখ্যভাবের মৈত্রীতে বাঙ্গালী পুষ্ট হয়, যে স্নেহের অবদানে বাঙ্গালী বীর্য্য সম্পন্ন হয়, সেই আশীর্ব্বাদ, সেই মৈত্রী, সেই স্নেহের কথার স্থান ইতিহাসে নাই।

মানুষের অভ্যুদয় ও অবনতির কথা জীবনের একমাত্র কথা নয়। আত্ম অবদান ক'রে কিরূপে সুখী হয়, ছোট ছোট ঘটনার ভিতরে জীবন গভীরতায় কিরূপ ভ'রে উঠে—ইহা দেখিবার ও বুঝিবার অবকাশ যেমন পল্লী ইতিহাসে আছে তেমনটি আর কোথাও নাই।

কল্যাণাস্পদ হীরেন্দ্রনাথ বাঙ্গলার এক পল্লী-জীবনের আবরণ উন্মোচন করিয়া এক অধ্যায় প্রকাশ করিতেছেন। লোহাগড়াবাসী তাহার নিকট চিরকাল কৃতজ্ঞ থাকিবেন। লোহাগড়া অতি ক্ষুদ্র সমাজ হইলেও, তার শত দৈন্য থাকিলেও লেখকের নিকট এই পল্লীমাতা দেবীর ন্যায় পূজ্য। ইহারই স্তন্যপানে তিনি বর্দ্ধিত হইয়াছেন। মাতৃভক্ত মাতৃপূজার আয়োজন করিয়া মায়ের কথা মায়েরই পাদপদ্মে অর্ঘ্যদান করিতেছেন। ভাল মন্দের কথা ইহাতে উঠে না—মায়ের পূজা সন্তান করিতেছে ইহাই দেখিবার জিনিষ। সন্তান যেমনই হউক—তাহার অঞ্জলি যেমনই হউক—মায়ের নিকট তাহা অমূল্য এবং যিনি এরূপ পূর্ণাঞ্জলি হস্তে মাতৃমন্দিরে আরব্ধ পূজায় ঋত্বিকরূপে উপস্থিত হইতেছেন—তাহার মাতৃপূজার এই ছবি সন্তানের পক্ষে প্রাণ-মনোমুগ্ধকর।

কল্যাণীয় হীরেন্দ্রনাথ এ পূজা একাই সম্পন্ন করিতে রাজি নহেন, তিনি আমাকেও আহ্বান করিয়াছেন মাতৃমন্দিরের দ্বারে, দ্বারী হইয়া দাড়াইতে। পূজামগ্ন তিনি, পূর্ণাহুতিতে আমাকে সাহায্য করিতে অবকাশ দিয়া এই মাতৃপূজায় আমাকে পূত করিয়াছেন।

লোহাগড়া আমার জন্মভূমি। এই জন্মভূমির গৌরব আমার ন্যায় শত সন্তানেরও গৌরব। এই পূজার দৃশ্য দূর হ'তে দেখিয়া পূজারীসহ আমিও অর্ঘ্য দান করিয়া ধন্য হইতেছি।

রাঁচী
অক্ষয় তৃতীয়া, ১৩৩৬

শ্রীমহেন্দ্র নাথ সরকার

ভূমিকা।

ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময় হইতে জননীর মূর্ত্তি দেখিতে দেখিতে, তাঁহার মায়া-মমতার ফলে বাঁচিয়া থাকিতে থাকিতে সন্তান তাঁহাকে ভাল বাসিতে শিখে। শাস্ত্রে বলেন "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।" মানুষের নিকট সর্ব্বাগ্রেই এই জননী এবং তৎপরে জন্মভূমি স্বর্গ অপেক্ষাও গরীয়সী। উভয়ের নিকট সন্তান চিরঋণী ; সে ঋণ অপরিশোধ্য ; শোধের একটি মাত্র পন্থা উভয় মাকে ভালবাসা- এবং উভয়ের সেবা। উহাদ্বারা জন্মজন্মান্তরেও ঋণের শেষ হয় না, শোধের পন্থামাত্র ধরা হয়। প্রত্যেকেরই প্রথমেই বিশ্বজননীর প্রথমমূর্ত্তি জননীকে এবং পরে দ্বিতীয় মূর্ত্তি জন্মভূমিকে সেবাভক্তি দ্বারা প্রীত করিতে হয়। প্রত্যেকেরই হৃদয়ের বিস্তার অনুসারে গর্ভধারিণী মাতা হইতে যেমন "স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু", তেমনই জন্মপল্লী হইতে সমগ্রা বসুন্ধরা মায়ের মূর্ত্তি। স্তন্যপায়ী শিশু মায়ের কক্ষে শুইয়া বিরাট বিশ্বকক্ষ লক্ষ্য করে। মনের ও শক্তির সাধ্যানুসারেই ভক্তির বিচার হয়, সেবার সামগ্রী দ্বারা হয় না। প্রাণ ভরিয়া ভক্তিশ্রদ্ধা দিয়া শাকান্নে মায়ের এবং স্বল্পোপচারে জন্মভূমির পূজা করা যায়। প্রকৃত অনুভূতি দ্বারা মাকে চিনিলে, তাঁহার স্বরূপ সকলকে চিনাইতে স্বতঃ-প্রবৃত্তি হয়। এখানে শুধু জন্মভূমির কথা বলিব। কেহ জন্মভূমির স্বরূপ প্রকটিত করিতে যেভাবে যেটুকু চেষ্টা করিতে পারেন, তাহাতে তাঁহার জন্মগত কর্ত্তব্য পালিত ও ধর্ম্ম রক্ষিত হয়। এই জন্যই বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন—"বাঙ্গালীতে বাঙ্গলার ইতিহাস যে যাহাই লিখুক না কেন, সে মাতৃপদে পুষ্পাঞ্জলি।"

মদীয় অন্যতম প্রিয়তম ছাত্র শ্রীমান্ হীরেন্দ্র নাথ মজুমদার এইরূপ পুষ্পাঞ্জলি দিবার জন্য তাহার জন্মপল্লীর ইতিহাস—"লোহাগড়া কাহিনী" প্রকাশিত করিতেছেন। আমি "যশোহর-খুলনার ইতিহাসের বৃহৎ দুইখণ্ডে দুইটি জেলার ইতিহাস সঙ্কলনের চেষ্টা করিয়াছি, কাহিনী সমাপ্ত করিতে পারি নাই। বড়ই আনন্দের বিষয় আমার ছাত্রগণ সেই দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হইয়া এই দুই জেলার কয়েকটি বড় বড় গ্রামের নানা কাহিনী সংগ্রহে ব্যাকুল হইয়াছেন। "মহেশ্বর পাশার" পরিচয় বাহির হইয়াছে, লোহাগড়ার কাহিনী বাহির হইতে চলিল। সেনহাটি বা কালিয়ার কাহিনী কেন বাহির হইতেছে না, বুঝিতেছি না। এ জাতীয় পল্লীর কথা যাহাই বাহির হইতেছে তাহাতেই আমি অত্যন্ত গৌরব অনুভব করিতেছি। আমি সরল প্রাণে, সরল আশীর্ব্বচনে ব্রতী ছাত্রদিগকে উৎসাহিত ও জয়যুক্ত করিবার জন্য চেষ্টিত ও লালায়িত। সুহৃদের প্রশংসা বা সমপ্রাণতাকে কেহ পক্ষপাতদুষ্ট বলিয়া রুষ্ট হন না, ইহাই আমি জানি।

লোহাগড়া যশোহর জেলার একটি প্রসিদ্ধ গণ্ডগ্রাম। স্বচ্ছতোয়া নবগঙ্গার কূলে অবস্থিত এইস্থানে স্বাস্থ্য এবং বাসের সুবিধা যেমন সুন্দর, এখানকার বাজার তেমনই উৎকৃষ্ট বাণিজ্য স্থান বা গঞ্জ। নামের উৎপত্তি নিষ্পত্তি করিতে গেলে বুঝিতে পারা যায় না, কোন্ সুদূর অতীত কালে এখানে মধুমতী, নবগঙ্গা ও বানকানা এই ত্রিসীমায় তিনটি প্রবল প্রবাহের পরিখায় সুদৃঢ় গড় বা দুর্গ ছিল, "গড়"-যুক্ত নামের চিহ্নে যাহা এখনও পরিচিত? এখনও নবগঙ্গার পবিত্র খাতের দক্ষিণে বহু কর্ম্মকারের বাস আছে, তাহারা লোহার অস্ত্রশস্ত্র প্রস্তুত করিতে এখনও দক্ষ ও অভ্যস্ত। ভূষণার রাজা সীতারামের প্রধান সেনাপতি মেনাহাতী বা রামরূপ ঘোষের বসতি ছিল, লোহাগড়ার অনতিদূরে রায়গ্রামে। সীতারাম যে তাঁহার সেনাধ্যক্ষের ব্যবস্থায় লোহাগড়া হইতে অনেক কামান বন্দুক বা তরবারি প্রস্তুত করিয়া লইতেন, তাহা বিশ্বাস করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। কিন্তু আমরা দেখিতে পাই, রাজা সীতারামের অভ্যুত্থানের শতাধিক বর্ষ পূর্ব্বে পুরাতন দলিলে লোহাগড়ার নাম আছে। সুতরাং অনুমান করা যায়, খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভে কোন বিখ্যাত বীর পার্শ্ববর্ত্তী জয়পুরে রণজয় করিয়া সেই বিজয়নগরীর উপকণ্ঠে লোহাগড়ায় নবগঙ্গা ও "বড়গঙ্গা" বা মধুমতীর সংযোগস্থলের সন্নিকটে গড় ও অস্ত্র-কারখানা স্থাপন করিয়াছিলেন। এই বীরপুঙ্গব ভূষণার মুকুন্দরাম বা তাঁহার বলদৃপ্ত পুত্র সত্রাজিৎ ব্যতীত আর কেহ হইতে পারেন না। হয়তঃ সেই সময় হইতে জয়পুরে (পূর্ব্বে বঙ্গজ ও পরে দক্ষিণরাঢ়ীয়) গুহ বংশের বাস। এই গুহবংশীয় রঘুদেব সত্রাজিতের বীরবংশের অভিভাবক ছিলেন। কিন্তু কে কালের পটোত্তলন করিয়া পূর্ব্ব চিত্র প্রকটিত করিবেন?

লোহাগড়ায় এক্ষণে কয়েকঘর উচ্চবংশীয় ব্রাহ্মণ জাতির বসতি থাকিলেও বৈশ্য-বারুজীবী সম্প্রদায়ই এখানকার প্রধান অধিবাসী। এই জাতিভুক্ত মৌদ্গল্য দত্ত বংশীয় কমললোচন দত্ত সম্ভবতঃ ভূষণার কর্ম্মসূত্রে এখানে আসিয়া বাস করেন। বাদশাহ শাহজাহানের রাজত্বকালে যখন রাজমহলে বাঙ্গলার রাজধানী ছিল, তখনই বঙ্গাধিপ শাহসুজার দরবারে কমললোচনের পৌত্র কৃষ্ণচন্দ্র ও চন্দ্রশেখর কয়েকটি মহলের রাজস্ব সংগ্রহ কার্য্যের কৃতিত্বের ফলে "মজুমদার" উপাধি লাভ করেন। উঁহাদেরই বংশীয় কেহ কেহ মোগলের "নওয়ারা" মহলের নাবধ্যক্ষ হন। চন্দ্রশেখর লোহাগড়ার আবাস বাটীতে যে তদানীন্তন স্থাপত্যসম্পত কারুকার্য্যযুক্ত সুন্দর জোড়-বাঙ্গলা মন্দির নির্ম্মাণ করেন, তাহা এখনও বর্ত্তমান। এই বংশীয় স্বনামখ্যাত রায় যদুনাথ মজুমদার বাহাদুর এম, এ, বি, এল; সি, আই, ই: বেদান্ত বাচস্পতি, বিদ্যাবারিধি মহোদয়ের জন্মলাভে লোহাগড়া এক্ষণে পুণ্যবতী। তিনি আধুনিক যশোহরের সকল শুভসূচনা এবং উন্নতি বিধায়ক কর্ম্মের অগ্রদূত রূপে দেশে বিদেশে প্রতিষ্ঠা সম্পন্ন। তদীয় জামাতা খ্যাতনামা

অধ্যাপক ডাঃ মহেন্দ্রনাথ সরকার এম, এ, পি এইচ, ডি মহাশয় স্বীয় দার্শনিক জ্ঞান সাধনায় এবং আদর্শ চরিত্র মাহাত্ম্যে সর্ব্বত্র সুপরিচিত। গ্রন্থকার তাহার লোহাগড়া কাহিনীতে উভয়ের জীবনচিত্রের একটি সজীব আভাষ ত দিয়াছেনই, অধিকন্তু প্রথমতঃ ব্রাহ্মণ বংশ হইতে আরম্ভ করিয়া স্থানীয় নানা বংশীয় আরও কত কৃতী সন্তানের খ্যাতির সকল দাবিও বিশেষভাবে আলোচনা করিয়াছেন, বহু বংশতালিকা দিয়া স্বীয় মত সমর্থন করিয়াছেন। সুতরাং বংশেতিহাসের খাতিরে ও এ পুস্তকের সমাদর হওয়া উচিত।

যিনি যে স্থানের অধিবাসী, তিনিই সেই স্থানের ইতিহাস লিখিবার প্রকৃত অধিকারী, কারণ নিজ জন্মপল্লীর হাবভাব, আকাশ-বাতাস ও শোভা-সমৃদ্ধি তাহাকে বাল্য হইতে অনুপ্রাণিত করিয়া রাখে। হীরেন্দ্রনাথের বিদ্যাবত্তা, সূক্ষ্মানুসন্ধান, দেশপ্রীতি ও লেখনীর শক্তি তাহার পুস্তককে বৈশিষ্ট্য দিয়াছে। তিনি সরল সজীব অকুণ্ঠিত ভাষায় নিজের প্রাণের ভাবকে চিত্রিত করিয়াছেন, খুঁটিনাটি বহু সংবাদে পুস্তকখানিকে পুষ্ট করিয়াছেন। গ্রামের ইতিবৃত্ত তথাকার অধিবাসীদিগের জন্যই প্রধানতঃ লিখিত হয়; সুতরাং সে ক্ষেত্রে খুঁটিনাটি সংবাদ কোন ঘটনাটিকে বিকৃত না করিয়া স্মৃতির উদ্বোধনে প্রমাণিতই করিয়া থাকে। বিশেষতঃ লোহাগড়ার দত্ত-মজুমদার ও রায়-সরকার প্রভৃতি প্রখ্যাত বৈশ্য বংশগুলি যশোহর-খুল্‌নার সর্ব্বত্র স্বসম্প্রদায়িক বিশিষ্ট পরিবারের সহিত এরূপভাবে বৈবাহিক ও সৌহৃদ্য সম্বন্ধযুক্ত, যে উহারা সকলেই এই লোহাগড়া কাহিনীকে আত্মকাহিনীর মত সাদরে গ্রহণ ও অধ্যয়ন করিবেন, ইহা স্বচ্ছন্দে আশা করিতে পারি। এই পুস্তকে গ্রন্থকার নিজ পল্লীর সাহিত্য-সম্পদের যে নমুনা ও বিবরণী দিয়াছেন, উপসংহারে স্থানীয় সেকালের ও একালের সর্ব্ববিধ অবস্থার যে তুলনায় সমালোচনা করিয়াছেন, তাহা স্থানীয় লোকের ত উপভোগ্য হইবেই, পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের বা জেলার অধিবাসীদিগেরও চিত্তে চিন্তাবৃত্তির উন্মেষ করিয়া স্বদেশপ্রীতি জাগ্রত করিবে। আমি এই পুস্তকের বহুল প্রচার কামনা করি।

দৌলতপুর কলেজ
২২শে ভাদ্র, ১৩৩৭।

শ্রীসতীশ চন্দ্র মিত্র

নিবেদন

আজ বহু দিনের কল্পনা ও সাধনার ফলে আপনাদের সমক্ষে এই সামান্য ইতিবৃত্ত লইয়া অগ্রসর হইয়াছি। যে উদ্দীপনায় উত্তেজিত হইয়া এই গুরুভার গ্রহণ করিয়াছি তাহা ভাষায় প্রকাশ করিবার শক্তি আমার নাই। ঐতিহাসিক বিবরণী ইহাতে আদৌ নাই, সুতরাং পাঠকবর্গের স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে লেখক একজন ঐতিহাসিক নহেন। শুধু প্রাণের আবেগে স্বজাতি ও স্বদেশের পূর্ব্বাপর সংক্ষিপ্ত ঘটনাবলী উল্লেখ করিতে চেষ্টা করিয়াছি। সমালোচকগণ ভ্রম প্রদর্শন করিলে তাহা অবনত মস্তকে গ্রহণ করিব ও তজ্জন্য কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ থাকিব। আমার লোহাগড়ার ইতিবৃত্ত প্রধানতঃ লোহাগড়ার লোকের জন্যই লিখিত; তবে ইহার মধ্যে যে সব চরিত্র বা ঘটনা আছে তাহা যশোহরের সকল গ্রামের অধিবাসীর নিকট প্রিয় বস্তু হইবে বলিয়া আশা করি। সাধারণের নিকট যোগ্য নাও হইতে পারে, তথাপি ভিন্ন গ্রামের স্বজাতীয় বন্ধুগণের নিকট যে প্রিয়বস্তু হইবে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

এই পুস্তকে যাহা কিছু লিখিত হইয়াছে তাহাতে কোন প্রকার স্বার্থপরতা করি নাই। কোন জাতি বা সম্প্রদায়ের উপর কোন প্রকার কটাক্ষপাত এই পুস্তকে স্থান পায় নাই। যাহা সত্য ও সরল তাহাই শুধু আলোচনা করিয়াছি। কাহাকেও অযথা প্রশংসা বা নিন্দা করি নাই। গুণীর দোষাংশ যেমন বাদ পড়ে নাই, নিন্দিতের গুণের চিত্রও তেমনি উজ্জ্বল করিয়া দেখাইয়াছি। বিবেক-বুদ্ধিতে যাহা সত্য বলিয়া জানিয়াছি, তাহা প্রকাশ করিতে আদৌ কুণ্ঠিত হই নাই। যতদূর সম্ভব সরল ও সরস ভাষায় এই পুস্তক লিখিয়া কতকগুলি সুন্দর ছবি দ্বারা ইহাকে সুশোভিত করিতে ত্রুটী করি নাই।

আমাদের দেশের, আমাদের জাতির, আমাদের সমাজের কোন ইতিহাস নাই। স্বাধীন জাতিরই কেবল ইতিহাস আছে—তাঁহারাই কেবল ইতিহাসের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া থাকেন ও ইতিহাসের দ্বারা স্বদেশ ও স্বজাতির গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখেন। যে জাতির ধারাবাহিক কোন ইতিহাস নাই, সে জাতির ইতিবৃত্ত সঙ্কলন করা যে বিশেষ কষ্টসাধ্য, তাহা যিনি ওরূপ কার্য্যে কখনও অগ্রসর হইয়াছেন তিনিই জানেন। আমার পূর্ব্বে যদিও শ্রদ্ধেয় শ্রীযুত অবিনাশ চন্দ্র সরকার বি, এল, মহাশয় এরূপ একখানি পুস্তক সঙ্কলন



করিয়াছেন, তথাপি পরমপূজনীয় পিতৃদেবের আদেশানুসারে এবং তাঁহারই চেষ্টা, যত্ন ও উৎসাহে অনুপ্রাণিত হইয়া এই কষ্টসাধ্য কার্য্যে ব্রতী হইয়াছি। এতদ্ভিন্ন শতবর্ষ বয়স্ক অতি বৃদ্ধ প্রত্যক্ষদর্শী পরমপূজনীয় শ্রীযুক্ত গিরিশ চন্দ্র ভৌমিক মহাশয়ের মুখে শ্রবণ করিয়া অনেক তথ্য অবগত হইয়াছি। তাঁহার প্রবল স্মরণ শক্তি আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছে। বহুদিন হইতে আমার বাসনা যে স্বগ্রামের একটা ইতিবৃত্ত সঙ্কলন করিব; সুযোগ ও সময়ের অভাবে এতদিন তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে সক্ষম হই নাই। যাঁহাদের উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া এই ক্ষুদ্র অথচ মহৎ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি, তাঁহাদের শ্রীচরণে বারবার প্রণাম করিতেছি। শ্রীভগবানের নিকট কায়মনোবাক্যে শুধু এই প্রার্থনা করি যে কোনপ্রকার স্বার্থ বা স্বজাতি-প্রীতি যেন আমাকে কর্ত্তব্য ভ্রষ্ট না করিতে পারে।

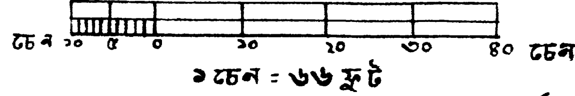
দৌলতপুর কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সতীশ চন্দ্র মিত্র বি, এ, মহাশয়ের 'যশোহর-খুলনার ইতিহাস' ও শ্রীযুক্ত অবিনাশ চন্দ্র সরকার বি, এল, মহাশয়ের "রায়-সরকার বংশের ইতিবৃত্ত" হইতে যথেষ্ট সাহায্য পাইয়াছি, তজ্জন্য আমি ইঁহাদের নিকট চির-কৃতজ্ঞ। বিশেষতঃ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সতীশ চন্দ্র মিত্র মহাশয় এই পুস্তকের 'ভূমিকা' লিখিয়া ইহার গাম্ভীর্য্য ও সম্পদ বৃদ্ধি করিয়াছেন। আমি তাঁহার পুরাতন ছাত্র—তাঁহার এই অপরিশোধ্য স্নেহের দানে নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করিতেছি। ইহা ব্যতীত লক্ষ্মীপাশার পোষ্ট মাষ্টার সেনহাটী নিবাসী শ্রীযুত নলিনীমোহন সেন বহু আয়াস স্বীকার করিয়া বিনা স্বার্থে এই পুস্তকের ছবি তুলিয়া দিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহাকেও অন্তরের শত ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। কলিকাতা গভর্ণমেণ্ট সংস্কৃত কলেজের দর্শন শাস্ত্রের অধ্যাপক পরমপূজনীয় ডাক্তার শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ সরকার এম, এ; পি এইচ, ডি; মহাশয় অনুগ্রহ করিয়া এই পুস্তকের 'অবতরণিকা' লিখিয়া দিয়া আমাকে ধন্য করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহাকে অন্তরের শ্রদ্ধা ও ভক্তির অর্ঘ্য প্রদান করিতেছি। ইতিনা নিবাসী বন্ধুবর শ্রীযুত জগদ্বন্ধু দাশ এম, এ, মহাশয় এই পুস্তকের ভ্রম সংশোধন করিয়া দিয়া আমাকে চির-সৌহার্দ্দ্য-বন্ধনে আবদ্ধ করিয়াছেন। অবশেষে সারুলিয়া নিবাসী শ্রীযুত ললিতকুমার স্বর্ণকারকেও এই পুস্তকের মানচিত্র অঙ্কনের জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

লোহাগড়া, যশোহর
শারদীয়া সপ্তমী, ১৩৩৭।

শ্রীহীরেন্দ্র নাথ মজুমদার।

সূচীপত্র।

চিত্র সূচী


মোচড়া
ছাতরা
কালনা
মধুমতী নদী
কুন্দশী
লক্ষ্মীপাশা
লোহাগড়া-কালনা রোড
লোহাগড়া থানা
স্কেল
৬৪" ইং = ১ মাইল
চেন ১০ ৫ ০ ১০ ২০ ৩০ ৪০ চেন
১ চেন = ৬৬ ফুট

লোহাগড়ার মানচিত্র।

লোহাগড়া কাহিনী

প্রথম অধ্যায়

নামের উৎপত্তি

লোহাগড়া নামের উৎপত্তি লইয়া অনেকে অনেক কথা বলেন কিন্তু ইহার নাম লোহাগড়া হইল কেন, তাহা নিশ্চিতরূপে বলা যায় না। তবে মুসলমান রাজত্বের সময় হইতে লোহাগড়া নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। ঔরংজেবের রাজত্ব সময়ের কয়েকটী মন্দির অদ্যাবধি ভগ্নাবস্থায় বিদ্যমান থাকায় এই গ্রামের বয়স নিরূপণ করিয়া দিতেছে। ইহা যে অতি প্রাচীন গ্রাম তাহা এই ভগ্নাবশেষ হইতে আমরা জানিতে পারি। প্রবাদ কতই আছে বটে, কিন্তু কোন প্রবাদেরই বিশেষ ভিত্তি আছে বলিয়া মনে হয় না। তবুও দু একটি প্রবাদ আলোচনা করা উচিত। মহম্মদপুরের রাজা সীতারাম রায়ের এখানে বড় বড় কামান বন্দুক অস্ত্রের কারখানা ছিল বলিয়াই ইহার নাম লোহাগড়া হইয়াছে। রাজা সীতারামের কামান বন্দুকের কারখানার কোন অস্তিত্ব বা প্রমাণ নাই। ঐরূপ কোন কারখানা থাকিলে অবশ্যই তাহার কিছু নিদর্শন থাকিয়া যাইত কিন্তু এ যাবৎকাল কেহ কোন নিদর্শনই প্রাপ্ত হন নাই। সীতারাম রায়ের বহু পূর্ব্বে ১০৫৯ বঙ্গাব্দেও আমরা দলিল পত্রে লোহাগড়া নাম দেখিতে পাই এবং ভূষণার জমিদার মুকুন্দরাম রায়ের সময় ১৬০৮ খৃষ্টাব্দে ও আমরা লোহাগড়া নাম কাগজ পত্রে দেখিতে পাইতেছি, সুতরাং এ প্রবাদ গ্রাহ্য নহে।

গ্রামের নাম লোহাগড়া কেন হইল এবং কে রাখিল তাহার কোন ইতিহাসও নাই। কমল লোচন দত্ত কোন সময় কোথা হইতে লোহাগড়ায় আসিয়াছিলেন বা তাহার পূর্ব্বপুরুষগণ বরাবর এস্থানে বাস করিতেছিলেন কি না কিছুই জানা যায় না। ইতিহাস রাখা বাঙ্গালীর স্বভাবের বিরুদ্ধ। পূর্ব্বেও

এ গ্রামে কৃতী লোক যথেষ্ট ছিলেন এবং বর্ত্তমান সময়ও ঘরে ঘরে শিক্ষিত লোকের ছড়াছড়ি, কিন্তু দুঃখের বিষয় ঘরের খবর কেহই রাখেন নাই এবং রাখেনও না। পূর্ব্বপুরুষের নাম পর্য্যন্ত অনেকে জানেন না, অথচ মোগল পাঠান বাদশাহদের নাম কাহারও অবিদিত নাই। সুতরাং লোহাগড়া নাম যে কেন হইল ইহার উত্তর দেওয়া সহজসাধ্য নহে, তবে অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া বলিতে পারি যে লোহাগড়ায় অধিকাংশ কর্ম্মকার বাস করিয়া তাহারা লৌহের ব্যবসায় করিত ; তদনুসারে গ্রামের নাম লোহাগড়া হওয়াই সম্ভব। বহুকাল হইতে লোহাগড়া গ্রামের দক্ষিণাংশে বহু কর্ম্মকার বাস করিয়া ব্যবসায় করিয়া আসিতেছে ইহাই নাম হওয়ার একটা প্রমাণ বলিয়া ধরা যাইতে পারে। মোটের উপর গ্রামের অধিকাংশ লোকই কর্ম্মকার ছিল এবং তাহাদের লৌহের কারখানায় লৌহের জিনিষের গড়ন হইত বলিয়াই লোহাগড়া নাম হইয়া থাকিবে। অবশেষে লোহাগড়া নামোৎপত্তির দ্বিতীয় কারণ কয়েকটী দ্রব্যের দ্বারা প্রতীয়মান হয়। এই স্থানে কতকগুলি জিনিষ অদ্যাবধি দৃষ্ট হয়, যেমন গড়ের পুষ্করিণী, মোচড়ার গড় ইত্যাদি। এই 'গড়' কথার তাৎপর্য্য কি তাহা আমরা 'গড়' অর্থাৎ দুর্গ (fort) ভিন্ন অন্য কিছুই অবগত হইতে পারি না। লোহাগড়ায় সম্ভবতঃ কোন সময় কোন রাজার দুর্গ ছিল তাহা না হইলে গড়ের পুষ্করিণী ও মোচড়ার গড় এ শব্দগুলি পুরুষানুক্রমে চলিয়া আসিতেছে কেন? আর ঐ 'গড়' ও গড়ের পুষ্করিণী বস্তুতঃ দৃষ্ট হইতেছে কেন?

পূর্ব্বে এই লোহাগড়া যে নামেই পরিচিত হউক না কেন আমাদের বিশ্বাস এই স্থান বহুকাল হইতে মধুমতী, নবগঙ্গা ও বানকানা নদীর দ্বারা পরিবেষ্টিত ও 'গড়' দ্বারা বিশেষভাবে সংরক্ষিত (well-fortified) ছিল বলিয়াই লোহাগড়া নাম হইয়াছে।

সীমা—যশোহর জেলার অন্তর্গত নড়াইল মহকুমার অধীন নবগঙ্গা নদীর উত্তরপূর্ব্ব কোণে লোহাগড়া গ্রাম প্রতিষ্ঠিত। লোহাগড়ার পূর্ব্বে মধুমতী, উত্তরে নবগঙ্গা, পশ্চিমে নবগঙ্গা এবং দক্ষিণে খণ্ড খণ্ড গণ্ডগ্রাম। ইহার তিন দিক প্রাকৃতিক পরিখা দ্বারা বেষ্টিত শুধু দক্ষিণাংশে ইহার কোন প্রাকৃতিক সীমা নাই।



ভাগড়ার প্রাকৃতিক দৃ

পৃঃ ৩

লোহাগড়া কাহিনী

পরিমাণ—এই গ্রামের পরিমাণ ফল দেড় বর্গ মাইল। লোহাগড়া, চারাবাড়ী, মাইটকোমড়া ও গন্ধবাড়িয়া একত্রে মিলিত হইয়াই বর্ত্তমান লোহাগড়া। চারাবাড়ী, মাইটকোমড়া ও গন্ধবাড়িয়া বাদ দিলে লোহাগড়া সদর বোধ হয় অর্দ্ধমাইলের বেশী নয়। লোহাগড়া পূর্ব্ব পশ্চিমে দীর্ঘ। প্রশস্তে ইহার পরিমাণ এক মাইলের বেশী হইবে না।

লোক সংখ্যা—লোক গণনা অনুসারে জানা যায় যে এই গ্রামের মোট লোক সংখ্যা ১০০০ জন। তন্মধ্যে পুরুষ ৩০০, স্ত্রী ৩০০, বালক বালিকা বাকী ৪০০। অকালমৃত্যু অত্যধিক বৃদ্ধি পাওয়ায় এই গ্রামের লোক সংখ্যা ক্রমশঃই হ্রাস পাইতেছে। নবগঙ্গা নদী মরিয়া যাওয়া এবং ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাবই ইহার প্রধান কারণ বলিয়া সকলেরই ধারণা ছিল, কিন্তু বর্ত্তমানে দেখিতে পাওয়া যায় যে শুধু ম্যালেরিয়া কেন কলেরা টাইফয়েড্ ও তাহার সহিত সংযোগ হইয়াছে। গ্রামবাসীর অবিবেচনা, অবহেলা, ডোবা গর্ত্তের পচা জল ও পুরুষপুরুষানুক্রমে কূপপায়খানা ব্যবহার করাই অকালমৃত্যু ও লোকসংখ্যা বৃদ্ধির অন্তরায় বলিলে অত্যুক্তি হইবে না।

প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য

প্রকৃতি দেবী চিরকালই পরিবর্ত্তনশীল। যশোহর জেলায় যে সমস্ত নদীর প্রবাহ দেখিতে পাই তন্মধ্যে মধুমতী ও নবগঙ্গার কিছু কিছু বিশেষত্ব ছিল। মধুমতী ও নবগঙ্গা দ্বারা উত্তর পূর্ব্ব ও পশ্চিমে বেষ্টিত হইয়াই এই লোহাগড়া গ্রাম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। যে নবগঙ্গা একদিন স্বচ্ছ সলিলের দ্বারা লোহাগড়ার শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়াছিল সে আর এখন তেমন নাই। লোহাগড়া হইতে নবগঙ্গা সোজা কালনার নিকট মধুমতীতে মিশিয়াছিল; কিন্তু সে অংশ বর্ত্তমানে মরিয়া গিয়াছে কারণ বানকানা নামক একটি শাখা এই স্থান হইতে নবগঙ্গার জল লইয়া কালিয়ার পার্শ্ববর্ত্তী কালীগঙ্গায় মিশাইতেছে। প্রবাদ চলিয়া আসিতেছে যে নবগঙ্গার পার্শ্ববর্ত্তী স্থানের লোকের কখনও মৎস্য দুগ্ধের অভাব ছিল না। এটা বর্ত্তমানে শুধু কথাতেই জানা যায়, বাস্তবিকপক্ষে কার্য্যতঃ দেখিতে পাওয়া যায় না। কোনদিন ছিল যখন খাদ্যদ্রব্যের দুর্গতি সর্ব্বত্র থাকা সত্ত্বেও লোহাগড়া প্রভৃতি স্থানের

লোকে কোনদিনই মৎস্য দুগ্ধের অভাব অনুভব করেন নাই, কিন্তু নবগঙ্গা দিন দিন হীনবীর্য্যা হওয়ায় সকলেই সে সুখ হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন। তত্রাচ বর্ত্তমানে যাহা কিছু আছে তাহাও যশোহর খুলনা জেলার কোন স্থানেই দৃষ্ট হয় না। এখনও ক্রিয়া কর্ম্ম উপলক্ষে বহু দূরদেশ হইতে লোকে দধি, দুগ্ধ, মৎস্য ও সন্দেশ ক্রয় করিয়া থাকেন।

দেশ "অজন্মা" হইতেছে। বর্ষাকালে গ্রাম জলে জলাকীর্ণ হয় ও ডোবা গর্ত্ত বদ্ধ জলে পরিপূর্ণ হইয়া দূষিত হইয়া থাকে। নানাবিধ রোগের আবির্ভাব হইয়াছে। দু একজন সঙ্গতিসম্পন্ন ব্যক্তি ও প্রাণের ভয়ে গ্রাম ছাড়িয়াছেন। অকালমৃত্যু বৃদ্ধি পাইয়াছে ফলে লোক সংখ্যা কমিতেছে। শস্যক্ষেত্রের উর্ব্বরতা বৃদ্ধি নাই বরং দিন দিন হ্রাস দেখা যায়। মানব সমৃদ্ধি এখানে বহুদিন লীলা করিয়াছে, বর্ত্তমানে কালের স্রোতে ইহা দূষিত হইয়াছে। গ্রাম জঙ্গলাকীর্ণ হইয়া বসতির অযোগ্য হইয়াছে কাজেই মানুষ ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইতেছে। এই নবগঙ্গা নদীই এ গ্রাম বাসোপযোগী করিয়াছিল—বাণিজ্য বিস্তারের দ্বারা গ্রামকে সমৃদ্ধিশালী করিয়াছিল—শস্য ক্ষেত্রের হরিৎছটায় এ সমৃদ্ধ পল্লীর সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিয়াছিল।

নদ-নদী অবিরতই পরিবর্ত্তনশীল। এই নবগঙ্গা যে কত গতি পরিবর্ত্তন করিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। ইহার জন্মস্থান মাথাভাঙ্গা। মাথা ভাঙ্গার একটি শাখার নামই আমাদের নবগঙ্গা। মাগুরার নিকট কুমারের সহিত মিলিত হইয়াই নবগঙ্গা পুনর্জীবিত হইয়াছে। নবগঙ্গা কুমারের জলে সঞ্জীবিত হইয়া স্বচ্ছ সলিলে উভয় কূলের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়াছে। মাগুরা, বিনোদপুর, সত্রাজিৎপুর, নহাটা, সিঙ্গিয়া, নলদী, রায়গ্রাম, লক্ষ্মীপাশা, লোহাগড়া প্রভৃতি বিখ্যাত স্থান'গুলি নবগঙ্গার ক্রীড়াভূমি।

জীবজন্তু—জীবজন্তু সম্বন্ধে লোহাগড়ায় অন্যান্য গ্রাম অপেক্ষা একটু বিশেষত্ব দেখা যায়। কেঁদো বাঘ (Leopard) প্রায় বারমাসই এখানে দৃষ্ট হইয়া থাকে। অতীতের কথা স্মরণ করিলেও আমরা জানিতে পারি যে ১৮৬৪ খৃঃ ৺বংশীধর ঘরের যে সুবৃহৎ চণ্ডীমণ্ডপ অদ্যাবধি বিদ্যমান আছে, ঐ চণ্ডীমণ্ডপের পার্শ্বস্থ প্রকোষ্ঠের সিঁড়িঘর দিয়া শীতকালের প্রাতে এক প্রকাণ্ড ব্যাঘ্র ছাদের উপর গমন করিয়া তথায় শয়ন করতঃ সুখে রৌদ্র উপভোগ করিতেছিল এমন সময়



লোহাগড়ায় ব্যাঃ

পৃঃ ৫

বাটীস্থ জনৈক স্ত্রীলোক ছাদে উঠিতেই ব্যাঘ্র দেখিয়া বিন্দুমাত্র বিচলিত না হইয়া নীরবে ছাদের দরজা বন্ধ করিয়া নামিয়া আসেন ও বাটীস্থ সকলের নিকট ব্যাঘ্রের বিষয় বর্ণনা করেন। তখন অতি অল্প সময়েই কোলাহলে গ্রামস্থ লোকজন তথায় আসিয়া উপস্থিত হন। তখনকার দিনে গাদা বন্দুকের প্রচলন বেশী থাকায় কেহ গাদা বন্দুক, কেহ বর্ষা, কেহ লাঠি, আর কেহ বা সড়কি লইয়া সিড়ির দরজায় উপস্থিত হন। জনৈক নমঃশূদ্র পালোয়ান সিড়ির দরজা খুলিয়া দিয়া ঐ ব্যাঘ্রকে আহ্বান করিতেই ব্যাঘ্র হুঙ্কার শব্দে লম্ফপ্রদান করিয়া সিড়ির দরজায় উপস্থিত লোকজন ক্ষত-বিক্ষত করিয়া নিকটস্থ জঙ্গলে (ডাক্তার নিবারণচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের বর্ত্তমান বাটীর সম্মুখে) প্রবেশ করিল। লোহাগড়ায় তখন নীল বিদ্রোহ নিবারক এক সৈন্যদল বা পল্টন (Regiment) অবস্থান করিত। গ্রামস্থ কেহ কেহ তৎক্ষণাৎ এই ব্যাঘ্রের আগমনবার্ত্তা সৈন্য শিবিরে বর্ণনা করিলে কয়েকজন সৈনিক জঙ্গলে প্রবেশ করিয়া বন্দুকের সাহায্যে ঐ ব্যাঘ্র নিহত করেন ও গ্রামস্থ সকলের বিশেষ প্রশংসাভাজন হন। পুনরায় ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে আর এক সুন্দরবনের বাঘের (Royal Bengal Tiger) অত্যাচারের কথা অদ্যাপি অনেকেরই স্মৃতিগোচরে জাগরিত আছে। পশ্চিমপাড়া সরকার বাটীর ৺দেবনারায়ণ সরকার মহাশয়ের পাঁচ বৎসর বয়স্ক একটি শিশু পুত্র সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে রন্ধনশালার সন্নিকটস্থ প্রাঙ্গন মধ্য হইতে মলত্যাগ কালীন্ এক প্রকাণ্ড ব্যাঘ্র কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়। ইতিমধ্যে বালকের ক্রন্দনধ্বনি শ্রবণ করিয়া তাঁহার মাতা রন্ধনশালা হইতে বহির্গত হইয়া চীৎকার করিতেই ব্যাঘ্র শিকার মুখে করিয়া জঙ্গলাভিমুখে দ্রুত পলায়ন করিল। তখন বালকের মাতার বিকট চীৎকার ও ক্রন্দনে তথায় বহু লোকের সমাগম হয়। রায় বাহাদুর যদুনাথের মুখে শ্রুত আছি যে তিনিও স্বর্গীয় কেদারনাথ রায় মহাশয়ের বাটী হইতে ঐ চীৎকার শ্রবণ করিয়া তথায় উপস্থিত হন। সঙ্গে সঙ্গে ৺কেদারনাথ রায়, ৺দুর্গাচরণ রায়, ৺সারদাগোবিন্দ রায় প্রভৃতি বহু লোক তথায় উপস্থিত হইয়া বালকের অন্বেষণে জঙ্গল মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন যে ব্যাঘ্র তাহার শিকার মুখে করিয়া দ্রুতবেগে ধাবিত হইতেছে এবং মুহূর্ত্ত মধ্যে তাঁহাদের দৃষ্টির অগোচরে চলিয়া যায়। যদিও কেঁদোবাঘ আজকাল

সর্ব্বত্রই দৃষ্ট হয় তথাপি ব্যাঘ্রের এরূপ ভীষণ অত্যাচারের কথা পল্লীগ্রামে বড় একটা শুনিতে পাওয়া যায় না। এই সম্পর্কে লোহাগড়ায় ব্যাঘ্র শিকারের কথা এখন পাঠককে যৎকিঞ্চিত বর্ণনা করিব। ফরিদপুর জেলান্তর্গত কাশিয়ানী নিবাসী প্রসিদ্ধ শিকারী বাবু অক্ষয়কুমার সেন ১৯১৮ খৃঃ পরপর তিন দিনে তিনটী বড় কেঁদো বাঘ (Leopard) শিকার করিয়া গ্রামস্থ সকলের ধন্যবাদার্হ হন। তৎপর আমাদের লেপ্‌ট্যাণ্ট্‌ কুমার অধিক্রম মজুমদার ১৯১৯ ও ১৯২০ খৃঃ ৺শারদীয়া পূজার সময় দুইটী বৃহদাকার কেঁদোবাঘ শিকার করিয়া শিকারে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেন ও সকলের প্রশংসাভাজন হন। পরে ১৯২৬ খৃঃ শ্রীমান মনীন্দ্রকুমার দত্ত একটি কেঁদো বাঘ শিকার করিয়া দুঃসাহসের পরিচয় দেন। অবশেষে ১৯২৮ ও ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে পঞ্চানন্দ সর্দ্দার দুইটী কেঁদোবাঘ শিকার করিয়া গ্রামবাসীকে ব্যাঘ্রের অত্যাচার হইতে রক্ষা করেন। এতদ্ব্যতীত লোহাগড়ায় অনিলকুমার সরকার ও শ্রীমান মনীন্দ্রকুমার দত্ত খাঁচা কলের সাহায্যেও ২।১টী বাঘ মারিয়াছেন। লোহাগড়া অতি প্রাচীন গ্রাম বলিয়াই এখানে বহু বড় বড় বিষধর সর্পেরও প্রাদুর্ভাব পরিলক্ষিত হয়।

শ্রীসম্পদ

দেশমাতৃকার শ্রীসম্পদ সমস্তই সন্তানের উপর নির্ভর করে। যেমন ফুলের সৌন্দর্য্য ফলে, তেমনি জননীর সৌন্দর্য্যের বিকাশ সন্তানে। কিন্তু শুধু কুসন্তানের জন্য দিয়াই আমাদের জন্মভূমি চিরদুঃখিনী। জন্মভূমি জননীর সম্মানেই সন্তানের সম্মান, জন্মভূমির শ্রীবৃদ্ধিতেই সন্তানের শ্রীবৃদ্ধি। শ্যামলা জননীর প্রস্ফুটিত হাসিমুখ কি কখনও কুসন্তান দেখিতে পারে? যেখানে মাতার শীর্ণ দেহ, ম্লান মুখ দেখিয়া সন্তানের হৃদয় করুণায় বিগলিত হয় না, অত্যাচার প্রপীড়িত ভাইএর কাতর ক্রন্দন উপেক্ষিত হয়, যেখানে স্বার্থান্ধ হইয়া সন্তানেরা পরস্পরের বিপক্ষে দণ্ডায়মান হয়, সেখানে মঙ্গলের আশা কোথায়? মাতার দারিদ্র্য দেখিয়া যেখানে সন্তান আপনাকে ধনী-মানী বিবেচনা করিতে পারে, যেখানে তুচ্ছ স্বার্থের জন্য সন্তান অন্ধ সাজিয়া বসে, যেখানে মিথ্যা-প্রবঞ্চনা, দ্বেষ-হিংসা স্থান পায় সেখানে মঙ্গল আসিতে চায় না। যে দিন সন্তানেরা আত্মবিচ্ছেদ



স্বর্গীয় বিশ্বনাথ সরকার প্রতিষ্ঠিত শিবমন্দির

পৃঃ

ভুলিয়া একমনে একপ্রাণে মায়ের পূজা করিতে শিখিবে, সেই দিন জন্মভূমির দুর্দ্দশা দূর হইবে। অভাগিনী মায়ের শ্রীসম্পদ যাহা আমরা দেখিতে পাই তাহা তাহার দুএকটি সুসন্তানের অঞ্জলি-স্বরূপ। মায়ের সম্পদ যতই তুচ্ছ হউক, সন্তানের নিকট উহা অতি মূল্যবান। বর্ণনার অযোগ্য হইলেও সন্তানের নিকট বর্ণনাতীত।

দেবমন্দির—লোহাগড়া চিরদিনই ঠাকুরের সেবার জন্য প্রসিদ্ধ। ঘরে ঘরে ৺শ্রীশ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত আছেন ও নিত্য পূজার ব্যবস্থা চলিয়া আসিতেছে। ইহা ব্যতীত ৺শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের মন্দির, ৺শ্রীশ্রীশিব মন্দির ও মধুমিলন মন্দিরে ৺শ্রীশ্রীগৌরনিতাই বিগ্রহ স্থাপিত হইয়া মহা-সমারোহে নিত্যপূজা-অর্চনা ও ভোগ রাগের সুব্যবস্থা আছে। প্রত্যেক ঠাকুরের সেবার জন্য ভিন্ন ভিন্ন দেবোত্তর সম্পত্তি নির্দ্দেশ করা আছে।

হাই স্কুল—উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় ১৯০২ সালে প্রতিষ্ঠিত হইয়া দেশের ও দশের শিক্ষা বিস্তার করিয়া আসিতেছে। বর্ত্তমানে উক্ত স্কুলে তিনশত ছাত্র অধ্যয়ন করে ও দশজন শিক্ষক অধ্যাপনার কার্য্যে নিযুক্ত আছেন। তন্মধ্যে তিনজন গ্রাজুয়েট্, দুইজন আণ্ডারগ্রাজুয়েট্, দুইজন পণ্ডিত, দুইজন এণ্ট্রান্স, বাকী একজন ম্যাট্রিকুলেশন পাশ। লোহাগড়া স্কুল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন একটি প্রথম গ্রেডের স্কুল বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। কেন না এই স্কুল হইতে বহু ছাত্র পনর টাকা বৃত্তিলাভ এমন কি প্রেসিডেন্সি বিভাগে ইংরাজী বিষয়ে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া দেশ-বিদেশে বিশেষ সুযশ অর্জ্জন করিয়াছে।

দাতব্য চিকিৎসালয়—১৯০৩ সালে দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপিত হইয়াছে। এই দাতব্য চিকিৎসালয় হইতে দেশের ও বিদেশের গরীবেরা বিনামূল্যে ঔষধ ব্যবহার করিয়া বহু দুরারোগ্য ব্যাধি হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া আসিতেছে। এই চিকিৎসালয়ের দ্বারা দেশের বিশেষ উপকার সাধিত হইয়াছে। এখানে একজন সাব্ এসিষ্ট্যাণ্ট্ সার্জ্জন্ ও একজন কম্পাউণ্ডার সর্ব্বদাই কার্যে নিযুক্ত আছেন। যিনি এই স্কুল ও চিকিৎসালয়ের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিয়া দেশের মহান উপকার করিয়াছেন—যাঁহার চেষ্টা ও যত্নে লোহাগড়ার সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সাধিত হইয়াছে, সেই মহাপুরুষের বিষয় আমরা পরে আলোচনা করিব।

বালিকা বিদ্যালয়—ইং ১৯১৭ সালে স্থানীয় বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। প্রায় পঞ্চাশটী বালিকা এই বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিয়া থাকে। সুশিক্ষয়িত্রীর অভাবে একজন বহুপারদর্শী শিক্ষক এই বিদ্যালয়ের শিক্ষকতা করিয়া আসিতেছেন। বালিকা বিদ্যালয়ের উপর আমরা গ্রামবাসীর সুদৃষ্টি আকর্ষণ করি। বালিকাদের উপরই ভবিষ্যত সন্তানের উন্নতি সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে, কেননা ইহারাই ভবিষ্যতে সন্তানের জননী হইবে। ইহাদের শিক্ষাও সেইভাবে গঠিত হওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য। মা শিক্ষিতা হইলে পুত্রও শিক্ষিত না হইয়া পারে না। আর মা অশিক্ষিতা হইলে শুধু কুসন্তানই প্রসব করিবে। সুতরাং বালিকা বিদ্যালয়ের উপর সকলেরই বিশেষ যত্ন ও দৃষ্টি থাকা একান্ত কর্ত্তব্য। এই সম্পর্কে আমি আরও দু-একটি কথা বলিয়া পাঠককে বিরক্ত করিতে ইচ্ছা করি। আজকাল বালিকাদের শিক্ষা ও স্বাধীনতা সম্বন্ধে অনেক প্রবন্ধ পড়া যায়। চারিদিকেই যেন একটা জাগরণের সাড়া দেখা যায়। এটা অবশ্যই ভাল লক্ষণ তাহাতে কোন সন্দেহ নাই, তবে অন্যান্য দেশের সহিত তুলনায় সত্য সত্যই আমাদের দেশ এখনও অনেক নিম্নস্তরে পড়িয়া আছে। শুধু আমাদের দেশ কেন, যে দেশে মহিলারা অশিক্ষিতা সে দেশের কোন উন্নতির আশা নাই, দুঃখের বিষয় অনেকে একথা উপলব্ধি করেন না। বিশেষতঃ কন্যাদের শিক্ষার মর্ম্ম পিতামাতা কমই বুঝিয়া থাকেন। এখনও দেশে একটা অন্ধবিশ্বাস সর্ব্বত্রই দৃষ্ট হয় যে, কন্যাকে শিক্ষা দেওয়া অনর্থক পয়সা নষ্ট করা—কারণ তাহারা রোজগার করিয়া আনিবে না। বর্ত্তমান সময়েও অনেককে বলিতে শুনা যায় যে, মেয়েদের আবার শিক্ষা দিয়ে কি হবে—তারা কি চাকরী ক'রবে? চাকরী যেন শিক্ষার চরম উদ্দেশ্য! মহিলাদের সম্বন্ধে লিখিবার অনেক বিষয় আছে, কিন্তু আমি আর এখন তাহা লইয়া সময় অতিবাহিত করিতে ইচ্ছা করি না। সমাজের কোন্‌স্থানে নারীর আসন স্থিরীকৃত হইবে ইহা লইয়া পুরুষ মহলে ও আজকাল একটা মহাসমস্যা উপস্থিত হইয়াছে। "আজ যাঁহারা ভাবুক ও চিন্তাশীল তাঁহারা বুঝিতেছেন যে এই নারীসমাজকে যদি মানুষ করিয়া না গড়িতে পারা যায়, তবে জাতির প্রাণপ্রতিষ্ঠা অসম্ভব, জগতের বিভিন্ন জাতির সঙ্গে ঘাতপ্রতিঘাতে নিজেদের টিকিয়া থাকা সুদূর পরাহত। তাই দেশের কল্যাণকামীর তরফ্‌ হইতে



লাহাগড়া বালিক বিদ্যালয়



যুক্ত বরদা কান্ত দত্ত।

(বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষক

পৃঃ ৯

নারী জাগৃতির জন্য চেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে।" বালিকাদিগকে একাধারে আদর্শ পত্নী, আদর্শ গৃহিণী ও আদর্শ নারীরূপে দেখিতে হইলে বাল্যাবস্থায় তাহাদের সুশিক্ষার বন্দোবস্ত করিতে হইবে।

সাধারণ পাঠাগার—লাইব্রেরী স্থাপনের প্রধান উদ্দেশ্য এই যে ইহার গ্রন্থ পাঠ করিয়া যুবকদের উদাস প্রাণে নবজীবনের সাড়া আসিবে। ইহার দৈনিক পত্র, মাসিক পত্র, এবং বহু অমূল্য গ্রন্থরাজি দ্বারা অল্প আয়াসেই 'ছাত্র-মন-তরী' গড়িয়া উঠিবে। বস্তুতঃ লাইব্রেরী আন্দোলনকে কেন্দ্র করিয়া দেশের যুবক আন্দোলন জমাট বাঁধিবে। লাইব্রেরীতে সংগৃহীত ভাল ভাল নব প্রকাশিত পুস্তক পাঠ করিয়াই দেশের যুবক যুবতী নবভাবের নূতন প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হইয়া স্বদেশের সেবায় আত্মনিয়োগ করিতে সক্ষম হইবে। স্কুল কলেজের শিক্ষার মধ্যে ছাত্রের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হয় না। লাইব্রেরীর শিক্ষাই তাদের নিরাশ প্রাণে আশার প্রদীপ জ্বালিয়া দিবে। একমাত্র লাইব্রেরীর নূতন নূতন জীবন্ত পুস্তকের ভিতর দিয়াই যুবকচিত্তে পুলকের স্পন্দন জাগায়। 'ছাত্রানাং অধ্যয়নং তপঃ'—সত্য এ প্রাচীন বাক্য। "অধ্যয়নই আজ তোমাদের তপস্যা, শুধু জ্ঞানলাভের জন্য নয়, পাণ্ডিত্যের জন্য নয়, ধর্ম্মে-সমাজে-রাষ্ট্রে যে বেড়াজাল আচ্ছন্ন হইয়া আছে সেই জাল ছিন্ন করার মত চিত্তবল এবং বুদ্ধি কৌশল আয়ত্ত করিবার নিমিত্ত আজ তোমাকে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিতে হইবে। স্বাধীনতারই জন্য আজ তোমাকে স্বাধীনতার মর্ম্মকথা জানিতে হইবে। অধ্যয়নের দ্বারাই সত্যের আলোকে তোমার প্রাণ মন বিভোর হইয়া উঠিবে—তুমি নির্ভীক হইবে"।

লোহাগড়ার সাধারণ পাঠাগারটী অনেক ভাঙ্গা গড়ার ভিতর দিয়া বর্ত্তমান অবস্থায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। সদাশয় বাবু ভুবনমোহন সরকার তাঁহার স্বর্গীয় পিতৃদেব রামনারায়ণের স্মৃতিরক্ষার্থে বর্ত্তমানে একটি পাকা দ্বিতল গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া ইহাকে পুনর্জ্জীবিত করিয়াছেন। তাঁহাকে আজ অন্তরের শত ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। তাঁহার নিকট আমরা আরও আশা করি যে তিনি যেন এই পুস্তকালয়ের সর্ব্বাঙ্গীন সৌষ্ঠব সম্পাদন করিয়া দেশের শ্রীবৃদ্ধির সহায়তা করেন। বর্ত্তমান সময়ে এই পুস্তকালয়ে পুস্তকের সংখ্যা দুই হাজার। বহু ধর্ম্মগ্রন্থ, কাব্য, মহাকাব্য, ইতিহাস, নাটক ও উপন্যাস এই পুস্তকালয়ে সংগ্রহ করা আছে। ইহা ব্যতীত দৈনিক, সাপ্তাহিক

ও মাসিক পত্রিকাদি সাধারণের পাঠের জন্য নিয়মিতভাবে আনা হইয়া থাকে। যশোহর জেলায় যে সমস্ত পুস্তকালয় আছে তন্মধ্যে লোহাগড়ার এই সাধারণ পাঠাগারই শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিতে বসিয়াছে। দিন দিন ইহার কলেবর ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে। এই সম্পর্কে বাবু হৃদয়নাথ সমাদ্দারের কথা উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না। হৃদয়নাথের সত্য সত্যই হৃদয় আছে। বহু অসুবিধার মধ্যেও তিনি এই পুস্তকালয়ের লাইব্রেরীয়ান পদে নিযুক্ত থাকিয়া যেভাবে আগ্রহের সহিত কার্য্য করিয়া আসিতেছেন তাহাতে গ্রামবাসী সকলেরই ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন।

থানা—লোহাগড়া থানার অন্তর্গত ২২১ খানি গ্রাম আছে। যশোহর জেলায় লোহাগড়া থানা একটি প্রধান থানা। এখানে দুইজন সবইনস্‌পেক্টর দেশের শান্তি স্থাপনের জন্য সর্ব্বদাই নিযুক্ত আছেন। এই থানার সাহায্যে ইহার অন্তর্গত গ্রাম সমূহে বিশেষ সুশৃঙ্খলার সহিত শান্তি বিরাজ করিতেছে।

ডাকঘর—লোহাগড়ার ডাকঘর ডাক-বিভাগের একটি ব্রাঞ্চ অফিস্। এখানে দৈনিক যে পরিমান মণিঅর্ডার ও ইনসিওর হইয়া থাকে তাহাতে সাব অফিস্ হইবার উপযুক্ত। সাব অফিস্ হইতে হইলে যে সমস্ত গুণ থাকা প্রয়োজন তদপেক্ষা ইহাতে অনেক বেশী আছে কিন্তু দুঃখের বিষয় গ্রামবাসীর ঔদাসীন্যের জন্যই ইহাকে আমরা সাব অফিস্‌রূপে দেখিতে পাইতেছি না।

ষ্টীমার ঘাট—আর, এস, এন কোম্পানী ষ্টীমার চালাইয়া দেশের বহু অর্থ শোষণ করিয়া লইতেছে। নৌকাযোগে যাতায়াত একরূপ বন্ধ হইয়া যাইতেছে। খুলনা-দৌলতপুর হইতে কালিয়া হইয়া লোহাগড়া লাইন। এই লোহাগড়া ষ্টেশন হইতে বহু যাত্রী যাতায়াত করিয়া থাকে। এই ষ্টেশনের দ্বারা কোম্পানী বিশেষ লাভবান হইয়া আসিতেছে। এখানে কোম্পানীর বার্ষিক আয় এক-লক্ষ মুদ্রার অধিক।

মোটর সার্ভিস—সম্প্রতি তিন বৎসর গত হইতে চলিল লোহাগড়া হইতে নড়াইল পর্য্যন্ত এই নয় মাইল রাস্তা মোটর সার্ভিস খোলা হইয়াছে। প্রায় পনর-বিশখানি মোটরবাস্ ও ট্যাক্সি দিবারাত্র দৌড়া-দৌড়ি করিতেছে। স্থানীয় যুবকসম্প্রদায়ের দ্বারাই ইহা পরিচালিত হইয়া

র রায় বলিক লাইব্রে



শ্রীযুক্ত হৃদয়নাথ সমাদ্দার
(লাইব্রেরীয়ান) পৃ

আসিতেছে। বাস্ ও ট্যাক্সি সংযোগে সাধারণের .নড়াইল গমনাগমনের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে।

ইউনিয়ন কমিটি—১৯১৭ খৃষ্টাব্দে লোহাগড়া ইউনিয়ন কমিটি প্রথম গঠিত হয়। লোহাগড়া, চারাবাড়ী, গন্ধবাড়িয়া, মাইট-কোমড়া, কালনা, কামঠানা, ছাতড়া, মোচড়া ও করফা লইয়া লোহাগড়া ইউনিয়ন কমিটী। প্রতি গ্রাম হইতে একজন করিয়া সদস্য মনোনীত হয়েন। সর্ব্বোপরি একজন চেয়ারম্যান্ এই কমিটীর কার্য্য নির্ব্বাহ করাইবার জন্য নিযুক্ত থাকেন। গত দশ বৎসর ধরিয়া উক্ত কমিটীর সুযোগ্য চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীনাথ মজুমদার মহাশয় নানাবিধ বিপদ ও অসুবিধার মধ্যেও যে ভাবে শ্রমশীল আগ্রহে দেশের উন্নতি করিয়াছেন ও নিজেকে সর্ব্বদাই পরহিতে নিয়োজিত করিয়াছিলেন তজ্জন্য গ্রামবাসী তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ। বহুজনের হিতের জন্য যিনি সতত সযত্ন, তিনি সকলেরই ধন্যবাদের পাত্র। গত দশ বৎসর পূর্ব্বে লোহাগড়া গ্রামের যে অবস্থা ছিল—রাস্তা-ঘাট, হাট-বাজার যেরূপ দুর্গম ছিল, ড্রেনের অভাবে ও জঙ্গলের বৃদ্ধি হেতু গ্রামের যে দুর্গতি ছিল, তাহা শুধু ইঁহার ঐকান্তিক চেষ্টা ও যত্নে দূরীভূত হইয়া বর্ত্তমানে এক নূতন হাওয়া বহিতেছে। বিশুদ্ধ পানীয় জলের অভাব টিউব ওয়েল স্থাপনের দ্বারা দূরীভূত হইয়াছে। মেথর সার্ভিসের দ্বারা হাট-বাজার পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও পায়খানা পরিষ্কারের কার্য্য চলিতেছে। বড়ই লজ্জা ও আক্ষেপের বিষয় যে গ্রামবাসী অনেকেই এখনও এই মেথরের উপকারিতা সম্যকরূপে উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। গত বর্ষে উক্ত ইউনিয়ন কমিটী ইউনিয়ন বোর্ডে পরিণত হইয়াছে এবং শ্রীযুক্ত বাবু মতিলাল সরকার উক্ত বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট্ নিযুক্ত হইয়াছেন। গ্রামবাসী প্রত্যেকেই আশা করেন যে, বর্ত্তমান প্রেসিডেণ্ট মহোদয় রাস্তায় আলোর সুবন্দোবস্ত ও মেথর সার্ভিসকে স্থায়ী করিয়া স্বদেশের হিত সাধিত করিবেন।

বাজার—লোহাগড়া বাজার যশোহর জেলায় বাজার সমূহের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। যেমন এখান হইতে বহু পরিমাণ দ্রব্যাদি বিদেশে রপ্তানী হইতেছে, তেমনই এখানে নানাবিধ মালের আমদানী ও হইয়া থাকে। পনর-বিশ গ্রামের লোক এই বাজার হইতে

দৈনিক মৎস্য দুগ্ধ ক্রয় করিয়া থাকে। সাধারণতঃ প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি কলিকাতা প্রভৃতি স্থানে না যাইয়া এ স্থানে বসিয়া সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়। বস্ত্র ও ঔষধাদির জন্য বহু দূরদেশ হইতে লোকে এই বাজারে আসিয়া থাকে। এখানে সাইকেল মেরামত ও ক্রয় করা যায়। ঘড়ি হারমোনিয়াম প্রভৃতি মেরামত হইয়া থাকে। সাইন বোর্ড লেখান, ফটো তোলান ও ছবি বান্ধাই হইয়া থাকে। অসুখের জন্য বার মাসই কমলা, বেদানা, ডালিম, ন্যাসপাতি, খেজুর, কিশমিস ও আঙ্গুর প্রভৃতি প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ ফল প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। সোডা, লিমনেড, পাউরুটী ও বিস্কুট এখানে প্রস্তুত হইয়া থাকে। বড় বড় কাঠের গোলায় পর্য্যাপ্ত পরিমাণে শাল-সেগুণ প্রভৃতি আস্ত ও চেরাই করা কাঠ পাওয়া যায়। টিন-খুটি, লোহা-লক্কর প্রভৃতি কোন জিনিষের জন্যই বিদেশে যাইতে হয় না। বাজারের মালিক স্থানীয় রায় বংশ। বর্ত্তমান লোহাগড়ার হাট ৺রামপ্রসাদ রায়ের প্রতিষ্ঠিত। প্রতি সোম ও বৃহস্পতিবারে হাট বসে। বাজার প্রত্যহ বেলা দশটায় বসিয়া থাকে। মালিকের যত্ন ও চেষ্টার অভাব না হইলে এতদিন ইহা একটি প্রকাণ্ড বন্দর বলিয়া দেশ বিদেশে পরিচিত হইত তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

ব্যাঙ্ক—তিন বৎসর হইতে চলিল লোহাগড়া বাজারে কমারশিয়াল ব্যাঙ্ক নামে একটি ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইয়াছে। স্থানীয় বহু গণ্যমান্য ভদ্র মহোদয় উক্ত ব্যাঙ্কের অংশ গ্রহণ করিয়াছেন। এই ব্যাঙ্কের মূলধন এক লক্ষ টাকা। সাধারণের সুবিধার জন্য অল্প সুদে টাকা ধার দেওয়া হয় ও টাকা আমানত রাখিয়া উক্ত ব্যাঙ্ক হইতে সুদ দেওয়া হইয়া থাকে। বর্ত্তমান বর্ষে শত করা ছয় টাকা করিয়া অংশীদারগণকে ডিভিডেণ্ড্ (লভ্যাংশ) দেওয়া হইয়াছে। উক্ত ব্যাঙ্কের কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতিকে আমরা তাহাদের যত্ন ও চেষ্টার জন্য শত শত ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। আমরা আশা করি যেন ভবিষ্যতে উক্ত ব্যাঙ্কের ক্রমোন্নতি হইয়া দেশের ও দশের মহা উপকার সাধিত হয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়

পূর্ব্বাভাস

বাঙ্গলা একাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ইংরাজী সপ্তদশ খৃষ্টাব্দের প্রথম ভাগে দিল্লীর সম্রাট্ বাদশাহ আকবরের শেষ রাজত্বকালে কমল লোচন দত্ত লোহাগড়া গ্রামে বাস করিতেন। তিনি যে সময় লোহাগড়ায় আসিয়া বাস করেন সে সময় লোহাগড়ার অবস্থা যতদূর অবগত হওয়া যায় তাহাতে অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া বলিতে পারি, যে উত্তরে খরস্রোতা নবগঙ্গা উত্তরবাহিনী হইয়া লোহাগড়ার নিম্ন দিয়া প্রবাহিত হইয়া মধুমতীতে মিশিয়াছিল এবং দুই মাইল পূর্ব্বে মধুমতী উত্তাল তরঙ্গ তুলিয়া দক্ষিণ দিকে ধাবিত হইতেছিল। পশ্চিমে বঙ্কার নালা * বর্ত্তমান বানকানা নবগঙ্গা হইতে কালিয়ার নিম্নের খালের সহিত সংযুক্ত থাকিয়া লোহাগড়ার স্বাস্থ্য সম্পাদনে যথেষ্ট সহায়তা করিতেছিল, এ সময় বারাষিয়া নদী কালনার নিম্নে মধুমতী নাম ধারণ করিয়া প্রবল পরাক্রমে প্রবাহিত ছিল এবং কালনা হইতে শিরগ্রাম পর্য্যন্ত যে নদী মধুমতী নামে প্রসিদ্ধ উহা সে সময় এলেঙ্খালির খাল নামে অভিহিত ছিল। গড়াই যে স্থানে বারাষিয়া নাম ধারণ করিয়াছে সে স্থান হইতে কালনা পর্য্যন্ত মধুমতীর সহিত যে খাল সংযুক্ত ছিল তাহাই কালে ভাঙ্গিয়া বড় হইয়া মধুমতী নামে অভিহিত হইতেছে। বারাষিয়া দিন দিন ক্ষীণ কলেবরা হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছিল, বর্ত্তমানে বারাষিয়া মরিয়া গিয়া স্থানে স্থানে শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। নবগঙ্গা, বারাষিয়া ও মধুমতী যে স্থানে মিলিত হইয়াছে উহার নাম কীর্ত্তনখোলা, অর্থাৎ যে সময় গড়াই নদী বারাষিয়া ও মধুমতী এই দুইভাগে বিভক্ত হইয়া কালনার নিম্নে আসিয়া মিলিত হইয়াছিল এবং নবগঙ্গা লোহাগড়ার উত্তর দিয়া ঐ মিলিত স্থানে সংযুক্ত হইয়াছিল সে সময় ঐ ত্রিমোহনাকে কীর্ত্তনখোলা বলিত। ঐ স্থানে বর্ষার প্রারম্ভ হইতে শেষ

---

* এই বঙ্কা কে তাহা জানা যায় না তবে নবগঙ্গা মরিয়া যাওয়ায় এই বঙ্কার নালা বর্ত্তমান বানকানাতে পরিণত হইয়াছে।

পর্য্যন্ত তিন নদী জলধারার খরস্রোতের উত্তাল তরঙ্গ তুলিয়া কুলুকুলু নিনাদে নৃত্য করিতে করিতে দক্ষিণমুখী হইয়া চতুর্দ্দিকে কীর্ত্তনের সুর তুলিয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া প্রবাহিত হইত। কত শত শত মাল বোঝাই কিস্তী নৌকা, কত শত শত যাত্রীবাহী নৌকা ঐ উত্তাল তরঙ্গে পড়িয়া অসহায় অবস্থায় আরোহী সহিত নিমজ্জিত হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। ভয়ে ঐ স্থান দিয়া নৌকাযোগে যাতায়াত করা অত্যন্ত কষ্টকর ছিল এ কারণ বহুকাল ধরিয়া কীর্ত্তনখোলা অতীব ভীতিপ্রদ স্থান ছিল। বর্ত্তমানে উহা ভরাট হইয়া মরিয়া চড়া পড়িয়া গিয়াছে। তখন লোহাগড়া এতই স্বাস্থ্যকর ছিল যে সাধারণতঃ যশোহর জেলায় ইহাকে দারজিলিং বলিলেও অত্যুক্তি হইত না। ৭০।৭৫ বৎসর পূর্ব্বে জেলা কলেক্টরেরা বোটে এ স্থান পরিদর্শন করিতে আসিয়া সুখ স্বচ্ছন্দ ভোগ করিয়া বলিতেন যে লোহাগড়া যশোহর জেলায় দারজিলিং। প্রবাদ এই লোহাগড়া নিবাসী রায় বংশোদ্ভব ধর্ম্মপ্রাণ ৺গিরিধর রায়ের হাজারমনি ত্রিশ চল্লিশখানা বড় বড় চালানি নৌকা এক সময় ঝড়েতে নবগঙ্গায় ডুবিয়া যাইয়া নবগঙ্গা নদীতে চড়া পড়িয়া যায় এবং তৎপর হইতে নবগঙ্গা মরিয়া যায়। প্রায় পঁচিশ ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে ঐ নৌকার নিদর্শন স্বরূপ পনর ষোল হাত মাটীর নীচে একখানা লোহাগড়া বাজার ঘাটে ও অপর খানা রাজঘাটে দৃষ্ট হইয়াছিল। বর্ষাকালে লাল-জল গ্রাম ও মাঠের উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়া গ্রাম ও মাঠের আবর্জ্জনা দূরীভূত করিয়া নূতন পলিমাটী পড়িয়া গ্রামকে ব্যাধিশূন্য করিয়া দিত এবং মাঠকে সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা করিয়া দেশের শ্রীসম্পদ বৃদ্ধি করিত কিন্তু বর্ত্তমানে সে দিন নাই। যে দিন গড়াই নদীর উপর কুষ্টিয়ার নিম্নদেশে রেলপুল প্রস্তুত হইয়াছে তাহার কিয়ৎকাল পর হইতেই গড়াই নদী ক্রমে ভরাট হইয়া চড়া পড়িয়া আসিতেছে এবং লালজল গ্রাম ও মাঠের উপর আদৌ দৃষ্ট হয় না। ফলে ফসলাদি আর দেশে সেরূপ জন্মায় না। এক শত বৎসর পূর্ব্বে এদেশে এক পাখি জমীতে তিন সলি ধান্য জন্মিত বর্ত্তমানে সে স্থলে পাঁচ সাত মন অর্থাৎ দেড় সলি ধান্যের অধিক জন্মে না। সেই সময় এক টাকায় তিন চারি মন ধান্য পাওয়া যাইত, বর্ত্তমানে এক মনের মূল্য তিন চার টাকা। তখন এক টাকা একমন আমন চাউলের মূল্য ছিল, বর্ত্তমানে উহা পাঁচ ছয় টাকার কম নহে। তখনকার দিনে এক সের

উৎকৃষ্ট গব্য ঘৃতের মূল্য ছিল দুই আনা দশ পয়সা, বর্ত্তমানে তিন টাকা, ভাল সরিষার তৈল দুই আনা বর্ত্তমান সময়ে আট আনা, দুগ্ধ প্রতি সের পয়সা পয়সা, বর্ত্তমানে গড়পড়তায় দুই আনা দশ পয়সা, অবশেষে ইলিশ মৎস্যের হালি ছিল চার পাঁচ পয়সা, বর্ত্তমান সময়ে উহার একটির মূল্য আট আনা দশ আনা। সুতরাং দেশে ঘোর পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে এ পরিবর্ত্তনের মূল কারণ গ্রাম ও মাঠে লালজল দৃষ্ট হয় না এবং বড় বড় নদী মরিয়া গিয়াছে।

আজকাল যেরূপ রাস্তা ঘাটের প্রাচুর্য্যে যাতায়াত যথেষ্ট সুগম হইয়াছে পূর্ব্বে এমন কিছু ছিল না, বরং নৌকাযোগেই সর্ব্বত্র গমনাগমন করিতে হইত। বর্ত্তমানে যে সমস্ত রাস্তা আছে উহার অধিকাংশই খাল ছিল। বর্ষাকালে নৌকা যোগে গ্রামবাসী গৃহ হইতে গৃহান্তরে যাতায়াত করিত। রাস্তা বলিতে বিশেষ একটা কিছু ছিল না—অধিকাংশ স্থানই জঙ্গলাকীর্ণ ছিল। এ সময় লোকে দীর্ঘজীবী হইত, দেশে ব্যাধি ছিল না বলিলেও হয়। হরিহরনগরের কবিরাজদ্বয় আনন্দচন্দ্র সেন ও মহিমাচন্দ্র সেন এই লোহাগড়া গ্রামে চিকিৎসা করিতেন। বর্ত্তমান সময়ের মত বহু রোগের প্রাদুর্ভাব ও বহু ডাক্তার হইয়া চিকিৎসা বিভ্রাট ঘটিত না। তবে ৭৬ বৎসর পূর্ব্বে ১২৫৯ সালে একবার মড়ক লাগিয়া এ গ্রামের বহুতর লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ঐ বৎসর কলেরাতে বোধ হয় গ্রামের অর্দ্ধেক লোক মরিয়া গিয়াছে। ৭০।৭৫ বৎসর পূর্ব্বে গ্রামে যে লোক বাস করিত বর্ত্তমানে তাহার একপঞ্চমাংশ লোক নাই, অধিকাংশ বসতবাটী ছাড়াভিটায় পরিণত হইয়া বন জঙ্গলে পরিপূর্ণ রহিয়াছে। মধুমতী নবগঙ্গা ও বানকানা নদী প্রবাহিত থাকিয়া এস্থানে ও পার্শ্ববর্ত্তী স্থান সমূহের সর্ব্বপ্রকারে স্বাস্থ্যের ও শস্যাদির উন্নতি সাধন করিয়াছে। বর্ত্তমানে এমন কোন ব্যাধি নাই যাহা বার মাস প্রতি গ্রাম আক্রমণ না করিতেছে।

বর্ত্তমান সময়ে স্বাস্থ্য সম্পর্কে সে অতীত গৌরব করিবার এদেশবাসীর কিছুই নাই। যে যে স্বাভাবিক কারণে দেশ স্বাস্থ্যকর ছিল বর্ত্তমানে তাহা না থাকায় এবং অন্যান্য উপায়ে তাহা রক্ষা করিবার চেষ্টা না করায় দেশ ধ্বংসমুখে অগ্রসর হইতেছে। স্বাস্থ্যের তিনটী প্রধান জিনিষ রৌদ্র, বাতাস ও জল ইহার কোনটীর অভাব বা দুষিত হইলে স্বাস্থ্য অবশ্যই সে স্থান পরিত্যাগ করিবে ইহা সকলেই অবগত আছেন। বর্ত্তমানে প্রতিগ্রাম

বনজঙ্গলে পরিপূর্ণ থাকায় গ্রামে অধিকাংশ সময় রৌদ্র পাওয়া যায় না। অধিকাংশ বসত বাটীর উপর বেত, বাঁশ, আগাছা ও অস্বাস্থ্যকর জঙ্গলের মধ্যে স্থানে স্থানে মলমূত্র পরিত্যাগের স্থান নির্ব্বাচন করিয়া গ্রামবাসিগণ সর্ব্বদা দূষিত দুর্গন্ধময়, বাতাস গ্রহণ করিতেছেন। নদী পুষ্করিণী প্রভৃতিতে অপরিষ্কার, আবর্জ্জনা, ময়লা নিক্ষেপ করিয়া জল দূষিত ও কলুষিত করিয়া তাহাই পানীয়ের জন্য ব্যবহার করিতেছেন। ইহার ফলে দেশে বারমাস সমানভাবেই কলেরা, ম্যালেরিয়া, বসন্ত, টাইফয়েড্ প্রভৃতি কঠিন কঠিন ব্যাধির আক্রমণে দেশ ক্রমশঃই ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইতেছে। স্বাস্থ্য বিষয়ে বাঙ্গালী যেরূপ উদাসীন এরূপ বোধ হয় অন্য কোন জাতি জগতে দৃষ্ট হয় না। কি শিক্ষিত কি অশিক্ষিত, কি পুরুষ কি নারী, কি ধনী কি নির্ধন সকলেই এ বিষয়ে একসুরে বাঁধা।

কি বিদ্বান্ কি মূর্খ; কি এম, এ, বি, এল, কি বি, এ, বি, এল,; কি ডাক্তার কি মাষ্টার; কি বিদ্যাভূষণ কি ন্যায়লঙ্কার সর্ব্বোপরি যাহারা লক্ষপতি তাহারাও স্ব স্ব বসতবাটী আস্বাস্থ্যকর বনজঙ্গলে পরিপূর্ণ করতঃ স্থান নির্ব্বাচন না করিয়া পায়খানা করিয়া গ্রামে গ্রামে মহামারীর বীজ ছড়াইতেছেন ইহারই ফলে দেশ নানাবিধ ব্যাধি কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া জনমানবশূন্য হইতে বসিয়াছে। বোধ হয় দশ বৎসর এরূপ চলিতে থাকিলে এদেশ আর একটি সুন্দরবনে পরিণত হইবে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি এ সম্বন্ধে সকলেই উদাসীন। ধ্বংসের দিকে অগ্রসর হওয়া যখন সকলেরই বাঞ্ছনীয় তখন উহা সাধন করিতে বিলম্ব হইবে না।

স্বাস্থ্যের অমূল্য সম্পদ ভগবানের অযাচিত দান। যে তিনটী প্রধান জিনিষ যাহা হিন্দুরা অতি প্রাচীনকাল হইতে ভগবানের বিভূতি স্বরূপে পূজা করিয়া আসিতেছেন, তাহারই প্রতি যখন বর্ত্তমান পাশ্চাত্য শিক্ষিতাভিমানী বাঙ্গালী জাতির দারুণ ঘৃণা ও অবহেলা গ্রামে গ্রামে প্রতি বাড়ীতে দেখিতে পাই তখনই মনে হয় যে স্বাস্থ্যের প্রতি এই জ্ঞানকৃত অবহেলার জন্য যে মহাপাপ, সেই মহাপাপের ফলে এ জাতি অবশ্যই ধ্বংস হইয়া যাইবে।

চারিদিকে দেশের প্রাকৃতিক অবস্থা ও দেশবাসীর চরিত্র অনুসন্ধান করিয়া ইহাই বিশেষভাবে উপলব্ধি হয় যে সেই সময় উপস্থিত হইয়াছে। গ্রামের অধিকাংশ জনপ্রাণিবিরল বসতবাটী যাহা কিছু কিছু দেখা যায়

তাহাও বনজঙ্গলে আবৃত এবং তন্মধ্যে মল-মূত্র পতিত হওয়ায় গ্রাম দূষিত গন্ধে সর্ব্বদাই ভরপুর। পুষ্করিণীর জল একেবারেই অব্যবহার্য্য হইয়াছে। নদী খাল শুষ্ক হইয়া গিয়াছে, যাহা কিছু আছে তাহাতেও অনেক সময় গলিত শব ও মড়া ভাসিয়া যাইতে দেখা যায়।

বর্ত্তমান সময়ে "কচুরীপানা" নামক এক জলজ উদ্ভিদ এদেশে আসিয়া যেমন স্বাস্থ্য তেমনই ফসলের অনিষ্ট করিয়া গ্রামবাসীকে ঘোরতর বিপদ-গ্রস্ত করিয়াছে। উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিতাভিমানী যুবকবৃন্দ দীর্ঘজীবন লাভ করিবার জন্য এদিকে একবার দৃষ্টিপাত করিবেন কি? দীর্ঘজীবী হইয়া সুখ স্বচ্ছন্দ ভোগ করাই মানুষের প্রথম ও প্রধান আবশ্যক বস্তু, তাহাই যখন লোকে অনায়াসে অবহেলা করিতেছে তখন আর এ দেশের মঙ্গল নাই, একথা ধ্রুব। লোহাগড়া ও নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহ স্বাস্থ্য সম্বন্ধে বহুকাল হইতেই শ্রেষ্ঠ স্থান বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়া আসিতেছিল, বর্ত্তমানে এই সকল স্থান অবনতির চরম সোপানে উপনীত।

পূর্ব্বে এই লোহাগড়া গ্রামে শক্তিসম্পন্ন বড় বড় পালোয়ান জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এখন আর তেমন দৃষ্ট হয় না। ৺রামপ্রসাদ রায় ও ৺দর্পনারায়ণ মজুমদারের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বংশ পরিচয় কালে এই ব্যক্তিদ্বয়ের অত্যধিক শক্তি ও বলের কথা উল্লেখ করিব। প্রায় একশত বৎসর পূর্ব্বে যখন দেশের এরূপ অবস্থা ছিল তখন তিন শত বৎসর পূর্ব্বে উহা অপেক্ষাও যথেষ্ট পরিমাণে যে সর্ব্ব বিষয়ে বিশেষ উন্নত ছিল তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। এই তিন শত বৎসর পূর্ব্বে কমললোচন নবগঙ্গা নদীর দক্ষিণ তীরে নদীর নূতন চড়ার উপরই বাসস্থান নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। লোহাগড়ার যে অংশে তাঁহার বংশধরগণ বর্ত্তমানে বাস করিতেছেন তাহার উত্তর দিক দিয়া নবগঙ্গা নদী প্রবাহিত ছিল, ইহা দেখিয়া বিশেষভাবে উপলব্ধি করা যায় যে তিন শত বৎসর পূর্ব্বে নবগঙ্গা নদীর দক্ষিণ পাড়ে বালুকাময় নূতন চড়ার উপর বাসস্থান নির্দ্দেশ করিয়া নিকটে কৌলিন্য প্রধান লক্ষ্মীপাশা, জয়পুর, কাশীপুর ও মল্লিকপুর প্রভৃতি সামাজিক প্রধান স্থান দেখিয়াই লোহাগড়া বাসস্থান মনোনীত করিয়া থাকিবেন।

এ সময় মহারাজ প্রতাপাদিত্য বর্ত্তমান খুলনা জেলার সুন্দর বনে যশোহর নগরে রাজত্ব করিতেছিলেন কিন্তু লোহাগড়া প্রভৃতি স্থান যে তাঁহার অধিকার-

ভুক্ত কখনও হয় নাই একথা বলা যায় না। মহারাজ প্রতাপাদিত্য দস্যু, তস্কর, মগ্, ফিরিঙ্গিদিগের অত্যাচার হইতে দেশকে রক্ষা করিলেও, নবগঙ্গা তীরে মগ্, দস্যুর অত্যাচার বড় কম হয় নাই। এখনও ছাতড়া, মোচড়া, কালনা, ধোপাদহ, চোরখালি, কচুবাড়িয়া প্রভৃতি গ্রামে মগো সাহা, মগো কায়স্থ, মগো বারুই প্রভৃতি বসতি করিতেছে। ইহার দ্বারা প্রমাণ হয় যে এদেশেও যথেষ্ট অত্যাচার হইত।

সমস্ত ভারতবর্ষ বৌদ্ধধর্ম্মের প্লাবনে বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী হওয়ায় ভারতে সর্ব্বত্র তাহার নিদর্শন—মন্দির, প্রতিমূর্ত্তি প্রভৃতি কিছুনা কিছু প্রাপ্ত হওয়া যায়, কিন্তু এদেশে বৌদ্ধধর্ম্মের কোন নিদর্শনই দৃষ্ট হয় না এবং নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে কিছু আছে বলিয়াও অবগত নহি। খুলনা জেলার বহুস্থানে বৌদ্ধ স্তুপ বর্ত্তমানেও দৃষ্ট হইয়া থাকে, কিন্তু যশোহর জেলার এই অংশে কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। এজন্য বৌদ্ধধর্ম্মের প্লাবন এ স্থানে পৌছিয়াছিল কিনা সন্দেহ।

কমললোচনের বংশধরদিগের অনেকের বাটীতেই বহুপ্রাচীন সময়ে চড়ক-পূজা (দেল) প্রচলিত ছিল। বৌদ্ধদিগের ধর্ম্মপূজাই কালক্রমে চড়কপূজারূপে পরিণত হইয়াছে—ইহা নিঃসন্দেহরূপে প্রমাণ হইয়াছে। ইহাতে অনুমান হয় যে কমললোচনের পূর্ব্বপুরুষেরা বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী হইতেও পারেন, তবে ইহার সত্যাসত্য নিরূপণ করা কঠিন। এসময় বঙ্গদেশ বারভূঁয়ার রাজস্বাধীন শাসিত হইত। লোহাগড়া প্রভৃতি স্থান চাক্‌লা ভূষণার অন্তর্গত ছিল। তখন ভূষ্‌ণায় মুকুন্দরাম রায় রাজত্ব করিতেন। বাদশাহ জাহাঙ্গীরের সময় ১৬০৮ খৃষ্টাব্দে ইস্‌লাম খাঁ যখন বঙ্গের শাসনকর্ত্তা তখন মুকুন্দরাম রায় রাজত্ব করিতেন। এসময় কমললোচন লোহাগড়া নিজ অধিকারে লইয়া বাস করিতেছিলেন। কমললোচন যে স্থানে বাস করেন তাহা ব্যতীত আর কত সম্পত্তি তিনি ভোগ দখল করিতেন তাহা জানিবার উপায় নাই কারণ তাহার কোন দলিল পত্রাদিও নাই। কমললোচনের পৌত্র কৃষ্ণচন্দ্র দত্ত ও চন্দ্রশেখর দত্ত নবাব সরকারে চাকুরী করিয়া কতকগুলি মৌজার ভূম্যধিকার লাভ করিয়া নবাব প্রদত্ত খেতাব 'মজুমদার' উপাধি প্রাপ্ত হন এবং এসময় উঁহারা যে সমস্ত সম্পত্তি করিয়াছিলেন তাহা "নওয়ারার মহাল" বলিয়া খ্যাত।

ফরিদপুর জেলার বেনেবৌর রায়চৌধুরীগণ ঐ নওয়ারার মহালের জায়গীরদার ছিলেন। নবাব সরকারের যুদ্ধে রণতরী বা রসদবাহী নৌকা এবং দেশ হইতে দস্যু, তস্কর, দূর করিবার সাহায্যে নৌকা সরবরাহ করিবার জন্যই এই জায়গীর। এই নওয়ারার মহাল হইতে রায়চৌধুরীদের অধীন কৃষ্ণচন্দ্র, চন্দ্রশেখর প্রভৃতি তালুকদার ছিলেন, নির্দ্দিষ্ট কর ও নৌকা সরবরাহ করিয়া সম্পত্তি ভোগ দখল করিতেন। এই সময় হইতেই দত্ত মজুমদার বংশীয়েরা তালুকদার বলিয়া খ্যাত। ১০৫৯ বঙ্গাব্দে যে কৃষ্ণচন্দ্র, চন্দ্রশেখর জীবিত ছিলেন তাহা দলিলপত্র হইতে অবগত হওয়া যায় এবং তালুকদার কথাও সে সব দলিলপত্রে প্রাপ্ত হওয়া যায়, ইহার পূর্ব্বের কোন দলিলাদি আমরা দেখিতে পাই না।

যখন সাজাহান বাদশাহ হইয়া ১৬২৮ খৃষ্টাব্দে কাশিমখাঁকে বাঙ্গলার নবাব করিয়া প্রেরণ করেন তখন ভূষণা সংগ্রাম সিংহের জায়গীর ছিল। তিনি বঙ্গীয় নওয়ারার বিভাগে অধ্যক্ষ হইয়া দেশ হইতে দস্যু তস্কর দূরীভূত করেন। ভূষণার অন্তর্গত নলদী-পরগণায় এই নওয়ারার মহালেই মৌদগল্য গোত্র বংশীয় কমললোচন সর্ব্বপ্রথম লোহাগড়া গ্রামে বাসস্থান নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন।

১৭৯৩ খৃঃ লর্ড কর্ণওয়ালিশের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় বেনেবৌর রায়চৌধুরীদের "নওয়ারার মহালে"র জায়গীর সত্ব লোপ হইয়া যায়। কমললোচন দত্তের অধস্তন ৬ষ্ঠ পুরুষ দর্পনারায়ণ মজুমদার ও দত্ত-মজুমদার বংশীয় অন্যান্য সকলে ঐ সময় নিজ নিজ নাম খারিজ করিয়া যশোহর কালেক্টরীতে তালুক সৃষ্টি করিয়া তালুকদার হন।

১৭৬৫ খৃঃ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বাদশাহ সাহআলমের নিকট হইতে বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার দেওয়ানী গ্রহণ করেন। তখন দেশের অর্থ পড়িল ইংরাজের হস্তে এবং শাসন থাকিল অকর্ম্মণ্য নবাবের হস্তে। এসময় জোর জবরদস্তি করিয়া নিরীহ প্রজার নিকট হইতে অতিরিক্ত অর্থ আদায় করিতে থাকায় প্রজাকুল নিঃস্ব ও নিরন্ন হইয়া পড়িল। ১৭৬৯ খৃঃ (১১৭৬ সালে) অনাবৃষ্টি হইয়া দেশে ফসল অজন্মা হওয়ায় 'ছিয়াত্তরে মন্বন্তর' নামে ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেশে উপস্থিত হইয়া বঙ্গের এক তৃতীয়াংশ লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল। এসময় ৺বৈষ্ণবদাস মজুমদার জীবিত ছিলেন এবং তিনিও এ দারুণ দুর্ভিক্ষের বিভীষিকা দর্শন করিয়াছিলেন।

এসময় ভূষণায় ফৌজদারী দেওয়ানী মোকদ্দমা হইত এবং রাজকরাদি ভূষণায় দাখিল করিতে হইত। ১১৮৮ সালে (ইং ১৭৮১ খৃঃ) যশোহরের নিকট মুরলীতে একটি আদালত স্থাপিত হয় ও জেলা ভূষণা, সাহউজিয়াল, যশোহর, মহম্মদসাহি ও সৈদপুর পরগণা এই আদালতের এলেকাভুক্ত হয়। তখন যশোহর, খুলনা, ফরিদপুর উহার শাসনাধীন ছিল এবং টিলম্যান্ হেঙ্কেল্ সাহেব এখানে ইংরাজ আমলের জজ-ম্যাজিষ্ট্রেট্ নিযুক্ত হইয়া আসেন। জজ-ম্যাজিষ্ট্রেট হইলেও দেওয়ানী মোকদ্দমা ব্যতীত ফৌজদারী বিচারভার তাহার উপর ন্যস্ত ছিল না, উহা ছিল নবাবের কর্ম্মচারীর উপর। পরে ১৭৮৬ খৃঃ বা ১১৯৩ সালে যশোহর একটি জেলারূপে পরিণত হয় এবং হেঙ্কেল্ সাহেবই উহার প্রথম কালেক্টর। তখন ভূষণা নলদী পরগণা সহ নূতন জেলা যশোহরের অধীন করিয়া দেওয়া হয়।

১৪২৬ ও ১৪৫৭ খৃঃ মধ্যে গৌড়ের রাজা নসীরুদ্দীন মহম্মদশা যশোহরের উত্তরভাগ নিজ নাম 'সরকার মামুদাবাদ' নামে বিভাগ করেন। সম্রাট আকবরের সময়ে সরকার মামুদাবাদের অধীন ৮৮টী পরগণা ছিল। ১৭২২ খৃঃ নবাব মুর্শীদকুলিখাঁর সময় ভূষণাকে একটি চাকলায় পরিণত করা হয় এবং তাহার অন্তর্গত সরকার মামুদাবাদ, পরগণা ফতেয়াবাদ, পরগণা নলদী এবং অন্যান্য পরগণা। চাকলা ভূষণার জমিদারীতে রাজা সীতারামই রাজত্ব করিতেন; উহা ফরিদপুর, যশোহর ও খুলনা জেলার অংশ লইয়া বিস্তৃত ছিল। নলদী পরগণা, রাজা সীতারামের জায়গীর ছিল। রাজা সীতারামের পতনের পর ১৭১৪ খৃঃ ভূষণা জমিদারী নাটোর রাজার সহিত বন্দোবস্ত হয় এবং পরগণা নলদী ও নাটোরের জমিদারীভুক্ত হইয়া যায়। ১৮০১ খৃঃ নলদী পরগণার গবর্ণমেণ্ট রাজস্ব বাকী পড়ায়, পাইকপাড়ার দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের বংশধরগণ উহা খরিদ করিয়া অদ্যাবধি ভোগ দখল করিতেছেন। ১৮১১ খৃঃ নদী মধুমতী যশোহরের পূর্ব্বসীমানা স্থির হয়। (তৎপূর্ব্বে ১৭৮৭ খৃঃ ফরিদপুর যশোহর হইতে বাহির হইয়া নূতন জেলায় পরিণত হয়)।

১৭৬৪ খৃঃঅব্দে মেজর রেনেল কলিকাতা হইতে ফরিদপুর যাইবার পথে বর্ত্তমান মধুমতী অর্থাৎ বোয়ালমারী হইতে কালনা পর্য্যন্ত যে নদী তাহার পরিবর্ত্তে ঐ স্থানে এলেখালী নামে একটি খাল দেখিয়াছিলেন, তাহা তিনি

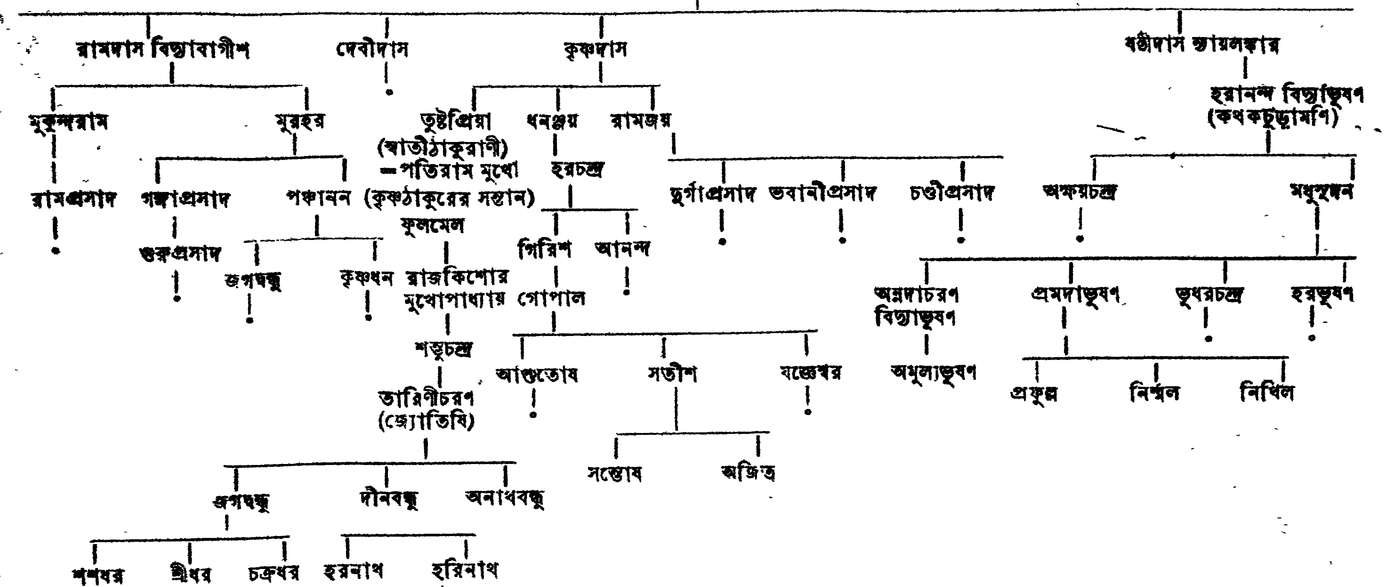
ঘোড়ায় পার হইয়া যান। এখনও মধুমতীর অংশ বিশেষ এলেখালী নদী নামে পরিচিত আছে। কোন সময় পদ্মানদী যশোহরের পূর্ব্বসীমানা ছিল। বহু পরে ১৮৬১ খৃঃ নড়াইল মহকুমা স্থাপিত হয়; কিন্তু ১২৩৯ সালে (খৃঃ ১৮৩২ সালের পূর্ব্বে) লোহাগড়া মহকুমা হওয়া স্থির হইয়া মুনসেফী আদালত স্থাপিত হইয়া বহু দিন মোকদ্দমা মামলা বিচারাদি চলিতেছিল। লোহাগড়া মুনসেফী আদালতে স্থানীয় তহবিলদারদিগের সহিত মণ্ডল (সাহা) দিগের এক ঘোরতর মামলা হইয়াছিল, তাহার কাগজপত্র এখন ও বর্ত্তমান দেখিতে পাই। ইহা ব্যতীত নিম্নলিখিত মোকদ্দমা স্থানীয় মুনসেফী আদালতে মীমাংসা হইয়াছে ও তাহার কাগজপত্র এযাবৎকাল ৺তারাপ্রসন্ন মজুমদার মহাশয়ের বাটীতে যত্নে রক্ষিত আছে। ১২৪৬ সালে ৺হরিশ্চন্দ্র মজুমদারের সহিত রথের রাস্তা লইয়া ৺গুরুপ্রসাদ রায়ের মোকদ্দমা, ১২৬৪ সালে দত্ত-মজুমদারের সহিত ৺তারাপ্রসন্ন মজুমদারের খাজনার হারা-হারির মোকদ্দমা ও ১২৬৭ সালে পুনরায় রাস্তার মোকদ্দমার বিচার হইয়া ১২৭০ সালে এই আদালত নড়াইল উঠিয়া যায়। ১৮৮২ খৃঃ খুলনা ও বাগেরহাট যশোহর হইতে পৃথক হইয়া নূতন জেলায় পরিণত হয়। ১৫৮২ খৃঃ রাজা টোডরমল পরগণা বিভাগ এবং জমিদারী বন্দোবস্ত করেন। ১৬৫৮ খৃঃ সুলতান সুজার সময় পুনরায় বন্দোবস্ত হয়। ১৭২২ খৃঃ মুর্শিদকুলিখাঁর সময় ও বন্দোবস্ত হয়। ১৭২৮ খৃঃ সুজাউদ্দীন খাঁ বন্দোবস্ত করেন।

১৭৭৭ খৃঃ পাঁচসনা বন্দোবস্ত, ১৭৯০ খৃঃ দশশালা বন্দোবস্ত ও ১৭৯৩ খৃঃ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হয়। এই সময় তালুকদারগণ জমিদারদিগের অধীনতা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া নিজ নিজ নাম খারিজ করিয়া গবর্ণমেণ্ট অধীন খারিজাতালুক সৃষ্টি করেন। ১৯২০—১৯২৪ খৃঃ ডিষ্ট্রীক্ট সেটেলমেণ্ট হয়। যশোহর জেলায় গবর্ণমেণ্ট রাজস্ব, ভূমির উপর প্রতি একরে, নয় আনা পাঁচ পাই। প্রজার কর প্রতি একরে ২৲ টাকা।

ইং ১৯২১ সালের লোক গণনায় যশোহরে লোকসংখ্যা ছিল ১৭২২২১৯, তন্মধ্যে পুরুষ ৮৯৩৫৯২, স্ত্রী ৮২৮৬২৭। ইং ১৯১১ সালে ছিল ১৭৫৮২৬৪। লোহাগড়া থানায় (আলফাডাঙ্গা বাদ) ১৯২১ সালে ছিল ৯৪৮৪৩, তন্মধ্যে হিন্দু পুরুষ ২০২৮৩, স্ত্রী ২০৭৬১। মুসলমান পুরুশ ২৭৪৯৬, স্ত্রী ২৬২৯৫।

লোহাগড়া থানায় ১৯১২—১৯২১ সাল পর্য্যন্ত জন্ম ২৮৫৯৩, মৃত্যু ২৮২৭৬। যশোহর জেলায় ৩৭২৬ খানা মৌজা আছে। লোহাগড়া থানান্তর্গত ৯৭৫ খানা মৌজা ও ২২১ খানি গ্রাম আছে।

ভাবরাসুর হইতে লোহাগড়া আগত আখণ্ডল ভট্টাচার্য্য বংশের বংশতালিকা। (ক)



(খ)

- রুচিরাম চক্রবর্ত্তী
  - রুদ্রেশ্বর
    - রাজারাম
      - রাজচন্দ্র
        - জগমোহন
          - ভাগিনেয় কালাচাঁদ মুখোপাধ্যায় = বরদাময়ী
          - ভ্রাতা হারাধন গঙ্গোপাধ্যায়
            - বিভূতিভূষণ
              - মনোরঞ্জন
                - দুলালী
                - মানিক
              - বিনয়
                - রতন
              - মৃণালিনী = বিরাজমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (জয়পুর)
                - পুত্র
              - স্নেহলতা = যতীন বন্দ্যোপাধ্যায় (জয়পুর)
                - পুত্র
              - সত্যভূষণ
              - উর্ম্মিলা
              - বলাই (মৃত)
        - কমলাকান্ত
      - কৃষ্ণচন্দ্র
        - রামচাঁদ
          - হরিনারায়ণ ভট্টাচার্য্য
            - গোপাল গোবিন্দ = ক্ষীরোদা সুন্দরী
            - জগদ্বন্ধু বিদ্যাবিনোদ
              - কালিদাস
              - কুমারেশ
              - প্রফুল্ল
              - কালিকৃষ্ণ
              - সুশীল
    - দুর্গারাম বাচস্পতি
      - রামকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী
        - রামনিধি

তৃতীয় অধ্যায়

(বংশ পরিচয়)

ব্রাহ্মণ বংশ

সিদ্ধপুরুষ রামভদ্র সিদ্ধান্ত

কমললোচন মোগল সম্রাট্ আকবর শাহের সমসাময়িক একথা পাঠক পূর্ব্বেই অবগত আছেন। ইহার পূর্ব্বের আর কোন ইতিবৃত্ত অনুসন্ধানে জানা যায় না। কমললোচন লোহাগড়া দত্ত-মজুমদার বংশের প্রতিষ্ঠাতা। এই গ্রামের ব্রাহ্মণগণ এই বংশের বহুতর ব্রহ্মোত্তর জমি এ যাবৎকাল ভোগ করিয়া আসিতেছেন, ইহাতে অনুমান হয় যে এই বংশীয় কৃতী লোক ব্রাহ্মণ আনাইয়া এস্থানে বসতি করাইয়াছেন। আখণ্ডল বংশীয় পণ্ডিতপ্রবর রামভদ্র সিদ্ধান্ত কাহার দ্বারা লোহাগড়া গ্রামে আনীত হন তাহা সত্য করিয়া বলা যায় না, তবে পরস্পর শ্রুত হওয়া যায় যে এই অশূদ্র পরিগ্রাহী পণ্ডিত মজুমদার বংশোদ্ভব ৺বৈষ্ণব দাস মজুমদারের সমসাময়িক, এবং তাঁহার কর্ত্তৃক লোহাগড়া আনীত হইয়া এই বংশকে ইষ্টমন্ত্র প্রদান করেন। * এই

* এই সম্বন্ধে পূজ্যপাদ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় আমাকে যে পত্র লিখিয়াছেন তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল।

"পূজ্যপাদ পণ্ডিতপ্রবর সিদ্ধপুরুষ আমার বৃদ্ধ প্রপিতামহ ৺রামভদ্র সিদ্ধান্ত মহাশয় আখণ্ডলের আদিস্থান ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত ভাবরাসুর গ্রাম বসবাসের অযোগ্য হওয়ায় ঐ গ্রাম ত্যাগ করিতে কৃতসঙ্কল্প হন। আমার স্বর্গত পিতৃদেবের নিকট শ্রুত হইয়াছি যে লোহাগড়ার দত্তবংশীয় দেবদ্বিজভক্ত পরম ধার্ম্মিক ৺বৈষ্ণবদাস মজুমদার মহাশয়ের একান্ত আগ্রহে উক্ত সিদ্ধান্ত মহাশয় লোহাগড়ায়ই বাস করিতে স্বীকার করেন। গ্রামের সর্ব্বোৎকৃষ্ট স্থানই তাঁহার বাসের জন্য নির্ব্বাচিত হইয়াছিল। উক্ত মজুমদার মহাশয় সিদ্ধান্ত মহাশয়ের অলৌকিক গুণগ্রামে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার নিকট হইতে দীক্ষিত হন। তৎকালে তিনি অশূদ্র প্রতিগ্রাহী থাকিলেও মজুমদার মহাশয়ের ভক্তিতে আকৃষ্ট হইয়াই বোধ হয় তাঁহাকে দীক্ষা দান করেন। তৎকাল হইতে সাত আট পুরুষ আমরা এখানে বাস করিতেছি। সন ১২০৯ সালের তায়দাদে দৃষ্ট হয় দানবীর উক্ত বৈষ্ণব দাস ও কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের প্রদত্ত নিষ্কর ভূমি আমরা এ কাল পর্য্যন্ত ভোগ করিতেছি।

* * * *

যশোহরের খ্যাতনামা উকিল শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র সরকার মহাশয় প্রণীত তাঁহাদের বংশের ইতিহাসে "বোধ হয় তাঁহার অনবধানতা বশতঃই" আমাদের বংশাবলীর কোন কোন স্থানে ভ্রম প্রমাদ দৃষ্ট হয় এবং কুলজিনামাও অসম্পূর্ণ আছে। তোমার পুস্তকে সেইগুলির সংশোধন হইলে আমি সুখী হইব।"

আখণ্ডল বংশীয় ভট্টাচার্য্যগণ পুরুষানুক্রমে দত্ত—মজুমদার বংশীয় ব্রহ্মোত্তর ভোগ করিয়া আসিতেছেন বলিয়া ইঁহারা যে এই দত্ত বংশীয় লোকের দ্বারা আনীত তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। ১২০৯ সালের তায়দাদে দেখিতে পাই যে বৈষ্ণব দাস মজুমদারের দত্ত ব্রহ্মোত্তর ইঁহারা ভোগ দখল করিতেছেন।

বর্ত্তমান ফরিদপুর জেলার অন্তঃপাতী ভাবরাসুর গ্রামে আখণ্ডল ভট্টাচার্য্য দিগের পূর্ব্বপুরুষ বাস করিতেন। উঁহারা যে কারণেই হউক নিজগ্রাম ত্যাগ করিয়া কোন কোন ঘর ইতিনা ও কুকুরা গ্রামে আসিয়া বাস করেন। কিন্তু পণ্ডিত শ্রেষ্ঠ রামভদ্র সিদ্ধান্ত ফরিদপুর হইতেই লোহাগড়া আসিয়া বাস করেন। আখণ্ডল বংশীয়গণ চিরকাল অশূদ্র পরিগ্রাহী ছিলেন; বিশেষতঃ রামভদ্রের উত্তরাধিকারিণীগণ নিতান্ত অসহায় ও নিঃস্ব ছিলেন না। তথাপি ইঁহারা দত্ত বংশীয় ব্রহ্মোত্তর ভোগ করিয়া আসিতেছেন তাহা আমরা দলিলপত্রে দেখিতে পাই। পণ্ডিত রামভদ্র সিদ্ধান্ত একজন সিদ্ধপুরুষ ছিলেন। ইঁহার চারিপুত্র জন্মগ্রহণ করে। জ্যেষ্ঠ রামদাস বিদ্যালঙ্কারের বংশ বর্ত্তমানে নিঃসন্তান হইয়া গিয়াছে। মধ্যম দেবীদাস নিঃসন্তান হইয়া গিয়াছেন। তৃতীয় কৃষ্ণদাসের বংশধর কেহ কেহ পৌরোহিত্য গ্রহণ করিয়াছেন। কনিষ্ঠ ষষ্ঠিদাস ন্যায়লঙ্কারের বংশধরগণের যাজন ক্রিয়া আদৌ দৃষ্ট হয় না। পণ্ডিত রামভদ্র সিদ্ধান্তের কনিষ্ঠ পুত্র পণ্ডিত ষষ্ঠী দাস ন্যায়লঙ্কার একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। তিনি নিজ বাটীতে চতুষ্পাঠী খুলিয়া সংস্কৃত ব্যাকরণাদি শিক্ষা দিতেন। তাহার পুত্র কথকচূড়ামণি হরানন্দ বিদ্যাভূষণ কথকতা করিয়া দেশ বিদেশে বিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়া গিয়াছেন। ইঁহার সময়েও বাড়ীতে চতুষ্পাঠী বিদ্যমান ছিল। হরানন্দের পুত্র মধুসূদন বাড়ীতে থাকিয়া ইষ্টমন্ত্র প্রদান করিতেন। দত্ত-মজুমদার ও রায়-সরকার বংশীয় অনেকেই এই আখণ্ডল বংশীয় ভট্টাচার্য্যদিগের নিকট হইতে ইষ্ট মন্ত্র গ্রহণ করিয়া আসিতেছেন। এই অশূদ্র পরিগ্রাহী ভট্টাচার্য্যগণ লোহাগড়া দত্ত ও দাস বংশের অনেকেরই মন্ত্রদাতা। মধুসূদনের চারি পুত্র জন্মগ্রহণ করে:—অন্নদাচরণ, প্রমদাভূষণ, ভূধরচন্দ্র ও হরভূষণ। জ্যেষ্ঠ পণ্ডিত অন্নদাচরণ বিদ্যাভূষণ সাতিশয় ক্ষমতাবান্। এই অন্নদাচরণই পণ্ডিত শ্রেষ্ঠ রামভদ্র সিদ্ধান্তের অধস্তন পঞ্চমপুরুষ। ইঁহার বাটীতে যে শিবলিঙ্গ ও ৺শ্রীশ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ বিগ্রহ গৃহদেবতা স্বরূপ প্রতিষ্ঠিত তাহা

পণ্ডিত রাম ভদ্রেরই স্থাপিত। পণ্ডিত অন্নদাচরণ প্রথম জীবনে নিজ বাটীতে চতুষ্পাঠী খুলিয়া সংস্কৃত চর্চ্চার সহায়তা করিতেন। বর্ত্তমানে উহা উঠিয়া গিয়াছে। লোহাগড়া উচ্চ ইংরাজী স্কুল স্থাপনে অন্নদাচরণ একজন অক্লান্ত কর্ম্মী। ১৯০২ সাল হইতে বিদ্যাভূষণ মহাশয় উক্ত স্কুলের হেড্ পণ্ডিতের পদে নিযুক্ত থাকিয়া বিশেষ দক্ষতার সহিত শিক্ষকতা করিয়া আসিতেছেন। অন্নদাচরণের একমাত্র পুত্র অমূল্যভূষণ ১৯২০ খৃঃ ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এ যাবৎ বাটীতেই অবস্থান করিতেছেন। রামভদ্র সিদ্ধান্ত যে কারণেই হউক শিষ্যদের অনুরোধে বাধ্য হইয়া পৌরোহিত্য গ্রহণ করেন। কালবশে সরকার বংশের পৌরোহিত্য আখণ্ডল বংশীয়দিগের হস্তচ্যুত হইয়া তাহাদিগের কার্য্যকারকের হস্তগত হয়। যদিও উক্ত কার্য্যকারকের বংশীয়গণ আখণ্ডল বংশোদ্ভব বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন তথাপি উঁহারা যে আখণ্ডল বংশীয় নহেন আমরা তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাইয়াছি। আমাদের বিশ্বাস রামভদ্রের বংশধর কেহ যাজন ক্রিয়াদি সুচারুরূপে পরিচালন জন্য রুদ্রেশ্বর কি রাজারাম চক্রবর্ত্তী ইহাদের কাহাকেও গোমস্তারূপে নিযুক্ত করিয়া স্বীয়ালয়ে আশ্রয় দেন। ইঁহারা স্বজাতি এবং ইঁহাদের মধ্যে বহুকালের বান্ধবতা থাকায় পরস্পর জ্ঞাতি বলিয়া পরিচিত হইয়া আসিতেছেন। পণ্ডিত জগবন্ধু বিদ্যাবিনোদ ৺রুচিরাম চক্রবর্ত্তীর অধস্তন সপ্তম পুরুষ। বিদ্যাবিনোদ মহাশয় লোহাগড়া উচ্চ ইংরাজী স্কুলে সেকেণ্ড পণ্ডিতের কার্য্যে বহুকাল নিযুক্ত ছিলেন। তিনি নিজ বাটীতে গৃহদেবতাস্বরূপ ৺শ্রীশ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত করেন এবং চতুষ্পাঠী খুলিয়া ছাত্রদের ব্যাকরণ শিক্ষা দিতেন। দুঃখের বিষয় ১৩৩৬ সালের কার্ত্তিক মাসে কঠিন রোগে আক্রান্ত হইয়া ১৯শে অগ্রহায়ণ তারিখে নাবালক পুত্রগণ রাখিয়া পণ্ডিত মহাশয় পরলোক গমন করেন।

রামভদ্র সিদ্ধান্তের তৃতীয় পুত্র কৃষ্ণ দাসের বংশধরগণের মধ্যে কাহাকেও কৃতবিদ্য দেখা যায় না। কৃষ্ণদাসের দৌহিত্র রাজকিশোরের পৌত্র ৺তারিণী-চরণ মুখোপাধ্যায় জ্যোতিষ গণনায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। তদীয় পুত্র জ্যেষ্ঠ জগবন্ধু লোহাগড়া স্কুলে শিক্ষকতা করিতেছেন, মধ্যম দীনবন্ধু ডাক্তার ও কনিষ্ঠ অনাথবন্ধু সম্প্রতি এল্ এম্ এফ্ (ডাক্তারী) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। জগবন্ধু মুখোপাধ্যায়ের পূর্ব্বপুরুষ ৺পতিরাম মুখোপাধ্যায় মহাশয়



পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অন্নদা চরণ
বিদ্যাভূষণ।



স্বর্গীয় তারিণী চর মুখে ধ্যায়,

পৃঃ ২৭



শ্রীযুক্ত বিভূতি ভূষ ঙ্গাপাধ

পূর্ব্বোক্ত আখণ্ডল বংশের কন্যা বিবাহ করেন, তৎপুত্র স্ববংশের দৌহিত্র সন্তান বলিয়া বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের পূর্ব্বপুরুষগণ. তাঁহাদের স্বকীয় বসত বাটীর মধ্যে বাসোপযোগী স্থানে ভোগোত্তর দিয়া উক্ত মুখোপাধ্যায় মহাশয় দিগকে বাস করাইয়াছেন। এইরূপে শ্রেষ্ঠ কুলীনগণকে কন্যা সম্প্রদান করিয়া তাহাদের পালন করা এই আখণ্ডল বংশের চিরন্তন প্রথা। উক্ত বিদ্যাভূষণ মহাশয়ও তাহার চারিকন্যা, ভ্রাতুষ্পুত্রী এবং ভগ্নী প্রভৃতিকে সমাজের শীর্ষস্থানীয় কুলীনের সহিত বহু অর্থ ব্যয় করিয়া বিবাহ দিয়াছেন।

শ্রীযুত বিভূতিভূষণ গঙ্গোপাধ্যায়ের পূর্ব্বপুরুষ মুর্শিদাবাদ জেলায় বাস করিতেন। ১২৯০ সালে বিভূতিভূষণ নয় বৎসর বয়সে লোহাগড়া আসিয়া বসতিবাস করেন। লোহাগড়া নিবাসী জগমোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের ভাগিনেয় কালাচাঁদ মুখোপাধ্যায়ের স্ত্রী বরদাময়ী কর্ত্তৃক প্রতিপালিত ও দীননাথ কুণ্ডু মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে রক্ষিত। বিভূতিভূষণ ১৮৯৬ খ্রীঃ এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া গত ৩৩ বৎসর শিক্ষকতা করিয়া আসিতেছেন। মল্লিকপুর ও নলদী মাইনর স্কুলের হেড্ মাষ্টার ছিলেন; লোহাগড়া, কোটাখোল-দিঘলিয়া স্কুলে শিক্ষকতা করিবার পর বর্ত্তমানে লক্ষ্মীপাশা স্কুলে শিক্ষকের কার্য্যে নিযুক্ত আছেন। ১৩০৯ সালে রায় বাহাদুর যদুনাথের প্রতিষ্ঠিত লোহাগড়া কালনা হইতে কাশীপুর পর্য্যন্ত গ্রামসমূহের সহানুভূতিতে পরিপুষ্ট "দরিদ্র বান্ধব সমিতির" সম্পাদকের কার্য্য করিয়াছেন। ১৩১১ সালে ঐ সমিতির কার্য্য বন্ধ হইয়া যায়। বিভূতিভূষণের তিন পুত্র :—মনোরঞ্জন, বিনয়ভূষণ ও সত্যভূষণ। জ্যেষ্ঠ মনোরঞ্জন উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত না হইলেও নাটকাভিনয়ে এতদ্দেশে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। মধ্যম বিণয়ভূষণ আলিপুর কালেক্টরীতে চাকুরী করেন। কনিষ্ঠ সত্যভূষণ ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া আই, এস্ সি

নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণ রামনাথ চক্রবর্ত্তী

বিড়ালদিরি ডিংসাই ভরদ্বাজ কর্পূরচন্দ্র রায়ের সন্তান রামনাথ চক্রবর্ত্তী নামক জনৈক নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ কাশী যাত্রাকালে লোহাগড়ায় দত্ত বা রায় বংশীয় কোন গৃহস্থের বাটীতে আতিথ্য গ্রহণ করেন। কাহার বাড়ীতে তিনি অতিথি হইয়াছিলেন তাহা সত্য করিয়া জানা যায় না।

বিড়ালদি হইতে লোহাগড়া আগত চক্রবর্ত্তী বংশের বংশতালিকা।

- রামনাথ চক্রবর্ত্তী
  - রত্নেশ্বর
    - ননীরাম
      - দেবকীনন্দন
        - বৈদ্যনাথ
          - গোবিন্দ
            - বরদা
              - নিশিকান্ত
                - কন্যা
              - পঞ্চানন
                - •
          - গিরিধর
            - জগবন্ধু
              - রাজেন্দ্র
                - •
              - সুরেন্দ্র
                - পুত্র
              - মহেন্দ্র
                - পুত্র
              - মতি
              - ধীরেন্দ্র
                - পুত্র (রোগগ্রস্ত)
              - জিতেন্দ্র
                - কন্যা
            - বিষ্ণুচরণ
              - বিনোদ
  - যাদবেন্দ্র
    - নরসিংহ
      - রামরাম
        - গোলকচন্দ্র
          - গোপালচন্দ্র
            - তারাপদ
              - পঙ্কজ
              - অনাদি
              - অধীর
              - চিত্তরঞ্জন
    - কালিনাথ বিদ্যাভূষণ
      - গঙ্গাধর
        - গুরুপ্রসাদ
          - কমলাকান্ত বিদ্যালঙ্কার
            - প্রাণনাথ শিরোমণি
              - হৃদয়
                - •
              - কন্যা
                - সারদাসুন্দরী
                  - মাণিকলাল চক্রবর্ত্তী
                    - শিবদাস
                    - গুরুদাস
                    - রাখালদাস
                    - কৃষ্ণদাস
                    - কানাইলাল
                    - পতিতপাবন
                    - পঞ্চানন
  - (নাম জানা যায় না)
  - নারায়ণ বিদ্যাভূষণ
    - ভগবান
      - কালিকাপ্রসাদ
        - প্রাণনাথ
          - নিবারণ
            - রামপদ
              - কন্যা
            - বিজয়
            - বসন্ত (মৃত)
          - শ্রীনাথ (চিরকুমার)
    - জয়রাম
      - গোপীনাথ
        - বিষ্ণুরাম সিদ্ধান্ত
          - রামচরণ
            - মথুরানাথ
              - রজনীকান্ত
                - জ্যোতিষ
                  - সুধাংশু
                - সতীশ
                  - মানসকুমার
                - রাজকুমারী (ইতিনায় (সরমঙ্গল, ফরিদপুর বিবাহ)
              - রসিকলাল
                - •
              - মতিলাল
                - পঞ্চানন
      - হরিনারায়ণ বিদ্যালঙ্কার
        - ভৈরবচন্দ্র বিদ্যানিধি
          - দুর্গাচরণ
            - বিশ্বম্ভর
            - দিগম্বর
            - নীলাম্বর
            - দ্বিজবর
              - রাজবালা (মৃত)
                - মনোরঞ্জন রায়
              - রাধানাথ
                - কালিপদ
                - নারায়ণ
                - নিতাই
              - কান্তিভূষণ
                - কন্যা
              - ইন্দু
              - শশী
                - •
              - বিভূতি
                - পুত্র
            - দেবীবর

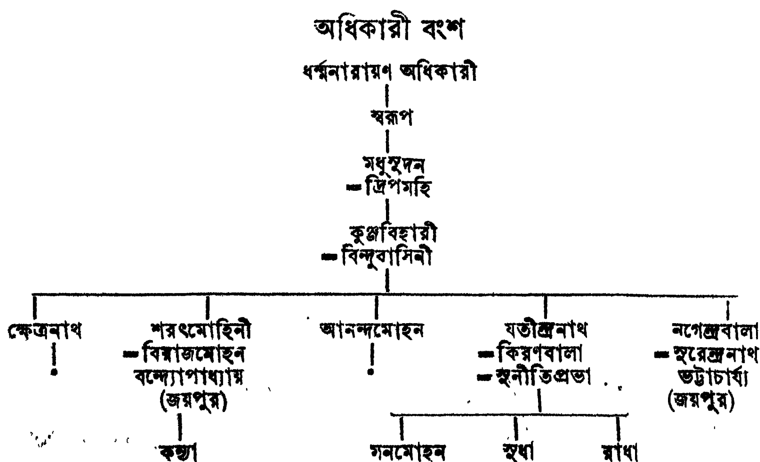
তবে তাহার অনুরোধে তিনি কাশী হইতে প্রত্যাগমন করিয়া ৺গোপালচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের বর্ত্তমান বসতবাটীতেই বাস করেন। এই ব্যক্তির চারি পুত্র জন্মগ্রহণ করে। জ্যেষ্ঠ রত্নেশ্বর ও তাহার সন্তান সন্ততি মজুমদার বাটীর ব্রহ্মোত্তর জমিতে পুরুষানুক্রমে বাস করিয়া আসিতেছেন। মধ্যম যাদবেন্দ্রের বংশধর বর্ত্তমান তাঁরাপদ চক্রবর্ত্তী। তৃতীয়ের বংশধর যত্নাথ ও সীতানাথ উভয়েই নিঃসন্তান হইয়া গিয়াছেন। কনিষ্ঠ নারায়ণচন্দ্র বিদ্যাভূষণের বংশধর বর্ত্তমান রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী, রাধানাথ চক্রবর্ত্তী ও রামপদ চক্রবর্ত্তী। এই চক্রবর্ত্তী মহাশয়গণ পুরুষানুক্রমে দত্ত-মজুমদার ও তহবিলদার বংশের দত্ত ব্রহ্মোত্তর ভোগ করিয়া আসিতেছেন বলিয়া আমাদের অনুমান হয়, যে এই দত্ত বংশের লোকেই উহাদিগকে ব্রহ্মোত্তর দিয়া স্থাপিত করিয়াছেন। যতদূর অবগত হওয়া যায় তাহাতে এই বংশের দত্ত ব্রহ্মোত্তর জমি যাহা ইহারা ভোগ করিবার জন্য পাইয়াছেন তাহার পরিমাণ দুই শত পাখির কম নহে।

এই চক্রবর্ত্তী বংশে বহু খ্যাতনামা পণ্ডিত জন্মিয়া বংশ উজ্জ্বল করিয়া দেশ বিদেশে লোহাগড়ার যশোবৃদ্ধি করিয়াছেন। ৺নারায়ণচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, ৺কালিনাথ বিদ্যাভূষণ, বিষ্ণুরাম সিদ্ধান্ত, ৺হরিনারায়ণ বিদ্যালঙ্কার, ৺ভৈরবচন্দ্র বিদ্যানিধি, ৺কমলাকান্ত বিদ্যালঙ্কার ও ৺প্রাণনাথ শিরোমণির নাম প্রাতঃস্মরণীয়। ইহাদের গভীর পাণ্ডিত্যে এ দেশের মুখোজ্জ্বল হইয়াছে। ৺বিষ্ণুরাম সিদ্ধান্তের পুত্র ৺রামচরণের ন্যায় দশকর্ম্ম জ্ঞাত পুরোহিত লোহাগড়ায় কেন, পার্শ্ববর্ত্তী কোন গ্রামে দৃষ্ট হইত না। ৺ভৈরবচন্দ্র বিদ্যানিধির পুত্র ৺দুর্গাচরণ গ্রামের একজন প্রবীন কর্ত্তৃপক্ষীয় লোক ছিলেন। মজুমদার বংশোদ্ভব ধর্ম্মপ্রাণ ৺তারাপ্রসন্ন মজুমদারের সহিত ইহার বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। গ্রামের সাধারণ কার্য্যে দুর্গাচরণের পরামর্শ গ্রহণ করিতে হইত। দুর্গাচরণ একজন কৃতী লোক ছিলেন। ইহার জীবিত কালে নিজ বাটীতে চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া সংস্কৃত চর্চ্চার সহায়তা করেন। পণ্ডিত লোকনাথ ন্যায়রত্ন এই চতুষ্পাঠীর প্রথম অধ্যক্ষ নিযুক্ত হয়েন। ইঁহার পরবর্ত্তী কালে পণ্ডিত মধুসূদন বিদ্যারত্ন উহার ভার প্রাপ্ত হন। প্রাণনাথ শিরোমণি ও তাহার নিজবাটী অর্থাৎ শিবদাস গুরুদাস চক্রবর্ত্তী বর্ত্তমান যে বাড়ীতে বাস করিতেছেন ঐ বাড়ীতে চতুষ্পাঠী খুলিয়া সংস্কৃত ব্যাকরণাদি

শিক্ষা দিতেন। ৺নারায়ণ বিদ্যাভূষণের বংশধর ৺প্রাণনাথের পুত্র ৺শ্রীনাথ ও চিরকুমার থাকিয়া দশকর্ম্মে বিশেষ খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। এই দত্ত বংশীয়গণ যখন প্রবল প্রতাপান্বিত তখন হইতেই ইহাদের ব্রহ্মোত্তর ভোগ করিয়া এই চক্রবর্ত্তী বংশ তাহাদিগের পৌরোহিত্য করিয়া আসিতেছেন। এই চক্রবর্ত্তী বংশের যাজন ক্রিয়া পুরুষ পুরুষানুক্রমে দৃষ্ট হইতেছে।

বর্ত্তমান সময়ে এই চক্রবর্ত্তী বংশ নিঃস্ব হইয়া পড়িয়াছে। পূর্ব্বের ন্যায় আর পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করেন না। দশকর্ম্মেও পারদর্শী লোক নাই। অনেকেই চাকুরী করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করেন। তবে ইহারা অমায়িক, সত্যবাদী ও সরল প্রকৃতির লোক। বহুদিন যাঁহারা জীবিত ছিলেন তন্মধ্যে গোপালচন্দ্র চক্রবর্ত্তী প্রাচীন হইয়া রোগ শয্যায় শায়িত ছিলেন। তিনি ১৩৩৬ সালে ৭৫ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন। ইহার পুত্র তারাপদ নড়াইল আদালতে চাকুরী করেন। রজনীকান্ত বাড়ীতে থাকিয়া দশকর্ম্ম পর্য্যবেক্ষণ ও বিষয়সম্পত্তি রক্ষা করেন। ইহার ভ্রাতা রসিকলাল সব্ইন্স্পেক্টরের চাকুরী করিয়া পেনসন লইয়া বর্ত্তমানে বাড়ীতে আছেন। রজনীকান্তের দুই পুত্র জ্যোতিষ ও সতীশ। কনিষ্ঠ সতীশ বাঙ্গলা পুলিশ বিভাগে এ্যাসিষ্ট্যাণ্ট সব্ইনসপেক্টর। রসিকলাল অপুত্রক। দ্বিজবরের পুত্র রাধানাথ, নিবারণের পুত্র রামপদ এবং মাণিকলালের পুত্র গুরুদাস প্রভৃতি যাজনক্রিয়া সম্পন্ন করেন।

অধিকারী বংশ



পাবনা জেলা-ব্রাহ্মণ গাঁ হইতে আগত কাঞ্জিলিয়া কানুর হরদেব মৌলিকের সন্তান।

- কৃষ্ণরাম মৌলিক
  - জয়হরি
    - রামসুন্দর
      - মধুসূদন =ষষ্ঠী
        - চন্দ্রকান্ত =কিরণশশী
          - অমূল্য =নলিনী
          - মাখন বি. এ, =ননী
            - মহেন্দ্র (পরিতোষ)
          - কন্যাদ্বয়
        - ডাঃ পূর্ণচন্দ্র এল.এম, এস, =কুমুদিনী =মানদাসুন্দরী
          - জগদ্বন্ধু
          - দীনবন্ধু
          - অনাথবন্ধু
          - বেলারাণী =পঞ্চানন চক্রবর্ত্তী (কালিয়া)
          - সুরাজবাসিনী (মৃত) =অমূল্যকুমার ভট্টাচার্য্য (লোহাগড়া)
          - কমলা
          - ছবি
        - প্যারীকান্ত =দীনতারিণী
          - শশী =নিভাননী
          - কান্ত
          - নৃত্যগোপাল
          - বিনোদ
          - নন্দগোপাল
          - কানাই
          - বৈদ্যনাথ
          - অহিনাথ
          - মৃনালিনী =সতীশ চক্রবর্ত্তী (লোহাগড়া)
        - নিশিকান্ত =প্রফুল্ল =নীহার
        - সূর্য্যকান্ত =৺ইন্দুমতী =উর্ম্মিলা =জ্ঞানদা
        - কাশীশ্বরী
        - ক্ষীরোদা
        - বিরজা
        - ভুবনমোহিনী
        - দক্ষিণা
        - মহালক্ষ্মী
        - সরোজিনী
        - অন্নদা
        - সরলা
      - গদাধর

অধিকারী বংশ।

এই বংশ চিরদিনই ইষ্টমন্ত্র প্রদান করিয়া আসিতেছেন। বর্ত্তমানে একমাত্র যতীন্দ্রনাথ এই বংশে মন্ত্রদাতা। তিনি বহু শিষ্য করিয়া স্বীয় অবস্থার বিশেষ উন্নতি সাধন করিয়াছেন এবং পূর্ব্বপুরুষ অনুষ্ঠিত পূজা-পার্ব্বনাদি যথা দোল, রাস, জন্মাষ্টমী প্রভৃতি অদ্যাবধি সুসম্পন্ন করিয়া আসিতেছেন। ইহার একপুত্র ও দুই কন্যা যথা মনমোহন, সুধা ও রাধা। মনমোহন নাবালক।

মৌলিক বংশ।

অনুমান ১২০৯ সালে পাবনা জেলান্তর্গত ব্রাহ্মণগাঁ নিবাসী কৃষ্ণরাম মৌলিক দিঘাপতিয়া রাজার দত্ত ব্রহ্মোত্তর গ্রহণ করিয়া লোহাগড়া আসিয়া বাস করেন। কৃষ্ণরামের বংশধরগণের মধ্যে ডাঃ পূর্ণচন্দ্রই সর্ব্বাপেক্ষা কৃতবিদ্য। কৃষ্ণরামের পুত্র জয়হরি, তস্য পুত্র রামসুন্দর। রামসুন্দরের দুই পুত্র মধুসূদন ও গদাধর। গদাধর নিঃসন্তান। জ্যেষ্ঠ মধুসূদনের পাঁচ পুত্র ও নয় কন্যা যথা চন্দ্রকান্ত, পূর্ণচন্দ্র, প্যারীকান্ত, নিশিকান্ত, সূর্য্যকান্ত, কাশীশ্বরী, ক্ষীরোদা, বিরজা, ভুবনমোহিনী, দক্ষিণা, মহালক্ষ্মী, সরোজিনী, অন্নদা ও সরলা। জ্যেষ্ঠ চন্দ্রকান্ত এতদ্দেশে একজন গ্রাম্য কালোয়াৎ বলিয়া পরিচিত। বাল্যকাল হইতেই চন্দ্রকান্ত সঙ্গীত-প্রিয় ছিলেন। তিনি সঙ্গীত শিক্ষাভিলাষে দিল্লীতে গমন করেন এবং তথায় একবৎসরকাল অবস্থান করিয়া দিল্লীর সুপ্রসিদ্ধ গায়ক ছন্নীখাঁর নিকট সঙ্গীত শিক্ষা করেন। এই পরিবারে প্রায় সকলেই অল্পবিস্তর গান করিতে পারেন। চন্দ্রকান্ত গয়া, কাশী, বৃন্দাবন, বৈদ্যনাথ, পুরী, মথুরা, সেতুবন্ধ, প্রয়াগ, হরিদ্বার, চন্দ্রনাথ, ব্রহ্মপুত্র, দ্বারকা, বদরিকাশ্রম, বিন্ধ্যাচল, দিল্লী, লক্ষ্ণৌ, অযোধ্যা, ভুবনেশ্বর, সাক্ষিগোপাল, বৈতরণী, বম্বে, কামখ্যা, নেপাল, পশুপতিনাথ, নৈমিষারণ্য, গঙ্গাসাগর, কুরুক্ষেত্র, উমানন্দ, পুষ্কর, হরিহরছত্র, আগ্রা, মাহেশ, কন্‌খল্ প্রভৃতি বহুতীর্থ ও ১৩৩৩ সালে হরিদ্বারে পূর্ণকুম্ভ দর্শন করিয়াছেন। ইঁহার দুই পুত্র অমূল্য ও মাখন উভয়েই সুগায়ক। অমূল্য বাঙ্গলা পুলিশ বিভাগে সবুইনস্পেক্টারের চাকুরী করেন আর মাখন ১৯২৫ খৃঃ



সুগায়ক শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত মৌলিক।



ডাক্তার পূর্ণচন্দ্র মৌলিক, এল, এম, এস.



স্বর্গীয় গোপাল চন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

পৃঃ ৩৩. ৩০ দ্রষ্টব্য।

ফরিদপুর কলেজ হইতে বি, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া নলদী ও বর্ত্তমানে লক্ষ্মীপাশা স্কুলে শিক্ষকতা করিতেছেন।

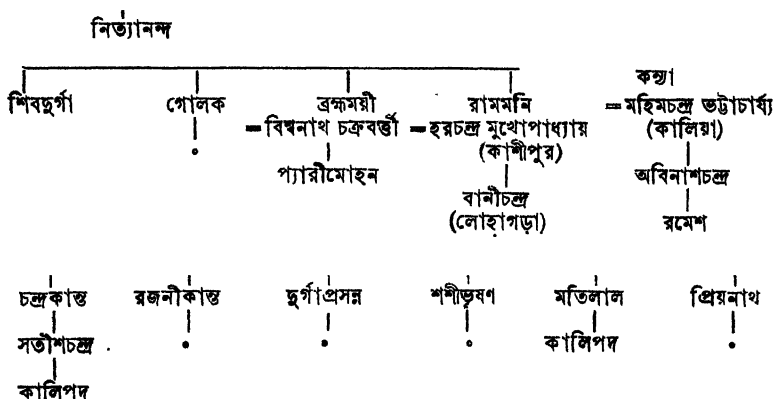
মধ্যম পূর্ণচন্দ্র এল, এম, এস ডাক্তার। তিনি সেনহাটী স্কুল হইতে এন্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বঙ্গবাসী কলেজ হইতে এফ, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তৎপরে কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজে প্রবেশ করিয়া ১৮৯৯ সালে এল, এম, এস ডাক্তার হইয়া নদীয়া জেলান্তর্গত নাটুদাহ নামক স্থানে কিছুকাল চিকিৎসা ব্যবসায় করেন ও তৎপর দেওঘর যাত্রা করিয়া তথায় বহুকাল অবস্থান করতঃ চিকিৎসা ব্যবসায়ে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করেন। কয়েক বৎসরের জন্য স্বগ্রাম লোহাগড়ায় চিকিৎসা ব্যবসায় করিয়া বর্ত্তমানে কলিকাতা মহানগরীতে ব্যবসায় করিতেছেন। এই ব্যবসায়ে পূর্ণচন্দ্র বহু বিত্ত অর্জ্জন করিয়াছেন। ইহার তিন পুত্র ও চারি কন্যা যথা জগদ্বন্ধু, দীনবন্ধু, অনাথবন্ধু, বেলারাণী, সুরাজবাসিনী, কমলা ও ছবি। জগদ্বন্ধু হাজারিবাগ কলেজে বি, এ, অধ্যয়ন করেন। দীনবন্ধুর বাল্যকালেই মৃত্যু হয়। অনাথবন্ধু নাবালক।

তৃতীয় প্যারীকান্ত সাতিশয় সরল প্রকৃতির লোক। ইনি বাড়ীতে থাকিয়া বিষয় কর্ম্মাদি পর্য্যবেক্ষণ করেন। ইঁহার আট পুত্র ও এক কন্যা যথা শশী, কান্ত, নৃত্যগোপাল, বিনোদ, নন্দগোপাল, কানাই, বৈদ্যনাথ, অহিনাথ ও মৃণালিনী। শশী ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বাড়ীতে থাকিয়া হোমিওপ্যাথী চিকিৎসা শিক্ষা করিতেছেন। কান্ত পুলিশের ভিতর কনেষ্টবলের কার্য্য করেন, নৃত্য জন্মাবধি খঞ্জ, বিনোদ পুলিশ বিভাগে কনেষ্টবলের কার্য্য করেন। নন্দ ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন, কানাই প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন কিন্তু হটাৎ তাহার মৃত্যু হইয়াছে। বৈদ্যনাথ ও অহিনাথ নাবালক।

চতুর্থ নিশিকান্ত একজন সাধু প্রকৃতির লোক। সৎস্বভাব ও সরল প্রকৃতি বিশিষ্ট। সর্ব্বকনিষ্ঠ সূর্য্যকান্তও জ্যেষ্ঠ চন্দ্রকান্তের ন্যায় সঙ্গীত চর্চ্চায় বিশেষ সুখ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। ইনি বাড়ীতে থাকিয়া সঙ্গীত শিক্ষা দিতেন। তিনি ১৩৩৬ সালের অগ্রহায়ণ মাসে জ্বরাক্রান্ত হইয়া পরলোক গমন করেন।

দত্ত মজুমদার বংশের আদি পুরোহিত রামরাম রায়ের বংশতালিকা।

রামরাম রায়

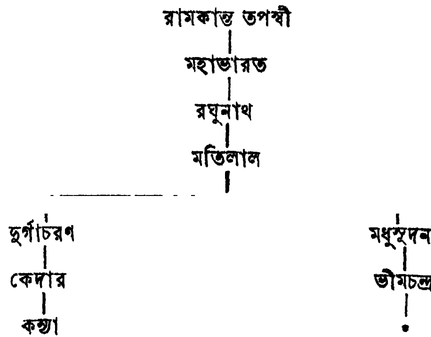


পুরোহিত রামরাম রায়।

বর্ত্তমান মতিলাল মুখোপাধ্যায় যে বাটীতে বাস করিতেছেন, উহা রামরাম রায়ের বসতবাটী। রামরামের দুই পুত্র নিত্যানন্দ ও জগদ্বন্ধু। জ্যেষ্ঠ নিত্যানন্দের তিন কন্যা—শিবদুর্গা, ব্রহ্মময়ী, রামমনি ও একমাত্র পুত্র গোলক। গোলক নিঃসন্তান। পিতা বর্ত্তমানে বাল্যাবস্থায় ইহার মৃত্যু হয়। নিত্যানন্দের জ্যেষ্ঠা কন্যা শিবদুর্গার স্বামী রঙ্গপুর জেলায় গমন করিয়া তথায় ৺কালী স্থাপনা করিয়া বসতিবাস করেন। কনিষ্ঠা কন্যা রামমনির সহিত কাশীপুর নিবাসী হরচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বিবাহ হয়। রামমনির গর্ভে হরচন্দ্রের একমাত্র পুত্র বানীচন্দ্রের জন্ম হয়। নিত্যানন্দের দৌহিত্র বানীচন্দ্র মাতামহ সম্পত্তির উত্তরাধিকারী সূত্রে লোহাগড়া আসিয়া বাস করেন। বানীচন্দ্রের ছয় পুত্র ঃ—চন্দ্রকান্ত, রজনীকান্ত, দুর্গাপ্রসন্ন, শশীভূষণ, মতিলাল ও প্রিয়নাথ। জ্যেষ্ঠ ও পঞ্চম ব্যতীত ইহারা সকলেই নিঃসন্তান। জ্যেষ্ঠ চন্দ্রকান্তের পুত্র সতীশচন্দ্র, তাহার পুত্র কালিপদ। পঞ্চম মতিলালের একমাত্র পুত্র কালিপদ। এই দৌহিত্র বংশ যাজন ক্রিয়া পরিচালনে অসমর্থ হওয়ায় গোমস্তা নিযুক্ত করিয়া উহা সম্পন্ন করাইতেন, পরে কালবশে দত্ত মজুমদার বংশের পৌরোহিত্য হস্তচ্যুত হইয়া পূর্ব্বোক্ত চক্রবর্ত্তী বংশর হস্তগত হয়। কালক্রমে চক্রবর্ত্তী বংশই দত্ত

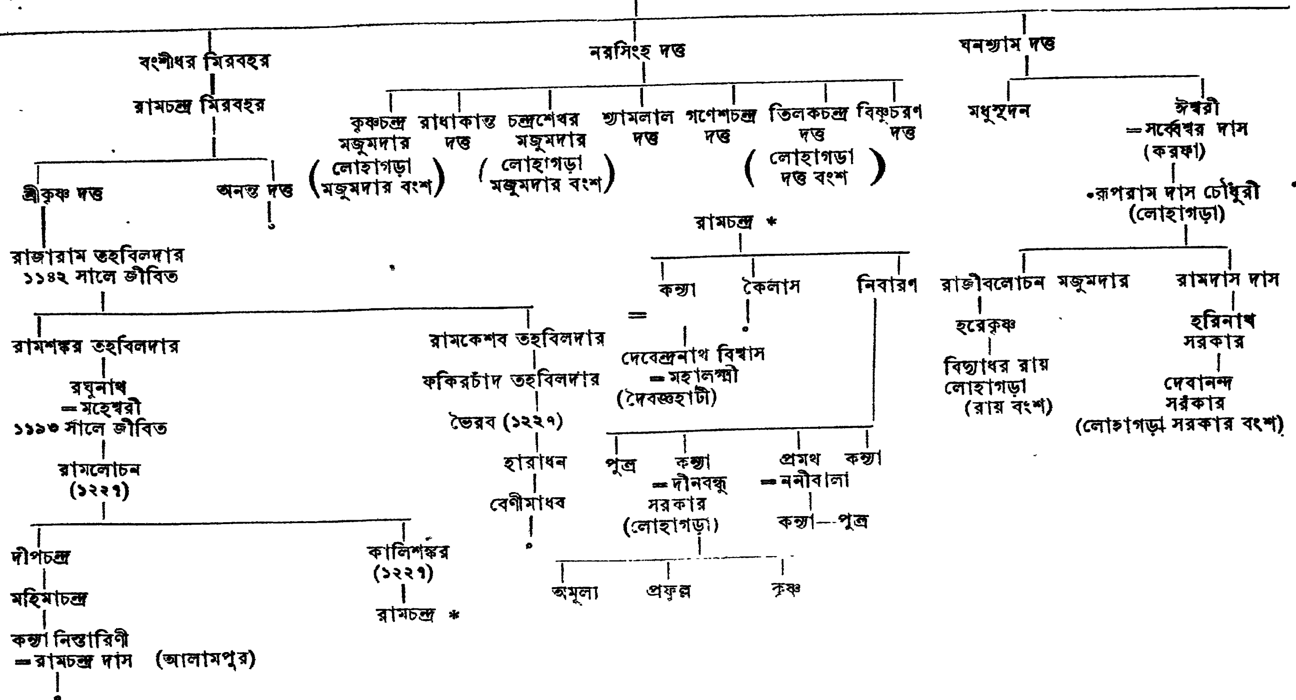
মজুমদার বংশের কুলপুরোহিত বলিয়া গণ্য হইয়া আসিতেছে। নিত্যানন্দের ভ্রাতা জগবন্ধুর একমাত্র কন্যার সহিত কালিয়া নিবাসী মহিমচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের বিবাহ হয়। মহিমচন্দ্র দশকর্ম্মে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। ইনি ৺তারাপ্রসন্ন মজুমদারের বাটীতে পৌরোহিত্য করিতেন। ইঁহার পুত্র অবিনাশচন্দ্রের ন্যায় দশকর্ম্মজ্ঞাত পুরোহিত অতি অল্পই দৃষ্ট হইত। অবিনাশচন্দ্রের পুত্র রমেশ যাজন ক্রিয়া করিতে অসমর্থ হওয়ায় মল্লিকপুর নিবাসী ভট্টাচার্য্য বংশোদ্ভব ভবনাথ ভট্টাচার্য্য কবিভূষণ মহাশয় বর্ত্তমানে মজুমদার বাটীতে পৌরোহিত্য গ্রহণ করিয়াছেন।

রামকান্ত তপস্বীর বংশতালিকা।



তপস্বী বংশ।

এই তপস্বী বংশে বর্ত্তমানে যে উভয় ভ্রাতা কেদারনাথ ও ভীমচন্দ্র জীবিত আছেন, রামকান্ত উঁহাদের উর্দ্ধতন ষষ্ঠ পূর্ব্বপুরুষ। রামকান্তের একপুত্র মহাভারত, তাহার পুত্র রঘুনাথ। এই রঘুনাথই তপস্বী বাটীতে বার্ষিক ৺শ্রীশ্রীজগদ্ধাত্রী পূজার প্রচলন করেন। ইঁহার সময় হইতেই এই বাটীতে অদ্যাবধি দোল পূজা হইয়া আসিতেছে। রঘুনাথ অতি নিষ্ঠাবান ও সাত্ত্বিক প্রকৃতির লোক ছিলেন। তাঁহার ধর্ম্মানুরাগ সত্যই প্রবল ছিল। তাঁহার একমাত্র পুত্র ছিলেন মতিলাল। মতিলালের দুই পুত্র—জ্যেষ্ঠ দুর্গাচরণ ও কনিষ্ঠ মধুসূদন। দুর্গাচরণের পুত্র কেদার আর মধুসূদনের পুত্র ভীমচন্দ্র উভয়েই যাজন ক্রিয়া করেন। কেদারের পুত্রসন্তান নাই আর ভীমচন্দ্র নিঃসন্তান।


বর্ত্তমান তহবিলদার বংশের বংশতালিকা।
কমললোচন (কমলাকান্ত) দত্ত
বংশীধর মিরবহর
নরসিংহ দত্ত
ঘনশ্যাম দত্ত
রামচন্দ্র মিরবহর
কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার
রাধাকান্ত দত্ত
চন্দ্রশেখর মজুমদার
শ্যামলাল দত্ত
গণেশচন্দ্র দত্ত
তিলকচন্দ্র দত্ত
বিষ্ণুচরণ দত্ত
মধুসূদন
ঈশ্বরী
=সর্ব্বেশ্বর দাস
(করফা)
(লোহাগড়া মজুমদার বংশ)
(লোহাগড়া মজুমদার বংশ)
(লোহাগড়া দত্ত বংশ)
শ্রীকৃষ্ণ দত্ত
অনন্ত দত্ত
•রূপরাম দাস চৌধুরী
(লোহাগড়া)
রামচন্দ্র *
রাজারাম তহবিলদার
১১৪২ সালে জীবিত
কন্যা
কৈলাস
নিবারণ
রাজীবলোচন মজুমদার
রামদাস দাস
হরেকৃষ্ণ
হরিনাথ সরকার
রামশঙ্কর তহবিলদার
রামকেশব তহবিলদার
দেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস
=মহালক্ষ্মী
(দৈবজ্ঞহাটী)
বিদ্যাধর রায়
লোহাগড়া
(রায় বংশ)
দেবানন্দ সরকার
(লোহাগড়া সরকার বংশ)
রঘুনাথ
=মহেশ্বরী
১১৯৩ সালে জীবিত
ফকিরচাঁদ তহবিলদার
ভৈরব (১২২৭)
রামলোচন
(১২২৭)
হারাধন
পুত্র
কন্যা
=দীনবন্ধু
সরকার
(লোহাগড়া)
প্রমথ
=ননীবালা
কন্যা
বেণীমাধব
কন্যা—পুত্র
দীপচন্দ্র
কালিশঙ্কর
(১২২৭)
অমূল্য
প্রফুল্ল
কৃষ্ণ
মহিমাচন্দ্র
রামচন্দ্র *
কন্যা নিস্তারিণী
=রামচন্দ্র দাস (আলামপুর)

লোহাগড়া কাহিনী :

তহবিলদার বংশ।

পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ বংশীধর মিরবহর।

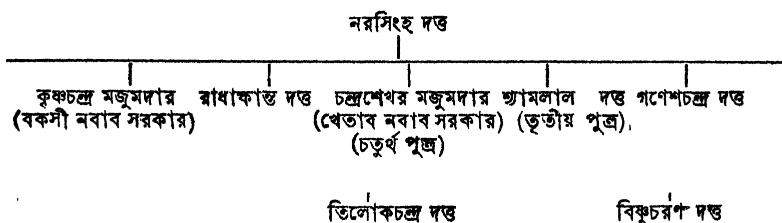
লোহাগড়া দত্ত মজুমদার বংশের প্রতিষ্ঠাতা কমললোচন দত্ত ৩৫০ বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ দশম শতাব্দীর প্রারম্ভে জীবিত ছিলেন। লোহাগড়াগ্রামে দত্ত বংশই সর্ব্বপ্রথমে আগমন করিয়া বাস করেন, পরে কালক্রমে অন্যান্য রায়-সরকার বংশীয়দিগের পূর্ব্বপুরুষের সহিত কন্যা বিবাহ দিয়া—জমি যৌতুক দিয়া এই দত্ত বংশীয় লোকেই উহাদিগকে লোহাগড়া গ্রামে আনয়ন করেন ইহার প্রমাণ যথেষ্টই আছে। ধোপাপাড়ার সমস্ত জমি কন্যা বিবাহ দিয়া যৌতুক দেওয়া হইয়াছে এবং প্রফুল্লকুমার রায়ের নূতন বসতবাড়ীর পূর্ব্বাংশ হইতে মজুমদার পাড়ার মাঠের রাস্তা পর্য্যন্ত জমি, যাহা বর্ত্তমানে মতিলাল দত্ত ও রমেশচন্দ্র মজুমদার দখল করিতেছেন, ঐ জমিও রায় বংশে কন্যা বিবাহ দিয়া যৌতুক দেওয়া হইয়াছে। ইহা ব্যতীত রায় বাটীর পূর্ব্বে বহির্ব্বাটী সংলগ্ন যে পচা পুষ্করিণী উহাও যৌতুক জমি। দত্ত বংশের এক শাখা তহবিলদার বংশের আদিপুরুষ কমল লোচনের জ্যেষ্ঠ পুত্র বংশীধর নবাব আমলে "মিরবহর" অর্থাৎ নৌসেনাপতি ছিলেন। তিনি মিরবহর বলিয়াই পরিচিত ছিলেন। বংশীধর পার্শী ভাষায় অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন। বহুসংখ্যক পার্শী ও উর্দ্দু গ্রন্থ তাহার কণ্ঠস্থ ছিল। ইহার পুত্র রামচন্দ্রও নৌসেনাপতি ছিলেন। এই সময়ই সম্ভবতঃ তহবিলদার বাটীতে অতি উচ্চ সুবৃহৎ মঠ প্রস্তুত হইয়া ৺বাসুদেব বিগ্রহ স্থাপিত হয় ও তাঁহার সেবার জন্য জমি দেবোত্তর দেওয়া হয়। কালক্রমে মহিমাচন্দ্র তহবিলদারের জামাতা রামচন্দ্র দাস ঐ পুরাতন মঠ ভাঙ্গিয়া বাড়ীর উপর নূতন দালান নির্ম্মাণ করেন।

তহবিলদার বংশের বহু ব্রহ্মোত্তর জমি এখনও ব্রাহ্মণগণ ভোগ করিতেছেন। দত্ত বংশের এই শাখার রাজারাম হইতেই তহবিলদার উপাধি দৃষ্ট হয় এবং সেই সময় হইতে এযাবৎ ঐ "তহবিলদার" উপাধি চলিয়া আসিতেছে। নবাবী আমলে চাকুরী হইতে যে এই তহবিলদার উপাধি তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু কে কোন সময় কাহার নিকট এই

উপাধি প্রাপ্ত হন তাহার কোন ইতিহাস নাই। বারুজীবি জাতির উপাধি কায়স্থেরই উপাধির ন্যায় কিন্তু তহবিলদার কোন জাতীয় উপাধি দেখা যায় না। উহা চাকুরীর জন্যই নবাব প্রদত্ত খেতাব, তদনুসারে সেই খেতাবই বংশ পরম্পরায় চলিয়া আসিতেছে।

যে বংশে নৌসেনাপতি, খাজাঞ্চি এক সময় জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল, সেই বংশে একমাত্র প্রমথনাথই কোনক্রমে গৃহ আলোকিত করিতেছেন। বর্ত্তমানে এই বংশের অতি দুর্দ্দশা। বিষয় সম্পত্তি কিছুই নাই। মহিমাচন্দ্রের বিধবা কন্যা নিস্তারিণী ও নিবারণের পুত্র প্রমথ পিতার সহিত এখনও জীবিত। বিধবা নিস্তারিণীর সহিত মোকদ্দমা করিয়া নিবারণ দৈন্য দশায় কাল যাপন করিতেছেন। প্রমথনাথ কলিকাতা পোর্ট কমিশনারের অধীনে চাকুরী করিতেছেন।

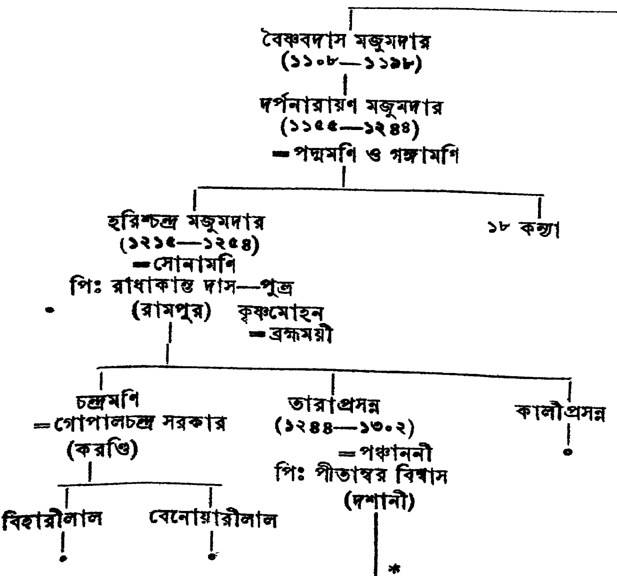
কমললোচনের দ্বিতীয় পুত্র নরসিংহ দত্তের সাতপুত্র।

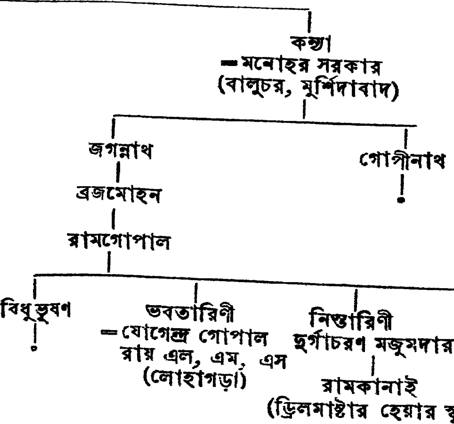


কমললোচনের দ্বিতীয় পুত্র নরসিংহের সাত পুত্র সকলেই তালুকদার এবং তদীয় বংশধরগণ সকলেই নিজ নিজ তালুকের বসত বাড়ীতে বাস করিতেছেন। ইহাতে অনুমান হয় যে এই সমস্ত বিষয় সম্পত্তি কমললোচনের সময়ই সৃষ্ট হইয়া থাকিবে, তৎপর কমললোচনের পুত্রেরা পৃথকান্ন হইয়া সম্পত্তি বিভাগ করিয়া লইয়া থাকিবেন। সাত পুত্র মধ্যে জ্যেষ্ঠ কৃষ্ণচন্দ্র ও চতুর্থ চন্দ্রশেখর উভয়েই নবাব সরকারে চাকুরী করিয়া নবাবপ্রদত্ত খেতাব 'মজুমদার' উপাধি প্রাপ্ত হন। অন্যান্য সকলে দত্ত উপাধিতে বংশ পরম্পরায় ভূষিত হইয়া আসিতেছেন।

নরসিংহ দত্তের জ্যেষ্ঠ পুত্র কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের বংশ তালিকা।

কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার (১০৫৯ সালে জীবিত)
হরিবল্লভ মজুমদার
(১০৭৮—১১৪৮)
=চন্দ্রমুখী





*

- রায় বাহাদুর যদুনাথ = শরৎকুমারী, পিঃ অভয়াচরণ সরকার (করগু)
- বসন্তকুমারী = সাধক কেদারনাথ রায় (লোহাগড়া)
- শ্রীনাথ = ক্ষীরোদাসুন্দরী, পিঃ উমেশচন্দ্র দত্ত (খালিস্পুর)
- মহেন্দ্রনাথ ০ (যৌবন অবস্থায়উভয়ের মৃত্যু)
- জানকীনাথ ০
- হেমন্তকুমারী = যোগেন্দ্রনাথ দাস (খালিস্পুর) *

শ্রীনাথের সন্তান:

- হরেন্দ্রনাথ বি. এ, = সুশীলা, পিঃ মতিলাল সরকার (লোহাগড়া)
  - রণেন্দ্রনাথ
- নরেন্দ্রনাথ বি, এ, ১৩২৭ সালে ২৪ বৎসর বয়সে মৃত্যু।
- ধীরেন্দ্রনাথ = মনোরমা, পিঃ নগেন্দ্রচন্দ্র ভৌমিক উকিল (চন্দনী মহাল)
- হীরেন্দ্রনাথ বি, এল, = লীলা, পিঃ কালীপ্রসন্ন বিশ্বাস, উকিল (দৈবজ্ঞহাটী)
  - রথীন্দ্রনাথ (গৌর)
- অমরেন্দ্র বাল্যাবস্থায় মৃত্যু।
- ইন্দুমতী ১৫বৎসরে মৃত্যু। = হরেন্দ্রকুমার বিশ্বাস, বি এল, (দৈবজ্ঞহাটী)
- মণীন্দ্র ৫ বৎসরে মৃত্যু।
- ইন্দিরা = হরেন্দ্রকুমার বিশ্বাস বি, এল, (খুলনা)
  - ভবানীশঙ্কর (দুলাল)
- প্রিয়ম্বদা = প্রদ্যোৎকুমা[র] সরকার বি, এ, (লোহাগড়া)
  - বিদ্যুৎকুমার

বসন্তকুমারীর সন্তান:

- যতীন্দ্র = গোলাপবাসিনী
  - হরিদাস
  - শ্রীবাস
  - নরহরি মৃত
  - বীরেন্দ্র
  - সাইজি
- সত্যেন্দ্র ০
- রবীন্দ্র এম, এ, বি, এল, = রাজবালা
  - শচীন্দ্র বি, এস সি,
  - স্নেহ (বেথুনকলেজ)
  - সুধীন্দ্র
- হেমনলিনী = গোপালচন্দ্র বিশ্বাস এম, এ. বি, এল (সব জজ) (বারাকপুর)
  - প্রফুল্ল
  - অমূল্য
- মৃণালিনী মহেন্দ্রনাথ বিশ্বাস (বারাকপুর)
  - অপরাজিতা
  - মোহিনী
  - রঙ্গিনী
- সৌরেন্দ্র বি, এ ক্লাস (প্রেসিডেন্সী কলেজ)

যদুনাথের সন্তান:

- কুমার বিক্রম = কুঞ্জবালা, পিঃ বেনীমাধব পাল (নওয়াপাড়া)
  - শান্তিময়ী (১৬ বৎসরে মৃত্যু) = ননীগোপাল সমাদ্দার বি, এ, (কচুবাড়িয়া)
- কুমার পরাক্রম = প্রমীলা, পিঃ প্রসন্নগোপাল রায় বি, এল, (লোহাগড়া)
  - রণক্রম (তপু)
  - সমরক্রম (অম্বু)
- লীলাবতী = ডাঃ মহেন্দ্রনাথ সরকার এম, এ, পি এইচ. ডি, (লোহাগড়া)
  - রাণী মৃত
- কুমার অধিক্রম বি. এল. (ডেপুটীম্যাজিষ্ট্রেট্) = কমলা, পিঃ চন্দ্রকান্ত দাস (দশানি)
  - অমরক্রম (শম্ভু)
- প্রভাবতী = প্রফুল্লকুমার রায় বি. এল (লোহাগড়া)
  - শিবপ্রসাদ
  - সুনীতি
- কুমার উরুক্রম = লীলা, পিঃ শরৎচন্দ্র বিশ্বাস বি. এল. (দৈবজ্ঞহাটী)
- কুমার গুরুক্রম বি, এল, = লক্ষ্মী ভারতী, পিঃ অধ্যাপক যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার বি, এ, (কচুবাড়িয়া)
- হৈমবতী মৃত
- উমাবতী = মণীন্দ্রনাথ সমাদ্দার বি. এ, (কচুবাড়িয়া)

দত্ত-মজুমদার বংশ।

৺নরসিংহ দত্ত।

কমললোচনের দ্বিতীয় পুত্র নরসিংহ দত্ত বাদশাহ সাজাহানের রাজত্বকালে বঙ্গাব্দ ১০৩৪ সালে জীবিত ছিলেন। খাল কন্যাদহের পাড়ে "নরসিংহের ভূই" বলিয়া বহু প্রাচীন সময় হইতে তাঁহার নামে একখণ্ড বৃহৎ জমি তাঁহারই নাম ঘোষণা করিয়া আসিতেছে। ইহা ব্যতীত তাঁহার সম্বন্ধে আমরা আর কিছুই বিশেষ জানিতে পারি না। ঐ জমি বর্ত্তমানে রায়বাহাদুর যদুনাথ ও তদীয় সহোদর শ্রীযুত শ্রীনাথ মজুমদারের দখলে আছে এবং বহুদিন হইতে রায় বাহাদুরের পূর্ব্বপুরুষেরা দখল করিয়া আসিতেছেন। নরসিংহের সাতপুত্র জন্মগ্রহণ করে। কৃষ্ণচন্দ্র, রাধাকান্ত, চন্দ্রশেখর, শ্যামলাল, গণেশচন্দ্র, তিলোকচন্দ্র ও বিষ্ণুচরণ।

খ্যাতনামা কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার।

নরসিংহের জ্যেষ্ঠ পুত্র কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার ১০৫৯ বঙ্গাব্দে ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকালে নবাব সরকারে চাকুরী করিয়া কতকগুলি মৌজার ভূম্যধিকার লাভ করেন ও "মজুমদার" উপাধি প্রাপ্ত হন। সাধারণতঃ তিনি বকসী বলিয়া পরিচিত ছিলেন এই প্রবাদ চলিয়া আসিতেছে। বিশেষ প্রমান না থাকিলেও অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া যাহা লিখিতেছি তাহাও ভিত্তিশূন্য নয়। দত্ত বংশে এই প্রথম মজুমদার উপাধি। কৃষ্ণচন্দ্রের সময় হইতে এই বংশ জ্ঞানে, গুণে, ঐশ্বর্য্যে ও সম্পদে গণণীয় হয় এবং মোগল সরকার হইতে এই গ্রামে সর্ব্বপ্রথম 'মজুমদার' বলিয়া খ্যাতি লাভ করেন। মোগল আমলে 'মজুমদার' পদ অত্যন্ত সম্মানজনক ও শক্তিজ্ঞাপক ছিল। এই নবাব প্রদত্ত খেতাব জাতীয় পদবীতে পরিণত হইয়া অদ্যাবধি বংশ-পরম্পরায় চলিয়া আসিতেছে। সম্ভবতঃ ইঁহার সময় মজুমদার বাটীর পুরাতন দালান প্রস্তুত হয় এবং মোচড়ায় বণিকদিগের বাটীর কিছু উত্তরে একটি গড় প্রস্তুত হয়, উহার চিহ্ন বর্ত্তমানেও দৃষ্ট হয়। মোচড়ার গড়ে লক্ষীপাশা সাকিনের নড়াইলের বর্ত্তমান ম্যানেজার শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় ও ঐ বংশে সুশীলচন্দ্র

বন্দ্যোপাধ্যায়দিগের পূর্ব্বপুরুষ বিপন্ন অবস্থায় নিজেদের জীবন রক্ষার্থে মোচড় গড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া রক্ষা পাইয়াছিলেন এ প্রবাদ অদ্যাবধি প্রচলিত আছে এবং সেই সময় হইতে উক্ত বন্দ্যোপাধ্যায় ও মজুমদার এই দুই বংশের আত্মীয়তা-বান্ধবতা বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত চলিয়া আসিতেছে। সুশীলকুমার অদ্যাবধি এই বংশের ব্রহ্মোত্তর ভোগ করিতেছেন।

ধর্ম্মপ্রাণ কৃষ্ণচন্দ্রই লোহাগড়া গ্রামে দুর্গোৎসব মহাযজ্ঞের প্রথম প্রতিষ্ঠাতা। অদ্যাবধি তাঁহার বংশে বার্ষিক দেবী পূজা সুসম্পন্ন হইয়া আসিতেছে। কৃষ্ণচন্দ্র নিরহঙ্কার ও পরোপকারী ছিলেন। জীবনে যে কেহ তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়াছেন, তিনি তাঁহাকে তাঁহার ব্যক্তিত্বে, সরল ব্যবহারে ও বুদ্ধিমত্তায় মুগ্ধ করিছেন। এই খ্যাতনামা মহাত্মা একমাত্র পুত্র হরিবল্লভ মজুমদারের জন্য যশঃ, প্রতিষ্ঠা ও ঐশ্বর্য্য রাখিয়া স্বর্গারোহণ করেন।

হরিবল্লভ মজুমদার।

কৃষ্ণচন্দ্রের একমাত্র পুত্র হরিবল্লভ, তাঁহার পুত্র বৈষ্ণবদাস, তাঁহার পুত্র দর্পনারায়ণ। হরিবল্লভ, বৈষ্ণবদাস ও দর্পনারায়ণের দত্ত বহু ব্রহ্মোত্তর জমি লোহাগড়া, লক্ষ্মী-পাশা, জয়পুর, মল্লিকপুর ও টগরবন্ধের ব্রাহ্মণগণ অদ্যাবধি ভোগ করিতেছেন। গত সেটেলমেণ্টের সময় উহাতে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করা হয় নাই। ১০৭৮ হইতে ১১৪৮ পর্য্যন্ত হরিবল্লভ জীবিত ছিলেন। তাঁহার সময় যে সমস্ত সম্পত্তির নিদর্শন দেখা যায়, পরবর্ত্তী সময় সে সমস্ত সম্পত্তি হস্তচ্যুত হইয়া গিয়াছে। হরিবল্লভের সময় সম্পত্তির বৃদ্ধি হইয়াছিল ইহা আমরা জানিতে পারি। গোয়ালবাথান, কৃষ্ণপুর, মিরঘাই, রাঘবপুর, রায়পাশা ও করফা প্রভৃতি গ্রাম কাগজ পত্রেই দৃষ্ট হয় কিন্তু ঐ সমস্ত সম্পত্তি বর্ত্তমানে অন্যে ভোগ করিতেছে।

হরিবল্লভ মজুমদারের সহধর্ম্মিনী বৈষ্ণবদাস মজুমদারের মাতা চন্দ্রমুখী পুরী দর্শনপথে বৈতরণীতে গমন করিয়াছিলেন ইহা বৈতরণীর পাণ্ডার খাতায় এযাবৎ লিপিবদ্ধ আছে।

স্বর্গীয় বৈষ্ণবদাস মজুমদার।

১১৬১ সালে রাণী ভবানীর রাজত্বকালে বৈষ্ণবদাস জীবিত ছিলেন।

স্বর্গীয় বৈষ্ণবদাস মজুমদারের ক্রীতদাস খরিদের দলিল।

ইহার জীবিতাবস্থায় ১১৭৩ সালে পলাশীর যুদ্ধ হয়। ১১৭৭ সালে বৈষ্ণবদাস যে ক্রীতদাস-দাসী খরিদ করিয়াছেন তাহার দলিল পত্র বর্ত্তমানেও দৃষ্ট হয়। ঐরূপ আরও কতকগুলি ক্রীতদাস ও অন্নাভাবে মানুষ বিক্রয় সম্বন্ধীয় দলিল বর্ত্তমানে কলিকাতা এসিয়াটিক সোসাইটীতে দেওয়া হইয়াছে। আমরা ঐ দলিলের এক খানার অবিকল নকল উদ্ধৃত করিলাম। ১১৯৫ সালে বৈষ্ণবদাসের জীবিতাবস্থায় বাড়ীতে ৬টী মহিষ খরিদ করা হয়, ইহাতে অনুমান হয় যে মহিষের দুগ্ধ দধি এদেশে প্রচলিত ছিল কিন্তু বর্ত্তমানে এতদ্দেশে কোন স্থানেই ওরূপ দৃষ্ট হয় না। বৈষ্ণবদাস গুরু ব্রাহ্মণে সাতিশয় ভক্তিমান ছিলেন। তৎকালে তাঁহার ন্যায় দেবদ্বিজভক্ত পরম ধার্ম্মিক ব্যক্তি অতি অল্পই দৃষ্ট হইত।

শক্তিশালী দর্পনারায়ণ।

বৈষ্ণবদাসের একমাত্র পুত্র দর্পনারায়ণ অত্যন্ত বলিষ্ঠ, ধার্ম্মিক ও সত্যপ্রিয় ব্যক্তি ছিলেন। লর্ড কর্ণওয়ালিশের সময় ১৭৯৩ খৃঃ অর্থাৎ ১২০০ অব্দে দশশালা বন্দোবস্তের সময় নিজ নামে যশোহর কলেক্টরীতে তালুক পত্তন করেন। দর্পনারায়ণ পদ্মমণি ও গঙ্গামণি নাম্নী দুই স্ত্রীর পাণিগ্রহণ করেন। ইঁহাদের গর্ভে দর্পনারায়ণের এক পুত্র ও ১৮ কন্যার জন্ম হয়। এই ১৮ কন্যার বিষয় পরে পাঠককে অবগত করাইব। দর্পনারায়ণের মৃত্যুর পর পদ্মমণি ১৮৫১ সালে জীবিত ছিলেন। ঐ সালে তিনি যশোহর কলেক্টরীতে নাবালক পৌত্র তারাপ্রসন্নের অভিরক্ষক হইয়া স্বীয় নাম পত্তন করেন। দর্পনারায়ণের জীবিত সময় লোহাগড়া প্রভৃতি স্থানে নীলকর সাহেবরা তালুকদারদিগের নিকট হইতে জমি ইজারা লইয়া নীলের চাষ করিতেন। দর্পনারায়ণ বহু জমি এমন কি মৌজা সাহেবদের নীলচাষের জন্য ইজারা দিয়াছিলেন। দর্পনারায়ণ মিতব্যয়ী ছিলেন না, এ কারণ শেষ জীবনে ঋণজালে জড়িত হইয়াছিলেন। ইহার শারীরিক শক্তি প্রশংসনীয়। তৎকালে দেশের মধ্যে ইনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলবান বলিয়া পরিচিত ছিলেন। ইঁহার অত্যধিক বল সম্বন্ধে প্রবাদ প্রচলিত আছে যে একদা তিনি বাড়ীর সন্নিকটে নবগঙ্গায় স্নান করিতে গিয়া বৃষ্টি হওয়ায় ছোট একখানা হাটুরে ডিঙ্গি-নৌকা মস্তকের উপর

ধারণ করিয়া বৃষ্টি নিবারণে সক্ষম হইয়া বাড়ী পৌছিয়াছিলেন। দর্পনারায়ণের সময় বাটীর পুর্ব্বাংশে ছোট পুষ্করিণী ছিল। ঐ পুষ্করিণীর সংস্কারকালে যে জাবমাটি (কাদা) উঠিয়াছিল তাহাতে কালাচাঁদ-রাধানাথ চক্রবর্ত্তীদিগের পুর্ব্বপুরুষের একটি বলদ নিমগ্ন হওয়ায় গ্রামস্থ কেহই তাহাকে উদ্ধার করিতে না পারিয়া দর্পনারায়ণের শরণাপন্ন হয়। সকলে দর্পনারায়ণকে বলদটী উদ্ধার করিতে অনুরোধ করায় তিনি উহার পেটের নিম্নে লম্বা লম্বা বাঁশ দিয়া তাহার উপর তক্তা পাতিয়া তদোপরি দণ্ডায়মান হইয়া বলদটীকে ক্রোড়ে তুলিয়া আনেন। এ সময় দর্পনারায়ণের বৃদ্ধাবস্থা। তিনি ৮০ বৎসরেরও অধিককাল জীবিত ছিলেন। এই বৃদ্ধের প্রাতঃকালে জলখাবারের ব্যবস্থা ছিল দুধ, চিড়া ও গুড় একত্রে পাঁচসের ওজন। দর্পনারায়ণের মৃত্যুর প্রবাদ ও চমৎকার এবং উহা সত্য বলিয়া এই বংশে বরাবরই প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। লক্ষ্মীপাশার জনৈক বাড়ুয্যে মহাশয় দর্পনারায়ণের নিকট টাকা পাইতেন, তিনি কয়েক তারিখে টাকার জন্য আসিয়া টাকা না পাইয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। অন্য একদিবস পুনরায় ঐ ঠাকুরকে আসিতে দেখিয়া বৃদ্ধ দর্পনারায়ণ বাড়ী হইতে যাইয়া দত্ত বাড়ীর পশ্চিমের গর্ত্তের পাড়ে বসিয়াছিলেন এবং তথায় তাহার মৃত্যু হয়। সম্ভবতঃ সত্যভঙ্গ হেতু ক্ষোভে, দুঃখে ও লজ্জায় তাহার মৃত্যু সংঘটিত হইয়াছিল। দর্পনারায়ণ অতিশয় সরল প্রকৃতির লোক ছিলেন এবং জীবিত কালে যথেষ্ট অন্নদান করিয়া গিয়াছিলেন। তবে এই সময় হইতেই এ বংশের বিষয় সম্পত্তি হস্তচ্যুত হইতে থাকে বলিয়া আমাদের বিবেচনা হয়।

৺হরিশ্চন্দ্র মজুমদার।

দর্পনারায়ণের পুত্র হরিশ্চন্দ্র মাত্র উনচল্লিশ বৎসর জীবিত ছিলেন। ইঁহার মৃত্যুর পর অল্পকাল মধ্যে স্ত্রী সোনামণি ও মৃত্যুমুখে পতিত হন। হরিশ্চন্দ্র অতিশয় বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ লোক ছিলেন। তিনি আমরণ পিতৃঋণ পরিশোধ করিতে করিতে জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন। ১২৪৬-৪৭ সালে তাহার জীবিতাবস্থায় নড়াইলের প্রবল জমিদার বাবু রামরতন রায় মোচড়া গ্রামের বসতির উত্তরাংশে সমস্ত ধান্য জমি বেদখল

করিয়া লইয়া যান। উহা লইয়া ঘোরতর মামলা. মোকদ্দমার সৃষ্টি হয়। ঐ মোকদ্দমায় বহু অর্থ ব্যয় হওয়ায় হরিশ্চন্দ্র ঋণজালে জড়ীভূত হইয়া পড়েন। কলিকাতার সুপ্রিম কোর্টে এই মোকদ্দমার বিচার হয়। এই মোকদ্দমায় মীরগঞ্জ কন্সার্ণের এনন কোহন্ ডনলপ সাহেব সাক্ষ্য দিয়া প্রবল জমিদারের কবল হইতে হরিশ্চন্দ্রকে রক্ষা করেন। মোচড়া মৌজা হরিশ্চন্দ্রের দখলীভুক্ত হয়। ১২৪৬ সালে হরিশ্চন্দ্রের সহিত বিদ্যাধর রায়ের পৌত্র গুরুপ্রসাদের রথের রাস্তা লইয়া এক মোকদ্দমার সৃষ্টি হয়। এই মামলা লোহাগড়া মুনসেফী আদালতে মীমাংসা হয় তাহা আমরা দলিলপত্র হইতে অবগত আছি।

হরিশ্চন্দ্রের সময় নীলকর সাহেবদের এদেশে পূর্ণোন্নতি। ইহারা অধিকাংশ জমিতে নীল বপন করিত এবং তালুকদারদিগের নিকট হইতে ঐ সমস্ত জমি ইজারা লইয়া সামান্য কর দিয়া নীল প্রস্তুত করিয়া বহু অর্থ উপার্জ্জন করিত। এ সময় দেশের লোক বর্ত্তমান সময়ের ন্যায় বিলাসিতার স্রোতে ভাসে নাই। সাধারণতঃ লোকে মিতব্যয়ী, সন্তুষ্টচিত্ত, বলিষ্ঠ ও নীরোগ ছিল বলিয়া অবগত হওয়া যায়।

স্বর্গীয় তারাপ্রসন্ন মজুমদার।

হরিশ্চন্দ্রের জ্যেষ্ঠপুত্র তারাপ্রসন্ন নাবালক অবস্থায় অভিভাবিকা দর্পনারায়ণের স্ত্রী পদ্মমণির হস্তে প্রতিপালিত হন। কনিষ্ঠ কালীপ্রসন্ন শৈশবাবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হন। তারাপ্রসন্ন নাবালক অবস্থায় দর্পনারায়ণের জামাতা লক্ষপতি ত্রিলোচন দত্তের ও তদীয় স্ত্রী দর্পনারায়ণের কন্যা ত্রিপুরা-সুন্দরীর স্নেহে ও সাহায্যে যথেষ্ট উপকৃত হন। এই নাবালক অবস্থায় দর্পনারায়ণের অন্যতম দৌহিত্র রামচাঁদ দাসই বাড়ীর সমস্ত বিষয় সম্পত্তির সর্ব্বময় কর্ত্তা ও তাহার স্ত্রী কর্ত্রী ছিলেন। তাঁহারাই একদিকে যেমন তারাপ্রসন্নের সংসার রক্ষা করিয়াছিলেন, অপরদিকে তেমনই নিজেদের ভবিষ্যতের সংস্থান এই সংসার হইতেই করিয়া লইয়াছিলেন। রামচাঁদ স্বপরিবারে তারাপ্রসন্নের বাড়ীতে একান্নভুক্ত হইয়াছিলেন এবং পুত্রকন্যার বিবাহাদি তারাপ্রসন্নের সংসার হইতেই দিয়াছিলেন।

তারাপ্রসন্ন নাবালক অবস্থা হইতে উত্তীর্ণ হইয়া যশোহরে চাকুরী করিতে

যাত্রা করেন এবং তথায় চাকুরী লাভ করিয়া পরে কলেক্টরের মহাফেজ (record keeper) হন। চাকুরীতে তাহার বিশেষ সুনাম ও প্রশংসা ছিল। তিনি কদাপি কপর্দ্দকও ঘুষ লইতেন না। একারণ তদানীন্তন ম্যাজিষ্ট্রেট্ "মন্‌রো" "বার্টন্" সাহেব তারাপ্রসন্নকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিতেন এবং সহর শুদ্ধ লোক তাহাকে প্রীতি ও শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন। তিনি নিজ মুখে প্রকাশ করিয়াছেন যে কোন জমিদারের পক্ষ হইতে একখানা পুরাতন নিষ্করের তায়াদাদ নষ্ট করিয়া দেওয়ার জন্য তাহাকে পাঁচ হাজার টাকা ঘুষ দিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি তাহা গ্রহণ করেন নাই বরং তায়দাদ সম্পর্কীয় লোককে সংবাদ দিয়া আনাইয়া তাহার সহি-মহর নকল (certified copy) লইতে উপদেশ দিয়া তাহা দিয়াছিলেন। ইচ্ছা করিলে তারাপ্রসন্ন লক্ষ টাকা উপার্জ্জন করিতে পারিতেন কিন্তু ঘুষের টাকা লওয়া মহাপাপ জানিয়া কদাপি ঐরূপ অর্থ উপার্জ্জন করেন নাই বরং ঘুষখোরদের অত্যন্ত ঘৃণার চক্ষে অবলোকন করিতেন।

লোহাগড়া নিবাসী প্রহ্লাদচন্দ্র সরকার ও তারাপ্রসন্ন মজুমদার উভয়েই একই সময় যশোহর চাকুরী করিতে গিয়াছিলেন। এবং ১৮৫৯ খৃঃ উভয়েই উকীল হইবার জন্য যে আবেদন করেন তাহা আমরা কাগজপত্রে দেখিতে পাই। পরে উকীল না হইয়া কালেক্টরীতে প্রবেশ করিয়া প্রহ্লাদচন্দ্র নাজীর ও তারাপ্রসন্ন মহাফেজের (record keeper) চাকুরী করেন এবং উভয়েই এই চাকুরী করিয়া বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। বর্ত্তমানে চাকুরীর সে মর্য্যাদা ও সম্মান নাই। চাকুরীর সময় উভয়েই একই বাসায় স্বপরিবারে বাস করিতেন। তারাপ্রসন্নের মৃত্যুসময় পর্য্যন্ত প্রহ্লাদচন্দ্রের সহিত তাঁহার প্রগাঢ় বন্ধুত্ব ছিল এবং পরস্পর পরস্পরকে বিশেষ সম্মান ও শ্রদ্ধা করিতেন। লোহাগড়া নিবাসী পূর্ব্বপাড়ার দুর্গাচরণ চক্রবর্ত্তীও তারাপ্রসন্নের একজন পরম বন্ধু ছিলেন। সিঙ্গিয়া-শোলপুরের তদানীন্তন জমিদার বাবু কালিপ্রসন্ন রায়ও তাঁহার পরম বন্ধু ছিলেন।

তারাপ্রসন্ন সুপুরুষ, বুদ্ধিমান, কর্ম্মঠ, পরোপকারী, ধার্ম্মিক ও সত্যপ্রিয় ছিলেন। তাঁহার উন্নত ললাট, সুদীর্ঘ নাসিকা ও দীর্ঘকায় দেখিয়া সকলেই বিস্ময়ান্বিত হইত। তিনি একজন গোড়া হিন্দু ছিলেন। প্রাতঃ-স্নান করিয়া পূজা-আহ্নিক শেষ না করিয়া কদাপি জল গ্রহণ করিতেন না। তদানীন্তন সময়ে হিন্দু আচারের বহির্ভূত কার্য্য দেখিলে তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ



স্বর্গীয় তারা প্রসন্ন মজুমদার

পৃঃ ৪৭

হইতেন। তারাপ্রসন্ন ন্যায়নিষ্ঠ, জিদি, গম্ভীর ও তেজস্বী প্রকৃতির লোক ছিলেন। তাঁহার গাম্ভীর্য্য দেখিয়া অনেকে বৃথাভিমানী বলিয়া ধারণা করিত কিন্তু তাহা সত্য নহে। জীবনে যে কেহ তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়াছেন, তাঁহাকে তাঁহার ব্যক্তিত্বে, গাম্ভীর্য্যে, সরলব্যবহারে, বুদ্ধিমত্তায়, নির্ভীকতায় ও স্পষ্টবাদিতায় মুগ্ধ হইতে হইয়াছে। তিনি জীবনে কার্য্যসিদ্ধির জন্য কখনও হীন কপটতার বা তোষামোদের আশ্রয় গ্রহণ করেন নাই। এরূপ মহৎ গুণাবলী আজকালের দিনে বড়ই দুর্লভ। তিনি সদ্ব্যয়ী ও অন্যের প্রতি সম্ভ্রমশীল ও সকলের যথোপযুক্ত সম্মান রক্ষা করিতে সর্ব্বদা যত্নশীল ছিলেন। ধনগর্ব্ব কোনদিনই তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। তিনি কখনই অযথা বাক্য ব্যয় করিতেন না, কিন্তু শেষ বয়সে উন্মাদ রোগে সে গাম্ভীর্য্য নষ্ট হইয়া দিবারাত্র সকলের সহিত বকাবকী করিতেন।

যশোহর চাকুরী করিয়া মাত্র ৭৫৲ টাকা বেতন পাইতেন তাহাতেই বাড়ীতে দুর্গোৎসব পূজা উপলক্ষে গ্রামস্থ সকলকে নিমন্ত্রণ খাওয়ান, যাত্রাগান, আত্মীয়-স্বজনকে কাপড় দেওয়া, অন্যান্য ক্রিয়াকর্ম্ম ও যশোহর বাসা বাটীতে যথেষ্ট লোক প্রতিপালন করিয়া গিয়াছেন। তারাপ্রসন্নের যত্নে ও উদ্যোগে গ্রামবাসী রামচন্দ্র স্বর সখের যাত্রাগানের দল তৈয়ারী করিয়া বহুকাল পর্য্যন্ত প্রতি বৎসর পূজার সময় তারাপ্রসন্নের বাটীতে যাত্রাগান করিতেন। যাত্রাদলের পোষাকাদি সমস্ত ব্যয়ভার তারাপ্রসন্ন নিজে বহন করিতেন। তাঁহার সময় ১২৮৭ অব্দে নিজ বাটীতে উত্তর পোতায় দালান ও পূর্ব্বপুরুষ প্রতিষ্ঠিত মহাযজ্ঞ দুর্গোৎসবের জন্য সুবৃহৎ চণ্ডীমণ্ডপ প্রস্তুত হয়।

রামচাঁদ যেমন তারাপ্রসন্নকে বাল্যাবস্থায় রক্ষা করিয়াছিলেন সেইরূপ দর্পনারায়ণের অন্য দৌহিত্র কচুবাড়িয়া নিবাসী হরানন্দ দাসও তারাপ্রসন্নের সংসার রক্ষা করিয়াছিলেন। রামচাঁদের উপর সমস্ত ভারই ছিল কিন্তু যশোহর চাকুরী করিতে যাইয়া কিছুকাল পরে তাহার উপর নানা কারণে বিরক্ত হওয়ায় হরানন্দকেই বাড়ীর সর্ব্বময় কর্ত্তা করিয়া দেন। জগচ্চন্দ্র দত্ত ও ঐ সময় চাকুরী করিতে এ সংসারে প্রবেশ করেন। তিনি অতি দৈন্যদশায় পতিত হইয়া সামান্য বেতনে তারাপ্রসন্নের আশ্রয় গ্রহণ করেন। হরিবল্লভের কন্যার বংশধর রামগোপাল সরকার ও এই সংসারে প্রবেশ করিয়া তারাপ্রসন্নের উপকার করিয়াছিলেন।

তারাপ্রসন্ন অত্যন্ত. নির্লোভ প্রকৃতির ছিলেন তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। শরিকী সম্পত্তি বিক্রয়ার্থ উপস্থিত হইলে তিনি শরিকদের ডাকিয়া উহা লইতে বলিতেন কিন্তু নিজে কখনও তাহা গ্রহণ করিতেন না। বিষয় সম্পত্তি বৃদ্ধি করিবার প্রবল ইচ্ছা তারাপ্রসন্নের হৃদয়ে বলবতী ছিল কিন্তু ভগবান তাঁহাকে তাহা বৃদ্ধি করিতে দেন নাই। নিজ অভিলাষ অসম্পূর্ণ রাখিয়া ক্রমে মস্তিষ্কের ব্যাধি বৃদ্ধি পাইয়া ১৩০২ সালে অর্থাৎ ১৮৯৬ খৃঃ ১৭ই অগ্রহায়ণ পূর্ণিমা তিথিতে দ্বিপ্রহর সময় কালিঘাটে নাভিগঙ্গা মধ্যে শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের ক্রোড়ে স্বজ্ঞানে হরিনাম করিতে করিতে স্বর্গারোহণ করেন। প্রখর বুদ্ধিমত্তা, ন্যায়নিষ্ঠা, সত্যবাদিতা, ধর্ম্মানুরাগ এবং কর্ম্মে একনিষ্ঠতাই ছিল তাঁহার জীবনের বিশেষত্ব। শোকে তিনি কোনদিন কাতর হন নাই। আনন্দে তিনি কোনদিনই কর্ত্তব্য কর্ম্মে অবহেলা করেন নাই। আহারে, বিহারে, সুখে, দুঃখে, সম্পদে, বিপদে কোনদিনই তিনি বিচলিত হন নাই। সর্ব্ব বিষয়ে তিনি পরিমিত ছিলেন। সংসারের মায়া কোনদিনই তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। তাঁহার জীবদ্দশায় তাঁহার তৃতীয় পুত্র মহেন্দ্রনাথ ও কনিষ্ঠ পুত্র জানকীনাথ পরলোক প্রাপ্ত হন, কিন্তু সাধারণ মানুষের মত কোনদিনই তিনি শোকে বিচলিত হন নাই।

তারাপ্রসন্নের চারি পুত্র ও দুই কন্যা জন্মগ্রহণ করে। জ্যেষ্ঠ যদুনাথ, মধ্যম শ্রীনাথ, তৃতীয় মহেন্দ্রনাথ, কনিষ্ঠ জানকীনাথ এবং কন্যাদ্বয় বসন্তকুমারী ও হেমন্তকুমারী। মহেন্দ্রনাথ ও জানকীনাথ যৌবনাবস্থায় পিতামাতা বর্ত্তমানে মৃত্যুমুখে পতিত হন। জ্যেষ্ঠপুত্র যদুনাথ যে বৎসর যশোহর ওকালতী আরম্ভ করেন তৎপরবৎসর তারাপ্রসন্ন কার্য্যে অবসর লইয়া পেনসন গ্রহণ পূর্ব্বক কখনও বাড়ীতে কখনও যশোহর বাসাবাটীতে অবস্থান করিতেন। কিছুকাল পরে তাহার মস্তিষ্কের ব্যাধি জন্মে। যখন এই ব্যাধি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকে তখন কলিকাতা সহরে কালিঘাটে একটি স্থান কয়েকবৎসরের জন্য মেয়াদী জমা লইয়া তথায় গৃহ নির্ম্মাণ করতঃ বাস করিতে থাকেন। তখন লোহাগড়া নিবাসী নিবারণচন্দ্র দত্ত মহাশয় তাহার সঙ্গে অবস্থান করিতেন। ক্রমে মস্তিষ্কের পীড়া বৃদ্ধি পাইতে থাকিলে যদুনাথ তাহাকে যশোহর লইয়া যান। তথায় কিছুকাল থাকিবার পর জ্বর ও উদরাময় কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া ক্রমে দুরারোগ্য হন এবং ঐ ব্যাধিতেই তাঁহার



স্বর্গীয়া পঞ্চাননী মজুমদার।

পৃঃ ৪৯

মৃত্যু সংঘটিত হয়। ঐ সময়ও নিবারণচন্দ্র দত্ত মহাশয় তাঁহার সঙ্গে থাকিয়া তাঁহাকে যথেষ্ট সেবা ও শুশ্রূষা করিয়াছিলেন। মৃত্যুর সাত আট দিবস পূর্ব্বে যশোহর বাসায় রোগশয্যায় সকলকে বলিতেন যে "আমি ১৭ই অগ্রহায়ণ পলাইয়া যাইব, কেহ আমাকে রক্ষা করিতে পারিবে না" এরূপ পত্রাদিও বন্ধুবান্ধবের নিকট পূর্ব্ব হইতেই তিনি লিখিয়াছিলেন। সত্য সত্যই ১৭ই অগ্রহায়ণ তারিখে এই মহাপ্রাণ মানবলীলা সম্বরণ করেন।

তারাপ্রসন্নের স্ত্রী পঞ্চাননীর পাঁচ বৎসর বয়ঃক্রমকালে বিবাহ হয়। তৎপর তাঁহার পিতা দশানি নিবাসী পিতাম্বর বিশ্বাসের মৃত্যু হয়। পঞ্চাননীর ১ মাস বয়স সময়ে তাঁহার মাতার মৃত্যু হয়। পিতৃমাতৃহীনা হইয়া চন্দনীমহালের শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত ভৌমিকদের বাটীতে (পিশিবাড়ী)* লালিত পালিত হন। বিবাহের পরই শ্বশুরালয়ে আসিয়া বাড়ীর কর্ত্রী রামচাঁদ দাসের স্ত্রীর অত্যাচারে অধিকাংশ সময় জগচ্চন্দ্র দত্তের বাটীতে তাহার স্ত্রীর নিকট সময় অতিবাহিত করিতেন। রামচাঁদের স্ত্রী সর্ব্বময়ী কর্ত্রী, তিনি নিজের সুবিধা বুঝিয়া কার্য্য করিতেন। রামচাঁদের স্ত্রীর সহিত মধ্যে মধ্যে তারাপ্রসন্নের ভগিনী চন্দ্রমনিও করগুী হইতে আগমন করিয়া তাহার সহিত যোগদান পূর্ব্বক পঞ্চাননীকে সময় সময় বিপন্ন করিয়া তুলিতেন, কাজেই পঞ্চাননীর সংসারের উপর বিশেষ আসক্তি ছিল না। পরে তারাপ্রসন্নের মামী ব্রহ্মময়ী বিধবা হইয়া কচুবাড়িয়া হইতে এই বাটীতে আগমন করেন এবং এসংসার নিজ হস্তে লইয়া রামচাঁদকে স্বপরিবারে এই বাটীর পাকের দালানের দক্ষিণাংশে পৃথক বাড়ী করিয়া তথায় বাস করিতে দেন। কিছুকাল পরে তারাপ্রসন্নের পুত্রেরা বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে রামচাঁদ স্বপরিবারে ঐ স্থান ত্যাগ করিয়া নূতন বাটীতে গিয়াছিলেন। ব্রহ্মময়ী তারাপ্রসন্নের সংসার রক্ষা ও তাহার পুত্র কন্যার জন্য আজীবন নিঃস্বার্থ ভাবে পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন। হরানন্দ ও ব্রহ্মময়ীই এই সংসার ও তারাপ্রসন্নের পুত্র কন্যাকে প্রতিপালন করিয়া স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। পঞ্চাননী

---

* চন্দনীমহালের সদানন্দ ভৌমিক দশানির পিতাম্বর বিশ্বাসের ভগ্নী সুমিত্রাকে বিবাহ করেন। পিতাম্বর বিশ্বাসের কন্যা পঞ্চাননীর জন্মের একমাস পরে, তাঁহার স্ত্রীর মৃত্যু হওয়ায় পঞ্চাননীর পিশিমা পঞ্চাননীকে চন্দনীমহালে আনিয়া নিজবাটীতে প্রতিপালন করেন। সদানন্দের পুত্র রামনারায়ণ, রামনারায়ণের চারি পুত্র—চন্দ্রকান্ত, কৈলাশচন্দ্র, উমেশচন্দ্র ও কেদার নাথ। ইহারাই বর্ত্তমানে চন্দনীমহালের লব্ধপ্রতিষ্ঠ বংশ।

পরম সৌভাগ্যবতী ছিলেন। তিনি বহু তীর্থ পর্য্যটন করিয়া জীবন চরিতার্থ করিয়া গিয়াছেন, অবশেষে ১৩২২ সালে কাশীতীর্থে গমন করিয়া তথায় মাসাধিক কাল ভাগবৎ পাঠ করাইয়া উহা শ্রবণ করিয়া আত্মার উৎকর্ষ সাধন করেন। ইহার ন্যায় ধর্ম্মপরায়ণা সতী রমণী অল্পই দৃষ্ট হয়। ১৩২৯ সালে ২৫ আশ্বিন তারিখে লোহাগড়া বাস-ভবনে স্বজ্ঞানে স্বর্গারোহণ করেন।

কর্ম্মবীর যদুনাথ।

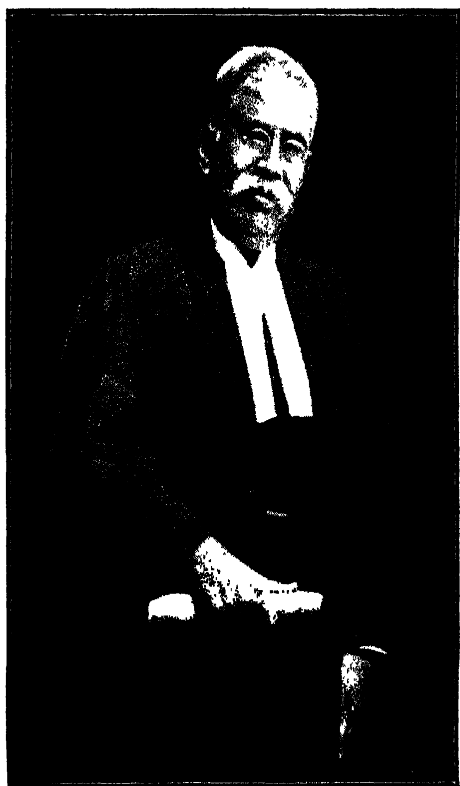
"আধুনিক যশোহরে সকল প্রকারে
স্বদেশ সেবায় কিংবা জ্ঞানের বিস্তারে,
কর্ম্মবীর যদুনাথ রায় বাহাদুর।
প্রসারিলা যশোরের খ্যাতি বহুদূর॥"

এই মহাপুরুষের জীবনী সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন লেখক যাহা লিখিয়াছেন তাহাই নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম,—A. C. Black Ltd. 4/6 Soho Sqr., London হইতে প্রকাশিত "Who is Who in India" পুস্তকে এই কর্ম্মবীর সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে—

Mozoomdar, Rai Jadunath Bahadur, Vedanta Vachaspati, Vidya Varidhi, M.A., B.L.; Kaiser-i-Hind (1915); C.I.E. (1921); M.L.A. (1922); Advocate and Landholder. Born, Oct. 1859. Education, Canning College, Lucknow and Free Church College, Calcutta; Prof Sanskrit College, Calcutta; Editor, *Tribune,* Lahore; Secretary, Finance Department, Kashmir; Principal, Katmandu College, Nepal; M.L.C. (1927).

Publications:—Amirter Prasar in 2 parts, in Bengali; Commentary on Vedanta Philosophy in Bengali; Religion of Love in English; Essays and Addresses in English; An Appeal to Young Hindu Gentlemen of Bengal in English; How to Live in God in English, and numerous other works; Editor, *Hindu Patrika,* Jessore, Bengal.

যশোহর-খুলনার ইতিহাস প্রণেতা অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মিত্র বি, এ, মহাশয় যদুনাথ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—"যশোহরের সর্ব্বপ্রধান উকীল রায় বাহাদুর যদুনাথ মজুমদার বেদান্তবাচস্পতি বিদ্যাবারিধি (M. A. B. L.,



কর্ম্মবীর যদুনাথ।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সতীশ চন্দ্র মিত্র

মহাশয়ের সৌজন্যে।

পৃঃ ৫১

C. I. E., M. L. A) মহোদয় বৈশ্যবারুজীবী জাতির উজ্জ্বলতম রত্ন এবং প্রতাপশালী নায়ক, তাঁহার সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা যেমন দেশে বিদেশে যশোহরের যশোবৃদ্ধি করিয়াছে, তাঁহার সর্ব্বতোমুখী চেষ্টা তেমনি স্বজাতিকে স্বল্পকালে উন্নতির পথে সবেগে প্রধাবিত করিয়াছে। আরও অনেক বিদ্বান্ ও সম্পন্ন ব্যক্তি তাঁহার সে চেষ্টার সহায় বটে, কিন্তু স্বজাতি সমাজে তাঁহার ঋণ অপরিশোধ্য। ১৩০৮ সালে যদুনাথের প্রবর্ত্তিত "বৈশ্যবারুজীবী সভা" এই জাতির উন্নতির অন্যতম হেতু।

লোহাগড়া—মৌদগল্য গোত্রীয় দত্ত-মজুমদার বংশে ১২৬৬ অব্দে খুলনার অন্তর্গত দশানি গ্রামে রায়-বাহাদুর যদুনাথের জন্ম। ১৭শ শতাব্দীর শেষে ইঁহার পূর্ব্বপুরুষ বংশীধর দত্ত মীরবহর ছিলেন। উহার ভ্রাতুষ্পুত্র কৃষ্ণচন্দ্র কতকগুলি মৌজার ভূম্যধিকার পাইয়া "মজুমদার" হন, রায় বাহাদুর তাঁহার অধস্তন সপ্তম পুরুষ। তাঁহার বাটীতে ঐ আমলের একটি সুন্দর কারুকার্য্য খচিত জোড়বাঙ্গালা আছে।

১৮৮৯ খৃঃ যশোহরে যখন দ্বিতীয়বার নীল-বিদ্রোহ উপস্থিত হয় তখন যাঁহারা রাজদ্বারে প্রজার পক্ষে দণ্ডায়মান হন, তন্মধ্যে লাহোরের বিখ্যাত "ট্রিবিউন" পত্রের ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক বাবু যদুনাথ মজুমদার এম, এ, ; বি, এল, সর্ব্বপ্রধান। যশোহরে লোহাগড়ার এক সমৃদ্ধ পরিবারে তাঁহার জন্ম, সুন্দর ও কমনীয় তাঁহার মূর্ত্তি, যেমন তিনি সুলেখক, তেমনই সুবক্তা। এই উদীয়মান যুবক ওকালতী পাশ করিয়া পূর্ব্ব বৎসর (১৮৮৮ খৃঃ) যশোহরে আসেন ; তাঁহার অনন্য সাধারণ প্রতিভা উপযুক্ত কার্য্যক্ষেত্রের সন্ধান করিতেছিল, নীল বিদ্রোহে তাহা জুটিল। তিনি প্রথম হইতেই ঐকান্তিক ভাবে প্রজার পক্ষে দণ্ডায়মান হইলেন। প্রজার নামে অসংখ্য মোকদ্দমা হইল, আর তাহারা শাস্তি পাইতে লাগিল। এই সকল মামলায় প্রজাপক্ষে উকীল হইতেন অক্লান্তকর্ম্মী যদুনাথ। শুধু প্রজার পক্ষে স্বল্প বা বিনা স্বার্থে ওকালতী করা নহে, সংবাদ পত্রে লেখা, গবর্ণমেণ্টে দরখাস্ত করা প্রভৃতি প্রায় সকল কার্য্যই যদুবাবু করিতেন। তিনি উদ্যোগী হইয়া মাননীয় সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহায্যে বিলাতে আবেদন পাঠাইলেন, তথায় মহামতি ব্রাড্‌ল বিদ্রোহবার্ত্তা পার্লিয়ামেণ্টে তুলিলেন। উহার ফলে বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট কৈফিয়ৎ তলব হয়। তখন ছোট

লাটসাহেব যদুনাথকে ডাকেন এবং তাঁহার সহিত অনেক তর্কবিতর্ক হয়। অবশেষে একটি সালিশী কমিটি স্থাপন করা স্থির হয়। ইহাতে প্রজার পক্ষে যদুনাথ, নীলকরের পক্ষে জোড়হাটী কান্‌সরণের টুইডি সাহেব এবং সরকার পক্ষে প্রেসিডেন্সী বিভাগের কমিশনার স্মিথ সদস্য হন। এই কমিটি প্রজাবর্গের অসন্তোষের কারণ নির্দ্দেশ পূর্ব্বক সমস্ত গোলমালের মীমাংসা করেন।

বাঙ্গলা ও ইংরাজী দার্শনিক গ্রন্থ লিখিয়া 'হিন্দু-পত্রিকা' সম্পাদক রায়বাহাদুর যদুনাথ মজুমদার বেদান্তবাচস্পতি, সি, আই, ই দেশ বিদেশে খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। রায়বাহাদুর যদুনাথ একজন কর্ম্মবীর, তিনি শিক্ষাবিস্তারের জন্য স্কুল স্থাপন বা স্বজাতির কল্যাণের জন্য সর্ব্বজাতীয় সদনুষ্ঠানে অগ্রণী হইয়া যশোহরের সর্ব্ববিধ উন্নতির জন্য চেষ্টা করেন।"

পণ্ডিত শ্রীকেদারনাথ ভারতী স্মৃতিসাংখ্য-মীমাংসাতীর্থ মহাশয় কর্ম্মবীর যদুনাথ সম্বন্ধে যাহা পূর্ব্বে লিখিয়াছেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম। "যশোহরজননীর বরেণ্য সন্তান যশোহর-জেলাবোর্ডের সুযোগ্য চেয়ারম্যান্, যশোহরের শ্রেষ্ঠ উকীল, কর্ম্মবীর রায় শ্রীযুত যদুনাথ মজুমদার বাহাদুর এম, এ, বি, এল, বেদান্তবাচস্পতি বিদ্যাবারিধি মহাশয় সমগ্র ভারতবর্ষে সুপরিচিত। সর্ব্বতোমুখী প্রতিভার ফলে তিনি নানাক্ষেত্রে—নানাসূত্রে—নানাভাবে পরিচিত হইয়াছেন। কেহ কৃষিশিল্পের সমুন্নয়নে, কেহ সাহিত্য-সেবায়, কেহ দেশের—দশের কার্য্যে, কেহ রাজনীতিক্ষেত্রে, কেহ অর্থনীতিতে, কেহবা দেশের স্বাস্থ্যোন্নতি—সাধনের চেষ্টায়, কেহবা শিক্ষা-বিস্তারের প্রসঙ্গে, কেহবা বিচারালয়ে ব্যবহার শাস্ত্রের পাণ্ডিত্যে তাঁহার প্রতিভার পরিচয় পাইয়াছেন। কিন্তু তাঁহার প্রতিভার সকল দিকের সংবাদ অনেকেই রাখেন না। তাঁহার স্বদেশ-বাৎসল্য, জনসাধারণের কল্যাণার্থে স্বার্থত্যাগ, আর্ত্তসেবা, প্রভৃতি সদ্‌গুণের কথা সাধারণের সুবিদিত হইলেও তাঁহার কর্ম্মজীবনের সর্ব্বাংশের পরিচয় সকলে জানেন না। তাহার বিস্তৃত বিবরণ লিখিতে গেলে একখানি প্রকাণ্ড গ্রন্থ হয়, এজন্য বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাঁহার কর্ম্মের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদত্ত হইবে।

রাজনীতিক্ষেত্রে যদুনাথ ঃ—ভারতীয় জনসাধারণের ইংলণ্ডীয় জনগণের ন্যায় তুল্যাধিকার লাভের বা ভারতে বৃটিশসংশ্রবযুক্ত



রায়বাহাদুর যদুনাথের যশোহর ভবন

পৃঃ ৫৩

স্বায়ত্ত-শাসন-লাভের উদ্দেশ্যে যখন জাতীয় মহাসমিতি বা কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা হয়, তখন হইতে দেশভক্ত মহানুভবগণ কংগ্রেসকে কেন্দ্র করিয়া নানাভাবে রাজনৈতিক অধিকার-লাভের চেষ্টা আরম্ভ করেন। কংগ্রেসই দেশের রাজনৈতিক মিলনমন্দির। এই কংগ্রেসের সৃষ্টি হইতে এ পর্য্যন্ত কর্ম্মবীর যদুনাথ কংগ্রেসের সহিত সংসৃষ্ট আছেন। কংগ্রেসের সৌষ্ঠবসাধনার্থে ইনি অন্যান্য নেতৃবর্গের ন্যায় সময়, অর্থ ও চিন্তা ব্যয় করিয়া আসিতেছেন। কংগ্রেসের কার্য্যে অপরাপর নেতার ন্যায় যদুনাথও অক্লান্ত-কর্ম্মী। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দ হইতে কংগ্রেসের মধ্যবর্ত্তিতায় যে রাজনৈতিক আন্দোলন চলিয়াছে, যাহার ফলে বর্ত্তমানে ভারতবাসী স্বায়ত্ত-শাসনাধিকার লাভ করিতেছেন, সেই আন্দোলনে যদুনাথের সম্বন্ধ অল্প নহে। কংগ্রেসের স্রষ্টা মহামতি হিউম্ ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে "ষ্টেটস্‌ম্যান্" পত্রে কর্ম্মবীর যদুনাথ সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন যে "I have known Jadunath almost from his boyhood and I do not know a greater lover of the country than him." অর্থাৎ যদুনাথকে আমি বাল্যাবধি জানি, আর আমি তাঁহা অপেক্ষা অধিক স্বদেশ-প্রেমিক কাহাকেও জানি না। ভারতবন্ধু হিউমের নিকট এইরূপ প্রশংসালাভ হইতে বুঝা যায়, যদুনাথ রাজনীতিক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠ নেতা। ভারতীয় রাজনৈতিক আন্দোলনের ন্যায্যতা বুঝিতে পারিয়া যখন মিঃ মণ্টেগু ও সদাশয় লর্ড চেমস্‌ফোর্ড মহোদয়, ভারতবর্ষীয় প্রজাসাধারণের অধিকারবর্দ্ধক শাসন-সংস্কারে চেষ্টাবান্ হন, তখন তাঁহারা দেশীয় নেতৃগণের সাক্ষ্য গ্রহণ করেন। ঐ সময়ে যদুনাথও অপরাপর নেতৃবর্গের ন্যায় সাক্ষ্যদানার্থে আহূত হন—এবং ভারতবাসীরা যে স্বায়ত্বশাসনাধিকার-লাভের সম্পূর্ণ যোগ্যপাত্র—ইহা (অত্যন্ত দৃঢ়তার সহিত) বহুবিধ অকাট্য যুক্তিবলে প্রতিপন্ন করেন। আবার যখন শাসন, বিচার, শিক্ষা ইত্যাদি বিভাগ-সমূহের মধ্যে কোন্ কোন্‌টীর ভার দেশীয় প্রতিনিধিগণের হস্তে অর্পিত হইবে—এই বিষয় স্থির করিবার জন্য কমিটির অধিবেশন হয়, তখন তাহাতে সাক্ষ্য দিতে গিয়াও যদুনাথ দেশীয় প্রজাসাধারণের অধিকার-বৃদ্ধির জন্য বিশেষ ভাবে চেষ্টা করিয়াছিলেন। যাহাতে মাত্র কতিপয় ধনশালী লোকের হস্তে প্রতিনিধি-নির্ব্বাচনের অধিকার ন্যস্ত না হয়, প্রত্যুত দেশের ধনী, মধ্যবিত্ত, দরিদ্র জনসাধারণ যাহাতে প্রতিনিধি-নির্ব্বাচনের ক্ষমতা লাভ করে—এজন্য অন্যান্য

নেতার ন্যায় যদুনাথও প্রভৃত চেষ্টা করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, নেতৃবর্গের ঐ চেষ্টা ব্যর্থ হয় নাই। সাধারণের এই অধিকার-লাভের জন্য যাঁহারা চেষ্টা করিয়াছিলেন, জনসাধারণ তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞ, ইহাতে সংশয় নাই।

১৮ লক্ষ যশোহরবাসীর মধ্যে ধনী বা দরিদ্র অপর কয়জন এরূপভাবে জনসাধারণের অধিকার-লাভের জন্য চেষ্টা করিয়াছেন জানি না। আমরা দেখি, এ প্রদেশে সাধারণের হিতকর যে কোনও আন্দোলন বা অনুষ্ঠান হয়, যদুনাথ তাহার অগ্রণী। এতদঞ্চলের রাজনৈতিক আন্দোলনকারীরা তাঁহার নেতৃত্বে কার্য্য করিয়া থাকেন। দেশীয় জনসাধারণের অধিকারবৃদ্ধি বিষয়ে তিনি নির্ভীকচিত্তে কংগ্রেসে যে সকল বক্তৃতা করিয়াছেন, শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গ তাহা অবগত আছেন। যদুনাথ একজন স্বাধীনচেতা স্বদেশভক্ত।

এই সেদিন কলিকাতার কংগ্রেসে শ্রীমতী এনিবেশান্তের সভানেত্রীত্ব লইয়া কলিকাতায় যে তুমুল সংগ্রাম চলিয়াছিল এবং যাহা লইয়া নানাবিধ দলাদলি —রেষারেষির উদ্ভব হওয়ায় কলিকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশন পণ্ড হইবার উপক্রম হইয়াছিল, উহা মিটাইবার জন্য স্যার চন্দ্রমাধব ঘোষ মহাশয়ের বাটীতে বঙ্গের প্রতিনিধিবর্গের যে সভা হইয়াছিল, তাহাতে যদুনাথ সভাপতির পদ গ্রহণ করিয়া উভয়পক্ষের বিবাদ মিটাইয়া দিয়া, নির্ব্বিবাদে কংগ্রেসের অধিবেশনের সহায়তা করিয়া, দেশের অশেষ মঙ্গল সাধন করিয়াছিলেন।

সংবাদপত্রের সংস্রবে দেশসেবা ঃ—দেশবাসীর আশা আকাঙ্খার, অভাব-অভিযোগের অভিব্যক্তির যন্ত্র সংবাদপত্র। সকল সভ্যদেশেই সংবাদপত্রের সাহায্যে জনসাধারণের মনের কথা, প্রাণের ব্যথা, প্রকাশিত হয়। সংবাদপত্রের সাহায্যে রাজনৈতিক আন্দোলন প্রসার লাভ করে। সকল সমাজেই নেতৃবর্গ সংবাদপত্রের পরিচালক। যদুনাথ, সংবাদপত্রের নায়কতায়ও শ্রেষ্ঠস্থানে প্রতিষ্ঠিত। দেশের কল্যাণকর আলোচনায় তাঁহার শক্তিমতী লেখনী কখনও বিরত হয় নাই। ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি তাঁহার আত্মীয় যশোহর-করগুীর অম্বিকাচরণ সরকার মহাশয়ের অর্থনায়কতায় সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার যোগেন্দ্রনাথ স্মার্ত্তশিরোমণি এম, এ, ডি, এল্ মহাশয়ের সহিত একযোগে "ইউনাইটেড্ ইণ্ডিয়া" নামক ইংরেজী সাপ্তাহিক সংবাদপত্র সম্পাদন করেন। "ইউনাইটেড্ ইণ্ডিয়া" পত্রে তিনি যে সমস্ত স্বাধীনচিন্তাপূর্ণ প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, তাহা তৎকালে সকলেরই চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছিল।

ঐ সময় অমৃতবাজারপত্রিকা, ষ্টেটস্‌ম্যান্‌, হিন্দুপেট্রিয়ট প্রভৃতি পত্রেও তিনি দেশীয় জনসাধারণের হিতার্থে অনেক প্রবন্ধ লিখিতেন্‌। যদুনাথ "ট্রিবিউনের" সম্পাদকতা স্বীকার করিয়া লাহোর গেলে, "ইউনাইটেড ইণ্ডিয়া" অমৃতবাজার-পত্রিকার সহিত মিলিত হয়। যদুনাথ 'ট্রিবিউনের' সম্পাদকতায় প্রভুত কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন। পাঞ্জাববাসীরা এখনও তাঁহার সে সেবা বিস্মৃত হন নাই। সার্দ্ধ তিন বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার পুত্র কুমার অধিক্রম মজুমদার যখন সৈনিকবিভাগে প্রবেশ করেন, তখন পাঞ্জাবের অধিবাসীরা তাঁহার প্রচুর অভ্যর্থনা করিয়া গাঢ় শ্রদ্ধার পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। যদুনাথ যখন তাঁহার পিতৃদেবের অভিপ্রায়ে কাশ্মীরের রাজস্ব-বিভাগের সেক্রেটারীপদ পরিত্যাগ করিয়া যশোহরে ওকালতি করিতে আসেন, তখন দেশীয় জনগণের মঙ্গলার্থে আলোচনা করিবার জন্য "সম্মিলনী" সংবাদপত্র প্রকাশ করেন। 'অমৃতবাজার পত্রিকা' যশোহরের মাগুরা হইতে (১৮৬৮ খৃঃ) কলিকাতায় স্থানান্তরিত হওয়ার পর, দীর্ঘকাল যশোহর হইতে সংবাদপত্র প্রকাশিত হইয়াছিল না। পরে যশোহরের সদর হইতে (১৮৮৯ খৃঃ) সম্মিলনী প্রকাশিত হয়। যদুনাথের লেখনী দীর্ঘকাল ধরিয়া "সম্মিলনী"তে বহু হিতকর ব্যাপারের আলোচনায় রত ছিল। বর্ত্তমানে যদুনাথ স্বয়ং স্বতন্ত্রভাবে সংবাদপত্র-পরিচালনের অবসর পান না, কিন্তু যখনই দেশের কোন সমস্যার সমাধানকল্পে আলোচনার প্রয়োজন হয়, তখনই তিনি "অমৃতবাজারপত্রিকা" "বেঙ্গলী" "ষ্টেটস্‌ম্যান" "ইংলিশম্যান্‌" "ডেলিনিউস্‌" প্রভৃতি প্রসিদ্ধ পত্রে প্রবন্ধ লিখিয়া দেশবাসীকে ও গবর্ণমেণ্টকে সৎপরামর্শ প্রদান করেন। আমরা দেখিতেছি, ১৮৮৩ খৃঃ হইতে এ পর্য্যন্ত দেশের মঙ্গলকর আন্দোলনে যদুনাথের লেখনী কখনও বিরত হয় নাই। যদুনাথ যশোহর জেলাবোর্ডের বে-সরকারী চেয়ারম্যান্‌। জেলাবোর্ডে বে-সরকারী চেয়ারম্যান্‌—নির্ব্বাচন-বিষয়ক আন্দোলনেরও তিনি অগ্রণী। তিনিই প্রথমে এদেশে জেলাবোর্ডে বে-সরকারী চেয়ারম্যান নিয়োগ সম্বন্ধে "অমৃতবাজারপত্রিকায়" আলোচনা করেন। সেই আন্দোলনের ফলে দেশে জেলাবোর্ডে বে-সরকারী চেয়ারম্যান্‌—নির্ব্বাচন-প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে—এরূপ মনে করিবার প্রচুর কারণ আছে। এই আন্দোলনের সুফল সমগ্র দেশ ভোগ করিতেছে। সংবাদপত্রের সহায়তায় যাঁহারা দেশের কার্য্য করিয়াছেন এবং করিতেছেন, যদুনাথ তাঁহাদেরই একজন।

প্রজাবন্ধু যদুনাথ ঃ—১৮৮৯।৯০ খ্রীষ্টাব্দে যশোহরে নীলকর ও প্রজাবর্গের মধ্যে গোলযোগ উপস্থিত হয়। অনেক নীলকর সদাশয় ছিলেন, তাঁহারা প্রজার উপর অত্যাচার করিতেন না, আবার অনেকে উৎপীড়নও করিতেন। অত্যাচারী নীলকরগণের পীড়নে প্রজাগণ অত্যন্ত প্রপীড়িত হইয়াছিল। প্রপীড়িত হিন্দু-মুসলমান প্রজাকুল দেশের বহু ধনী ও শিক্ষিত লোকের দ্বারে গিয়াছিল, কিন্তু কোথাও নেতা পাইয়াছিল না। নির্ভীক যদুনাথ, নীলকরের অত্যাচারে কাতর মধ্যবিত্ত ও কৃষক হিন্দু মুসলমান প্রজাবর্গের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। ঐ সময় অনেকবার তাঁহার জীবন বিপন্ন হওয়ার উপক্রম হয়, অন্যদিকে তাঁহাকে প্রজাপক্ষ হইতে বিচ্ছিন্ন করিবার জন্য প্রচুর অর্থের প্রলোভন দেখানও হয়, কিন্তু কর্ত্তব্যসাধনে অটল অচল যদুনাথ বিপদ্ ও প্রলোভন অতিক্রম করিয়াছিলেন। তিনি স্বীয় কর্ত্তব্যপথ হইতে বিন্দুমাত্রও বিচলিত হইয়াছিলেন না। যদুনাথ ভারতবন্ধু ব্রাডলা সাহেবের দ্বারা পার্লামেণ্টে নীলকর-প্রপীড়িত প্রজাপুঞ্জের দুঃখকাহিনী জানাইয়াছিলেন, পার্লামেণ্ট হইতে তদ্বিষয়ে এ দেশীয় গবর্ণমেণ্টের কৈফিয়ৎ-তলবও হইয়াছিল। পরিণামে প্রজাগণ উৎপীড়ন হইতে অব্যাহতি পাইয়াছিল; যশোহর হইতে নীলের চাষ উঠিয়া গিয়াছিল। গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক প্রকাশিত যশোহর জেলার গেজেটিয়ারে ইহার কিঞ্চিৎ বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছিল। যদুনাথ চিরদিনই প্রজার দুর্দ্দিনের আশ্রয়। নীলবিদ্রোহে যদুনাথের কৃতিত্ব সমস্ত লিখিতে গেলে স্বতন্ত্র একখানি গ্রন্থ লিখিতে হয়।

পূর্ব্বে যখন মিঃ মর্সহেড্ যশোহরের ম্যাজিষ্ট্রেট, তখন একবার যশোহরে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়, কিন্তু গবর্ণমেণ্ট দুর্ভিক্ষ ঘোষণা করেন না। যদুনাথ দেখিলেন, দুর্ভিক্ষ দেশের সর্ব্বনাশ করিতেছে, অথচ গবর্ণমেণ্ট দুর্ভিক্ষ ঘোষণা করিতেছেন না বা প্রজার প্রাণরক্ষার ব্যবস্থা করিতেছেন না। যদুনাথের পরদুঃখকাতর হৃদয় এই ঘটনায় কাঁদিয়া উঠিল। তিনি লাট্সাহেবের নিকট ঐ সম্বন্ধে আবেদন করিলেন, এবং তাঁহার অন্যতম সুহৃৎ বৌদ্ধ-প্রচারক ধর্ম্মপাল মহাশয়ের সাহায্যে "মহাবোধিসভা" হইতে চাউল বিতরণের ব্যবস্থা করিলেন। চাঁদা সংগ্রহ করিয়াও বহু টাকা তুলিলেন এবং দরিদ্রগণকে প্রয়োজনমত সাহায্য করিতে লাগিলেন। মধ্যবিত্ত, দরিদ্র,

অসহায়া বিধবা ও নিরুপায় লোকদিগের বাটীতে চাউল পাঠাইয়া দিতে লাগিলেন। দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট লোকেরা এই অপ্রত্যাশিত সাহায্য পাইয়া জীবন রক্ষা করিল। এ দিকে লাট্ সাহেব যদুনাথের আবেদন-পত্র পাইয়া তদন্তান্তে দুর্ভিক্ষ ঘোষণা করিলেন। অনতিবিলম্বে গবর্ণমেণ্ট হইতে সাহায্য করিবার ব্যবস্থা হইল। যদুনাথ দেখিলেন, তাঁহার যত্ন সফল হইয়াছে, দুর্ভিক্ষপীড়িত জনগণ রাজকীয় অনুগ্রহ লাভ করিতেছে, তখন তিনি আর স্বতন্ত্রভাবে কার্য্য না করিয়া গবর্ণমেণ্টের কার্য্যে সাহায্য করিতে লাগিলেন। যদুনাথ চিরদিনই আর্ত্তের পরিত্রাতা।

কর্ম্মবীর যদুনাথ দীর্ঘকাল যশোহর-মিউনিসিপালিটীর চেয়ারম্যান্ ছিলেন। তিনি যখন চেয়ারম্যান্ ছিলেন, তখন টাউনের রাস্তা সমূহের যথেষ্ট উন্নতিসাধন করেন ও অনেক পাকা ড্রেন্ নির্ম্মাণের ব্যবস্থা করেন। তিনি যশোহরের লালদীঘির আয়তন বৃদ্ধি করেন। তাঁহার চেষ্টাতেই যশোহরের জলের কলের কার্য্য আরব্ধ হয়। মিউনিসিপালিটীর কার্য্যে ব্যাপৃত থাকায় তাঁহার ওকালতিব্যবসায়ের অনেক ক্ষতি হইয়াছিল, কিন্তু তিনি তাহাতে পশ্চাৎপদ হন নাই। অদ্যাবধি তিনি যশোহর-মিউনিসিপ্যালিটীর কমিশনার্-রূপে যথাসাধ্য সহরের কল্যাণসাধন করিতেছেন। বর্ত্তমান সুযোগ্য চেয়ারম্যান্ মহাশয়কে তিনি মিউনিসিপালিটীর কার্য্যে নানারূপে সাহায্য করিয়া থাকেন। যশোহরের "উড্বর্ণ সার্জ্জিকেল ওয়ার্ড" এবং "এণ্ড্রু ফ্রেজার্ আউট্‌ডোর পেশাণ্ট ওয়ার্ড" প্রভৃতি তাঁহারই যত্নে নির্ম্মিত হয়। যদুনাথ যতদিন যশোহর-মিউনিসিপালিটীর চেয়ারম্যান্ ছিলেন, ততদিন যশোহরটাউনে কলেরা, বসন্ত, ম্যালেরিয়া প্রভৃতি পীড়ার প্রকোপ অধিক হইতে পারে নাই। যদুনাথ সংক্রামক-রোগের প্রসার নিবারণে সমর্থ হইয়াছিলেন। যশোহরে একটী মাত্র প্লেগ-রোগী আসিয়াছিল, যশোহরে তাহার মৃত্যু ও হইয়াছিল, কিন্তু যদুনাথের সুব্যবস্থাগুণে টাউনে উক্ত মারাত্মক সংক্রামক-রোগের প্রসার বৃদ্ধি হইতে পারিয়াছিল না। তিনি নিজে প্রত্যেক রোগীর গৃহে যাইয়া দেখিয়া ব্যবস্থা করাইতেন।

নদীসংস্কারে যদুনাথ ঃ—নদীসমূহের দুর্দ্দশা দেশের সর্ব্বনাশের প্রধান কারণ। নদী মরিয়া যাওয়াতেই যশোহরে রোগের বাহুল্য ঘটিয়াছে। নদীর সংস্কার ভিন্ন কোনও প্রকারে যশোহরের স্বাস্থ্যোন্নতি হইতে পারে

না—বুঝিয়া, যদুনাথ দীর্ঘকাল নদীসংস্কারের চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। সার ষ্টুয়ার্ট বেলী যখন বঙ্গের লেফটেনাণ্ট গবর্ণর, তখন হইতে যদুনাথ অক্লান্তভাবে চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। যদুনাথ যশোহরের দুর্দ্দশা দেখাইবার জন্য সার্ জন্ উড্‌বর্ণ ও সার্ এণ্ড্রু ফ্রেজার মহোদয়কে দুই দুইবার যশোহরে আনিয়াছিলেন। তিনি সার্ এণ্ড্রু ফ্রেজার মহাশয়কে কুষ্টিয়া হইতে জলপথে সঙ্গে করিয়া আনিয়া যশোহরের নদীর দুরবস্থা দেখাইয়াছিলেন, এবং উহার প্রতীকারকল্পে নিজের উদ্ভাবিত সুচিন্তিত 'স্কীম্' দেখাইয়া বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। ফলে সার এণ্ড্রু ফ্রেজার যশোহরের নদীর সংস্কার অবশ্যকর্ত্তব্য বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন। প্রথমে তিনি ভৈরবনদের সংস্কার আরম্ভ করিতে আদেশ দিয়াছিলেন, পরে অপর নদীর সংস্কারের ব্যবস্থা করিবেন প্রকাশ করিয়াছিলেন। ভৈরবসংস্কারের সূচনা হইয়াছিল, বজেটে সেজন্য টাকাও মঞ্জুর হয়, কিন্তু সার এণ্ড্রু ফ্রেজার বিলাতে চলিয়া যাওয়ায় সমস্ত আয়োজন ব্যর্থ হইয়া যায়। এই ঘটনায় যদুনাথ ভগ্নোৎসাহ হন নাই। তিনি অক্লান্তভাবে সার এডওয়ার্ড বেকার, লর্ড কারমাইকেল্, ও বর্ত্তমান গবর্ণর মহোদয়ের সহিত পুনঃ পুনঃ সাক্ষাৎ করিয়া (কলিকাতায় ও দার্জ্জিলিঙে যাইয়া) নদীসংস্কারের প্রয়োজন জ্ঞাপন করেন। সম্প্রতি তাঁহার চেষ্টায় আবার নদীসংস্কার আরম্ভ হইয়াছে। "এড়োল বিলের" খাল কাটা হইয়াছে, যমুনার সংস্কার আরব্ধ হইয়াছে, ভৈরবের সংস্কার শীঘ্র আরব্ধ হইবে স্থিরীকৃত হইয়াছে। এ সকলের মূল যদুনাথের চেষ্টা। যদুনাথ দুই বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতায় লাটভবনের সভায় মাননীয় লর্ড রোণাল্ডসে মহোদয়কে বলিয়াছিলেন যে 'ভগীরথ যেমন গঙ্গাস্রোত বহাইয়া সগরকুলের উদ্ধার সাধন করিয়াছিলেন, আপনিও তেমনি বাঙ্গালার মরা নদীতে স্রোত বহাইয়া মৃতপ্রায় বাঙ্গালী নরনারীর পুনর্জ্জীবন দান করুন।" তাঁহার আশা পূর্ণ হইবার সূচনা হইয়াছে। সম্প্রতি যশোহরের ভূতপূর্ব্ব জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ও চট্টগ্রামের ভূতপূর্ব্ব কমিশনার মিঃ গ্রিফিণ্ সাহেব বিলাত হইতে যদুনাথের অন্যতম বন্ধু বাবু কুঞ্জবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে এ সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহার সারভাগ এ স্থলে উদ্ধৃত হইতেছে।

"I rejoiced to see in the last No. to hand of *A. B. Patrika*

a paragraph stating that the re-opening of the Bhairab River would soon be an accomplished fact. It is not creditable to British administration in the past that this comparatively easy piece of engineering has been so long postponed. Millions of people have been carried off by malaria ; their lives might have been saved by restoring this great water-way. I rejoice that I should have been in a small measure useful ; and beg you to offer my warm congratulations to Rai Jadu Nath Majumdar Bahadur to whose indefatigable labour Jessore will stand eternally indebted.

দেশের স্বাস্থ্যোন্নতি-সাধনকল্পে যদুনাথের কার্য্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক মনোনীত "বেঙ্গল্‌পাব্‌লিক্‌ হেল্‌থ্‌ কমিটী"র মেম্বর হইয়া যদুনাথ এজন্য বিশেষ যত্ন ও চেষ্টা করিয়াছিলেন, ইহা অনেকেই অবগত আছেন।

জেলাবোর্ডে যদুনাথ ঃ—যশোহর-জেলাবোর্ডের চেয়ারম্যান্ পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া যদুনাথ জনহিতে অধিকতর মনোযোগ করিবার সুবিধা পাইয়াছেন।

লর্ড কারমাইকেল এদেশে আসিয়া বঙ্গপল্লীর জলাভাব নিবারণ করিবার জন্য দার্জ্জিলিঙে যে কমিটির অধিবেশন করান, যদুনাথ তাহার অন্যতম সদস্য ছিলেন, এবং তিনি ঐ কমিটীতে প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে, প্রতিজেলায় কোন্ গ্রামে জলাশয় আছে, আর কোথায় নাই, তাহার তালিকা প্রস্তুত হউক্। তদনুসারে সমস্ত জেলার ঐরূপ তালিকা প্রস্তুত হয়, যশোহর জেলারও হয়, কিন্তু জলাশয়ের জন্য বিশেষ কোনও চেষ্টা করা হয় না। যদুনাথ চেয়ারম্যান্ হইয়া সেই কার্য্য আরম্ভ করেন।

যদুনাথ জেলাবোর্ডের ব্যয়ে জলকষ্টক্লিষ্ট গ্রামে কূপ ও পুষ্করিণী খনন করাইতে আরম্ভ করিয়া জনসাধারণের মঙ্গলের দ্বার খুলিয়া দিয়াছেন। ৩ বৎসরে জেলাবোর্ড হইতে তিনি কূপ ও পুষ্করিণী-খনন জন্য প্রায় ৯০ সহস্র মুদ্রা ব্যয় করিয়াছেন। তিনি জেলাবোর্ডের ব্যয়ে কয়েকটি দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করিয়া ও বহু গ্রামে সাহায্যপ্রাপ্ত চিকিৎসক নিয়োগ করিয়া, সাধারণের প্রচুর উপকার করিয়াছেন ও করিতেছেন। তিনি ম্যালেরিয়া, কলেরা, বসন্ত, ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা প্রভৃতির আক্রমণ হইতে দেশবাসীকে

রক্ষা করিবার জন্য উপদেশপূর্ণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তিকা প্রচার করিয়া, দেশের অশেষ মঙ্গলের সূচনা করিয়াছেন। ঐ সমস্ত পুস্তিকা গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক অনুমোদিত হইয়াছে, এবং যশোহর জেলার বাহিরেও উহা প্রচারিত ও সমাদৃত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত যদুনাথ "পল্লীস্বাস্থ্য" নামক পুস্তক রচনা করিয়া, সাধারণের মধ্যে প্রচার করিয়া, লোকদিগকে স্বাস্থ্যরক্ষা-বিষয়ক শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন। ইহা ছাড়া তিনি গৃহপালিত গবাদিপশুর রোগ-নিবারণের উপায় শিক্ষা দিবার জন্য পুস্তিকা প্রকাশ করিয়াছেন, তদ্দ্বারা দেশের বহু উপকার ঘটিয়াছে। সম্প্রতি তিনি লুপ্তপ্রায় আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার পুনরুজ্জীবনকল্পে অগ্রসর হইয়া, জেলাবোর্ডের ব্যয়ে যশোহরে একটী আয়ুর্ব্বেদীয়-দাতব্য-চিকিৎসালয় স্থাপন ও আয়ুর্ব্বেদীয়-চিকিৎসক নিয়োগের ব্যবস্থা করিয়া, দেশীয় জনসাধারণের ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। সমগ্র বঙ্গবাসী তাঁহার এই অভূতপূর্ব্ব উপকারক কার্য্যের জন্য উচ্চকণ্ঠে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিয়াছেন। জেলাবোর্ডের কার্য্যে গবর্ণমেণ্ট ও দেশবাসী তাঁহার নিরপেক্ষতা, কর্ম্মদক্ষতা, শ্রমশীলতা সদ্বিবেচকতা প্রভৃতি গুণের পরিচয় পাইয়াছেন ও পাইতেছেন। জেলাবোর্ডের সভাপতিরূপেও যদুনাথ দেশসেবায় একনিষ্ঠ।

গত বৎসর যখন ঝটিকাবিপ্লবে যশোহরের নড়াইলমহকুমার অধিবাসীরা বিপন্ন হইয়া পড়েন, সে সময় যদুনাথ উক্ত ঝটিকাপীড়িত জনগণের দুঃখ দূর করিবার জন্য সরকারী ও বে-সরকারী সাহায্যের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন করিয়া দেশের যে উপকার করিয়াছেন, সাইক্লোন্‌কমিশনর হার্ডসাহেব তাহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন। ঐ সময় যদুনাথ গবর্ণমেণ্ট হইতে ও বে-সরকারী সভা হইতে টাকা আনিয়া, যশোহর জেলাবোর্ড হইতে বহু টাকা সাহায্য দিয়া, বহু লোকের গৃহাদিনির্ম্মাণের ব্যবস্থা করেন। তিনি নিজে ঝটিকাপীড়িত গ্রাম সমূহে যাইয়া লোকের দুরবস্থা দর্শন ও তাহার প্রতীকারের ব্যবস্থা করিয়া বহুলোকের উপকার করেন। বিপন্নের দুঃখমোচনে যদুনাথ সতত অগ্রণী।

"তুলার চাষ' কিরূপে কার্য্যতঃ আমাদের হিতকর হইতে পারে—এ সম্বন্ধে যদুনাথ অমৃতবাজারপত্রিকা, ইংলিশম্যান্, ষ্টেটস্‌ম্যান্ প্রভৃতি সংবাদপত্রে যে প্রণালীর আলোচনা করিয়াছেন, তাহার উপকারিতা হৃদয়ঙ্গম করিয়া,

অনেকে তাঁহার পরামর্শ অনুসারে তুলার চাষ আরম্ভ করিয়াছেন। অনেক শিক্ষিত ভদ্রলোক তাঁহার সুচিন্তিত পরামর্শের সম্মান রক্ষা করিয়া আনন্দিত হইয়াছেন। বস্ত্র-সঙ্কটে কিরূপ উপায় অবলম্বন করা উচিত,—এ সম্বন্ধে তিনি পুস্তিকা প্রচার করিয়া দেশীয়জনগণকে যে সদুপদেশ দিয়াছেন, তাহার অনুসরণ করিলে, বস্ত্রসমস্যার সমাধান করা যায়। যদুনাথের চিন্তা ও কার্য্য দেশবাসীর মঙ্গলে নিয়োজিত।

কর্ম্মবীর যদুনাথ নানাভাবে দেশের অর্থনীতি-বিষয়ক সমস্যার সমাধানে ব্যাপৃত আছেন। যশোহরের সুপ্রসিদ্ধ "লোন্ কোম্পানী লিমিটেডের" তিনি একজন ডিরেক্টর। যশোহরের সুপ্রতিষ্ঠিত "ইউনাইটেড্ ব্যাঙ্কের" তিনি স্থাপয়িতা ও ম্যানেজিং-ডিরেক্টর, "কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের" তিনি অন্যতম স্থাপয়িতা। কলিকাতার "বেঙ্গল ন্যাসন্যাল্ ব্যাঙ্কের" তিনি একজন পৃষ্ঠপোষক। যখন বেঙ্গলন্যাসন্যাল ব্যাঙ্ক বিপন্ন হয়, তখন যদুনাথ, সুপ্রসিদ্ধ শ্রীযুত ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি "বেঙ্গল ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্কের" পরিচালকগণকে নানারূপ সাহায্য করিয়া উক্ত ব্যাঙ্কের পুনঃপ্রতিষ্ঠার সহায় হইয়াছিলেন। যশোহরের "ব্যাঙ্কিং এণ্ড ট্রেডিং কোম্পানীর" সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নাই কিন্তু তিনি ঐ কোম্পানীর হিতৈষী, ও ঐ কোম্পানীর পরিচালকগণকে প্রয়োজনমতে সাহায্য করিয়া থাকেন। কৃষিজীবী হিন্দু-মুসলমান্-প্রজাদের ঋণদান ব্যবস্থায়ও যদুনাথ অগ্রণী। প্রথম যখন যশোহরে বহু গ্রামে "কো-অপারেটিভ সোসাইটীর" প্রতিষ্ঠা হয়, কিন্তু সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক স্থাপিত হয় নাই, সে সময় দরিদ্র কৃষকগণ প্রয়োজনমত ঋণ পায় না দেখিয়া, যদুনাথ ইউনাইটেড্ ব্যাঙ্ক হইতে কৃষক-সম্প্রদায়কে প্রয়োজনানুরূপ ঋণ-প্রদানের ব্যবস্থা করেন। ঐ সময়ে ঋণ না পাইলে দুঃস্থ প্রজাগণের কষ্টের সীমা থাকিত না। ৩ বৎসর পূর্ব্বে যখন বাঘারপাড়া থানায় দুর্ভিক্ষ হয়, তখন কৃষকগণের ঋণ প্রয়োজন হয়। যদুনাথ ইউনাইটেড্ ব্যাঙ্ক হইতে বহু সহস্র মুদ্রা ঋণ দিয়া তাহাদের রক্ষা করেন। যদুনাথ পরদুঃখ-মোচনে সতত উদ্‌যুক্ত।

যশোহরের কতিপয় গ্রামে "স্বদেশী আন্দোলনের" সময় গবর্ণমেণ্ট পিউনিটিভ পুলিশ বসাইবার ব্যবস্থা করেন। ঐ ব্যাপারে দরিদ্র নিরীহ প্রজাপুঞ্জের অসুবিধা ও ক্লেশ বৃদ্ধি পায় দেখিয়া, যদুনাথ, গবর্ণমেণ্টের

নিকট এক যুক্তিপূর্ণ আবেদনপত্র প্রেরণ করেন। ঐ আবেদনপত্রে তিনি পিউনিটিভ পুলিশ উঠাইয়া লইতে অনুরোধ করেন। গবর্ণমেণ্ট তাঁহার যুক্তিযুক্ত পরামর্শের সারবত্তা উপলব্ধি করিয়া পিউনিটিভ পুলিশ উঠাইয়া লন। দেশীয় জনগণের কল্যাণসাধনে যদুনাথ সতত সচেষ্ট। যশোহরে নমঃশূদ্র ও মুসলমানের বিবাদ উপলক্ষে পিউনিটিভ পুলিশ বসিলেও তিনি ঐরূপ করিয়াছিলেন।

শিক্ষাবিস্তারে যদুনাথঃ—বাল্যাবধি যদুনাথ দেশে শিক্ষা-বিস্তার-কল্পে চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। শিক্ষাবিস্তারার্থে তিনি অর্থব্যয় ও শ্রমস্বীকারে কুণ্ঠিত হন নাই। তাঁহার চেষ্টায় যশোহরে লোহাগড়া-হাইস্কুল, সম্মিলনী-ইন্‌ষ্টিটিউশন্‌, সুফলাকাটী-হাইস্কুল, রাজঘাট-হাইস্কুল ও বরিশালজেলায় কদমতলা-হাইস্কুল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এ সকল বিদ্যালয়ের কর্ণধার তিনি। নিম্ন-প্রাথমিক ও উচ্চপ্রাথমিক বিদ্যালয়, মধ্যইংরাজীবিদ্যালয় —উচ্চইংরাজীবিদ্যালয়, বালিকাবিদ্যালয় সর্ব্বত্রই তিনি সাধ্যানুরূপ সাহায্য করিয়া থাকেন। জেলাবোর্ডের সভাপতিরূপে তিনি বহু নূতনবিদ্যালয়স্থাপনে সাহায্য করেন। বঙ্গীয় বৈশ্যবারুজীবিসভার সভাপতিরূপেও বহু নূতন বিদ্যালয়স্থাপনে ও পরিচালনে অর্থ সাহায্য করেন।

যশোহরের টাউন্‌হল্‌-স্থাপনের প্রথম উদ্যোক্তা যদুনাথ।—ভূতপূর্ব্ব ম্যাজিষ্ট্রেট্‌ মিঃ এস্‌, কে অগস্তি মহাশয়ের সাহায্যে তিনি যশোহরটাউন্‌হলের কার্য্য সম্পূর্ণ করিতে পারিয়াছিলেন। যশোহরের ধ্বংসোন্মুখ "পাব্‌লিক্‌ লাইব্রেরী" তিনি রক্ষা করিয়াছেন এবং বর্ত্তমানেও রক্ষা করিতেছেন। সাধারণকার্য্যে যশোহরে যদুনাথই অগ্রণী।

পূর্ব্বে যশোহরে জুরিপ্রথা ছিল না, অথচ অন্য অনেক স্থলে ঐ প্রথা ছিল। কর্ম্মবীর যদুনাথের অক্লান্ত আন্দোলনের ফলেই যশোহরে জুরির বিচার প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। খুলনা যখন যশোহর হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার বহু পরে পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য লাভ করিয়াছিল, স্বতন্ত্র জেলাজজ পাইয়াছিল, তখন হইতে খুলনায়ও জুরিপ্রথা প্রচারিত হইয়াছিল।

যদুনাথ বহুকাল হইতেই যশোহর-জেলের বে-সরকারী পরিদর্শক। যশোহর-জেলে কয়েদীরা অনাবৃত স্থানে বসিয়া আহার করিতে বাধ্য হইত। যদুনাথ ইহার প্রতীকারে বদ্ধপরিকর হয়েন। তাঁহারই চেষ্টায়

যশোহর-জেলে কয়েদীদিগের আহারস্থানে আবরণের ব্যবস্থা হইয়াছে। তিনি কয়েদীদিগের আরও অনেক অসুবিধা দূর করিয়াছেন। কয়েদীদিগের প্রতি যাহাতে অন্যায় অত্যাচার না হয়, সেদিকে তিনি সর্ব্বদা লক্ষ্য রাখেন। তাঁহার শুভেচ্ছা ও সাধুচেষ্টা বহুবার সুফল প্রসব করিয়াছে।

সৈন্য সংগ্রহে যদুনাথ ঃ—যদুনাথের মতে বাঙ্গালীর ভীরুতা অপবাদ অলীক। বাঙ্গালী শিক্ষা পাইলে সৈনিককর্ম্মের উপযোগী হইতে পারে। প্রথম-জীবনে যদুনাথ সৈন্যবিভাগে প্রবেশ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, কিন্তু তখন সে বাসনা পূর্ণ হয় নাই। নেপালে গিয়া তিনি কিঞ্চিৎ যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন। ইউরোপীয় মহাসমরের প্রথমাবস্থায় যখন কলিকাতা-টাউনহলে দেশীয় নেতৃবর্গ মিলিত হইয়া, বর্দ্ধমানাধিপতি মহাশয়ের সভাপতিত্বে, বঙ্গবাসী জনগণকে যোগ্যতানুসারে সৈন্যদলে গ্রহণের জন্য রাজদ্বারে প্রার্থনা জানাইয়াছিলেন, তখন যদুনাথ, তাঁহার কৃতী পুত্র কুমার অধিক্রমকে লইয়া সে সভায় যোগদান করিয়াছিলেন, কিন্তু সে সময় গবর্ণমেণ্ট দেশের সে আবেদন অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন। পরে যখন অবস্থা বিবেচনা করিয়া, গবর্ণমেণ্ট, বাঙ্গালীদের সৈনিকবিভাগে গ্রহণের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তখন যদুনাথ ডাক্তার এস্, কে মল্লিক ও ডাঃ সুরেশপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী প্রভৃতির সহিত একযোগে সৈন্যসংগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। দেশের জনসাধারণ ও গবর্ণমেণ্ট অবগত আছেন যে, যদুনাথ বহু সৈন্য সংগ্রহ করিয়া দিয়াছিলেন। শুধু তাহাই নহে, তিনি তাঁহার যোগ্য পুত্র হাইকোর্টের উকিল শ্রীমান্ কুমার অধিক্রম মজুমদার বি, এল্, কে ১১৲ টাকা বেতনের সৈনিক কার্য্যে প্রেরণ করিয়া দেশের দৃষ্টান্তস্থানীয় হইয়াছিলেন। অবশ্য শ্রীমান্ অধিক্রম নিজের ক্ষমতায় 'সুবাদার মেজর' পদ অধিকার করিয়াছেন এবং "সিভিল সার্ব্বিসে" নমিনেশন্ পাইয়াছেন, কিন্তু যদুনাথ তাঁহাকে সামান্য সৈনিকের কর্ম্মেই নিঃশঙ্কচিত্তে প্রেরণ করিয়াছিলেন। এ ক্ষেত্রে তাঁহার অসীম হৃদয়বলের পরিচয় পাওয়া যায়, কিন্তু যখন বাধ্যতামূলক সৈনিক-সংগ্রহ-ব্যবস্থার প্রবর্ত্তনের কথা হয়, তখন যদুনাথ রাজা ও প্রজার কল্যাণার্থে সংবাদপত্রে উক্ত ব্যবস্থার প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রতিবাদ সুযুক্তিপূর্ণ ও সঙ্গত হইয়াছিল। উচ্চরাজকর্ম্মচারী কামিং সাহেব, যদুনাথের মত অত্যন্ত মূল্যবান্ মনে

করিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে পত্র দ্বারা সে কথা জানাইয়াছিলেন। সম্ভবতঃ যদুনাথের এবং অন্যান্য নেতৃবর্গের প্রতিবাদ সঙ্গত মনে করিয়াই গবর্ণমেণ্ট ঐ বিধানের প্রবর্ত্তনে অগ্রসর হন নাই।

সাহিত্যসেবায় যদুনাথ ঃ—যদুনাথ বঙ্গসাহিত্যক্ষেত্রে শক্তিশালী সাহিত্যিক। বঙ্গভাষায় তিনি দর্শন, ধর্ম্মতত্ত্ব, রাজনীতি, সমাজতত্ত্ব, স্বাস্থ্যতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ে বহু উৎকৃষ্ট গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। তাঁহার "আমিত্বের প্রসার" "ব্রহ্মসূত্র" "পরিব্রাজকসূক্তমালা" "সাংখ্যকারিকা" "শাণ্ডিল্যসূত্র" "রণগাথা" প্রভৃতি গ্রন্থ তাঁহাকে সাহিত্যক্ষেত্রে উচ্চাসন প্রদান করিয়াছে। ইংরেজীভাষায়ও যদুনাথ বহু সুচিন্তিত সারসন্দর্ভময় গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। তাঁহার কীর্ত্তিপতাকা "হিন্দুপত্রিকা" সমাজের আদরের বস্তু। হিন্দুপত্রিকা যখন তিনি প্রকাশ করেন, তখন দেশে কোন পত্রিকায় শাস্ত্রের মর্ম্ম বিশদ ভাবে প্রকাশিত হইত না। তিনিই শাস্ত্রের প্রতি শিক্ষিতসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। হিন্দুপত্রিকা পাঠ করিয়া মহামহোপাধ্যায় মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন সি, আই, ই, মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত চন্দ্রকান্ততর্কালঙ্কার, মহামহোপাধ্যায় শিবচন্দ্র সার্ব্বভৌম প্রভৃতি পণ্ডিতমণ্ডলী, মহামনাবিবেকানন্দ অভেদানন্দ প্রভৃতি ধর্ম্মপ্রচারক সন্ন্যাসিগণ, মহাত্মা রাজনারায়ণ বসু, মহাত্মা স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, সুপ্রসিদ্ধ শরচ্চন্দ্র দাস সি, আই, ই, সুবিখ্যাত নগেন্দ্রনাথ ঘোষ প্রভৃতি পাশ্চাত্যবিদ্যায় সুপণ্ডিত ব্যক্তিবর্গ, অমৃতবাজার-পত্রিকা, হিন্দুপেট্রিয়ট্, সোমপ্রকাশ, হিতবাদী, হিন্দুরঞ্জিকা, অনুসন্ধান, ঢাকা-প্রকাশ প্রভৃতি সংবাদপত্র সমস্বরে যদুনাথের প্রশংসা করিয়াছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যসংস্কারক রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুর বিদ্যাসাগর হিন্দু পত্রিকা সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন "হিন্দুপত্রিকা ঋষিজ্ঞানের রত্নভাণ্ডার বুকে লইয়া মহাজনী নৌকার ন্যায় কালের স্রোতে ভাসিয়াছে। এদেশে এখনও রত্নের বণিক না আছে এমন নয়, যখন তাহারা ইহার পরিচয় পাইবে, তখন হিন্দুপত্রিকার চারিপার্শ্বে সাধুমহাজনের হাট বসিবে। ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, আপনি তাঁহার কৃপায় এই পুরাতন রত্নের বাণিজ্যে পূর্ণমনোরথ হইয়া স্বদেশের মুখ উজ্জ্বল করুন।"

হিন্দুপত্রিকার দ্বারা যদুনাথ সত্যই হিন্দুসমাজের মহোপকার সাধন করিয়া-ছেন। বাঙ্গালায় যেমন হিন্দুপত্রিকা, ইংরেজীতে তেমনি 'ব্রহ্মচারী' প্রকাশ



বেদান্তবাচস্পতি যদুনাথ

পৃঃ ৬৫

করিয়াও যদুনাথ সমাজের কল্যাণসাধন করিয়াছিলেন। 'ব্রহ্মচারী' কতিপয় বর্ষ দক্ষতার সহিত সম্পাদিত ও প্রচারিত হইয়া পরে হিন্দুপত্রিকার সহিত সম্মিলিত হয়।

সংস্কৃতচর্চ্চায়ও তিনি প্রচুর কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। বেদবেদান্তাদি শাস্ত্রে তিনি সুপণ্ডিত। তাঁহার শাস্ত্রজ্ঞানের পরিচয় পাইয়া বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার পণ্ডিতমণ্ডলী—নবদ্বীপের মহামহোপাধ্যায় যদুনাথ সার্ব্বভৌম, মহামহোপাধ্যায় অজিতনাথ ন্যায়রত্ন, ভট্টপল্লীর মহামহোপাধ্যায় শিবচন্দ্র সার্ব্বভৌম, দ্রাবিড় মহামহোপাধ্যায় লক্ষ্মণ শাস্ত্রী, মৈথিল মহামহোপাধ্যায় চিত্রধর মিশ্র, উৎকল মহামহোপাধ্যায় জগন্নাথ মিশ্র, মহামহোপাধ্যায় কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ, মহামহোপাধ্যায় কালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন, মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভূষণ, মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, ও অন্যান্য বহুসংখ্যক পণ্ডিত কলিকাতার সংস্কৃতকলেজে বর্দ্ধমানাধিপতি মহাশয়ের সভাপতিত্বে তাঁহাকে 'বেদান্তবাচস্পতি' উপাধি প্রদান করেন। উপাধিপত্রে লিখিত আছে :—

বেদান্তাদিষু তে নিরীক্ষ্য মতিমন্নৈপুণ্যমত্যুজ্জলম্,
চারিত্রং বিমলঞ্চ সজ্জনসুহৃদ্ দেশানুরাগং পরম্,
ত্বদ্‌বাগ্মিত্বমনাকুলঞ্চ মধুরং তে দীয়তে সাম্প্রতং,
প্রীত্যাস্মাভিরুপাধিরেষ মুদিতৈর্ব্বেদান্তবাচস্পতিঃ।

বেদান্তাদিশাস্ত্রে প্রচুর পাণ্ডিত্য, বিমল চরিত্র, প্রভূত স্বদেশানুরাগ, অনাকুল মধুর বাগ্মিত্ব আলোচনা করিয়া প্রীত হইয়া পণ্ডিতগণ এই উপাধি প্রদান করিতেছেন—ইহাই ঐ শ্লোকে প্রকাশ। পণ্ডিতগণ যে যোগ্যপাত্রে সদুপাধি প্রদান করিয়াছেন, তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না।

স্ত্রীশিক্ষাবিস্তারেও যদুনাথের আন্তরিক চেষ্টা আছে। লোহাগড়াবালিকা-বিদ্যালয়, যশোহরের তারাপ্রসন্ন-বালিকাবিদ্যালয়, ষষ্ঠীতলাবালিকাবিদ্যালয় তাঁহারই যত্নচেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হইয়া পরিচালিত হইয়াছে।

স্যার শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে গবর্ণমেণ্ট যে "হিন্দু ফিমেল্ এডুকেশন্ কমিটির" গঠন করেন, তাহার সদস্যরূপে যদুনাথ হিন্দুস্ত্রী-শিক্ষাবিস্তারের প্রকৃষ্ট উপায় উদ্‌ভাবন করিয়া দেশের অশেষ উপকার করিয়াছেন।

সংস্কৃত শিক্ষা-বিস্তারে তাঁহার যত্ন ও ত্যাগ-স্বীকার প্রশংসনীয়। তাঁহারই চেষ্টায় যশোহরে 'ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম' ও 'বেদবিদ্যালয়' স্থাপিত হইয়াছিল। দেশের ভাগ্য-দোষে ঐ অনুষ্ঠান স্থায়ী হয় নাই, কিন্তু তিনি সেজন্য শ্রম ও অর্থ-ব্যয় করিতে ক্রটী করেন নাই। তিনি জেলাবোর্ড হইতে অনেক চতুষ্পাঠীতে অর্থসাহায্যদানের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। তিনি যদিও নিজে ধনবান্ নহেন, তথাপি অনেক চতুষ্পাঠীতে ব্যক্তিগতভাবে অর্থ সাহায্য করিয়া থাকেন। শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণের সম্মান রক্ষা করিতে তিনি সততই প্রস্তুত। আমরা দেখি, পণ্ডিতগণ তাঁহার নিকট আসিলে রিক্তহস্তে ফিরিয়া যান না। তাঁহার পিতৃশ্রাদ্ধে তিনি দ্বিশতাধিক অধ্যাপক নিমন্ত্রণ করিয়া বিদায় করিয়াছিলেন। "মধ্যবঙ্গবিদ্বৎসম্মিলন" উপলক্ষে বহু পণ্ডিত তাঁহার যশোহরস্থ ভবনে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তিনি তাঁহাদের সকলেরই যথাযোগ্য সম্মান রক্ষা করিয়াছিলেন। যদুনাথ নিজে যেমন বিদ্বান্, তেমনই বিদ্যানুরাগী ও বিদ্বৎপ্রতিপালক।

অক্লান্তকর্ম্মী যদুনাথের অসাধারণ চেষ্টার ফলেই যশোহরে বঙ্গীয়সাহিত্য-সম্মিলনের নবম অধিবেশন সংঘটিত হইয়াছিল। যদুনাথ সম্মিলনের জন্য যে শ্রমস্বীকার, সময়ক্ষেপ ও অর্থব্যয় করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহারই যোগ্য। যদুনাথ হাওড়া—সাহিত্যসম্মিলনে দর্শনশাখাসভার সভাপতির পদ স্বীকার করিয়া, তাঁহার মূল্যবান্ অভিভাষণে যে পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়াছেন, তাহা গৌরবকর, সন্দেহ নাই। যদুনাথ সাহিত্যপরিষদের সদস্য। সাহিত্যে যদুনাথের ত্যাগ-স্বীকার যথেষ্ট।

যদুনাথ তাঁহার স্বজাতির মঙ্গলার্থে বৈশ্যবারুজীবিসভা স্থাপন করিয়া, ঐ সভার সভাপতিরূপে, সভার ব্যয়ে, বহুবিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন। ঐ সকল বিদ্যালয় তাঁহার স্বজাতির ব্যয়ে স্থাপিত হইয়াছে, কিন্তু হিন্দু মুসলমান্ সর্ব্বশ্রেণীই উহাতে শিক্ষালাভ করিতে পারিতেছে—সর্ব্বশ্রেণীর দরিদ্র বালকেরা বিনা বেতনে পড়িতে পারিতেছে। যদুনাথ তাহার স্বজাতীয়গণকে উপদেশ দিয়া থাকেন যে—"নিজজাতির মঙ্গলচেষ্টা করিবে, কিন্তু মনে রাখিবে, অন্যজাতির মঙ্গলের অবিরোধে কার্য্য করাই কর্ত্তব্য। যাহাতে কোনও জাতির সহিত স্বার্থ-সংঘর্ষ না ঘটে, সেরূপ পন্থায় গমন করাই প্রশস্ত। শুধু অবিরোধ নয়, সাধ্যমত অপরের উপকার ও করিতে হইবে।"

যদুনাথ সকল জাতির কল্যাণ প্রার্থনা করেন। সকল শ্রেণীর দরিদ্র-



সপরিবারে যদুনাথের মাতা স্বর্গীয়া পঞ্চাননী মজুমদার। পৃঃ ৬৯

লোকদিগের সাহায্যের জন্য তাঁহার হস্ত মুক্ত। যে স্থানে নিজে না পারেন, সেস্থানে বদান্য ধনবান্ লোকদিগের দ্বারা সাহায্য করান। সকল জাতিকেই তিনি আপন মনে করেন।

যদুনাথ যেমন জেলাবোর্ড প্রভৃতির নায়করূপে সৎকর্ম্মের সহায়, তেমন তিনি ব্যক্তিগত ভাবেও বহু সদনুষ্ঠান করিয়াছেন। তিনি নিজব্যয়ে নিজএলাকায় পুষ্করিণী খনন করাইয়া প্রজাগণের উপকার সাধন করিয়াছেন। তিনি নিজব্যয়ে নিজ গ্রামে ও যশোহর সহরে পুষ্করিণী খনন করাইয়াছেন; নিজ গ্রামে নিজ ব্যয়ে দাতব্য-চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন; যশোহর সহরে "যশোহরেশ্বর শিবমন্দির" প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। তিনি নিজে ধনবান্ না হইয়াও ব্রাহ্মণ কায়স্থ প্রভৃতি জাতীয় বহু লোককে অন্নদানে পালন করিয়াছেন ও করিতেছেন। বিদেশাগত সাধুসন্ন্যাসীরা তাঁহার নিকট আশ্রয়, আহার ও অর্থ-সাহায্য পাইয়া থাকেন—ইহা সকলেই জানেন। দীন দুঃখী আর্ত্তজনের দুঃখ দূর করিতে তিনি সতত সযত্ন। যথার্থ অভাবগ্রস্তকে তিনি যথাসাধ্য দান করিয়া থাকেন, কিন্তু প্রতারকগণকে সাহায্য করিয়া সমাজের অকল্যাণ-সাধনে সহায়তা করিতে ইচ্ছুক নহেন। যদুনাথ ধনী নহেন, কিন্তু ন্যায্যক্ষেত্রে যথাসাধ্য দান করিতে তিনি কখনও কুণ্ঠিত নহেন।

সরকারী উকীল হইয়াও তিনি কংগ্রেসে যোগদান করিতে বিরত হন নাই। দেশের সেবা করিবার উদ্দেশ্যে তিনি সরকারী ওকালতীও ত্যাগ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। যদুনাথ সর্ব্বকার্য্যেই ন্যায়ের পক্ষপাতী। জজই হউন্, ম্যাজিষ্ট্রেটই হউন্, অন্যায় কার্য্য করিলে কেহই তাঁহার সাহায্য লাভ করিতে পারেন না। রাজপুরুষদের অসঙ্গত কার্য্যের প্রতিবাদ করিতে তিনি চিরদিনই সাহসী। ঐরূপ কার্য্য করায় তিনি অনেকসময় বিপদেও পড়িয়াছেন, কিন্তু তাহাতে তিনি কর্ত্তব্যমার্গ হইতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হন নাই। সকলের সহিতই তাঁহার অমায়িক ব্যবহার। গর্ব্ব তাঁহাকে স্পর্শ করিতেও পারে না। রাজসম্মানে যদুনাথ অবিচলিত। যদুনাথ গবর্ণমেণ্ট হইতে 'রায় বাহাদুর' উপাধিলাভ করিয়াছেন—'কৈশার-ই হিন্দ' পদক লাভ করিয়াছেন, অনেক বিশিষ্ট প্রশংসাপত্র লাভ করিয়াছেন, সত্য, কিন্তু এ সমস্তই অযাচিত লাভ। এ সকলের জন্য তিনি কখনও চেষ্টা করেন নাই। 'রায় বাহাদুর' —উপাধিপ্রাপ্তির সংবাদ তিনি সর্ব্বপ্রথম তাৎকালিন ছোটলাট সারজন্ উডবর্ণ

মহোদয়ের স্বহস্তলিখিত পত্রে অবগত হইয়াছিলেন ; তৎপূর্ব্বে উহার সম্ভাবনা পর্য্যন্ত তাঁহার কল্পনায় আসে নাই। সারজন্ উডবর্ণ যশোহরে আসিয়া দরবারে বলিয়াছিলেন—"এদেশে রাজপ্রদত্ত উপাধিলাভের আশায় অনেকস্থলে অনেক প্রকার চেষ্টা তদ্বির হইয়া থাকে, কিন্তু রায় যদুনাথ মজুমদার বাহাদুরের পক্ষে এই উপাধি তাঁহার অচেষ্টালব্ধ, পরন্তু তাঁহার সম্পূর্ণ কৃতিত্বের ফল মাত্র। অতএব তাঁহার এই উপাধি শুধু তাঁহাকে সম্মানিত করে নাই, ফলে ইহা বস্তুতঃ যশোহরবাসিমাত্রেরই সম্মানের হেতুভূত হইয়াছে।"

যদুনাথ সতত পরোপকারে আগ্রহশীল। যে সব কর্ম্মপ্রার্থী তাঁহার নিকট সাহায্যপ্রার্থী হন, তিনি সাধ্যমত তাঁহাদের উপকার করিতে প্রস্তুত থাকেন। তাঁহার চেষ্টায় বহুলোকে দেওয়ানী, ফৌজদারী, পুলিশ, রেজিষ্ট্রেশন্ প্রভৃতি বিভিন্ন বিভাগে চাকরী পাইয়াছেন। উপকার করিবার বেলায় তিনি জাতি-বর্ণের প্রতি লক্ষ্য করেন না। হিন্দু-মুসলমান্ খৃষ্টান্—জাতিবর্ণ-ধর্ম্মনির্ব্বিশেষে সকলেই তাঁহার সাহায্য পাইয়া থাকেন।

যদুনাথ যশোহর "চিরুণীফ্যাক্টরীর" অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। সুপ্রসিদ্ধ নলডাঙ্গাধিপতি রাজা শ্রীযুক্ত প্রমথভূষণ দেব রায় বাহাদুরের সহিত মিলিত হইয়া, জাপানপ্রত্যাগত বিশেষজ্ঞ শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ ঘোষের ও অন্যান্য ভদ্র-লোকের সহায়তায় তিনি উক্ত ফ্যাক্টরী প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

যদুনাথ বয়সে প্রবীণ, কিন্তু কর্ম্মে তিনি যুবকের ন্যায় উদ্যমশীল, পরিশ্রমী ও সহিষ্ণু। তিনি প্রভাত হইতে রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত অনবরত কর্ম্ম করেন। আলস্য বা জড়তা তাঁহার জীবনে দেখা যায় না। এই প্রবীণ বয়সে নানা কার্য্যে প্রবৃত্ত থাকিয়াও তিনি নিত্য অধ্যয়নশীল। শাস্ত্রচর্চ্চায় যদুনাথ অত্যন্ত উৎসাহী। অহোরাত্র অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিতেছেন, আহার-নিদ্রার প্রতি লক্ষ্য নাই,—এরূপ ভাব তাঁহার প্রবীণবয়সেও দেখিতে পাই। যদুনাথ দেশের কর্ম্ম করিতেই ইচ্ছুক, তিনি সত্যই কর্ম্মবীর।

নানাকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া যদুনাথ নানা বিষয়ে অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিতে পারিয়াছেন। আর গবর্ণমেণ্টস্কুলে, কলিকাতাসংস্কৃতকলেজে, ও নেপাল-কলেজে কার্য্য করিয়া, কাশ্মীরে ফাইনান্স সেক্রেটারীরূপে, ট্রিবিউনের সম্পাদক ও পরিচালকরূপে, মহারাজ স্যার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর মহোদয়ের ষ্টেটের চীফ্ ম্যানেজাররূপে কার্য্য করিয়া, মিউনিসিপালিটী ও জেলাবোর্ডের



য়বাহাদুর যদুনাথের পরিবারবর্গ

পৃঃ ৬৯

চেয়ারম্যান্-রূপে কার্য্য করিয়া, নানাভাবে দেশের সেবা করিয়া, শিক্ষা, শিল্প, অর্থনীতি প্রভৃতি বিষয়ে যে অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছেন, তাহা দেশের সেবাতেই নিযুক্ত আছে।

' তিনি অসংখ্য কর্ম্মে ব্যাপৃত থাকেন, কিন্তু কর্ম্মে তাঁহার অলংবুদ্ধি নাই— অর্থাৎ তাঁহার নিজের হিসাবে তিনি তাঁহার কৃত কর্ম্ম যথেষ্ট মনে করেন না। তিনি সর্ব্বদাই মনে করেন, তাঁহার কর্ত্তব্যের অধিক অংশই অসমাপ্ত রহিয়াছে। তাঁহার বিবেচনায় সমগ্র জীবনই কর্ম্মের সময়। কর্ম্মজীবন ভিন্ন যতুনাথের একটী সাধনজীবন আছে; সাধারণে তাহার সংবাদ রাখেন না। যতুনাথ একজন যথার্থ ভগবদ্ভক্ত। মানব-প্রীতিতে তাঁহার হৃদয় পরিপূর্ণ। তাঁহার গ্রন্থসমূহে বহুস্থানে ভগবদ্ভক্তি ও মানবপ্রীতির উৎস উৎসারিত দেখা যায়। যতুনাথের জীবন যে কি আদর্শে পরিচালিত হয়, তাহা তাঁহার রচিত "যদি পাইতাম যৌবন পুনঃ" শীর্ষক কবিতায় পরিস্ফুট হইয়াছে। ঐ কবিতাটী পাঠ করিলে, সকলে তাঁহার আধ্যাত্মিক-জীবনের তত্ত্ব বুঝিতে পারিবেন!"

আমরা যতুনাথের সাংসারিক বিষয়ের তুচার কথা মাত্র উল্লেখ করিয়া তাহার সংক্ষিপ্ত জীবনী শেষ করিতেছি। যতুনাথ ১৮৮১ খৃঃ বি, এ, ও ১৮৮২ খৃঃ এম, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এম, এ, ও বি, এল, পরীক্ষায় তিনি বিশ্ব-বিদ্যালয়ে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। ১৮৮৮ খৃঃ যশোহরে পিতার বাসায় থাকিয়া যতুনাথ ওকালতী ব্যবসায় আরম্ভ করেন। তাঁহার অনন্যসাধারণ প্রতিভা, উৎসাহ, উদ্যম, স্বাধীন চেষ্টা ও আদর্শ চরিত্র প্রভাবে তিনি অতি অল্পদিনেই যশোহর 'বারে'র সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উকিল হন; সরকারী, বে-সরকারী, ইংরাজও দেশীয় ব্যক্তিগণ সকলেরই শ্রদ্ধা ও ভক্তির পাত্র হইলেন। ওকালতীতে সুযশ অর্জ্জন করিয়া শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করতঃ প্রভূত অর্থ উপার্জ্জনে সক্ষম হইয়া পৈত্রিক বিষয় সম্পত্তিও বৃদ্ধি করেন। যতুনাথ স্বাভাবিক গাম্ভীর্য্য, অসাধারণ ধৈর্য্য ও মানসিক বলের অধিকারী বলিয়া নিজ জীবনে যথেষ্ট অর্থ, সম্পত্তি, যশঃ ও প্রতিপত্তি অর্জ্জনে সক্ষম হন। ইনি শুধু বিষয় সম্পত্তি বৃদ্ধি করেন নাই, কলিকাতায় ব্যবসায় বাণিজ্য করিয়া লক্ষ লক্ষ টাকা অর্জ্জন করিয়া শিক্ষা বিস্তারের জন্য স্কুল স্থাপন, সুচিকিৎসার জন্য দাতব্য চিকিৎসালয় এবং স্বজাতির কল্যাণের জন্য সর্ব্বজাতীয় সদনুষ্ঠান ও যশোহরের সর্ব্ববিধ উন্নতির জন্য স্বোপার্জ্জিত বহুধন ব্যয় করিয়াছেন।

যদুনাথের অসীম জ্ঞান; স্বাভাবিক গাম্ভীর্য্য, অসামান্য বদান্যতা, অনাবিল স্বদেশ-প্রেম, অতুলনীয় স্বজাতি-প্রীতি প্রভৃতি গুণগ্রাম লক্ষ্য করিয়া সাধারণ মানবের সহিত উপমিত করা চলে না পরন্তু তাঁহার আসন অনেক উচ্চ স্তরে প্রতিষ্ঠিত। যদুনাথই যশোহরের প্রত্যেক জন হিতকর কার্য্যে অগ্রণী ও অক্লান্তকর্ম্মী; বারুজীবিজাতির একমাত্র কর্ণধার ও স্তম্ভ বিশেষ। কর্ম্ম জীবনের প্রারম্ভে যশোহরে বহু অর্থ ব্যয়ে ব্রহ্মচারী আশ্রম স্থাপন করিয়া উহা পরিচালনের জন্য যথেষ্ট অর্থ ব্যয় করিয়াও ঐ কার্য্যে অকৃতকার্য্য হন। তিনি স্বজাতির জন্য যে ত্যাগ স্বীকার করিয়াছেন এবং তাহাদের উন্নতির জন্য আজীবন যে অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া আসিতেছেন তাহা অন্যত্র দৃষ্ট হয় না। তাঁহার আজীবন স্বদেশানুরাগ ও স্বজাতি-প্রেম অবলোকন করিলে সত্য সত্যই লোহাগড়া প্রত্যেক বারুজীবির নিকট তীর্থক্ষেত্র বলিয়া অনুমিত হইবে। ১৩০৮ সালে যদুনাথ বৈশ্যবারুজীবি সভার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেন। উক্ত সভার প্রথম ও চতুর্থ বার্ষিক অধিবেশন তাঁহারই লোহাগড়াস্থিত ভবনে সুসম্পন্ন হয় ইহা বোধহয় অনেকেই অবগত আছেন।

পূর্ব্বপুরুষ প্রচারিত মহাযজ্ঞ দুর্গোৎসব মহাসমারোহে সুসম্পন্ন করিয়া আসিতেছেন ও পূর্ব্বপুরুষ প্রতিষ্ঠিত ৺শ্রীশ্রীধর-বিগ্রহ বর্ত্তমানে ৺শ্রীশ্রীলক্ষ্মী-নারায়ণ শিলারূপে তৎগৃহে নিত্য পূজা পাইয়া আসিতেছেন। ইহা ব্যতীত যশোহর বাসাবাটীতে সুন্দর ও সুবৃহৎ শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করতঃ ৺শিব স্থাপন করিয়া নিত্য পূজার ব্যবস্থা করিয়াছেন। তৎসঙ্গে ৺লক্ষ্মীনারায়ণ শিলা ও পিত্তল বিনির্ম্মিত বৃহৎ বুদ্ধ মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া পূজার ব্যবস্থা করিয়াছেন। ধর্ম্মে কর্ম্মে চিরদিনই যদুনাথ মুক্ত হস্ত, দেবদ্বিজে সদা ভক্তিমান্। যদুনাথ স্বোপার্জ্জিত অর্থের দ্বারা যশোহরে পুরাতন বাসাবাটী সুন্দর ও সুবৃহৎ আকারে নির্ম্মাণ, তৎ সম্মুখে পুষ্করিণী খনন ও পার্শ্বে ৺শিবমন্দি। প্রতিষ্ঠা কারিয়া বাস করিয়া আসিতেছেন। লোহাগড়া বাস-ভবনে যদুনাথ ও সহোদর শ্রীনাথ উভয়ের সমবেত চেষ্টা, যত্ন ও বহু অর্থ ব্যয়ে পুরাতন ইমারতাদির সংস্কার, প্রাচীর বেষ্টিত সুবৃহৎ অট্টালিকা, চণ্ডীমণ্ডপ সম্মুখস্থ করোগেট নির্ম্মিত বৃহৎ নাটমন্দির, অত্যুচ্চ নহবৎখানা ও বাড়ী সংলগ্ন পুষ্করিণীর সুবিস্তৃত পাকা ঘাট প্রভৃতি নির্ম্মিত হইয়াছে।





রায়বাহাদুর যদুনাথের লোহ ড়া ভবন

পৃঃ ৭১

যদুনাথ করগুি নিবাসী বাবু অভয়াচরণ সরকার মহাশয়ের কন্যা শরৎকুমারীকে বিবাহ করেন। এই রমণীর ন্যায় সাতিশয় দানশীলা, পরহিতকারিণী ও ধৰ্ম্ম পরায়ণা সতী রমণী অতিশয় বিরল। এই নারী মিষ্টভাষিণী ও অমায়িক প্রকৃতির ছিলেন। শরৎকুমারী একজন সদাচারী সুগৃহিনী; পাতিব্রত্য ও আতিথ্যই তিনি জীবনের একমাত্র ধৰ্ম্ম বলিয়া জানিতেন। পতি-পুত্র-কন্যা, পৌত্র-দৌহিত্র প্রভৃতি আত্মীয়স্বজন রাখিয়া বিগত ১৩৩৪ সালে ১৮ই পৌষ মঙ্গলবার একাদশী তিথিতে উপযুক্ত জামাতা ডাঃ মহেন্দ্রনাথ সরকারের কলিকাতা বাসাবাটীতে সাংসারিক আকর্ষণ শূন্য হইয়া স্বজ্ঞানে ইষ্টমন্ত্র জপ করিতে করিতে দেহত্যাগ করিয়া নারী জীবন সার্থক করিয়া গিয়াছেন।

১৩০২ সালের ১৮ই পৌষ তারিখে যদুনাথ তাঁহার পিতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে নবদ্বীপ, শান্তিপুর, কৃষ্ণনগর, বাকলা, বিক্রমপুর, পূৰ্ব্বস্থলী, মুলাজোড়, উত্তরপাড়া, কলিকাতা প্রভৃতি বঙ্গদেশের ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদিগকে নিমন্ত্রণ পত্র প্রদান করিয়া স্বীয় আলয়ে অভ্যর্থনা করেন। পিতার স্বর্গারোহণ কল্পে দানসাগর শ্রাদ্ধ করিয়া অতিমূল্যবান ১৬টী "ষোড়শ" ও পণ্ডিতদিগের সহচর বিদায় দেন। নবদ্বীপের মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত মধুসূদন স্মৃতিরত্ন, যদুনাথ সাৰ্ব্বভৌম, রাজকৃষ্ণ তর্কপঞ্চানন; পূৰ্ব্বস্থলীর মহামহোপাধ্যায় কৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চানন; কৃষ্ণনগরের আশুতোষ তর্কভূষণ; মূলাজোড়ের হরিশ্চন্দ্র তর্করত্ন; বিক্রমপুরের রাসমোহন সাৰ্ব্বভৌম; বাকলার কাশীশ্বর তর্করত্ন; উত্তরপাড়ার রামচরণ বিদ্যাবিনোদ প্রভৃতি এবং যশোহর, খুলনা ও ফরিদপুরের সমগ্র পণ্ডিত মণ্ডলী এই শ্রাদ্ধ উপলক্ষে নিমন্ত্রিত হইয়া শ্রাদ্ধবাসরে উপস্থিত হইয়াছিলেন। আদ্যশ্রাদ্ধ, দানসাগর ও তোরণ বৃষোৎসর্গ হইয়াছিল এবং বহু সহস্র লোক নিমন্ত্রিত হইয়া ভুরিভোজনে আপ্যায়িত হইয়াছিলেন। অবশেষে সুগায়িকা পান্নাময়ীর সুমধুর কীৰ্ত্তনে সকলকে পরিতৃপ্ত করিয়াছিলেন।

১৩২৮ সালে যদুনাথকে এক ঘোরতর সামাজিক বিপ্লবে জড়ীভূত হইতে হয়। পৃথিবীব্যাপী গত মহাযুদ্ধের সময় যদুনাথের তৃতীয় পুত্র কুমার অধিক্রমকে মেছোপটেমিয়া যুদ্ধক্ষেত্র হইতে ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট নিজ ব্যয়ে বিলাত লইয়া সিভিল সার্ভিসের উপযুক্ত শিক্ষা দিয়া আই, সি, এস করিয়া এদেশে আনয়ন করিবেন প্রকাশ করিয়া বিলাত প্রেরণ করেন।

বিলাতে এ সময় যুদ্ধক্ষেত্র হইতে প্রত্যাবৃত্ত সৈন্যদের বেকার সমস্যা অত্যধিক বৃদ্ধি পাওয়ায় কুমারের অদৃষ্টে আই, সি, এস হওয়া অসম্ভব হওয়ায়, তিনি ১৩২৮ সালের মাঝামাঝি স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া কলিকাতা গঙ্গাতীরে ধর্ম্মানুমোদিত প্রায়শ্চিত্তাদি করিবার পর লোহাগড়া বাটী একবার গমন করেন। এই বিলাত ফেরত লইয়া সমাজে চলাচল সম্বন্ধে গ্রামস্থ ব্রাহ্মণগণ গোপনে গোপনে পূর্ব্বহতে নির্য্যাতন করিবার অভিপ্রায়ে ষড়যন্ত্র করিয়া যাহা করিয়া তুলিয়াছিলেন, তাহা ১৩২৯ সালে ১লা বৈশাখ তারিখে বাড়ীতে শুভ পুণ্যাহের দিবস প্রথম প্রকাশ পায়। গ্রামের ব্রাহ্মণগণ পুণ্যাহপূজা ও আহারাদি করিবেন না ইহা প্রকাশ্যে স্পষ্ট বলিতে আশঙ্কা করিয়া প্রধান প্রধান কেহ বাড়ীতে অনুপস্থিত ছিলেন এবং অনেকে নানারূপ ওজর আপত্তি করিয়া বাড়ীর উপর আসিলেন না। অতিকষ্টে ও বিশেষ চেষ্টা করিয়া কেবল পুণ্যাহের কার্য্য রাধানাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের দ্বারা সম্পন্ন হয়, কিন্তু আহারাদি কেহই করেন না। এই সময় পর্য্যন্ত প্রতি বৎসর বাড়ীতে বৈশাখ মাসে দৈনিক একজন ব্রাহ্মণ ভোজন করান হইত তাহাও বিপাকে পড়িয়া বন্ধ হইয়া যায়, অধিকন্তু ব্রাহ্মণগণ হৈ চৈ করিয়া চারিদিক কুমারের বিলাত গমনের কথা রটাইয়া দিয়া ব্যাপার জটিল করিয়া তুলিলেন। অবশেষে বহুলাঞ্ছনার পর পূর্ব্ব পাড়ার ব্রাহ্মণগণ ক্রমে ক্রমে দৈনিক একজন করিয়া আহার করিতে আরম্ভ করেন। কিছুদিন পরে পশ্চিম পাড়ার ৩ ঘর বাদে ২ ঘর আহার করিতে আরম্ভ করেন।

১৩২৯ সালে যদুনাথের জননী পঞ্চাননীর মৃত্যুর পর এই বিলাত ফেরত ব্যাপারহেতু ইতিনা, মল্লিকপুর, কুন্দশী, জয়পুর, লক্ষ্মীপাশা ও কাশিপুর ব্রাহ্মণ সমাজের মধ্যে এমন গোলযোগের সৃষ্টি হইয়াছিল যে শ্রাদ্ধের দিন পর্য্যন্ত শ্রাদ্ধে সামাজিক ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত কেহ উপস্থিত হইবেন এমন আশাই ছিল না। কয়েকজন দুষ্ট প্রকৃতির ব্রাহ্মণ কেবল গোপনে গোপনে সমস্ত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের নিকট পত্র লিখিয়া নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতে নিষেধ পত্র দিয়াই সন্তুষ্ট হন নাই, উঁহারা লোক নিযুক্ত করিয়া বাড়ী বাড়ী সকলকে শ্রাদ্ধে উপস্থিত হইতে নিষেধ পর্য্যন্ত করিয়াছিলেন এবং যাহাতে শ্রাদ্ধ দিনে ব্রাহ্মণ সামাজিক ও ব্রাহ্মণ পণ্ডিত কেহ উপস্থিত না হন তজ্জন্য যত প্রকার চেষ্টা হইতে পারে তাহাও করিতে আদৌ ত্রুটি



স্বর্গীয়া শরৎ কুমারী মজুমদার

পৃঃ ৭৩

করেন নাই, কিন্তু ভগবৎ কৃপায় কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই, তাহাদের অসাধু উদ্দেশ্য সাধিত হয় নাই বরং বিলাত যাওয়া সম্বন্ধে দেশের প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়া যায়। যশোহর, খুলনা, ফরিদপুর জেলার সমগ্র ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, বাকলা, নবদ্বীপ, মুলাজোড়, বিক্রমপুর, কলিকাতাও মিথিলার প্রধান প্রধান পণ্ডিতমণ্ডলী হিন্দুর বিলাত গমন অনুমোদন করিয়া দেশের পরম হিতকার্য্য সাধন করেন। এই বিলাত ফেরত লইয়া সামাজিক ঘোরতর বিপ্লবের সময় লোহাগড়ার শ্রীযুত মতিলাল সরকার, কুন্দশী সাকিনের শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র ভট্টাচার্য্য ও গিরিধর মুখোপাধ্যায় এই পূজনীয় ব্যক্তিত্রয় প্রকৃত বন্ধুর ন্যায় কার্য্য করিয়া সমস্ত সামাজিক বিপ্লব নিবারণ করিয়া যদুনাথকে রক্ষা করেন, এজন্য এ বংশ তাঁহাদের নিকট চিরকৃতজ্ঞ। মল্লিকপুর বড়-বাড়ীর শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ ভট্টাচার্য্য, লক্ষ্মীপাশার শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, এই বংশের চির-সুহৃদ শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার ও হারানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভ্রাতৃগণের সহিত এবং কাশীপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও হরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়গণ এ পাড়াগেয়ে সামাজিক গোলযোগে প্রকৃত বন্ধুর ন্যায় সাহায্য করিয়া মীমাংসার পথ উন্মুক্ত করিয়া দেন। গ্রামের কয়েকজন দুষ্টপ্রকৃতির লোক এই সব গোলযোগের সৃষ্টি করিয়া নিরর্থক যদুনাথ ও তদীয় ভ্রাতা শ্রীনাথকে লাঞ্ছনা দিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারা শেষ বজায় রাখিতে পারেন নাই। এই গোলযোগে শুভ ফল এই দাঁড়াইল যে বিলাত যাওয়ার পথ সুগম হইয়া গেল।

১৩২৯ সালে ২৫শে কার্ত্তিক পুনরায় মাতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে যদুনাথ নবদ্বীপ, শান্তিপুর, কৃষ্ণনগর, বিক্রমপুর, মুলাজোড়, কলিকাতা, যশোহর, খুলনা, ফরিদপুর প্রভৃতি সমগ্র বঙ্গদেশের ও কাশী, দ্রাবিড়, মিথিলার বিখ্যাত পণ্ডিত মণ্ডলীকে সমাদরে লোহাগড়া ভবনে অভ্যর্থনা করিয়া সহচর বিদায় দেন। নবদ্বীপ, শান্তিপুর ও কৃষ্ণনগরের মহামহোপাধ্যায় কামখ্যানাথ তর্কতীর্থ, রামগোপাল তর্কতীর্থ, নৃত্যগোপাল গোস্বামী, রামগোপাল গোস্বামী, ললিতমোহন কাব্যপুরাণতীর্থ, যোগেন্দ্রনাথ স্মৃতিতীর্থ; বিক্রমপুরের হেরম্বচন্দ্র তর্কতীর্থ; মুলাজোড়ের হরিপদ স্মৃতিতীর্থ; কলিকাতার মহামহোপাধ্যায় কালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন, যোগেন্দ্রনাথ তর্কতীর্থ, রামচরণ তর্কতীর্থ, কালীবর তর্কতীর্থ, চণ্ডীচরণ স্মৃতিভূষণ, দক্ষিণাচরণ স্মৃতিতীর্থ, কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য,

রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ ও মিথিলার রঘুবীর ত্রিবেদী প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত মণ্ডলী উক্ত শ্রাদ্ধবাসরে যোগদান করিয়াছিলেন। এই শ্রাদ্ধবাসরে যেরূপ সভার অধিবেশন হইয়াছিল এরূপ এতদ্দেশে অতি অল্পই দৃষ্ট হয়। এরূপ পণ্ডিত মণ্ডলীর সমাগম পূর্ব্বে কখনও দেখি নাই। মিথিলার পণ্ডিত রঘুবীর ত্রিবেদী যখন অনর্গল সংস্কৃত ভাষায় ওজস্বিনী বক্তৃতা করিয়া শ্রাদ্ধের নিগূঢ় তত্ত্ব ব্যাখ্যা করেন, তখন বিরাট সভা মহানন্দে মাতিয়া উঠিয়াছিল। এই শ্রাদ্ধেও যদুনাথ বহু সহস্র লোক নিমন্ত্রণ করিয়া পরিতোষ মত ভোজন করান এবং অবশেষে সুদূর রাঢ় দেশীয় সুমধুর কীর্ত্তন শ্রবণ করাইয়া সকলকে হরিনামে মাতোয়ারা করেন। আমরা এই শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণ পত্র নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

শ্রীশ্রীদুর্গা শরণং

সময়োচিত নিবেদন মেতৎ।

অম্বা মে জগদম্বা পাদ কমলমধু পীত্বা জ্ঞানতোঽনিত্যকায়ংবিহায় স্বর্গতা।
তদাস্থ কৃত্য মাগামিনি সৌরকার্ত্তিকস্য পঞ্চবিংশতি দিবসে শনৈশ্চরদিনে ভবিতব্যং।
ভবদ্ভিঃ কৃপয়া সবান্ধবৈর্ম্মদীয় সদনে সমেত্য তৎপ্রপূর্য্যতামিতি।

পত্রিকেয়ং যশোহর জেলা-
ন্তর্গত লোহাগড়া গ্রামতঃ।
সন ১৩২৯।১০ই কার্ত্তিক।

সানুজো সুবিনীতো যদুনাথোঽহং প্রার্থয়ে।

শ্রীহরিঃ

জগ্ধ্বা স্বেষ্টমনুং বিহায় চ তনুং জিত্বা জনুং বিদ্যয়া
মাতা মে চরমে পরং পদমগাৎ কৃত্যং তদাস্থং বুধাঃ
ভব্যং মন্দদিনে রবৌ ধটগতে ক্লেশাক্ষিমে প্রার্থয়ে
পূর্য্যং বেশ্ম সমেত্য শাস্ত্রগহনে শার্দ্দূল বিক্রীড়িতাঃ।

পত্রীয়ং যশোহর জেলাস্তঃ-
পাতি লোহাগড়া
গ্রামতঃ বঙ্গাব্দ
১৩২৯।১০ কার্ত্তিক।

প্রশ্রিতো যদুনাথোঽহং শ্রীনাথ ভ্রাতৃকঃ শ্রিয়া
যাচে সৎকরুণাং ব্রহ্মবাদিনাং দীনসেবকঃ।

যদুনাথের পিতৃমাতৃ শ্রাদ্ধোপলক্ষে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত ব্যতীত স্থানীয় সমাজের যেসব বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সহিত প্রাচীন সময় হইতে দত্ত-মজুমদার, রায়-সরকার বংশের সম্বন্ধ চলিয়া আসিতেছে, তাহাদিগকেও ঐ কার্য্যে যত্নের



শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ মজুমদার।

(লোহাগড়া ইউনিয়ন কমিটার ভূতপূর্ব্ব চেয়ারম্যান)

পৃঃ ৭৫

সহিত আহ্বান করা হইয়াছিল। কাশিয়ানীর সেন, কৌটাখোলের সরকার, চাঁচড়ির দত্ত, রায়গ্রাম ও কলাগাছির ঘোষ এবং সিঙ্গিয়ার রায় বংশীয়দের নামই প্রধান উল্লেখযোগ্য।

শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ মজুমদার।

তারাপ্রসন্নের মধ্যম পুত্র শ্রীনাথ ১২৭৫ সালের ৫ই মাঘ ৺শ্রীশ্রীপঞ্চমী পূজার দিন লোহাগড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। শ্রীনাথ খুলনা গবর্ণমেণ্ট স্কুলে প্রবেশ করিয়া এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন, পরে কলিকাতা বিদ্যাসাগর কলেজ হইতে এফ্ এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া উক্ত কলেজে বি, এ অধ্যয়ন করেন। তৎপর কনিষ্ঠ ভ্রাতা জানকীনাথের দুরারোগ্য ব্যাধির জন্য দেশ-বিদেশে ভ্রমণ করিতে বাধ্য হন এবং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যদুনাথ চাকুরীর জন্য বিদেশে অবস্থান করায়, বিষয় সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ ও সাংসারিক সমস্ত ভার তাঁহার উপর বর্ত্তে। ১৯০২ খৃঃ হইতে ১৯০৪ পর্য্যন্ত এই দুই বৎসর কাল নড়াইল মহকুমা এর অনরারি ম্যাজিষ্ট্রেট পদে বৃত হন। ১৯০৪ খৃঃ কয়েক মাসের জন্য মাগুরায় সবরেজিষ্ট্রারের চাকুরী করেন। তৎপর ১৯০৬ খৃঃ পর্য্যন্ত চাঁচড়ার রাজা ৺জ্ঞানদাকণ্ঠ রায়ের স্ত্রী রাণী ভুবনমোহিনীর এষ্টেটের ম্যানেজার ছিলেন। ১৯০৬ খৃঃ হইতে ১৯১১ খৃঃ পর্য্যন্ত সৌদপুর পরগণার জমিদার ব্যারিষ্টার বোমকেশ চক্রবর্ত্তীর এষ্টেটের ম্যানেজারী করেন, পরে ১৯১২ খৃঃ জানবাজার ওয়ার্ড এষ্টেটে মকিমপুরের সব্‌ম্যানেজার হইয়া ১৯১৫ খৃঃ পর্য্যন্ত বিশেষ দক্ষতার সহিত কার্য্য পরিচালনা করেন। অবশেষে ১৯১৮ হইতে ১৯২৮ এই দশ বৎসর কাল লোহাগড়া ইউনিয়ন-কমিটীর চেয়ারম্যান্ মনোনীত হইয়া দেশের ও দশের সর্ব্ববিধ উন্নতির জন্য বিশেষ যত্নবান হন। লোহাগড়ার পুরাতন রাস্তাঘাটের সংস্কার এবং অনেক নূতন রাস্তা নির্ম্মাণ, মেথর সার্ভিস, পানীয়ের জন্য টিউব ওয়েলের প্রতিষ্ঠা ও শিক্ষার জন্য স্কুল স্থাপন প্রভৃতি সর্ব্ববিধ সদনুষ্ঠান ইঁহারই ঐকান্তিক উদ্যোগ, যত্ন ও চেষ্টায় সাধিত হইয়াছে। শ্রীনাথ লোহাগড়া উচ্চ ইংরাজী স্কুল স্থাপনের একজন অক্লান্তকর্ম্মী। ১৯০২ খৃঃ স্কুল স্থাপনে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যদুনাথকে বিশেষ সহায়তা করেন। উক্ত স্কুল নিজ আয়ে ব্যয় সঙ্কুলন করিতে সক্ষম না হওয়া পর্য্যন্ত বহুদিন অবৈতনিক শিক্ষকের কার্য্য করেন ও গ্রামে গ্রামে ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধি

চেষ্টা করিয়া কৃতকার্য্য হইয়া স্কুলের বিশেষ সাহায্য করেন। ১৯১৮ খৃঃ হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত উক্ত স্কুলের এসিষ্ট্যাণ্ট্ সেক্রেটারীর পদে নিযুক্ত আছেন। ইঁহার ন্যায় সত্যবাদী, তেজস্বী, নির্ভীক ও তীক্ষ্ণবুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তি লোহাগড়া গ্রামে অতি বিরল। শ্রীনাথ চিরদিনই জ্যেষ্ঠানুগত। ইঁহার ন্যায় ভ্রাতৃবৎসল ভাই অতি অল্পই দৃষ্ট হয়।

শ্রীনাথ খুলনা জেলার খালিস্পুর গ্রাম নিবাসী ৺উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা ক্ষীরোদাসুন্দরীকে বিবাহ করেন। এই নারী মিষ্টভাষিনী, অমায়িক ও সরল-প্রকৃতির সতী রমণী। ইঁহার ধর্ম্মানুরাগ অত্যন্ত প্রবল। দেবদ্বিজে সদাই ভক্তিমতী ও সদাচারী সুগৃহিনী। পূজা-অর্চ্চনা ও ইষ্টমন্ত্র জপ ইহার নিত্যকর্ম্ম। রামায়ণ, মহাভারত, শ্রীমৎ ভাগবত, চৈতন্যচরিতামৃত ও অন্যান্য ধর্ম্মগ্রন্থ ও পুরাণাদি পাঠ করিয়া আত্মার উৎকর্ষ সাধন করেন ও প্রতিবেশিনী মহিলাদিগকে শ্রবণ করাইয়া আধ্যাত্মিক উন্নতির সহায়তা করেন।

৺মহেন্দ্রনাথ ও ৺জানকীনাথ।

তারাপ্রসন্নের তৃতীয়পুত্র মহেন্দ্রনাথ ও সর্ব্বকনিষ্ঠ জানকীনাথ উভয়েই যৌবনাবস্থায় পরলোক গমন করেন। উভয় ভ্রাতাই দীর্ঘকায় ও বলিষ্ঠ ছিলেন। মহেন্দ্রনাথ সুচতুর ও তীক্ষ্ণবুদ্ধি বিশিষ্ট যুবক। ইনি কলিকাতা আর্ট স্কুলে চিত্রবিদ্যা শিক্ষা করিতেন। ৺বিজয়া দশমীর দিনে লোহাগড়া বাটীতে থাকিয়া মহেন্দ্রনাথ পঁচিশবৎসর বয়ঃক্রম কালে অকালে দেহত্যাগ করেন। কনিষ্ঠ জানকীনাথও দুরারোগ্য জ্বরাক্রান্ত হইয়া একাদিক্রমে দুই-বৎসরকাল ভুগিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন।

তারাপ্রসন্নের জ্যেষ্ঠা কন্যা বসন্তকুমারীর সহিত লোহাগড়া গ্রামের প্রসিদ্ধ রায়বংশীয় ধর্ম্মপ্রাণ ৺কেদারনাথ রায়ের বিবাহ হয়। বসন্তকুমারী অতিশয় সরল প্রকৃতিবিশিষ্ট সৌভাগ্যবতী নারী। ইঁহার পুত্রেরা সকলেই কৃতবিদ্য। বংশপরিচয়কালে এই পুত্রদের কথা উল্লেখ করিব।

কনিষ্ঠা কন্যা হেমন্তকুমারীর সহিত খুলনা জেলার খালিস্পুর নিবাসী জমিদার যোগেন্দ্রনাথ দাসের শুভ বিবাহ সম্পন্ন হয়। হেমন্তকুমারীর দুই পুত্র ও এক কন্যা:—অমিয়কান্তি, মৃণালকান্তি ও মনীষা। জ্যেষ্ঠপুত্র অমিয়কান্তি ১৯২২ খৃঃ কলিকাতা সংস্কৃতকলেজ হইতে বি, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ



শ্রীযুক্তা ক্ষীরোদা সুন্দরী
মজুমদার।

পৃঃ ৭৭



৺মহেন্দ্র নাথ মজুমদার।

পৃঃ ৭৭

হইয়া আমেরিকা যাত্রা করেন। তথায় দুই বৎসর অবস্থান করিয়া অর্থনীতি বিদ্যায় এম, এ উপাধি প্রাপ্ত হন এবং তৎপর ১৯২৫ খৃঃ ইংলণ্ড যাত্রা করেন। বর্ত্তমানে অমিয়কান্তি বিলাতে ব্যারিষ্টারী পড়িতেছেন ও সঙ্গে সঙ্গে পি-এইচ, ডি উপাধি গ্রহণের সর্ব্ববিধ চেষ্টা করিতেছেন। কনিষ্ঠ মৃণালকান্তি ১৯২৬ খৃঃ কলিকাতা সেণ্টপল কলেজ হইতে বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতা ইউনিভার্সিটী কলেজ হইতে বি, এল পাশ করিয়াছেন।

যদুনাথের সন্তান সন্ততি।

যদুনাথের জ্যেষ্ঠপুত্র কুমার বিক্রম এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এফ, এ অধ্যয়ন কালে মস্তিষ্কের ব্যাধি কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া গত পঁচিশ বৎসর কাল একই অবস্থায় কালাতিপাত করিতেছেন। অত্যধিক মস্তিষ্কের পরিচালনাই ঐ রোগের কারণ বলিয়া আমাদের অনুমান হয়। এফ, এ অধ্যয়নকালে 'চিন্তানির্ঝরিণী' গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এই পুস্তক রচনার পরই কুমার উন্মাদ রোগগ্রস্ত হন। ইঁহার ন্যায় সুলেখক অতি অল্পই দৃষ্ট হয়। উন্মাদরোগই এই উদীয়মান চিন্তাশীল যুবকের ভবিষ্যত তমসাচ্ছন্ন করিয়াছে। এই রোগগ্রস্ত হইয়াও 'প্রবন্ধমালা' নামক একখানা অতি সুন্দর ভাবপূর্ণ সরল গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। কুমার ১৩১৬ সালে ফরিদপুরজেলার অন্তর্গত নওয়াপড়া নিবাসী বাবু বেণীমাধব পালের কন্যা কুঞ্জবালাকে বিবাহ করেন। ইহার গর্ভে শান্তিময়ী নাম্নী একটি সুন্দরী কন্যার জন্ম হয়। কচুবাড়িয়া নিবাসী "সমসাময়িক ভারত" "মগধ গৌরব" প্রভৃতি গ্রন্থ-প্রণেতা সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক, পাটনা কলেজের অধ্যাপক স্বর্গীয় যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দারের জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীমান্ ননীগোপাল সমাদ্দার বি, এ, র সহিত বিগত ১৩৩১ সালের ৩রা আষাঢ় তারিখে শ্রীমতী শান্তিময়ীর শুভ বিবাহ সম্পন্ন হয়। ১৩৩৪ সালের বৈশাখ মাসে টাইফয়েড রোগে আক্রান্ত হইয়া শান্তিময়ী শ্বশুরালয় পাটনায় মহাশান্তির ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করেন।

মধ্যমপুত্র কুমার পরাক্রম বাল্যকাল হইতেই কলাবিদ্যার প্রতি অনুরক্ত ছিলেন। কলিকাতা আর্টস্কুলে কিছুকাল অধ্যয়ন করিবার পর, ব্যবসায় ক্ষেত্রে প্রবেশ করেন। একাদিক্রমে প্রায় পনর বৎসরকাল ব্যবসায়ে

লিপ্ত থাকিবার পর যশোহর ইউনাইটেড্ ব্যাঙ্কের ম্যানেজারি করেন। পরে ঐ চাকুরী পরিত্যাগ করিয়া বর্ত্তমানে তিনি যশোহর বাটীতে অবস্থান করিয়া 'হিন্দু পত্রিকা প্রেসের' কার্য্য সুদক্ষতার সহিত পরিচালনা করিতেছেন। কুমার লোহাগড়া নিবাসী ৺প্রসন্নগোপাল রায় বি, এল, মহাশয়ের জ্যেষ্ঠাকন্যা প্রমীলাবালাকে বিবাহ করেন। ইহার গর্ভে পরাক্রমের দুই পুত্র রণক্রম ও সমরক্রম জন্মগ্রহণ করিয়াছে।

লেফ্‌টেন্যাণ্ট কুমার অধিক্রম।

যদুনাথের পুত্রগণের মধ্যে তৃতীয় কুমার অধিক্রম সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষমতাশালী। কুমার ১৯১২ খৃঃ সংস্কৃত কলেজ হইতে বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বি, এল, পাশ করিয়া কলিকাতা হাইকোর্টে (ভকিল) ব্যবহারাজীবের কার্য্য আরম্ভ করেন। উক্ত ব্যবসায়ে অবস্থান কালে ১৯১৫ খৃঃ সমস্ত পৃথিবী-ব্যাপী মহাযুদ্ধ আরম্ভ হয়। তখন কুমার হাইকোর্টের কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া স্বদেশের সেবায় আত্মনিয়োগ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া ১৯১৬ খৃঃ সমর যাত্রা করেন। এই সময় হইতেই সুবেদার-মেজর কুমার অধিক্রমের নাম দেশ বিদেশে বিশেষভাবে পরিচিত হয়। কুমার অধিক্রম যখন যুদ্ধ যাত্রা করেন, তখন বাঙ্গালী-পল্টন প্রথম গঠিত হয় এবং এই পল্টন সুদূর মেসোপটেমিয়ায় শত্রুর বিরুদ্ধে সর্ব্বদাই দণ্ডায়মান ছিল। তখন কুমারের এই আত্মদান দেখিয়া দেশবাসী গাহিয়াছিলেন :—

"তুমি দেশের গর্ব্ব-কীর্ত্তি তুমি দেশের মান
মুগ্ধ নেত্রে দেখিছে বিশ্ব তোমার আত্মদান"

কুমার ১১৲ টাকা বেতনের সাধারণ সৈন্য হইয়া পল্টনে যোগদান করেন, পরে কর্ম্মক্ষেত্রে অবতরণ করিয়া স্বীয় শক্তিপ্রভাবে সাধারণ সৈন্য হইতে ক্রমান্বয়ে ল্যান্স-নায়ক, নায়ক, হাবিলদার, হাবিলদার-মেজর, জমাদার, জমাদার-মেজর, সুবেদার অবশেষে সুবেদার-মেজর পদে উন্নীত হন। এই সুবেদার মেজরই বাঙ্গালী পল্টনের সর্ব্বোচ্চ পদ। এই মহাযুদ্ধের সময় সুবেদার-মেজর কুমার অধিক্রম দেশবাসীর প্রিয়পাত্র হন। রেজিমেন্টের কাপ্তেন, কম্যাণ্ডার প্রভৃতি উচ্চ পদস্থ কর্ম্মচারিগণ কুমারের



লেফ্‌টেন্যাণ্ট

কুমার অধিক্রম মজুমদার বি, এল।

(ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্)

যুদ্ধ কৌশল অবলোকন করিয়া বিস্মিত হয়েন এবং কুমারকে ভূরিভূরি প্রশংসা-পত্র প্রদান করেন। যুদ্ধাবসানে সদাশয় ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট কুমারকে ম্যাজিষ্ট্রেট্ করিবার অভিপ্রায়ে নিজব্যয়ে বিলাত প্রেরণ করেন কিন্তু দুরদৃষ্ট বশতঃ কুমারের ভাগ্যে আই, সি, এস না হইয়া ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের চাকুরী ঘটে। যুদ্ধক্ষেত্র হইতে প্রত্যাবর্ত্তন কালে ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট কুমারকে পুরস্কার স্বরূপ জায়গীর প্রদান করিয়া বিশেষ সম্মানিত করেন। বর্ত্তমানে কুমার ডেপুটী-ম্যাজিষ্ট্রেটের চাকুরী করিতেছেন এবং ইণ্ডিয়ান্ টেরিটোরিয়াল ফোর্সের 'লেফ্‌টেন্যাণ্ট্' পদবীতে ভূষিত আছেন। কুমার অধিক্রম বাল্যকাল হইতে অসীম সাহসী, কৌশলজ্ঞ ও ও শক্তিশালী। ইঁহার বালক সুলভ চাঞ্চল্য, সরল স্বভাব ও মিষ্টভাষে সকলেই মুগ্ধ। কুমার খুলনাজেলার অন্তর্গত দশানি গ্রাম নিবাসী ৺জমিদার বাবু চন্দ্রকান্ত দাশ মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা কমলবাসিণীকে বিবাহ করেন। ইহার গর্ভে অধিক্রমের এক পুত্র শ্রীমান অমরক্রমের জন্ম হইয়াছে।

ছাত্রজীবন হইতে কুমার বড়ই সঙ্গীতপ্রিয়। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তিনি কলাবিদ্যায় বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করেন। হারমোনিয়াম, এস্‌রাস্, ক্লারিওনেট্ প্রভৃতি বংশীবাদনে অভ্যস্ত। অবশেষে ইঁহার শিকার-কৌশল ও প্রশংসনীয়। স্বগ্রাম লোহাগড়ায়, যশোহরে চাঁচরায় ও অন্যান্য স্থানে কেঁদো বাঘ (Leopard) শিকার করিয়া শিকারে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। যুদ্ধক্ষেত্র হইতে প্রত্যাবর্ত্তন কালে কুমার বহু উচ্চ প্রশংসা পত্র প্রাপ্ত হন উহার ২।১টী নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

Subedar Major K. A. Majumdar has been with the 49th Bengalis ever since they were a Double Company. He enlisted as a Sepoy in the original Bengali Double Company and has since risen to Subedar Major of the Regiment. He became a Jemadar on 1 Feb. 17, a Subedar on 1 June 17 and was appointed Subedar Major on 2nd. October 18. Throughout the time he has been with the unit I have found him keen, zealous, and hardworking. He is energetic both on parade and looking after the games played by the Unit. He has shown himself exceedingly helpful to me as the Senior

Indian Officer with the Unit and I am sorry he is now leaving he Regiment.

Sd. V. Sandiford, Lt.-Col.
Commanding 49th Bengalis.

Basra,
Mesopotamian Expeditionary Force, Jan. 24th 1920.

This is to certify that Subedar Major K. A. Majumdar, 49th Bengalis, served with me for the year I commanded the unit. He was a very good Indian Officer, quick and willing and of good birth and education......................... Before proceeding to Mesopotamia he passed the Musketry School Class at Satara..................... I consider that Subedar Major has done his very best and is deserving of consideration for his services to the State.

Sd. A Barret, Lt.-Col.
(late) Commanding 49th Bengalis.

Rawalpindi,
6-4-19.

Rampur Boalia,
April 15th 1919.

Kumar Adhikram Majumdar was amongst the first to join the Bengali Regiment in August 1916. Starting as a recruit he rapidly through the ranks through his ability and very soon attained Commissioned rank. He finally reached the top of the tree as Subedar Major of the Regiment. He is exceptionally well educated and is thoroughly hard-working capable and trustworthy. He is fit for any high position of trust.

Sd. S. G. Taylor,
(formerly Adjutant 49th Bengalis).

যদুনাথের চতুর্থ পুত্র কুমার উরুক্রম সাতিশয় উচ্চঅন্তঃকরণ বিশিষ্ট যুবক। সরলস্বভাব ও পরোপকারে সদাই যত্নবান। কুমার অল্প বয়স হইতেই কলিকাতা মহানগরীতে ব্যবসায় ক্ষেত্রে প্রবেশ করেন। ব্যবসায় বাণিজ্যে ইহার যথেষ্ট জ্ঞান আছে। কল-কব্জা মেকানিজম্ বিষয়ে কুমার বিশেষ পারদর্শী। ইনি খুলনা দৈবজ্ঞহাটী নিবাসী বাবু শরৎচন্দ্র বিশ্বাস বি, এল উকীল মহাশয়ের তৃতীয়া কন্যা লীলাবতীকে বিবাহ করিয়াছেন।



শ্রীযুক্ত কুমার গুরুক্রম মজুমদার বি, এল

পৃঃ ৮১

যদুনাথের কনিষ্ঠ পুত্র কুমার গুরুক্রম ১৯২৬ খৃঃ কলিকাতা সেণ্টপল্ কলেজ হইতে বি, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ইউনিভার্সিটি কলেজ হইতে বি, এল, পাশ করিয়া যশোহরে ওকালতী করিতেছেন। কুমার অতি ধীর ও মেধাবী যুবক। ইনি যশোহর কচুবাড়িয়া নিবাসী, পাটনা কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক, স্বনামধন্য ঐতিহাসিক ৺বাবু যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দারের জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী লক্ষ্মী ভারতীকে বিবাহ করিয়াছেন।

কন্যাদের পরিচয়ঃ—সর্ব্বজ্যেষ্ঠা শ্রীমতী লীলাবতীর সহিত লোহাগড়া নিবাসী ডাঃ শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ সরকারের বিবাহ হইয়াছে। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম, এ; পি এইচ্, ডি; গভর্ণমেণ্ট সংস্কৃত কলেজের দর্শনশাস্ত্রের খ্যাতনামা অধ্যাপক। লীলাবতী একজন শিক্ষিতা সুলেখিকা। মাসিক বৈশ্য-পত্রিকায় তৎপ্রকাশিত সুচিন্তিত প্রবন্ধ সমূহে, গদ্য সাহিত্যে তাঁহার বিশেষ অনুরাগের পরিচয় পাওয়া যায়। সূচিশিল্পেও তিনি পারদর্শিনী। তিনি বম্বে, বেহার, ইউ পি, রাজপুতানা, পাঞ্জাব, প্রভৃতি প্রদেশে বহু স্থান ভ্রমন করিয়াছেন। মধ্যমা কন্যা—শ্রীমতী প্রভাবতীর সহিত লোহাগড়া নিবাসী যশোহরের প্রসিদ্ধ উকীল শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার রায় বি, এল, মহাশয়ের বিবাহ হইয়াছে। প্রভাবতী অত্যন্ত বুদ্ধিমতী, সন্তান বৎসলা ও সহিষ্ণু। সূচিকার্য্যে তাঁহার যথেষ্ট অধিকার আছে। গদ্য ও পদ্য রচনাতে তিনি পারদর্শিনী। তাঁহার প্রবন্ধ ও কবিতা মাসিক বৈশ্য-পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়া থাকে। আমরা নিম্নে তাঁহার রচিত কবিতার দুচার ছত্র উদ্ধৃত করিলাম।

(১)

"মায়ের হৃদয়ে থাকে অমিয় সঞ্চিত।
সন্তান পালিবে ব'লে ঝরে অবিরত॥
মায়ের হৃদয়ে যদি না থাকিত ধন।
মরুভূমি সম হত সংসার-কানন॥
সাগর সিঞ্চিলে পায় মণিমুক্তা ধন।
মায়ের হৃদয়ে আছে অমূল্য রতন॥
ঝরণার মত তাহা ঝর ঝর ঝরে।
বিশ্ববাসী জীব তাই প্রাণে নাহি মরে॥

(২)

"এস এস সবে মিলি একতা বন্ধনে।
বিভুগুণ গাইসবে মিলি এক প্রাণে॥
হিংসা দ্বেষ ভুলে যাই জাতি অভিমান।
ত্রিশ কোটী প্রাণী মোরা হই একপ্রাণ॥
মনের আনন্দে করি মায়ের বন্দনা।
কেন ভুলে যাই মোরা ভারত ললনা॥
দাসত্ব-শৃঙ্খল হতে বন্ধন খুলিব।
জয় ভারতের জয় আমরা গাহিব॥"

(নববর্ষ)

মন্দাকিনী-স্রোত সম বেগ বয়ে যায়।
সন্তান সন্ততি তাহে শীতলতা পায়॥"

(মা)

কনিষ্ঠা কন্যা—শ্রীমতী উমাবতীর সহিত যশোহর কচুবাড়িয়া নিবাসী ধনাঢ্য শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ সমাদ্দার মহাশয়ের জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীযুক্ত মনীন্দ্রনাথ সমাদ্দারের বিবাহ হইয়াছে। ইনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি, এ; বর্ত্তমানে লণ্ডনে চার্টার-একাউন্ট্যান্ট-সিপ পড়িতেছেন। উমাবতী সূচিশিল্পে সিদ্ধহস্তা।

শ্রীনাথের সন্তান সন্ততি।

শ্রীনাথের পুত্রেরা সকলেই কৃতবিদ্য। জ্যেষ্ঠপুত্র হরেন্দ্রনাথ ১৯১৮ খৃঃ কলিকাতা বিদ্যাসাগর কলেজ হইতে বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া একবৎসর কাল 'ল' অধ্যয়ন করেন, পরে কলিকাতা মহানগরীতে ব্যবসায় ক্ষেত্রে প্রবেশ করেন। ব্যবসায় বাণিজ্যে ইঁহার প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি পরিলক্ষিত হয়। হরেন্দ্র নাথ অতি ধীর, গম্ভীর, বুদ্ধিমান ও কার্য্যকুশল। ইঁহার কার্য্যকরী ক্ষমতা বিশেষ প্রশংসনীয়। ইনি লোহাগড়া নিবাসী লোকপ্রিয় শ্রীযুক্ত মতিলাল সরকার মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা সুশীলা সুন্দরীকে বিবাহ করিয়াছেন। ইহার গর্ভে হরেন্দ্রনাথের এক পুত্র শ্রীমান রণেন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করিয়াছে। জন্মতারিখ ১৩৩৬।২৮শে আষাঢ়।

মধ্যম নরেন্দ্রনাথ ১৯১৭ খৃঃ দৌলতপুর কলেজ হইতে বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন অধ্যয়ন করিয়া ওকালতী পরীক্ষার পূর্ব্বে হার্ডিঞ্জহোষ্টেলে অবস্থানকালে দুরারোগ্য জ্বরে আক্রান্ত হন। তৎপর কলিকাতা উল্টাডাঙ্গা গদীতে (আড়ত) আসিয়া একাদশ দিবসে পরিবারস্থ সকলকে বিয়োগব্যথায় অভিভূত করিয়া ১৩২৭ সালের ২৭শে অগ্রহায়ণ তারিখে স্বর্গারোহণ করেন। নরেন্দ্রনাথ সাতিশয় মেধাবী, মিষ্টভাষী ও পরোপকারী ছিলেন। চিরকুমার অবস্থায় চব্বিশ বৎসর বয়সে নরেন্দ্রনাথের মৃত্যু হয়। তাঁহার নির্ম্মল চরিত্রের সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য আজিও সকলের স্মৃতিগোচরে জাগরিত রহিয়াছে। কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ না করিতেই, অসম্পূর্ণ আকাঙ্ক্ষিত জীবনে ভগবান তাঁহাকে নিজ ক্রোড়ে গ্রহণ



ক্ত ধীরেন্দ্র নাথ মজুমদার

পৃঃ ৮৩

করেন। ছাত্রজীবন হইতেই দীন দুঃখীর উপর নরেন্দ্রনাথের দয়া পরিলক্ষিত হইত। পাঠ্যাবস্থায় তিনি নিজ ব্যয় হইতে কিঞ্চিৎ সঞ্চয় করিয়া দীন-দুঃখীকে সাহায্য করিতেন। বিগত ১৩১৬ সালে ভীষণ ঝটিকাবর্ত্তের পর নরেন্দ্রনাথ অন্যান্য বালকগণ সঙ্গে করিয়া মোচড়া, কুমারকান্দা, কালনা, কামঠানা প্রভৃতি গ্রামে নিঃস্ব পরিবারে কায়িক-পরিশ্রম দ্বারা যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন তাহা আমরা অবগত আছি। স্বগ্রামের উন্নতির জন্য নরেন্দ্রনাথের বিশেষ আগ্রহ ছিল, তাই তিনি তাঁহার সমাজের উন্নতি-অবনতির কথা অনেক সময় ভাবিতেন। একারণ গ্রামস্থ সকলেই তাঁহাকে প্রীতির চক্ষে দেখিতেন। নরেন্দ্রনাথের ন্যায় নির্ভীক, নিরহঙ্কার, সত্যপ্রিয়, উদার ও চরিত্রবান যুবক তৎকালে লোহাগড়ায় দৃষ্ট হইত না। নরেন্দ্রনাথ একজন শক্তিশালী ও পাকা ফুটবল খেলোয়াড় ছিলেন। যিনি একবার তাঁহার সংস্রবে আসিয়াছেন, তিনিই জানেন যে নরেন্দ্রনাথ কিরূপ ধীর ও কত উদার প্রকৃতির যুবক ছিলেন। এই যুবকের অকাল মৃত্যুতে শুধু পরিবারস্থ নয়, স্বগ্রামের ও বিশেষ ক্ষতি সাধিত হইয়াছে।

তৃতীয় ধীরেন্দ্রনাথ ১৯২০ খৃঃ দৌলতপুর কলেজ হইতে আই, এস সি, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এক বৎসর কাল কলিকাতা বেলগাছিয়া মেডিক্যাল কলেজে ডাক্তারী অধ্যয়ন করেন। তৎপর উহা পরিত্যাগ করিয়া ব্যবসায় লিপ্ত থাকিয়া ধীরেন্দ্রনাথ অবসর মত পুস্তক রচনায় মনোনিবেশ করেন। স্বীয় সাধনা প্রভাবে ধীরেন্দ্রনাথ একজন সুলেখক হইয়াছেন। সর্ব্বপ্রথম তিনি উপন্যাস লিখিতে আরম্ভ করেন। পরে উপন্যাস লেখা বন্ধ করিয়া বর্ত্তমানে নাটক রচনায় লিপ্ত আছেন। বহু অর্থের প্রয়োজন বলিয়া অদ্যাবধি দু-এক খানা উপন্যাস ভিন্ন নাটক মুদ্রিত হয় নাই। তাঁহার রচিত পুস্তক :—

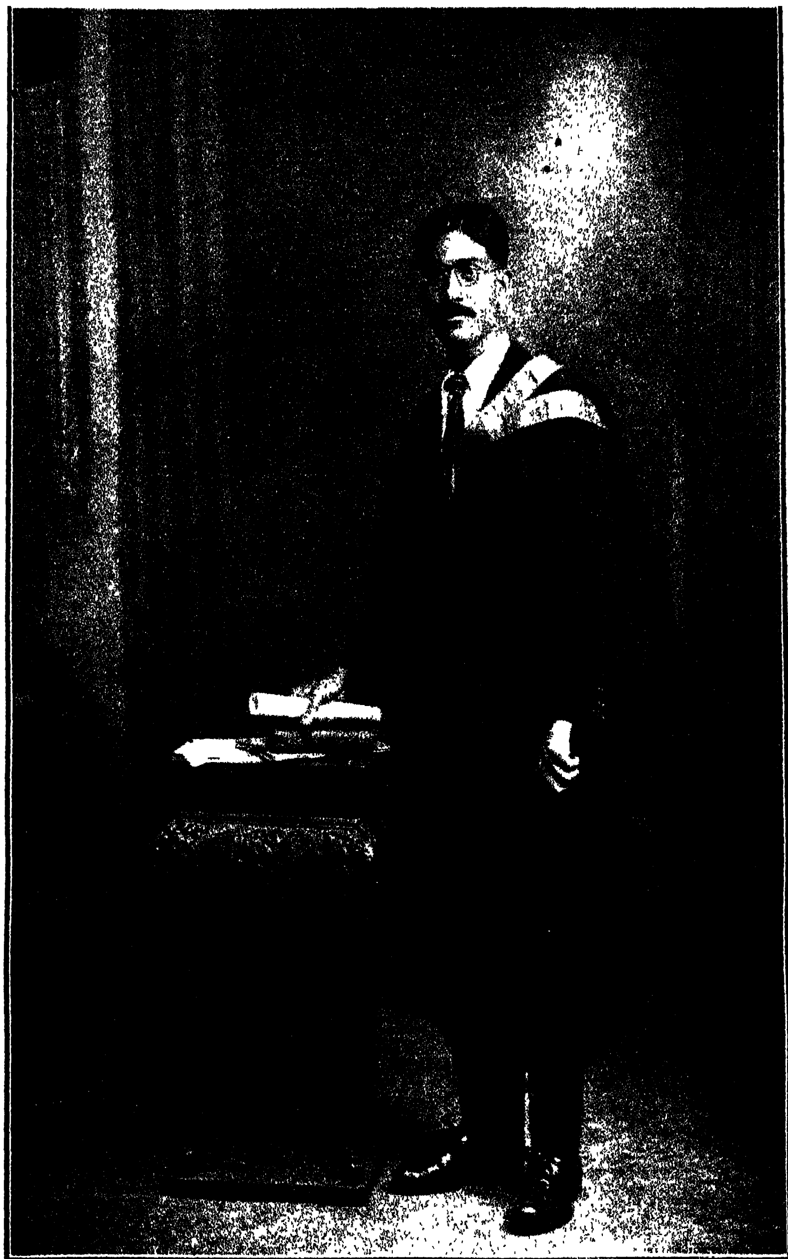
১। "পারিজাত" (উপন্যাস) ২। "মধুরমিলন" (উপন্যাস) ৩। "খেয়াল" (কবিতা) ৪। "কৃষ্ণপাণ্ডব" (পৌরাণিক পঞ্চাঙ্ক নাটক) ৫। 'প্রমীলা' (পৌরাণিক তৃতীয়াঙ্ক নাটক) ৬। "পতিঘাতিনী সতী" (ঐতিহাসি তৃতীয়াঙ্ক-নাটক) ৭। "শক্তিসাধনা" পঞ্চাঙ্ক নাটক।

শেষোক্ত নাটক দুখানির প্লট অতি সুন্দর, ইহার ভাষাও যেমন মার্জ্জিত, ভাব ও তেমনই চমক-প্রদ। এই উদীয়মান লেখকের জ্ঞান-পিপাসা দিন

দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। আমরা আশাকরি এই নবীন যুবকের পুস্তকগুলি অবিলম্বে মুদ্রিত হইয়া সর্ব্বসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ধীরেন্দ্রনাথ মিষ্টভাষী, সরলপ্রাণ ও সুচতুর। ইনি খুলনা চন্দনীমহাল নিবাসী শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রচন্দ্র ভৌমিক উকীল মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা মনোরমাকে বিবাহ করিয়াছেন।

চতুর্থ হীরেন্দ্রনাথ ১৯২৪ খৃঃ কলিকাতা বিদ্যাসাগর কলেজ হইতে বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বি, এল, পাশ করিয়া কলিকাতায় ওকালতী করিতেছেন। যাহা সত্য ও সরল হীরেন্দ্রনাথ চিরদিনই তাহার পক্ষপাতী। হীরেন্দ্রনাথ বাগেরহাট-দৈবজ্ঞহাটী নিবাসী শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বিশ্বাস উকীল মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী লীলাবতীকে বিবাহ করিয়াছেন। ইহার গর্ভে হীরেন্দ্রনাথের এক পুত্র শ্রীমান রথীন্দ্রনাথের জন্ম হইয়াছে। জন্মতারিখ ১৩৩৪।৮ই আশ্বিন। সর্ব্ব কনিষ্ঠ অমরেন্দ্রনাথ অতি শৈশবে মাত্র পাঁচবৎসর বয়ক্রম কালে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

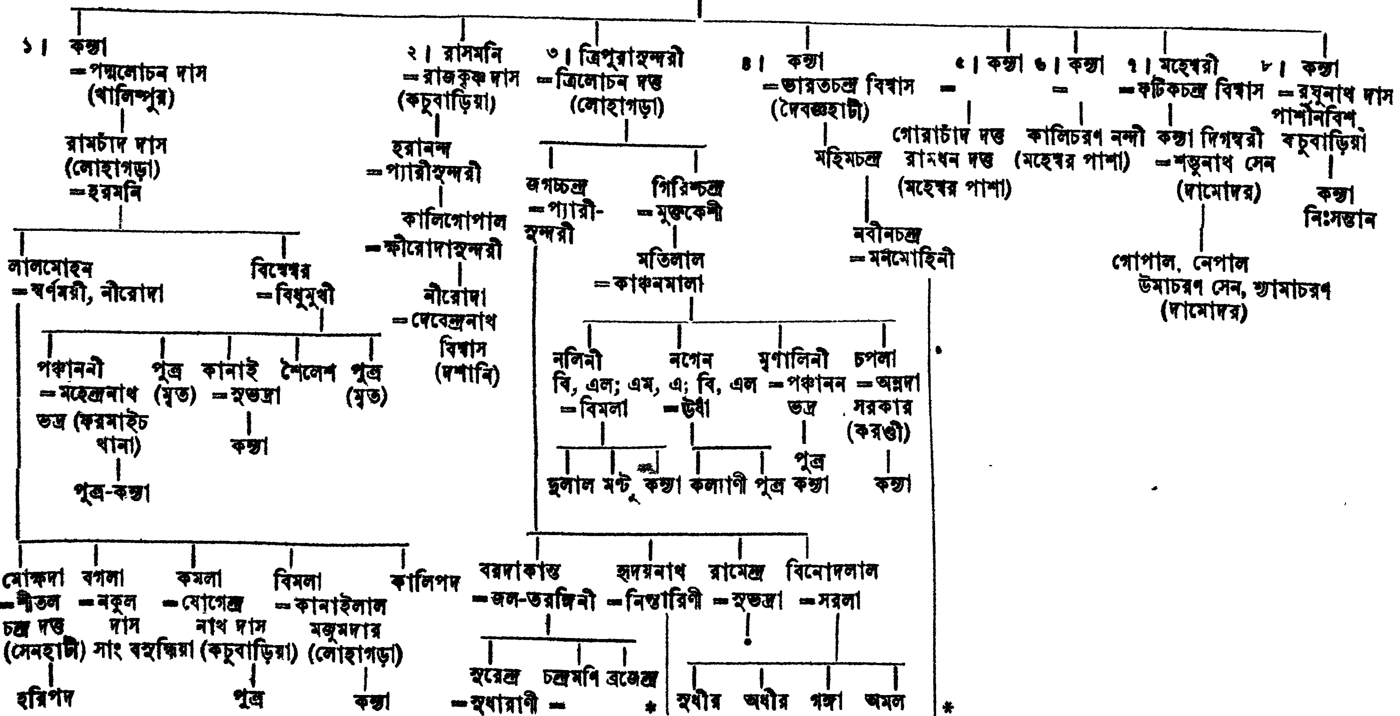
কন্যাদের পরিচয়—১মা। শ্রীমতী ইন্দুমতী, জন্ম লোহাগড়া ৭ই চৈত্র ১৩১০ সাল; বিবাহ ১৩২৩ সালের ১লা জ্যৈষ্ঠ দৈবজ্ঞহাটী নিবাসী ৺নবীনচন্দ্র বিশ্বাসের পুত্র শ্রীযুত হরেন্দ্রকুমার বিশ্বাস বি, এল, খুলনার উকীল। ১৩২৬ সালের ৩০শে বৈশাখ দুরন্ত টাইফয়েড্ রোগে আক্রান্ত হইয়া ইন্দুমতী শ্বশুরালয় দৈবজ্ঞহাটী গ্রামে অকালে সকলের মায়া পরিত্যাগ করিয়া একটী শিশুপুত্র রাখিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। ইন্দুমতী রূপেগুণে লক্ষ্মীবতী ছিলেন। সূচীকার্য্য, এমব্রয়ডারী, ক্রচেটওয়ার্ক ইত্যাদিতে তাহার যথেষ্ট অধিকার ছিল। ২য়া—শ্রীমতী ইন্দিরা, জন্ম, লোহাগড়া ২৫শে আষাঢ় ১৩১৬ সাল; বিবাহ—১৩২৯ সাল ১৮ই অগ্রহায়ণ খুলনার উকীল বাবু হরেন্দ্রকুমার বিশ্বাস বি, এল, মহাশয়ের সহিত। ইহার এক পুত্র ভবাণীশঙ্কর (দুলাল) জন্ম লোহাগড়া ১৩৩১ সালের ২৪ অগ্রহায়ণ। ইন্দিরা অতি অমায়িক সরল স্বভাববিশিষ্টা বুদ্ধিমতী নারী। সূচীকার্য্যে ইহার যথেষ্ট অধিকার আছে। ৩য়া—শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা, জন্ম লোহাগড়া ১০ই কার্ত্তিক ১৩১৯ সাল; বিবাহ ১৩৩৪ সালের ৮ই শ্রাবণ লোহাগড়া নিবাসী শ্রীযুত মতিলাল সরকারের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুত প্রদ্যোৎকুমার সরকার বি, এ,। ইহার এক পুত্র শ্রীমান বিদ্যুৎকুমার, জন্ম ওমো ১৩৩৬ সালের ২১ পৌষ। প্রিয়ম্বদা গুণবতী ও বুদ্ধিমতী, সূচিশিল্পে জ্যেষ্ঠা সহোদরার ন্যায় পারদর্শিনী। চরকায় সূতা কাটিতে সিদ্ধহস্তা।



শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্র নাথ মজুমদার বি, এল

পৃঃ ৮৫

দর্পনারায়ণের ১৮ কন্যার বংশ তালিকা।



* |

- কিরণশশী =সীতানাথ ভৌমিক বি, এল, (লোহাগড়া)
  - কন্যা
- মণীন্দ্র =মহামায়া
  - সুকুমার
- শচীন্দ্র বি, এ, =সুষমা

*

- কালীপ্রসন্ন (উকিল) =সরোজিনী পিঃ প্রহ্লাদচন্দ্র সরকার (লোহাগড়া)
  - নিরঞ্জন বি, এস সি,
  - ভূপেন মেডিক্যাল কলেজ
  - জিতেন্দ্র
  - লীলা =হীরেন্দ্রনাথ মজুমদার বি, এল, (লোহাগড়া)
    - রথীন্দ্র (গৌর)
  - সুধীর
  - অধীর
  - প্রমীলা
  - উর্ম্মিলা
- রাধিকাপ্রসাদ
- হরেন্দ্রকুমার বি, এল, =ইন্দিরা পিঃ শ্রীনাথ মজুমদার (লোহাগড়া)
  - ভবানীশঙ্কর (দুলাল)
- রাজেন্দ্রকুমার এম. বি, =বিমলা পিঃ সুবোধনাথ দত্ত (বারিপুর)
  - সুশীল
  - সুনীল
- নগেন্দ্রকুমার (উকিল) =লাবণ্য পিঃ বিপ্রদাস পাল (রাজঘাট)
  - কন্যা পুত্র
- ডাঃ হেমেন্দ্রকুমার =অমলা পিঃ ডাঃ যোগেন্দ্র গোপাল রায় এল, এম. এস (লোহাগড়া)
  - নিতাই
- শৈলেন্দ্রকুমার =অনুপমা পিঃ মহেন্দ্রনাথ ভদ্র (করমাইচ থানা)
- ক্ষীরোদা =শিবেন্দ্রচন্দ্র ভদ্র বি, এল (খালিশপুর)
  - পুত্র-কন্যা

দর্পনারায়ণ মজুমদারের ১৮ কন্যার বিবরণ।

দর্পনারায়ণ মজুমদারের ১৮ কন্যার মধ্যে মাত্র ৮ কন্যার কিছু কিছু বিবরণ বর্ণনা করিব, বাকী দশ কন্যার বিষয় আমরা অবগত হইতে পারি নাই। দর্পনারায়ণের জ্যেষ্ঠা কন্যার সহিত খালিস্পুর নিবাসী পদ্মলোচন দাসের বিবাহ হয়। এই কন্যার গর্ভে লোহাগড়া নিবাসী স্বনামধন্য রামচাঁদ দাসের জন্ম হয়। রামচাঁদ একজন কর্ম্মঠ ও তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি। দর্পনারায়ণের তৃতীয় জামাতা লক্ষপতি ত্রিলোচন দত্তের মৃত্যুর পর, তৎপুত্র জগচ্চন্দ্রের নিকট হইতে রামচাঁদ টাকা হাওলাত করিয়া দাদন করিতেন এবং অল্পকাল মধ্যে বহু অর্থ উপার্জ্জনে সক্ষম হইয়া ক্রমেক্রমে লোহাগড়ায় একজন ধনাঢ্য বলিয়া পরিচিত হন ও বহুতর সৎকার্য্য করেন। দুই তিনবার মহাভারত পাঠ ও তুলা-যজ্ঞ করিয়া নিজ বাটীতে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত নিমন্ত্রণ করিয়া সহচর বিদায় দেন। রামচাঁদ ধার্ম্মিক ও চরিত্রবান পুরুষ ছিলেন। তাহার সৎকার্য্যে গ্রামস্থ সকলেই মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিতেন। রামচাঁদ সৌভাগ্যবান—তাঁহার কার্য্যকরী ক্ষমতাও প্রশংসনীয়। স্বগ্রাম ও পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম সমূহে রামচাঁদের আধিপত্য ও সুযশ বিশেষভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তাঁহার জীবিতাবস্থায় নিজ বাটীতে বার্ষিক ৺ শ্রীশ্রীজগদ্ধাত্রী পূজার প্রচলন করেন এবং মৃত্যু-কাল পর্য্যন্ত সমারোহের সহিত বার্ষিক-ক্রিয়া রক্ষা করিয়া গিয়াছেন। রামচাঁদ মৃত্যুকালে তৎপুত্রদ্বয় লালমোহন ও বিশ্বেশ্বরের জন্য প্রভূত অর্থ রাখিয়া পরলোক গমন করেন, কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় যে রোগ শয্যায় শায়িত অবস্থায় পুত্রদ্বয় পিতাকে অত্যন্ত অযত্ন ও অবহেলা করিয়াছেন, তাহা তিনি মৃত্যুর পূর্ব্বে বড়ই আক্ষেপ করিয়া প্রকাশ করেন। এসময় তাঁহার রক্ষিত অনুমান পঞ্চাশ-হাজার টাকা জ্যেষ্ঠপুত্রের হস্তগত হয়। লালমোহন ও বিশ্বেশ্বর সদনুষ্ঠান কিছুই করেন নাই, বরং মহাপ্রাণ পিতৃদেবের বার্ষিক-ক্রিয়া ৺ জগদ্ধাত্রী পূজা বন্ধ করিয়া দেন ও সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত অর্থই নষ্ট করিয়া ফেলেন। লালমোহন মৃত্যুকালে নাবালক পুত্র কালীপদর জন্য কপর্দ্দক রাখিয়া যান নাই, বরং নাবালককে অত্যন্ত হীন অবস্থায় রাখিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। উইলে শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ মজুমদার মহাশয়কে ট্রাষ্টী করিবেন স্থির করিয়া, কোথায় কি আছে 'কাল বলিব' বলিয়া কিছুতেই নিজের নগদ টাকার কথা বলিলেন

না, তৎপর হঠাৎ বাক্য বন্ধ হইয়া তাঁহার মৃত্যু হয়। কনিষ্ঠ বিশ্বেশ্বর জীবিত আছেন। তাহার পুত্রদ্বয় কানাই ও শৈলেশ। জ্যেষ্ঠ কানাই সরকার বাটীতে তহশীলদারের কার্য্য করেন, আর কনিষ্ঠ শৈলেশ ব্যবসায় ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছেন।

দর্পনারায়ণের মধ্যমা কন্যা রাসমণির সহিত কচুবাড়িয়া নিবাসী রাজকৃষ্ণ দাসের বিবাহ হয়। এই কন্যার গর্ভে খ্যাতনামা হরানন্দ দাসের জন্ম হয়। দর্পনারায়ণের দৌহিত্রগণের মধ্যে হরানন্দই সত্যবাদী, কর্ম্মঠ, শক্তিশালী ও তীক্ষবুদ্ধিসম্পন্ন বলিয়াই লোহাগড়া গ্রাম তিনি তৎকালে স্বহস্তে শাসন করিয়াছেন। হরানন্দ সমাজের একজন কর্ত্তৃপক্ষীয় ব্যক্তি ছিলেন। তিনি বিশেষ পরোপকারী ও নির্লোভ প্রকৃতির ছিলেন বলিয়া গ্রামশুদ্ধ সকলেই তাঁহাকে শ্রদ্ধা, ভক্তি ও ভয় করিত। লোহাগড়া গ্রামে হরানন্দের প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তাঁহার একমাত্র পুত্র কালিগোপাল যশোহর কলেক্টরীতে চাকুরী করিয়া বর্ত্তমানে পেনসন্ গ্রহণ করিয়াছেন।

লক্ষপতি ত্রিলোচন দত্ত।

লোহাগড়া নিবাসী লক্ষপতি ত্রিলোচন দত্তের সহিত দর্পনারায়ণ তাঁহার তৃতীয় কন্যা ত্রিপুরাসুন্দরীর বিবাহ দেন। এই ত্রিলোচনের আদিম অধিবাস কোথায় ছিল তাহা নির্দ্দেশ করা যায় না। তৎকালে এতদ্দেশে কেবল ত্রিলোচন দত্তেরই অর্থ ছিল। তিনি লক্ষটাকার মালিক হইয়াও অতি-সাধারণভাবে জীবন যাপন করিতেন। তাহার নিকট হইতে টাকা লইয়া এই লোহাগড়া গ্রামে অনেকেই দাদন করিয়া বহুঅর্থ উপার্জ্জন করিয়া অবস্থার পরিবর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। ত্রিলোচন নিজ বাটীতে পাকা চণ্ডীমণ্ডপ নির্ম্মাণ করিয়া বার্ষিক দুর্গোৎসব পূজা আরম্ভ করেন। কিন্তু তৎপুত্র দুর্ভাগ্য জগচ্চন্দ্র নিজ জীবনে নানাভাবে সমস্ত অর্থ নষ্ট করিয়া শেষজীবনে অত্যন্ত কষ্টে কালাতিপাত করেন। জগচ্চন্দ্র মকিমপুরে নায়েবী করিতে যাইয়া, চুসহাটী যে জমাজমি ছিল তাহাও অবশেষে নষ্ট করিয়া, একেবারে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া অতি দৈন্যদশায় পতিত হন এবং সামান্য বেতনে স্বর্গীয় তারাপ্রসন্ন মজুমদারের আশ্রয় গ্রহণ করেন। পিতার বিপুল ধনসম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারী হইয়াও



স্বর্গীয়া প্যারী সুন্দরী দত্ত।

পৃঃ ৮৯

জগচ্চন্দ্র ভাগ্যলক্ষ্মীকে সুপ্রসন্ন রাখিতে পারিলেন না। তাহার জীবিত কালেই বাড়ীতে বার্ষিক দুর্গোৎসব বন্ধ হইয়া যায়। জগচ্চন্দ্রের স্ত্রী প্যারীসুন্দরী সৌভাগ্যবতী নারী। ইঁহার সরলস্বভাব ও অমায়িক প্রকৃতিতে সকলেই মুগ্ধ হইতেন। প্যারীসুন্দরীর ন্যায় ধর্ম্মপরায়ণা সতী রমণী অতি অল্পই দৃষ্ট হইত। ইহার গর্ভে জগচ্চন্দ্রের চারিপুত্র—বরদাকান্ত, হৃদয়নাথ, রামেন্দ্র ও বিনোদলালের জন্ম হয়। জ্যেষ্ঠপুত্র বরদাকান্ত লোহাগড়া গ্রামে একাদিক্রমে চল্লিশ বৎসর ধরিয়া পাঠশালায় পণ্ডিতের কার্য্য করিতেছেন। তৎপুত্র সুরেন্দ্র ও ব্রজেন্দ্র। সুরেন্দ্র কলিকাতা পুলিশ বিভাগে এসিষ্ট্যান্ট্ সব্ইনস্পেক্টর, আর ব্রজেন্দ্র ক্যাম্বেল মেডিক্যাল স্কুলে ডাক্তারী অধ্যয়ন করেন। জগচ্চন্দ্রের মধ্যমপুত্র হৃদয়নাথ নড়াইল কোর্টে আমলার চাকুরী করিয়া বর্ত্তমানে পেনসন্ গ্রহণ করিয়াছেন। তৎপুত্র জ্যেষ্ঠ মণীন্দ্রকুমার উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত না হইলেও, কতকগুলি গুণ তাহাতে পরিলক্ষিত হয়। এরূপ সৎসাহসী, ক্রীড়াকৌতুকজ্ঞ ও পরোপকারী যুবক বর্ত্তমানে লোহাগড়া গ্রামে দৃষ্ট হয় না। শিকারে অভ্যস্ত ও সন্তরণে বিশেষ পারদর্শী হওয়ায় সকলেরই প্রিয়পাত্র। কনিষ্ঠ শচীন্দ্রকুমার কলিকাতা সেন্টপল কলেজ হইতে ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন অধ্যয়ন করিতেছেন।

জগচ্চন্দ্রের তৃতীয় পুত্র রামেন্দ্রনাথ সুদূর নেপালরাজ্যে ডাক্তারী ব্যবসায় করিতে গিয়া দুরন্ত কলেরা রোগে আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। সর্ব্বকনিষ্ঠ বিনোদলাল এন্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কিছুদিন জমিদারী এষ্টেটে কার্য্য করেন, তৎপর উহা পরিত্যাগ করিয়া কিছুকাল বাড়ীতে অবস্থান করিবার পর, সম্প্রতি রায় এষ্টেটের নায়েব হইয়াছেন। ইহার পুত্রেরা সকলেই নাবালক।

জগচ্চন্দ্রের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা গিরিশচন্দ্রের পুত্র মতিলাল নিজবাটীতে এক সুবৃহৎ অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়াছেন। তৎপুত্রদ্বয় নলিনীকুমার ও নগেন্দ্রকুমার উভয়েই কৃতবিদ্য। জ্যেষ্ঠ নলিনীকুমার বি, এল; যশোহরে ওকালতী করেন। কনিষ্ঠ নগেন্দ্রকুমার এম, এ; বি, এল; এডভোকেট্, কলিকাতা হাইকোর্টে ব্যবহারাজীবের কার্য্য করেন।

দর্পনারায়ণের চতুর্থা কন্যার সহিত খুলনা দৈবজ্ঞহাটী নিবাসী ভারতচন্দ্র

বিশ্বাসের বিবাহ হয়। দর্পনারায়ণের দৌহিত্র মহিমচন্দ্রের পুত্র নবীনচন্দ্র সৌভাগ্যবান পুরুষ। ইহার পুত্রেরা সকলেই কৃতবিদ্য। ইহারা সকলেই ক্ষমতাবান ও শিক্ষিত। বর্ত্তমানে এই বংশ বিশেষ উন্নত।

দর্পনারায়ণের পঞ্চমা ও ষষ্ঠা কন্যার গর্ভজাত দৌহিত্র—গোরাচাঁদ, রামধন দত্ত ও কালিচরণ নন্দী—ইহাদের নিবাস মহেশ্বরপাশা।

দর্পনারায়ণ সপ্তমা কন্যা মহেশ্বরীকে ফটিকচন্দ্র বিশ্বাসের সহিত বিবাহ দেন। এই কন্যার গর্ভে দর্পনারায়ণের দৌহিত্রী দিগম্বরীর জন্ম হয়। দিগম্বরীর পুত্র খুলনা-দামোদর নিবাসী বাবু উমাচরণ সেন, গোপালচন্দ্র সেন ও নেপালচন্দ্র সেন। অষ্টমা কন্যার সহিত যশোহর কচুবাড়িয়া নিবাসী রঘুনাথ দাসের বিবাহ হয়। রঘুনাথ পার্শীভাষায় অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন। কামালপ্রতাপের মুন্সীদের বাড়ীতে ইনি পার্শী অধ্যয়ন করেন, পরে কালক্রমে একজন খ্যাতনামা পণ্ডিত বলিয়া পরিচিত হন। এই মুন্সীরাই ইহার পার্শী-ভাষায় অগাধ পাণ্ডিত্য দেখিয়া রঘুনাথকে সত্তর পাখি জমি জায়গীর প্রদান করেন। রঘুনাথের পুত্রসন্তান ছিল না। তাঁহার একমাত্র কন্যা জন্মগ্রহন করে।

রাধাকান্ত দত্তের সন্তান সন্ততি।

রাধাকান্ত দত্তের অধস্তন পুরুষের মধ্যে কাহাকেও তেমন কৃতবিদ্য দেখা যায় না। তবে যাহারা বর্ত্তমানে জীবিত আছেন, তন্মধ্যে ডাক্তার নিবারণচন্দ্রই সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষমতাবান। রাধাকান্তের প্রপৌত্র নিমানন্দের পৌত্র ভোলানাথ ও আদিত্য উভয় ভ্রাতা সুপারির ব্যবসায় করিয়া যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করেন। অনুমান পঞ্চাশ হাজার টাকা তাহারা এই সুপারির ব্যবসায়ে অর্জ্জন করিয়াছিলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ তাহাদের বংশধরগণ ঐ অর্থ হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন। ভোলানাথের মৃত্যুর পর আদিত্য ও ভোলানাথের স্ত্রী মামলা মোকদ্দমা করিয়া বহু অর্থ নষ্ট করেন, বাদবাকী বেহাত হইয়া যায়। ভোলানাথের পুত্রসন্তান ছিল না। আদিত্যের পুত্র নিবারণ ও বলরাম। জ্যেষ্ঠ ডাক্তার নিবারণ সমধিক আধ্যাত্মিক-চিন্তার লোক। পূজা, অর্চ্চনা, জপ, আহ্নিক, পাঠ ও ব্যাখ্যা ইহার দৈনিক ক্রিয়া। বহু তীর্থ পর্য্যটন ও বহুধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করিয়া ইনি জীবন চরিতার্থ ও



ডাক্তার নিবারণ চন্দ্র দত্ত।



শ্রীযুক্ত নিবারণ চন্দ্র দত্ত।

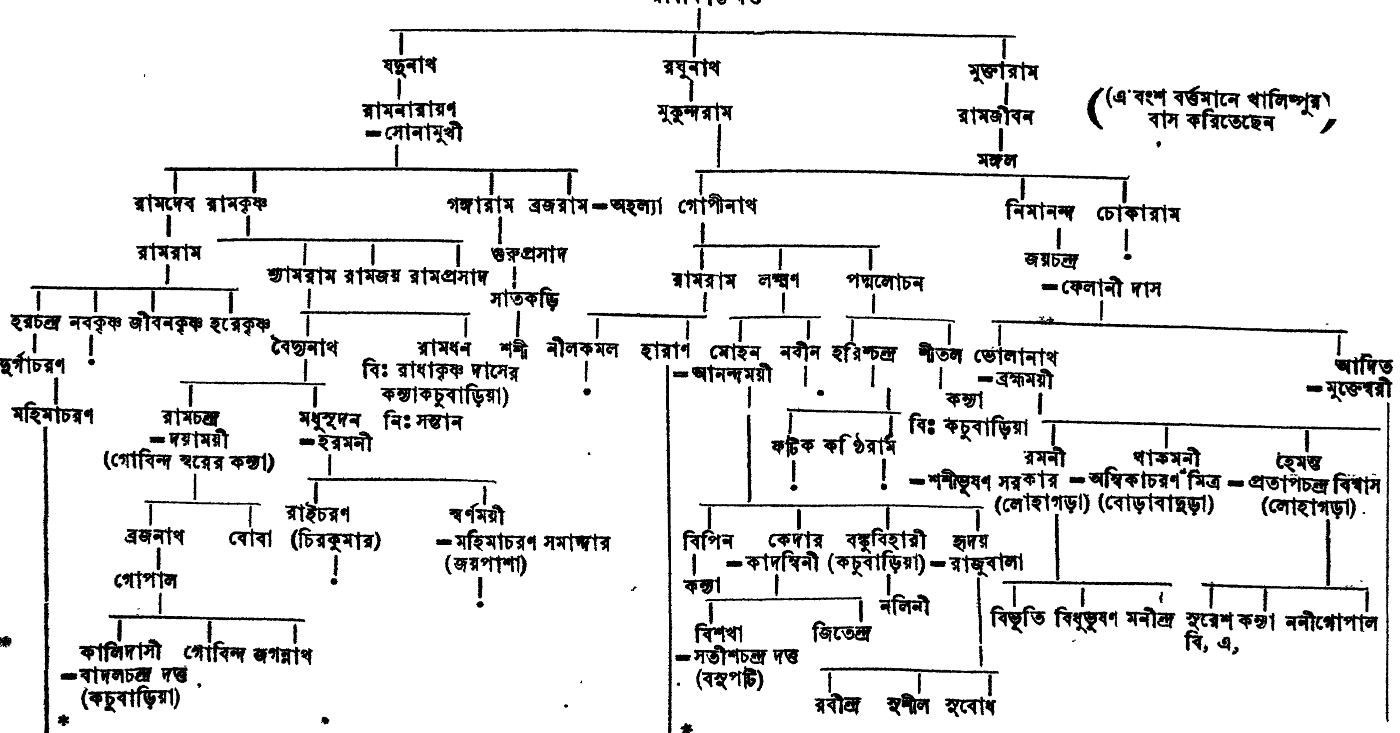
১১০ দ্রষ্টব্য।

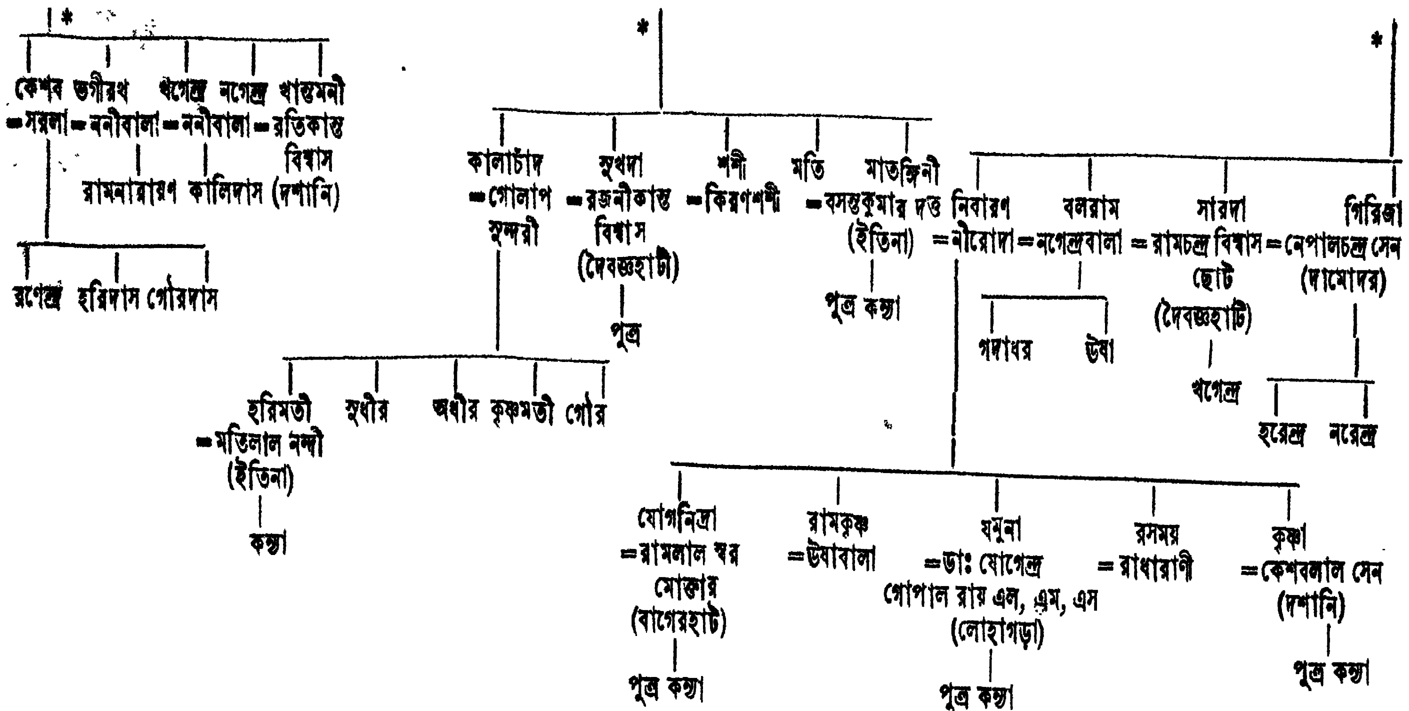


শ্রীযুক্ত পার্ব্বতী চরণ দত্ত।

পৃঃ ৯১, ৯৯ দ্রষ্টব্য।

নরসিংহ দত্তের দ্বিতীয়পুত্র রাধাকান্ত দত্তের বংশ তালিকা।




*
কেশব
=সরলা
ভগীরথ
=ননীবালা
খগেন্দ্র
=ননীবালা
নগেন্দ্র
খান্তমনী
=রতিকান্ত বিশ্বাস (দশানি)
রামনারায়ণ
কালিদাস
রণেন্দ্র
হরিদাস
গৌরদাস
*
কালাচাঁদ
=গোলাপ সুন্দরী
সুখদা
=রজনীকান্ত বিশ্বাস (দৈবজ্ঞহাটী)
পুত্র
শশী
=কিরণশশী
মতি
মাতঙ্গিনী
=বসন্তকুমার দত্ত (ইতিনা)
পুত্র কন্যা
হরিমতী
=মতিলাল নন্দী (ইতিনা)
কন্যা
সুধীর
অধীর
কৃষ্ণমতী
গৌর
*
নিবারণ
=নীরোদা
বলরাম
=নগেন্দ্রবালা
গদাধর
উষা
সারদা
=রামচন্দ্র বিশ্বাস ছোট (দৈবজ্ঞহাটি)
খগেন্দ্র
গিরিজা
=নেপালচন্দ্র সেন (দামোদর)
হরেন্দ্র
নরেন্দ্র
যোগনিদ্রা
=রামলাল ঘর মোক্তার (বাগেরহাট)
পুত্র কন্যা
রামকৃষ্ণ
=উষাবালা
যমুনা
=ডাঃ যোগেন্দ্র গোপাল রায় এল, এম, এস (লোহাগড়া)
পুত্র কন্যা
রসময়
=রাধারাণী
কৃষ্ণা
=কেশবলাল সেন (দশানি)
পুত্র কন্যা

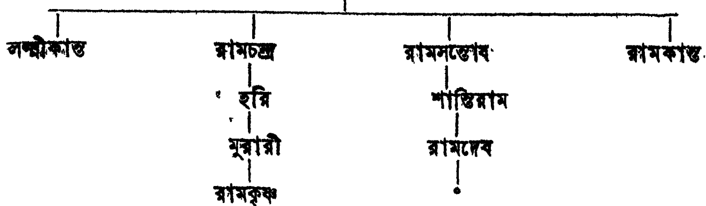
আত্মার উৎকর্ষ সাধন করিয়াছেন। ইহার স্থায় সত্যবাদী, ধার্ম্মিক ও নিষ্ঠাবান পুরুষ লোহাগড়া গ্রামে অতি বিরল। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা করিয়া দেশে বিশেষ সুযশ অর্জ্জন করিয়াছেন ও বিনামূল্যে গরীবদের ঔষধ বিতরণ করিয়া প্রকৃত পরোপকার করিতেছেন। কনিষ্ঠ বলরাম সুদূর নেপাল রাজ্যে কম্পাউণ্ডারের কার্য্য করেন। নিবারণের তুই পুত্র ও তিন কন্যা—যোগনিন্দ্রা, রামকৃষ্ণ, যমুনা, রসময় ও কৃষ্ণা। জ্যেষ্ঠপুত্র রামকৃষ্ণ কলিকাতা ক্যাম্বেল মেডিক্যাল স্কুল হইতে ডাক্তারী পাশ করিয়া নেপাল রাজ্যে ডাক্তারী করিতেছেন, আর কনিষ্ঠ রসময় চাকুরী করিতেছেন। বলরামের পুত্র গদাধর নাবালক।

রাধাকান্তের অধস্তন অষ্টম পুরুষ মহিমাচরণ। মহিমাচরণের চারিপুত্র—কেশব, ভগীরথ, খগেন্দ্র ও নগেন্দ্র। কেশব সরকার বাটীর তহশীলদার, ভগীরথ স্থানীয় বাজারে ব্যবসায় লিপ্ত, খগেন্দ্র খিদিরপুর ডকে চাকুরী করেন, আর নগেন্দ্র বাড়ীতেই থাকেন। কেশবের জ্যেষ্ঠপুত্র রণেন্দ্র প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

রাধাকান্তের অধস্তন সপ্তম পুরুষ রামচন্দ্র ও মধুসূদন। রামচন্দ্রের তুই পুত্র—জ্যেষ্ঠ ব্রজনাথ, কনিষ্ঠ জন্মাবধি বোবা। ব্রজনাথের একমাত্র পুত্র গোপাল। গোপাল রায় বাটী তহশীলদারের কার্য্য করেন। মধুসূদনের এক পুত্র ও এক কন্যা—রাইচরণ ও স্বর্ণময়ী। স্বর্ণময়ী বালবিধবা। রাইচরণ চিরকুমার। ইনি কবিরাজী ব্যবসায় করেন।

রাধাকান্তের মধ্যম পুত্র রঘুনাথ। রঘুনাথের অধস্তন পঞ্চম পুরুষ হারান ও মোহন। হারানের তিন পুত্র—কালাচাঁদ, শশিভূষণ ও মতিলাল। কালাচাঁদ কবিরাজী ব্যবসায় করেন। শশিভূষণ ও মতিলাল ব্যবসায় করিতেছেন। মোহনের চারিপুত্র—বিপিন, কেদার, বঙ্কুবিহারী ও হৃদয়নাথ। বিপিনের পুত্রসন্তান নাই, মাত্র তুইটী কন্যা রাখিয়া বিপিন পরলোক গমন করেন। কেদারনাথ লোহাগড়া পীতাম্বর দাতব্যচিকিৎসালয়ে কম্পাউণ্ডারের কার্য্য করেন। তৃতীয় বঙ্কুবিহারী লোহাগড়া পরিত্যাগ করিয়া কচুবাড়িয়া বসতি-বাস করিতেছেন। সর্ব্বকনিষ্ঠ হৃদয়নাথ সরকার বাটীতে তহশীলদারের কার্য্য করেন। হৃদয়নাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র রবীন্দ্র প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন।

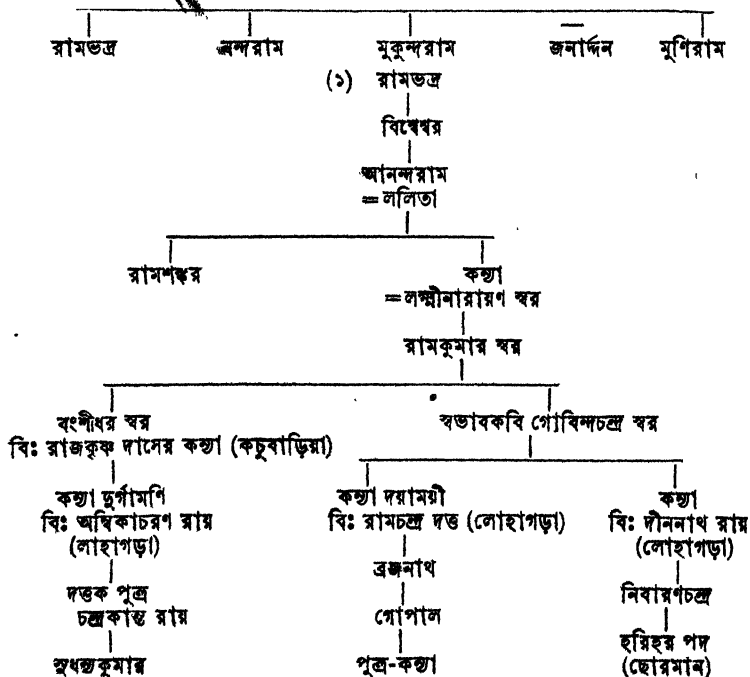
নরসিংহ দত্তের তৃতীয় পুত্র শ্যামদত্তের বংশতালিকা।



প্রহ্লাদ নিঃসন্তান প্রাণনাথ নিঃসন্তান

এবংশের শাখা নাই। মহেশচন্দ্র দত্ত, প্রহ্লাদচন্দ্র দত্ত এই বংশের বলিয়া পরিচয় দেন, কিন্তু বংশ তালিকায় কোথায়ও তাহাদের পূর্ব্বপুরুষের নাম দৃষ্ট হয় না, এজন্য উহারা যে এই বংশের তাহা সত্য করিয়া বলা যায় না। মহেশ নবদ্বীপ বাড়ী করিয়া তথায় বাস করিতেছেন। প্রহ্লাদ লোহাগড়ায় বাস করিতেছেন।

নরসিংহ দত্তের চতুর্থপুত্র চন্দ্রশেখর মজুমদারের বংশ তালিকা।



স্বভাবকবি গোবিন্দচন্দ্র স্বর।

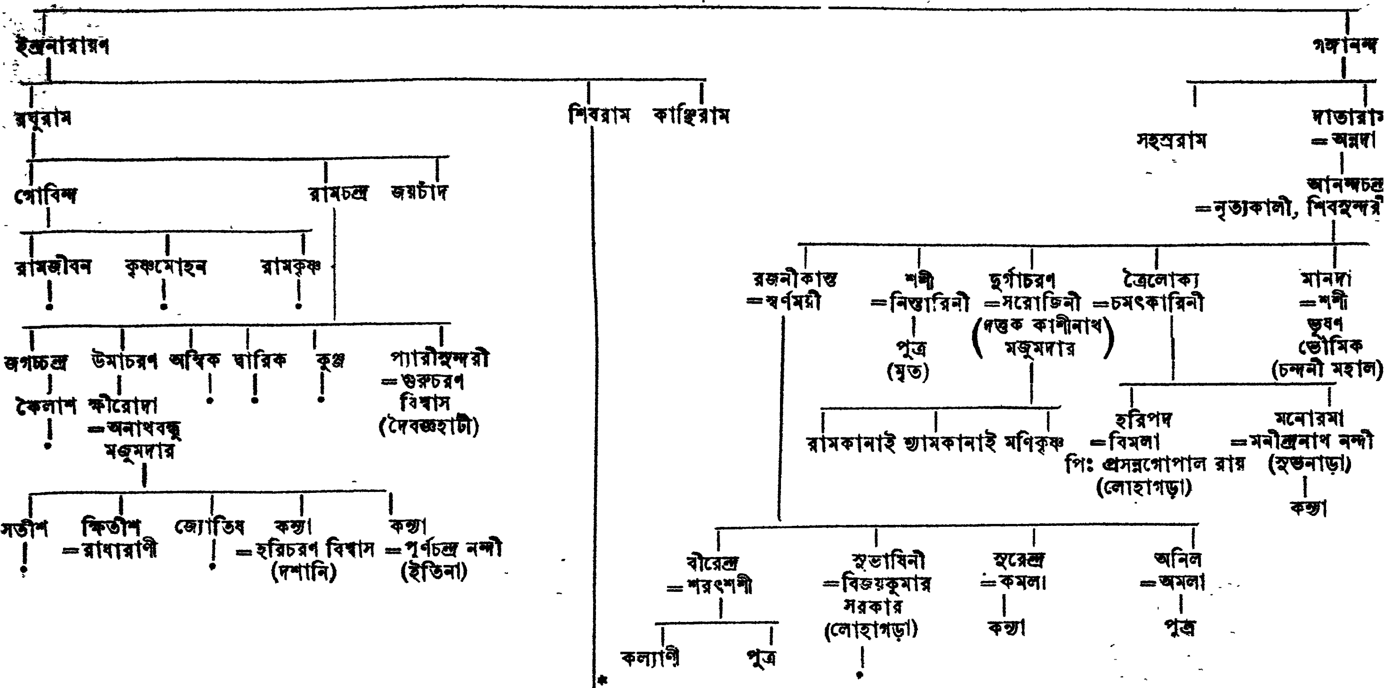
এই দৌহিত্র বংশে স্বভাব-কবি গোবিন্দচন্দ্র জন্ম গ্রহণ করিয়া বংশোজ্জ্বল করিয়াছেন। গোবিন্দচন্দ্রের জন্মে লোহাগড়া সত্য সত্যই গৌরবান্বিত। ইহার পিতা রামকুমার সাতিশয় সরল প্রকৃতির লোক ছিলেন। রামকুমারের দুই পুত্র—জ্যেষ্ঠ বংশীধর ও কনিষ্ঠ গোবিন্দচন্দ্র। বংশীধর সমধিক কৃতী-পুরুষ। ইনি পাবনায় মোক্তারী করিয়া বিশেষ সুখ্যাতি অর্জ্জন করিয়া প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করেন। বংশীধর নিজবাটীতে বার্ষিক দুর্গোৎসবের জন্য সুবৃহৎ চণ্ডীমণ্ডপ ও বাসের জন্য এক প্রকাণ্ড অট্টালিকা নির্ম্মাণ করেন। প্রতিবৎসর পূজায় মহাসমারোহের সহিত দান ও ব্যয় করিতেন। গোবিন্দচন্দ্র সু-কবি ছিলেন। মুখে মুখে সুন্দর সুন্দর কবিতা রচনা করিয়া লোক সমাজে বিশেষ আদৃত হইতেন। ইহার রচনা শক্তিতে গ্রামস্থ সকলে মুগ্ধ হইয়া ইঁহাকে ভক্তি ও প্রীতির চক্ষে দেখিতেন। বালকগণ গোবিন্দচন্দ্রের মুখে কবিতা শ্রবণ করিয়া বড়ই আনন্দ উপভোগ করিত। ইহার কবিত্বের সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য সরলতায় পরিপূর্ণ। আমরা এই কবির কবিতার সম্যক্ পরিচয় 'সাহিত্য সম্পদ' অধ্যায়ে বর্ণনা করিব।

বংশীধর ও গোবিন্দচন্দ্র কাহারও পুত্রসন্তান ছিল না। গোবিন্দচন্দ্রের দৌহিত্র নিবারণচন্দ্র রায় যাত্রার দল গঠন করিয়া দেশ বিদেশে গান করিয়া সকলেরই প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন। বড়ই দুঃখের বিষয় যে ইহাদের বংশে বাতি দিবার কেহই নাই। মাত্র বংশীধরের দৌহিত্র, দত্তকপুত্র চন্দ্রকান্ত অতি দৈন্য অবস্থায় কালাতিপাত করিতেছেন। চন্দ্রকান্তের পুত্রেরা নাবালক।

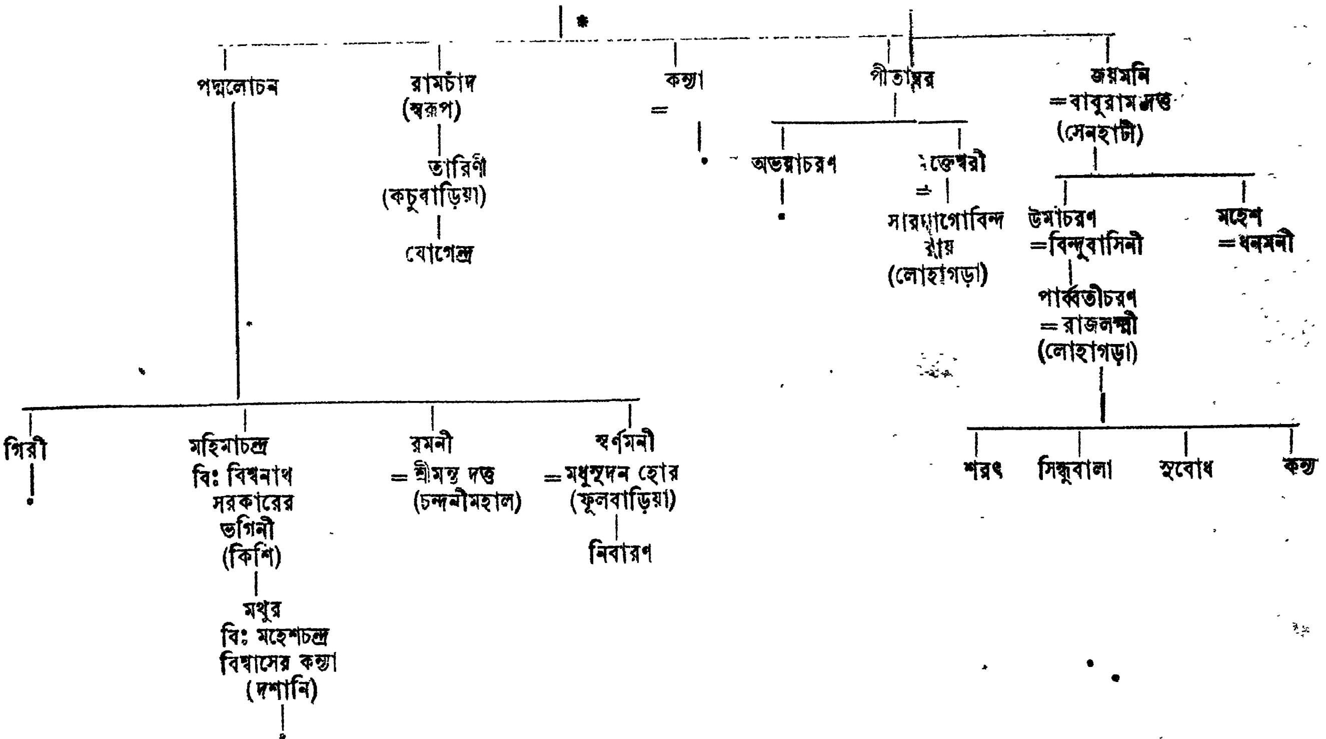
খ্যাতনামা চন্দ্রশেখর মজুমদার।

নরসিংহ দত্তের চতুর্থ পুত্র চন্দ্রশেখরও জ্যেষ্ঠ কৃষ্ণচন্দ্রের ন্যায় নবাব-সরকারে চাকুরী করিয়া নবাব প্রদত্ত খেতাব 'মজুমদার' উপাধি প্রাপ্ত হন। ইঁহারই সময় বাড়ীতে দুর্গোৎসব পূজার প্রথম প্রচলন হয়। বৈঠকখানা, চণ্ডীমণ্ডপ, জোড়বাঙ্গালা, শিবমন্দির প্রভৃতি ইমারতাদির দ্বারা বহির্ব্বাটী চক্ প্রস্তুত করিয়া মহাসমারোহে বার্ষিক পূজা করেন। বড়ই দুঃখের বিষয়

(২)



নন্দরাম
ইন্দ্রনারায়ণ
গঙ্গানন্দ
রঘুরাম
শিবরাম
কান্তিরাম
সহস্ররাম
দাতারাম
=অন্নদা
আনন্দচন্দ্র
=নৃত্যকালী, শিবসুন্দরী
গোবিন্দ
রামচন্দ্র
জয়চাঁদ
রামজীবন
কৃষ্ণমোহন
রামকৃষ্ণ
রজনীকান্ত
=স্বর্ণময়ী
শশী
=নিস্তারিনী
পুত্র
(মৃত)
দুর্গাচরণ
=সরোজিনী
(দত্তক কাশীনাথ মজুমদার)
ত্রৈলোক্য
=চমৎকারিনী
মানদা
=শশী
ভূষণ
ভৌমিক
(চন্দনী মহাল)
জগচ্চন্দ্র
উমাচরণ
অম্বিক
দ্বারিক
কুঞ্জ
প্যারীসুন্দরী
=গুরুচরণ
বিশ্বাস
(দৈবজ্ঞহাটী)
কৈলাশ
ক্ষীরোদা
=অনাথবন্ধু
মজুমদার
রামকানাই শ্যামকানাই মণিকৃষ্ণ
হরিপদ
=বিমলা
পিঃ প্রসন্নগোপাল রায়
(লোহাগড়া)
মনোরমা
=মনীন্দ্রনাথ নন্দী
(সুন্তনাড়া)
কন্যা
সতীশ
ক্ষিতীশ
=রাধারাণী
জ্যোতিষ
কন্যা
=হরিচরণ বিশ্বাস
(দশানি)
কন্যা
=পূর্ণচন্দ্র নন্দী
(ইতিনা)
বীরেন্দ্র
=শরৎশশী
সুভাষিনী
=বিজয়কুমার
সরকার
(লোহাগড়া)
সুরেন্দ্র
=কমলা
কন্যা
অনিল
=অমলা
পুত্র
কল্যাণী
পুত্র
*


*
পদ্মলোচন
রামচাঁদ
(স্বরূপ)
তারিণী
(কচুবাড়িয়া)
যোগেন্দ্র
কন্যা
=
পীতাম্বর
অভয়াচরণ
মুক্তেশ্বরী
=
সারদাগোবিন্দ
রায়
(লোহাগড়া)
জয়মনি
=বাবুরাম দত্ত
(সেনহাটী)
উমাচরণ
=বিন্দুবাসিনী
পার্ব্বতীচরণ
=রাজলক্ষ্মী
(লোহাগড়া)
মহেশ
=ধনমনী
শরৎ
সিন্ধুবালা
সুবোধ
কন্যা
গিরী
মহিমাচন্দ্র
বিঃ বিশ্বনাথ
সরকারের
ভগিনী
(কিশি)
মথুর
বিঃ মহেশচন্দ্র
বিশ্বাসের কন্যা
(দশানি)
রমনী
=শ্রীমন্ত দত্ত
(চন্দনীমহাল)
স্বর্ণমনী
=মধুসূদন হোর
(ফুলবাড়িয়া)
নিবারণ

চন্দ্রশেখরের বংশধরগণের মধ্যে বর্ত্তমানে কাহারও কাহারও যথেষ্ট অর্থ সঙ্গতি থাকা সত্ত্বেও, শরিকেরা গরীব হইয়া যাওয়ায় নিজ নিজ অংশ দিতে অক্ষম হওয়ায়, তাঁহারা তাহাদের অংশমত ভিন্ন অতিরিক্ত দিতে অস্বীকার করায়, ২৭৫ বৎসর পূর্ব্বে মহাপ্রাণ চন্দ্রশেখরের প্রবর্ত্তিত দুর্গোৎসব মহাযজ্ঞ ১৩৩২ সালে বন্ধ হইয়া যায়। চন্দ্রশেখর সাবেকী ইষ্টক নির্ম্মিত জোড়বাঙ্গলা নির্ম্মাণ করিয়া যে গৃহদেবতা ৺শ্রীশ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন, তাহা বর্ত্তমানেও সুন্দররূপে নিত্য পূজা ও ভোগ পাইয়া আসিতেছেন। তবে অবিলম্বে ঐ জোড়বাঙ্গলার সংস্কার আবশ্যক।

৺দাতারাম মজুমদার।

চন্দ্রশেখরের অধস্তন চতুর্থপুরুষ দাতারাম মজুমদার পাবনায় দেওয়ানের চাকুরী করিয়া পূর্ব্বপুরুষ প্রচারিত সমস্ত ক্রিয়াকর্ম্মাদি সমানভাবে বজায় রাখিয়া যান। মকরযাত্রা, রাসযাত্রা, দুর্গোৎসবাদি ক্রিয়াকর্ম্ম মহাসমারোহের সহিত সুসম্পন্ন করেন। দাতারাম তেজস্বীপ্রকৃতির ব্যক্তি ছিলেন। পূর্ব্বে লোহাগড়া গ্রামে কখনও পানের চাষ ছিল না, বর্ত্তমানেও নাই। দাতারামের জীবিতকালে জনৈক ব্যক্তি প্রথম পানের চাষ আরম্ভ করেন। দাতারাম চাকুরীস্থল হইতে গৃহে আগমন করিলে বরোজ সম্পর্কীয় কথা তাহার কর্ণগোচর হয়। তিনি তখন লোকজন সঙ্গে করিয়া ঐ বরোজ ভাঙ্গিয়া দেন এবং উহার ক্ষতিস্বরূপ কিছু অর্থ দিয়া ঐ বরোজের মালিককে লোহাগড়া পরিত্যাগ করিতে অনুরোধ করেন। তৎপর আর কখনও কেহ ঐরূপ কার্য্য করিতে অগ্রসর হয় নাই। লোহাগড়ার বৈশ্যবারুজীবি জাতি চিরকালই উন্নত। ইহাদের আচার, ব্যবহার, রীতি, নীতি ও শিক্ষা উচ্চ শ্রেণী অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহে। দাতারামের একমাত্র পুত্র আনন্দচন্দ্র।

৺রজনীকান্ত মজুমদার।

আনন্দচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র রজনীকান্তের জীবিতকাল পর্য্যন্তও ঐ বাটীতে সমস্ত পূজা-পার্ব্বণাদি সুসম্পন্ন হইয়াছে। রজনীকান্তের অবর্ত্তমানে ক্রিয়াকর্ম্ম সমস্তই একে একে লোপ হইয়াছে। রজনীকান্ত নিত্যপূজা,



স্বর্গীয় রাঘব চন্দ্র দত্তের শিব মন্দির

পৃঃ ১০৮ দ্রষ্টব্য



স্বর্গীয় চন্দ্রশেখর মজুমদারের জোড় বাংলা।

(অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সতীশ চন্দ্র মিত্র মহাশয়ের সৌজন্যে)

পৃঃ ৯৯

আহ্নিক ও ইষ্টমন্ত্র জপ করিতেন, দেব-দ্বিজে সদাই ভক্তিমান ছিলেন। ১৩৩২ সালে ৮ই চৈত্র রজনীকান্ত পরলোক গমন করেন। তিনি মৃত্যুকালে তিনপুত্র ও এক কন্যা রাখিয়া যান। জ্যেষ্ঠ পুত্র বীরেন্দ্রকুমার বহরমপুর কলেজ হইতে এফ্, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া উক্ত কলেজে বি, এ, অধ্যয়ন করিয়া কলিকাতায় বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্ট সেক্রেটারীয়েটে চাকুরী করেন। মধ্যম সুরেন্দ্রকুমার ও কনিষ্ঠ অনিলকুমার সুদূর কালাহাণ্ডি এষ্টেটে ব্যবসায় করিতেছেন। রজনীকান্তের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ত্রৈলোক্যনাথ ফরেষ্টারের পদ হইতে রেঞ্জারের পদে উন্নীত হইয়া বহুদিন চাকুরী করিয়া একমাত্র পুত্র হরিপদর জন্য সর্ব্বস্ব রাখিয়া পরলোক গমন করেন। হরিপদ আই, এস সি, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বি, এ, অধ্যয়ন কালে পিতার মৃত্যু ঘটায় লেখাপড়া ত্যাগ করিয়া বর্ত্তমানে পিতার ত্যক্ত বিষয় সম্পত্তি রক্ষা করিতেছেন।

চন্দ্রশেখরের পৌত্র ইন্দ্রনারায়ণের মধ্যমপুত্র শিবরামের পুত্র পদ্মলোচন মজুমদার নওয়াখোলা কুঠীর দেওয়ান ছিলেন। পদ্মলোচন কালক্রমে লোহাগড়ায় একজন ধনাঢ্য বলিয়া পরিচিত হন। পদ্মলোচনের পুত্র মহিমাচন্দ্রের সহিত লোহাগড়া নিবাসী ৺বিশ্বনাথ সরকার মহাশয়ের ভগিনীর বিবাহ হয়। মহিমাচন্দ্রের জীবিতাবস্থায় তৎপুত্র মথুরানাথের মৃত্যু হয়। পদ্মলোচন মজুমদারের ত্যক্ত ঐশ্বর্য্যের উত্তরাধিকারী না থাকায়, শরিকেরা বিষয় সম্পত্তিপ্রাপ্ত হইবে এই আশঙ্কায় মহিমাচন্দ্রের স্ত্রী পূর্ব্ব হতে ধন-সম্পত্তি সমস্তই আত্মীয়-স্বজনের বাড়ীতে লইয়া গচ্ছিত রাখেন এবং ক্রমে ক্রমে ঐ বিপুল ধন-সম্পত্তি আত্মীয়-স্বজনের হস্তগত হয়।

শিবরামের দৌহিত্রপুত্র পার্ব্বতীচরণ খুলনা জেলার অন্তর্গত সেনহাটীর কাটালিপাড়ার দত্ত-বংশীয় শিবরাম দত্তের প্রপৌত্র বাবুরাম দত্তের পৌত্র উমাচরণ দত্তের পুত্র। পার্ব্বতীচরণ অতি শৈশবে পিতৃমাতৃহীন হওয়ায়, তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত মহেশচন্দ্র দত্তের স্ত্রী ধনমণী দাসী (লোহাগড়ার রামগোপাল সরকার মহাশয়ের ভগ্নী) স্নেহপরবশ হইয়া উক্ত ৺রামগোপাল সরকারের সংসারে রাখিয়া তাহাকে পুত্রনির্ব্বিশেষে প্রতিপালন করেন। তৎপর ৺রামগোপাল সরকারের কন্যা ভবতারিণী, নিস্তারিণী ও সরোজিনীর অনুরোধে বাধ্য হইয়া পার্ব্বতীচরণ বিবাহ করেন, কিন্তু ৺রামগোপাল

সরকারের ভাবী উত্তরাধিকারিগণের ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া লোহাগড়া পরিত্যাগ করিতে মনস্থ করেন, তখন স্বর্গীয় কেদারনাথ রায় মহাশয়ের যত্নে রায়বাহাদুর যদুনাথের বাটীতে চাকুরী গ্রহণ করিয়া তাঁহারই সাহায্যে লোহাগড়া গ্রামে স্বতন্ত্র বাটী প্রস্তুত করিয়া বসবাস করেন। গত ত্রিশবৎসরকাল পার্ব্বতীচরণ নায়েবীর চাকুরী করিয়া আসিতেছেন। তিনি একজন তীক্ষ্ণবুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তি; বিষয়-সম্পত্তি, মামলা-মোকদ্দমায় বিশেষ পারদর্শী। পার্ব্বতীচরণের দুই পুত্র—জ্যেষ্ঠ শরৎকুমার জরিপের কার্য্য শিক্ষা করিতেছেন, কনিষ্ঠ সুবোধকুমার নাবালক।

মুকুন্দরামের সন্তান সন্ততি।

মুকুন্দরামের তিনপুত্র কৃষ্ণমঙ্গল, রামরতন, ও শম্ভুনাথ। কৃষ্ণমঙ্গলের দুই পুত্র রামশঙ্কর ও কালিশঙ্কর। রামশঙ্কর নিঃসন্তান। কালিশঙ্করের একমাত্র পুত্র ঈশ্বরচন্দ্র। ঈশ্বরচন্দ্রের এক কন্যা ও পাঁচপুত্র—সোণামণি, রামতারণ, প্যারীমোহন, বেনীমাধব, শশিভূষণ ও বিপিন। জ্যেষ্ঠপুত্র রামতারণ লোহাগড়া পরিত্যাগ করিয়া রামপুর বসতিবাস করেন। তিনি অশীতিবর্ষ বয়ঃক্রমকালে রামপুর গ্রামে দুইপুত্র রাখিয়া পরলোক গমন করেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র তারকনাথ ১৩৩১ সালে স্ত্রী জানকী সুন্দরী, পাঁচ পুত্র ও দুই কন্যা রাখিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। তারকনাথ কর্ম্মঠ ছিলেন। তিনি নিজ চেষ্টায় দাদন করিয়া বহু অর্থ উপার্জ্জনে সক্ষম হন ও প্রচুর অর্থব্যয় করিয়া নিজ বাটীতে এক সুবৃহৎ অট্টালিকা নির্ম্মাণ করেন। তিনি পুত্রদের শিক্ষার জন্য ব্যয় করিতে কখনও কুণ্ঠিত হন নাই। তঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র অবিনাশচন্দ্র ১৯২৩ খৃঃ দৌলতপুর কলেজ হইতে আই, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া যখন ৩য় বার্ষিক শ্রেণীতে বি, এ, অধ্যয়ন করেন, তখন তারকনাথের মৃত্যু হওয়ায় সংসারের সমস্ত ভার তাহার উপর পতিত হয়। ১৩৩৪ সালে অগ্রহায়ণ মাসে অবিনাশের প্রথমা স্ত্রী নীহারনলিনীর বিশবৎসর বয়সে মৃত্যু হয়, তখন তিনি দ্বিতীয় দার গ্রহণ করেন। বর্ত্তমানে অবিনাশ কলিকাতা মহানগরীতে ব্যবসায় বাণিজ্য করিতেছেন। মধ্যমপুত্র জ্যোতিষচন্দ্র সংসারে থাকিয়া বৈষয়িক কাজকর্ম্ম পরিচালনা করেন। তৃতীয় পুত্র ক্ষিতীশচন্দ্র কলিকাতা আর্টস্কুল হইতে এই বৎসর ড্রাপ্টস্ম্যানসিপ পরীক্ষা দিয়াছেন।



শ্রী ক্ত ভোলানাথ মজুমদার
মেম্বর ইউনিয়ন বোর্ড)



তারক নাথ মজুমদার।

পৃঃ ১০১

(৩য়) মুকুন্দরাম

- কৃষ্ণমঙ্গল
  - রামশঙ্কর
  - কালিশঙ্কর
    - ঈশ্বরচন্দ্র — বিঃ জয়চন্দ্র রায়ের কন্যা (লোহাগড়া)
      - সোনামণি =গিরিশচন্দ্র সরকার (করগু)
      - রামতারণ (কচুবাড়িয়া) =আদরমনী
        - তারক =জানকী সুন্দরী
          - অবিনাশ =নীহার নলিনী =নীহারনলিনী
          - জ্যোতিষ =প্রভাবতী
          - ক্ষিতীশ
          - হেমনলিনী =নগেন্দ্র নাথ সেন (দামোদর)
          - মাধব
          - পুত্র
          - সুকুমারী =উপেন্দ্র নাথ গুহ (আডড়িয়া)
        - শরৎ
          - বিমলকৃষ্ণ
        - চন্দ্রকান্ত (দত্তক) (অম্বিকাচরণ রায় লোহাগড়া)
      - প্যারীমোহন =দিনমণি
        - জটাধর =সরোজিনী
          - কমলকৃষ্ণ =কমলা
          - রাণী =নরেন্দ্র নাথ বিশ্বাস (দৈবজ্ঞহাটী)
          - রাজকৃষ্ণ
          - বিনয়কৃষ্ণ
          - সাবিত্রী
        - পঞ্চানন =সরলা
          - সুধাংশু
        - ভোলানাথ =উর্মিলা
          - রামকৃষ্ণ
          - অমরকৃষ্ণ
          - বিজয়কৃষ্ণ
      - বেণীমাধব =বামাসুন্দরী
        - ললিত = (সিদ্ধিপাশা)
          - পুত্র
        - কিশোরী =রাধারাণী
          - পুত্র
      - শশীভূষণ =স্বর্ণময়ী
        - রাধানাথ =সরোজিনী
          - সুধীর বি, এ, =মনীষা পিঃ যোগেন্দ্র নাথ দাস (খালিস্পুর)
          - সুধারাণী =লেঃ মাখন সমাদ্দার সব_ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট (কচুবাড়িয়া)
          - রেণুকা =ডাঃ কামিনী গুহ (দৈবজ্ঞহাটী)
      - বিপিন (করগু)
        - কালিদাস
        - কৃষ্ণদাস বি, এস সি,
        - চারুশীলা =বিভূতি ভূষণ সরকার (লোহাগড়া)
          - পুত্র
    - কন্যা
    - কন্যা
      - হারানচন্দ্র দত্ত
- রামরতন
- শম্ভুনাথ =ভুবনেশ্বরী

৪র্থ ও পঞ্চম পুত্র নাবালক। রামতারণের কনিষ্ঠ পুত্র শরৎচন্দ্র বাড়ীতে থাকিয়া সংসার প্রতিপালন করেন। ইহার পুত্র বিমলকৃষ্ণ নাবালক।

মধ্যম প্যারীমোহন চন্দ্রশেখর মজুমদারের অধস্তন ৬ষ্ঠ পুরুষ। জয়চন্দ্র রায়ের দৌহিত্রগণের মধ্যে প্যারীমোহনই সমধিক ভাগ্যবান। জয়চন্দ্র সর্ব্বাপেক্ষা প্যারীমোহনকে ভালবাসিতেন এবং মৃত্যুকালে তাঁহাকে কিছু অর্থ দিয়া পরলোক গমন করেন। ঐ অর্থ সাহায্যে প্যারীমোহন ক্রমান্বয়ে দাদনপত্র করিয়া স্বীয় অবস্থার বিশেষ উন্নতি সাধন করেন এবং মৃত্যুকালে পুত্রদের জন্ম সর্ব্বস্ব রাখিয়া যান। প্যারীমোহনের তিনপুত্র —জটাধর, পঞ্চানন ও ভোলানাথ সকলেই সক্ষম। জ্যেষ্ঠপুত্র জটাধর কিছুদিন ডাক্তারী করিয়া বর্ত্তমানে স্থানীয় বাজারে ডিস্পেন্সারী খুলিয়া ঔষধ বিক্রয় ও বিষয়সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ করেন। তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র কমলকৃষ্ণ কলিকাতা রিপন কলেজে আই, এস সি, অধ্যয়ন করেন। প্যারীমোহনের মধ্যম পুত্র পঞ্চানন কোর্টে আমলার চাকুরী করেন এবং কনিষ্ঠ ভোলানাথ বরিশাল ব্রজমোহন কলেজ হইতে এফ্, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া গত পনর বৎসর যাবৎ লক্ষ্মীপাশা ও বর্ত্তমানে লোহাগড়া উচ্চইংরাজী বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করিতেছেন। শিক্ষকতায় ভোলানাথের বিশেষ সুখ্যাতি আছে। ইহাদের পুত্রেরা সকলেই নাবালক।

তৃতীয় বেনীমাধব লোহাগড়া গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া সিদ্ধিপাশা গ্রামে যাইয়া বাস করেন। ইনি অতিবৃদ্ধ হইয়াও বর্ত্তমানে জীবিত আছেন। ইহার দুই পুত্র—ললিত ও কিশোরী। জ্যেষ্ঠ ললিত গবর্ণমেণ্ট রেলওয়ে বিভাগে ষ্টেশন মাষ্টারের চাকুরী করেন।

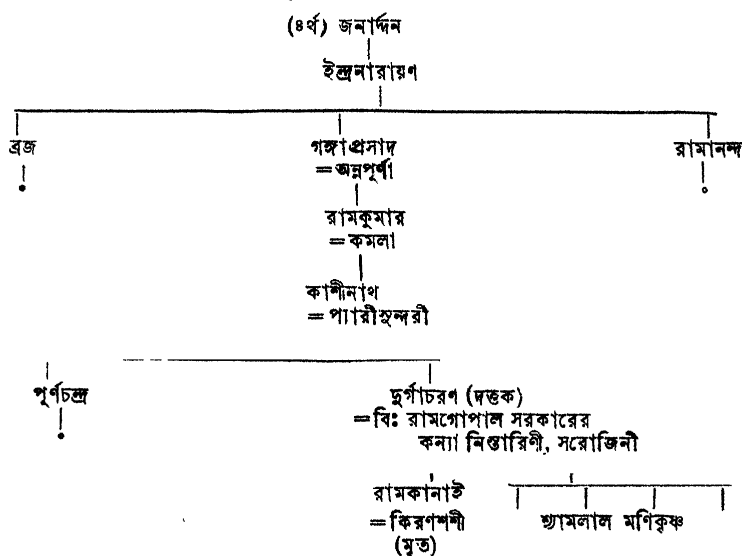
চতুর্থ শশিভূষণের একমাত্র পুত্র রাধানাথ কৃতবিদ্য পুরুষ। বাল্যকালে পিতার মৃত্যু হেতু রাধানাথ নানা দুঃখ কষ্টের ভিতর লেখাপড়া শিক্ষা করেন। আঠার বৎসর বয়ঃক্রমকালে এফ, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বাঙ্গালা পুলিশ বিভাগে সবইনসপেক্টরের চাকুরী প্রাপ্ত হন। তিনি একাদিক্রমে পঁচিশ বৎসরকাল বিশেষ দক্ষতার সহিত কার্য্য করিয়া পেনশন গ্রহণ করেন। বাল্যকালে যাঁহাকে অন্যের সাহায্যপ্রার্থী হইতে হইয়াছিল, তিনি আজ মিতব্যয়িতাগুণে প্রভূত অর্থ অর্জ্জনে সক্ষম হইয়াছেন। চাকুরীতে লিপ্ত থাকিয়া রাধানাথ (পি, এল) ওকালতী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ



শ্রীযুক্ত রাধানাথ মজুমদার,
উকিল।

পৃঃ ১০৩

হন এবং বর্ত্তমানে আলিপুর পুলিশ কোর্টে ওকালতী ব্যবসায় করিতেছেন। রাধানাথ চাকুরী করিয়া লোহাগড়া, খুলনা সহর ও কলিকাতায় বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকা প্রস্তুত করিয়াছেন। ইনি বর্ত্তমানে লোহাগড়া গ্রামে একজন ধনাঢ্য বলিয়া পরিচিত। ইহার একমাত্র পুত্র সুধীরকুমার কলিকাতা আশুতোষ কলেজ হইতে বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। সর্ব্ব কনিষ্ঠ বিপিন লোহাগড়া পরিত্যাগ করিয়া করগুি যাইয়া বাস করেন। বিপিনের দুই পুত্র—কালিদাসও কৃষ্ণদাস—ইঁহারা করগুিগ্রামে বাস করিতেছেন। কালিদাস ইছাপুর গান্‌ফ্যাক্টরীতে প্রবেশনার, আর কৃষ্ণদাস বর্ত্তমানবর্ষে রাজসাহী কলেজ হইতে বি, এস্ সি, পাশ করিয়াছেন।



হাবিলদার মেজর রামকানাই মজুমদার।

চন্দ্রশেখর মজুমদারের চতুর্থ পুত্র জনার্দ্দন। তাহার পুত্র ইন্দ্রনারায়ণ। ইন্দ্রনারায়ণের তিন পুত্র ব্রজমোহন, গঙ্গাপ্রসাদ ও রামানন্দ। জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ অপুত্রক। মধ্যম গঙ্গাপ্রসাদের পুত্র রামকুমার। রামকুমারের একমাত্র পুত্র কাশীনাথ মজুমদার ধনবান পুরুষ। কাশীনাথ বড়জিয়ালা কুঠীর দেওয়ানের কার্য্য করিয়া স্বীয় অবস্থার পরিবর্ত্তন করেন। কাশীনাথের মৃত্যুর পর একমাত্র পুত্র পূর্ণচন্দ্রের মৃত্যু হওয়ায় কাশীনাথের স্ত্রী আনন্দচন্দ্র

মজুমদারের দ্বিতীয় স্ত্রীর গর্ভজাত কনিষ্ঠ পুত্র দুর্গাচরণকে দত্তক পুত্র গ্রহণ করেন। মাতাপুত্রে ক্রমে অসৎভাব হওয়ায় কাশীনাথের স্ত্রী কাশীনাথের ত্যক্ত ধনসম্পত্তির যাহা আত্মীয়ের বাড়ীতে রাখেন তাহা দুর্গাচরণ ভোগ করিতে পারেন না। দুর্গাচরণ বড় দুঃখে কালাতিপাত করেন। বিষয় সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করেন। অবশিষ্ট জমাজমি যাহা রাখিয়া যান তাহাও তৎপুত্র জ্যেষ্ঠ রামকানাই সমস্তই এমন কি বসতবাটী পর্য্যন্ত বিক্রয় করিয়া বর্ত্তমানে নাবালক ভ্রাতৃদ্বয় শ্যামকানাই ও মণিকানাইকে পথের ফকির করিয়া দেন। রামকানাই পৃথিবীব্যাপী গত মহাযুদ্ধের সময় মেসোপটেমিয়া সৈন্য বিভাগে যোগদান করিয়া দেশের ও জাতির গৌরবের পাত্র হন। যুদ্ধক্ষেত্রে পারদর্শিতা দেখাইয়া সাধারণ সৈন্য হইতে ক্রমান্বয়ে ল্যান্স নায়ক, নায়ক, হাবিলদার ও অবশেষে হাবিলদার মেজরের পদে উন্নীত হন। যুদ্ধক্ষেত্র হইতে প্রত্যাগমন করিয়া কলিকাতা গবর্ণমেণ্ট হেয়ার স্কুলে ফিজিক্যাল ইনস্ট্রাক্টর বা ড্রিলমাষ্টারের পদে নিযুক্ত হইয়া গত আট বৎসর কাল বিশেষ দক্ষতার সহিত কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছেন। রামকানাই অতি সম্মানের সহিত এই পদমর্য্যাদা রক্ষা করিতেছেন।

বিবাহিত জীবনে রামকানাই সুখী হইতে পারেন নাই। বিবাহের অল্পকাল পরই তাঁহার স্ত্রীর মৃত্যু হয়। তৎপর হইতে অদ্যাবধি রামকানাই দ্বিতীয় দারপরিগ্রহ করেন নাই।

রামকানাই বলিষ্ঠ ও সরলপ্রকৃতির লোক। ইহার অসীম সাহস ও অসামান্য বল সত্যসত্যই প্রশংসনীয়। এই রামকানাই বাল্যকাল হইতে যে কতরূপ ধারণ করিয়াছেন তাহার ইয়ত্তা নাই। প্রথমে কলিকাতায় ট্রামের কণ্ডাক্টরের কার্য্য করেন, তৎপর উহা পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইয়া দেশ বিদেশে ভ্রমণ করেন। পরে সন্ন্যাসী বেশ ছাড়িয়া যুদ্ধযাত্রা করেন এবং সেখান হইতে প্রত্যাগমন করিয়া ঘোর সংসারী হন ও চাকুরী করিয়া পূর্ব্বপুরুষ প্রচারিত মহাযজ্ঞ দুর্গোৎসবের পুনরায়োজন করেন। এই সময় হঠাৎ তাহার স্ত্রীর মৃত্যু হয়। তৎপর হইতে সাকিনশূন্য অবস্থায় কলিকাতা মহানগরীতে অবস্থান করিয়া হেয়ারস্কুলের চাকুরী বজায় রাখিয়া কালাতিপাত করিতেছেন।

- (৫ম) মুনিরাম
  - অযোধ্যারাম =সরস্বতী
    - রামমোহন =নারায়ণী
      - রামলোচন
        - কন্যা বিঃ সেনহাটী ভদ্রবাড়ী
        - গোলক =পদ্মমণি
          - মথুর =রাইবিনোদিনী
            - হরিপদ =মহামায়া
            - কালিপদ
            - নীরোদা =বিপিনবিহারী দাস (কচুবাড়িয়া)
              - পুত্র
            - তারাপদ
          - প্রতাপ =সারদাসুন্দরী
            - কানাই =বিমলা পিঃ লালমোহন দাস (লোহাগড়া)
              - কন্যা
            - প্রফুল্ল =ললিতকুমার দাস (কাশীপুর)
              - পুত্র
        - বংশী
      - পদ্মলোচন (বৃন্দাবনবাসী)
      - বৈদ্যনাথ
      - কাঙ্গালী
    - জগমোহন
      - গোপাল
      - গোবিন্দ
    - ষষ্ঠীরাম
      - কৃষ্ণধন
        - হরি
        - কালী
      - পঞ্চানন
        - শ্রীনাথ
        - কেদার
        - কন্যা বিঃ করণ্ডী
          - জগবন্ধু সরকার (করণ্ডী)
            - কন্যা
          - দীনবন্ধু সরকার (লোহাগড়া)
            - অমূল্য
            - প্রফুল্ল
            - কৃষ্ণ
          - বেণীমাধব সরকার (লোহাগড়া)
            - বিনয়কৃষ্ণ
        - কন্যা বসন্তকুমারী =বিশ্বনাথ সরকার (ছোট)
          - উপেন্দ্রনাথ (বটুকানাথ) =সুধাংশুবালা
            - পুত্রগণ
    - দুর্গামণি বিঃ পরমেশ্বরপুর
    - হরমণি বিঃ খালিস্পুর

মোহন্ত পদ্মলোচন মজুমদার।

চন্দ্রশেখরের পঞ্চম পুত্র মুনিরাম। তাহার পুত্র অযোধ্যারাম। অযোধ্যারামের তিন পুত্র ও দুই কন্যা যথা—রামমোহন, জগমোহন, ষষ্ঠীরাম, দুর্গামণি ও হরমণি। রামমোহনের চারিপুত্র মধ্যে মধ্যম পদ্মলোচন ভক্তদাস ছিলেন। তিনি বৃন্দাবনবাসী হইয়া ভেক্ লইয়া মোহন্ত হইয়া গোবিন্দজীউর বাড়ীতে কোন কোন বিভাগের সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়া আমরণ তথায় বাস করেন। তৃতীয় বৈদ্যনাথ ও কনিষ্ঠ কাঙ্গালী উভয়েই নিঃসন্তান। জ্যেষ্ঠ রামলোচনের

দুই পুত্র ও এক কন্যা। কনিষ্ঠ পুত্র বংশী অপুত্রক। জ্যেষ্ঠ গোলকের দুই পুত্র—মথুর ও প্রতাপ। মথুরের জ্যেষ্ঠপুত্র হরিপদ কলিকাতা পুলিশ বিভাগে এসিষ্ট্যাণ্ট্ সব্ইনস্পেক্টরের চাকুরী করেন। মধ্যম কালিপদ টেলরিং (দর্জ্জী) ও কনিষ্ঠ তারাপদ মোটর চালকের কার্য্য করেন। প্রতাপের একমাত্র পুত্র কানাইলাল পাঠশালায় পণ্ডিতের কার্য্য করেন।

অযোধ্যারামের মধ্যমপুত্র জগমোহনের দুই পুত্র—গোপাল ও গোবিন্দ উভয়েই নিঃসন্তান। সর্ব্বকনিষ্ঠ ষষ্টীরামের দুই পুত্র—কৃষ্ণধন ও পঞ্চানন। কৃষ্ণধনের দুই পুত্র—হরি ও কালী উভয়েই নিঃসন্তান। পঞ্চাননের দুই পুত্র—শ্রীনাথ ও কেদার। শ্রীনাথ ও কেদার কাহারও পুত্র সন্তান ছিল না। পঞ্চাননের প্রথমা কন্যার গর্ভজাত সন্তান জগদ্বন্ধু, দীনবন্ধু ও বেণীমাধব সরকার। জগদ্বন্ধু করণ্ডীগ্রাম পরিত্যাগ করেন নাই। দীনবন্ধু ও বেণীমাধব উভয়েই করণ্ডী হইতে আগমন করিয়া মাতামহ সম্পত্তি ভোগদখল করিয়া লোহাগড়ায় বাস করিতেছেন। দ্বিতীয়া কন্যার গর্ভজাত সন্তান উপেন্দ্রনাথ ওরফে বটুকনাথ। উপেন্দ্রনাথের পঞ্চ পুত্ররত্ন সকলেই নাবালক।

গণেশচন্দ্রের সন্তানসন্ততি।

গণেশচন্দ্র দত্তের জ্যেষ্ঠ পুত্র রামেশ্বরের পৌত্র শ্রীকান্তের দৌহিত্র সন্তান—আদুরাম সমাদ্দার। আদুরামের দুই পুত্র ও পাঁচ কন্যা—নিবারণ তারক, ব্যাসমণী, শ্যামাসুন্দরী, নিস্তারিণী, মনমোহিনী ও হরসুন্দরী। জ্যেষ্ঠপুত্র নিবারণ অতিশয় তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি। বিষয়-সম্পত্তি, মামলা-মোকদ্দমায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। নিবারণচন্দ্র রায়বাটীতে তহশীলদারের কার্য্য করিতেন এবং লোহাগড়া বাজার সক্রান্ত বহু বিষয়ে রায় এষ্টেটের অনেক উপকার সাধন করেন। নিবারণের একমাত্র পুত্র হৃদয়নাথ হৃদয়বান্ পুরুষ। হৃদয়নাথ সৎসাহসী ও পরোপকারী। ইনি লোহাগড়া রামনারায়ণ সাধারণ পাঠাগারে লাইব্রেরিয়ান্ পদে নিযুক্ত থাকিয়া গত দ্বাদশ বৎসর কাল অতি দক্ষতার সহিত কার্য্য করিতেছেন। ইহার

নরসিংহ দত্তের পঞ্চম পুত্র গণেশচন্দ্র দত্তের বংশ তালিকা।

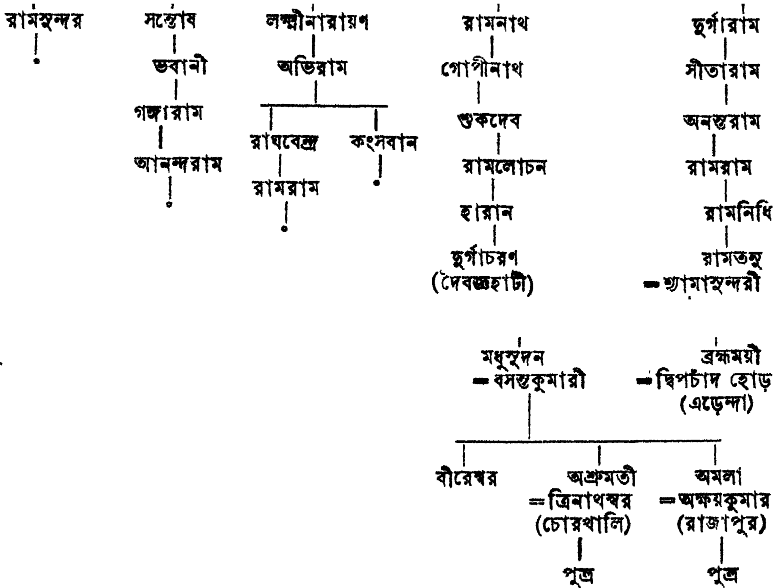
- গণেশচন্দ্র দত্ত
  - রামেশ্বর
    - রামরাম
    - চিন্তারাম
    - কাশীনাথ
      - শ্রীকান্ত
        - (কন্যা) রাসমণি
          - আতুরাম সমাদ্দার =আদরমণি
            - নিবারণ =সারদাসুন্দরী
              - হৃদয়নাথ =সুকেশী
                - রাধারাণী
            - তারক (উন্মাদ)
            - ব্যাসমণি =তারাচাঁদ বিশ্বাস (দশানি)
              - কেদারনাথ
              - প্রিয়নাথ
            - শ্যামাসুন্দরী =দুর্গাচরণ বিশ্বাস (দশানি)
              - রজনীকান্ত
              - বরদাকান্ত
            - নিস্তারিণী =প্রসন্নচন্দ্র বিশ্বাস (দশানি)
              - কুমুদবন্ধু
            - মনমোহিনী =নবীনচন্দ্র বিশ্বাস (দৈবজ্ঞহাটী)
              - কালীপ্রসন্ন বিশ্বাস (উকীল)
              - হরেন্দ্রকুমার বি, এল,
              - রাজেন্দ্রকুমার এম, বি,
              - নগেন্দ্রকুমার (উকীল)
              - হেমেন্দ্রকুমার (ডাক্তার)
              - শৈলেন্দ্রকুমার
            - হরসুন্দরী =রাইচরণ গুহ (দৈবজ্ঞহাটী)
              - সতীশ এম, এ,
              - শ্রীশ
              - কামিনী
          - হরিশ্চন্দ্র সমাদ্দার
  - বাণেশ্বর
    - মোচাই
      - নিমানন্দ
        - প্রহ্লাদ
          - শ্রীনাথ (মিছে) (খালিস্পুর)
            - নিবারণ
            - নেপাল
            - সীতানাথ
        - রাধানাথ
          - কৈলাস
        - সদারাম
    - ইন্দ্রনারায়ণ
      - পরশুরাম
        - বলরাম
          - কন্যা
            - মথুরানাথ দত্ত (কচুবাড়িয়া)
          - কন্যা
            - রাইচরণ দত্ত (খালিস্পুর)
          - কন্যা
            - রামচন্দ্র দে (খালিস্পুর)
              - উপেন্দ্রনাথ
              - পঞ্চানন
      - সর্ব্বেশ্বর
        - পঞ্চাননী =মহিমাচন্দ্র দত্ত (ঘরজামাই) সাং সেখহাটী
  - গোবিন্দরাম
    - নকড়ি
  - সূর্য্যনারায়ণ
  - রামশরণ

কার্য্যপ্রণালী সত্যই প্রশংসনীয়। কনিষ্ঠ তারক উন্মাদগ্রস্ত হইয়া পরলোক গমন করেন।

গণেশচন্দ্রের মধ্যম পুত্র বারেশ্বরের অধস্তন পঞ্চম পুরুষ শ্রীনাথ লোহাগড়া গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া খুলনা জেলার অন্তর্গত খালিস্পুর গ্রামে যাইয়া বাস করেন। শ্রীনাথের তিনপুত্র—নিবারণ, নেপাল ও সীতানাথ; ইহারা সকলেই জীবিত আছেন।

নরসিংহ দত্তের ৬ষ্ঠ পুত্র তিলকচন্দ্র দত্তের বংশ তালিকা।

তিলকচন্দ্র দত্ত

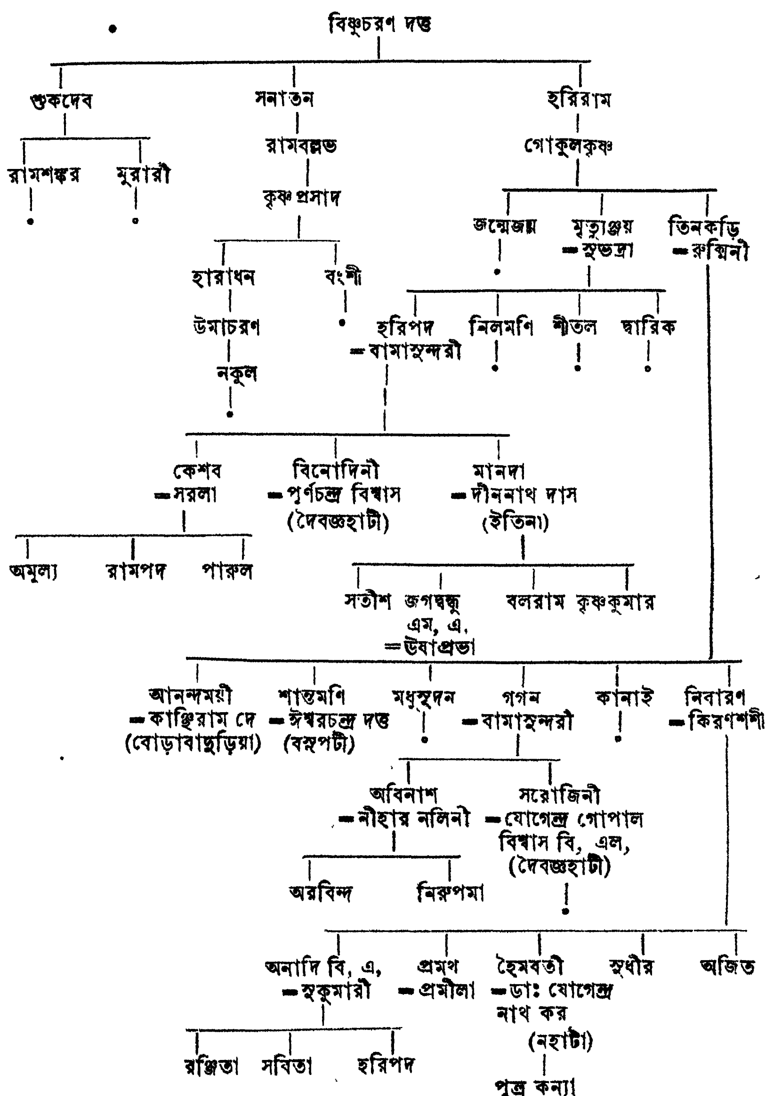


ধার্ম্মিক রাঘবেন্দ্রনাথ দত্ত।

নরসিংহ দত্তের ৬ষ্ঠ পুত্র তিলকচন্দ্রের পাঁচ পুত্র—রামসুন্দর, সন্তোষ, লক্ষ্মী-নারায়ণ, রামনাথ ও দুর্গারাম। জ্যেষ্ঠ রামসুন্দর নিঃসন্তান। মধ্যম সন্তোষের পুত্র ভবানী, তাহার পুত্র গঙ্গারাম, তাহার পুত্র আনন্দরাম নিঃসন্তান। তৃতীয় লক্ষ্মীনারায়ণের পুত্র অভিরাম। অভিরামের দুই পুত্র—রাঘবেন্দ্র ও কংশবান। তিলকচন্দ্রের অধস্তন চতুর্থ পুরুষ রাঘবেন্দ্র কীর্ত্তিমান পুরুষ। ১১৫৫ অব্দে

ইহারই নির্ম্মিত দোলমঞ্চ ও শিব মন্দির অদ্যাবধি তাহার ধর্ম্মানুরাগের পরিচয় দিতেছে। ধার্ম্মিক রাঘবেন্দ্র নিষ্ঠাবান পুরুষ ছিলেন। রাঘবেন্দ্রের একমাত্র পুত্র

নরসিংহ দত্তের ৭ম পুত্র বিষ্ণুচরণ দত্তের বংশ তালিকা।



রামরাম নিঃসন্তান। চতুর্থ রামনাথের পুত্র গোপীনাথ, তাহার পুত্র শুকদেব। শুকদেবের পুত্র রামলোচন, রামলোচনের পুত্র হারাণ, তাহার পুত্র দুর্গাচরণ, ইনি লোহাগড়া পরিত্যাগ করিয়া খুলনা দৈবজ্ঞহাটী গ্রামে গিয়া বাস করেন। ইহার পুত্রেরা বর্ত্তমানে জীবিত আছেন। কনিষ্ঠ দুর্গারাম। দুর্গারামের পুত্র সীতারাম, তাহার পুত্র অনন্তরাম। অনন্তরামের পুত্র রামরাম; তাহার পুত্র রামনিধি। রামনিধির পুত্র রামতনু, তাহার পুত্র মধুসূদন। মধুসূদনের পুত্র বীরেশ্বর জীবিত আছেন। ইনি কলিকাতার রায়বাহাদুর যদুনাথের ইলেক্ট্রীক্ রাইস মিলের ম্যাসিনমাষ্টার।

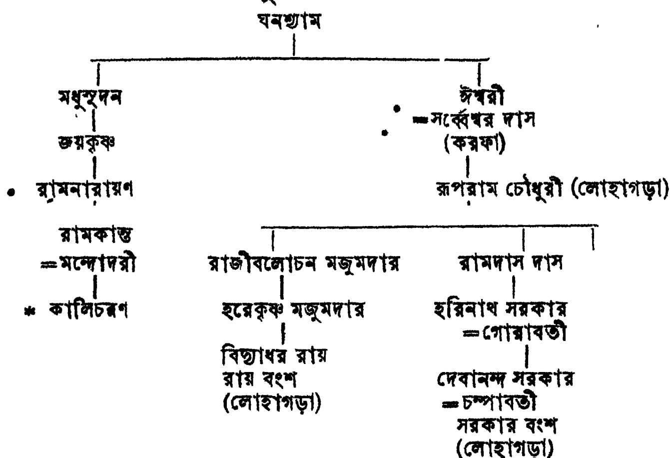
এই বংশের দত্ত বহু দেবোত্তর সম্পত্তি অদ্যাবধি কুলপ্রদীপ ধার্ম্মিক প্রবর রাঘবেন্দ্রের নাম ঘোসনা করিতেছে।

বিষ্ণুচরনের সন্তানসন্ততি।

নরসিংহ দত্তের অধস্তন ৬ষ্ঠ পুরুষ মধুসূদন, গগন, কানাই ও নিবারণ। জ্যেষ্ঠ মধুসূদন ও তৃতীয় কানাই নিঃসন্তান। মধ্যম গগন ও কনিষ্ঠ নিবারণ উভয়েই অমায়িক প্রকৃতির লোক। গগন একপুত্র ও এক কন্যা রাখিয়া পরলোক গমন করেন। গগনের পুত্র অবিনাশ ফরেষ্ট বিভাগে রেঞ্জারের চাকুরী করেন। নিবারণ জীবিত আছেন। তৎপুত্র জ্যেষ্ঠ অনাদিনাথ ১৯১৫ খৃঃ কলিকাতা রিপন কলেজ হইতে বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া গত দ্বাদশবৎসর কাল একাদিক্রমে লোহাগড়া উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের সহকারী হেডমাষ্টারের পদে শিক্ষকতা করিয়া আসিতেছেন। মধ্যম প্রমথ ১৯২২ খৃঃ প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বেঙ্গল টিম্বার ট্রেডিং কোম্পানীতে চাকুরী করিতেছেন। তৃতীয় সুধীরকুমার ১৯২৯ খৃঃ প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বর্ত্তমানে কলিকাতা টেলিগ্রাফিক কলেজ হইতে শিক্ষা-সমাপ্ত করিয়া চাকুরীর চেষ্টা করিতেছেন। সর্ব্বকনিষ্ঠ অজিতকুমার প্রথম শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিতেছেন।

বিষ্ণুচরণ দত্তের অধস্তন ৬ষ্ঠ পুরুষ কেশবলাল পৈত্রিক বিষয় সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন। নাবালক পুত্রদ্বয় রাখিয়া অকালে উদ্বন্ধনে তাঁহার মৃত্যু সংঘটিত হয়।

কমললোচন দত্তের ৩য় পুত্র ঘনশ্যামের বংশতালিকা।



* এই বংশ বর্ত্তমানে গঙ্গারামপুরে বাস করিতেছেন। বংশপরিচয় ও তাহাদের বর্ত্তমান বাসস্থান "গঙ্গারামপুর" বিষয় বৈতরণীর পাণ্ডার নিকট হইতে আমরা অবগত আছি। রামকান্তের স্ত্রী মন্দোদরী বৈতরণী গিয়াছিলেন।

দত্ত-মজুমদার বংশীয় নিম্নলিখিত বংশগুলির কোন উত্তরাধিকারী না থাকায় তাহাদের বংশ লোপ হইয়াগিয়াছে। সরকার পাড়ায় ভৌমিক বংশ ও ব্রজেন্দ্রগোপাল সরকারের মাতামহ বংশ (গঙ্গারাম সরকারের বংশ); তহবিলদার বাটীর সংস্পৃষ্ট দত্ত বংশ ও মজুমদার পাড়ায় (হারাণচন্দ্র দত্তের বংশ)।

(দাস বংশের ইতিবৃত্ত হইতে সংগৃহীত)

রায়-সরকার (দাস বংশ)।

বঙ্গাব্দ দশম শতাব্দীর শেষভাগে লোহাগড়া দত্ত-মজুমদার বংশের প্রতিষ্ঠাতা কমললোচন দত্তের কনিষ্ঠ পুত্র ঘনশ্যাম করফা নিবাসী সর্ব্বেশ্বর দাসের সহিত তাঁহার কন্যা ঈশ্বরীর বিবাহ দেন। সর্ব্বেশ্বরের পূর্ব্বপুরুষ কোথা হইতে আসিয়া যে করফায় বাস করেন তাহা আমরা অবগত হইতে পারি নাই। ঘনশ্যামই লোহাগড়া গ্রামে জামাতার বাটী নির্ম্মাণ করিয়া দিয়া তাহাকে স্বগ্রামে আনয়ন করেন। বর্ত্তমান রায় বাটীর বহির্ব্বাটীর পূর্ব্বাংশ যাহা বর্ত্তমানে পচা পুষ্করিণীতে পরিণত হইয়াছে, যেখানে

রায়, সরকার, ভৌমিক ও মজুমদার বংশের কুলচীনামা।

সর্ব্বেশ্বর দাস
|
রূপরাম দাস চৌধুরী

- (রায় ও মজুমদার) ১। রাজীবলোচন মজুমদার
  - হরেকৃষ্ণ
  - কৃষ্ণশরণ
    - সনাতন মজুমদার (৩নং মজুমদার বংশ)
  - ১। বিদ্যাধর রায় (রায় বংশ)
  - ২। দুর্গারাম মজুমদার (১নং মজুমদার বংশ)
  - ৩। রামনাথ মজুমদার (২নং মজুমদার বংশ)
  - ৪। চৌতরাম মজুমদার
- (সরকার) ২। রামদাস দাস
  - হরিনাথ সরকার
    - ১। কংসনারায়ণ সরকার (১নং সরকার বংশ)
    - ২। দেবানন্দ সরকার (২নং সরকার বংশ)
    - ৩। রামচাঁদ সরকার (৩নং সরকার বংশ)
    - ৪। রামেশ্বর সরকার
    - ৫। নন্দরাম সরকার
- (ভৌমিক) ৩। নরসিংহ দাস
  - অভিরাম দাস (১নং ভৌমিক বংশ)
- (ভৌমিক) ৪। মহেশচন্দ্র দাস
  - রঘুনাথ দাস (২নং ভৌমিক বংশ)

স্বনামধন্য গিরিধর রায় চতুরাগ্নি যাগ-যজ্ঞ করেন ঐ স্থানে ঘনশ্যাম জামাতার বসতবাটি নির্ম্মাণ করিয়া দেন। সর্ব্বেশ্বর পূর্ব্ব হইতে তাঁহার কতিপয় গ্রামবাসীর সহিত চালনী কারবার করিতেন। দৈবানুগ্রহে যে বৎসর তিনি শ্বশুরালয়ে বাস করিতে মনস্থ করেন সেই বৎসর ঐ কারবারে তাহার যথেষ্ট ধনাগম হয়। যথেষ্ট অর্থলাভ করিয়া সর্ব্বেশ্বর শ্বশুরালয়ে আগমন করেন। এদিকে তাহার পত্নী ঈশ্বরী এক সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর পুত্ররত্ন প্রসব করিয়াছেন দেখিয়া পৃথক গৃহ নির্ম্মাণ পূর্ব্বক বাস করিতে তাঁহার অত্যন্ত ইচ্ছা হয়, তিনি শ্বশুরের সহিত আর এক বাটীতে বাস করিতে রাজী হয়েন না। বোধহয় তখন "ঘরজামাই" আখ্যা বড়ই ঘৃণার্হ ছিল। ঘনশ্যাম জামাতাকে জমি যৌতুক দিয়া গৃহ নির্ম্মাণ পূর্ব্বক স্বগ্রামে বসতি করাইয়া দেন। সর্ব্বেশ্বরের বাটীর আয়তন কিরূপ ছিল এবং বাটিতে কতগুলি ঘর ছিল তাহা আমরা জানিতে পারি নাই। তবে সর্ব্বেশ্বর নিতান্ত নিঃস্ব ছিলেন না, তিনি মধ্যবিত্ত অবস্থার গৃহস্থের ন্যায় লোহাগড়া গ্রামে বাস করিতে আরম্ভ করেন।

রূপরাম দাসচৌধুরী।

সর্ব্বেশ্বরের পুত্র রূপরাম অতিশয় রূপবান ও গুণবান্ ছিলেন। দিদিমা আদরের দৌহিত্রকে "রূপো" বলিয়া ডাকিতেন তদনুসারে প্রাপ্তবয়সে মাতামহ ইহাকে রূপরাম নামে অভিহিত করেন। কমললোচন দত্তের জ্যেষ্ঠ পুত্র পণ্ডিত-শ্রেষ্ঠ বংশীধর মীরবহর যখন লোহাগড়া গ্রামে এক পাঠশালা স্থাপন করিয়া প্রাপ্ত বয়স্কদিগের পার্শী শিক্ষার সৌকর্য্যার্থে একজন মৌলবীকে গ্রামে আশ্রয় দেন, তখন রূপরাম মাতামহালয়ে বাস করিয়া ঐ পাঠশালায় মৌলবীর নিকট পার্শী ভাষা শিক্ষা করেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি বংশীধর মীরবহর পার্শীভাষায় অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন। তিনি রূপরামকে সাতিশয় স্নেহ করিতেন ও সময় সময়—বলিতেন "এই শালা মৌলবী হবে"। রূপরাম মাতামহের 'আদুরে' হইলেও শৈশবকাল হইতে লেখাপড়ার উপর তাহার যথেষ্ট আস্থা ছিল। দুর্ব্বোধ্য পার্শী বয়াদ সমূহ তাহার কণ্ঠস্থ ছিল। তিনি সভায় বসিয়া উপস্থিত মত পার্শী কবিতা রচনা করিয়া সভাস্থ আপামর সাধারণকে মোহিত করিতেন। ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতে তাঁহার বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল।

আমরা যখনকার কথা বলিতেছি তখন বাদশাহ জাহাঙ্গীর দিল্লীর সিংহাসনে সমাসীন। বাঙ্গলার রাজধানী বর্দ্ধমান নগর হইতে সম্রাটের আদেশানুযায়ী বর্ত্তমান ঢাকা তৎকালীন জাহাঙ্গীর নগরে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। এই নূতন রাজধানীর নাম করণ প্রবলপ্রতাপান্বিত দিল্লীর বাদশাহের নামানুসারেই হইয়াছিল।

জনশ্রুতি আছে রূপরামের বয়স যখন বিংশতিবর্ষ তখন তিনি এক মুসলমান ফকিরের সহিত গোপনে গৃহত্যাগ করিয়া বাঙ্গলার রাজধানী জাহাঙ্গীর নগরে গমন করেন। রূপরাম অন্তর্হিত হইলে অনেকে তাহার প্রাণবিয়োগ ঘটিয়াছে এরূপ সন্দেহ করিয়াছিলেন, কিন্তু স্বাধীনচেতা সর্ব্বেশ্বর কিছুতেই পুত্রের আকস্মিক মৃত্যু স্বীকার না করিয়া পুত্রের অনুসন্ধানে গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। গমনকালে বৃদ্ধা শ্বশ্রূ ও প্রৌঢ়া পত্নীকে মধ্যম শ্বশুর নরসিংহ দত্ত ও তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র খ্যাতনামা কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের (বক্সীর) তত্ত্বাবধানে রাখিয়া যান। মাত্র দুই তিন মাস দেশ-বিদেশে পর্য্যটন করিয়া পুত্রের সংবাদসহ বৃদ্ধ সর্ব্বেশ্বর স্বগৃহে প্রত্যাগমন করেন।

এদিকে রূপরাম মুসলমান ফকিরের সহিত বঙ্গের রাজধানী ঢাকা নগরীতে গমন করিয়া উক্ত ফকিরের সাহায্যে তথায় এক চাকুরী সংগ্রহ করেন। পরম্পর শ্রুত হওয়া যায়, ক্রমে স্বীয় বিদ্যাবলে নবাবের কৃপাপথে পতিত হইয়া একাদিক্রমে সাত বৎসর ঢাকানগরীতে বাস করিয়া রূপরাম নবাব সরকার হইতে চারিপরগণার মালেকানা প্রাপ্ত হন। ঢাকা হইতে প্রত্যাগমনকালে পথিমধ্যে দস্যু কর্ত্তৃক তাহার ধন অপহৃত হয়, এমন কি চৌধুরী পদবীর সনন্দখানি পর্য্যন্ত তাহার হস্তচ্যুত হয়। এ গল্পের সত্যাসত্য সম্বন্ধে কোন প্রমাণ না থাকিলেও অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া বলা যাইতে পারে যে রূপরামের গল্প সম্পূর্ণ মিথ্যা নহে। রায় বংশের আদিপুরুষ স্বনামধন্য বিদ্যাধর রায়ের সময়ের যে কুলচীনামা পাওয়া গিয়াছে তাহাতে রূপরাম ও তদীয় পুত্রগণকে "চৌধুরী" উপাধিতে ভূষিত দেখা যায়। যদিও রূপরামের জ্যেষ্ঠ পুত্র কালে "মজুমদার" উপাধি গ্রহণ করিয়া রাজীবলোচন মজুমদার নামে অভিহিত হইয়াছিলেন তথাপি রূপরামের অন্যতম পুত্র তখন পর্য্যন্ত "দাস চৌধুরী" পদবী ধারণ করিয়া আসিতেছিলেন।

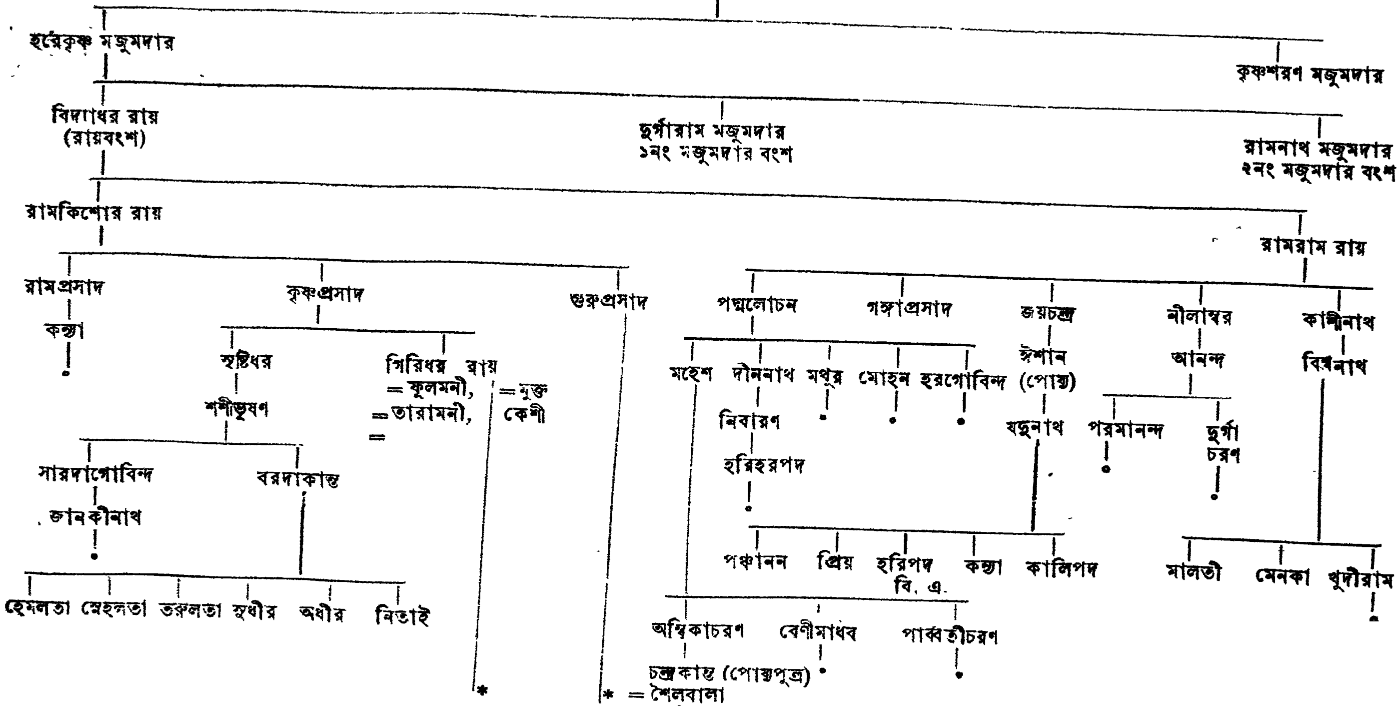
রূপরামের স্বদেশাগমনের কিছুকাল পরে তাঁহার মৃত্যু হয়। এ সময় রূপরাম অবিবাহিত। অবশ্য রূপরাম ইচ্ছা করিলে মজুমদার বংশীয় •স্বনামধন্য কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের (বক্সীর) সাহায্যে বিবাহিত হইয়া সংসারধর্ম্ম করিতে পারিতেন, কিন্তু তাঁহার বিবাহ করিবার আদৌ ইচ্ছা ছিল না। তিনি স্বদেশাগমনের পর হইতে বৃদ্ধা জননী ঈশ্বরীর সহিত কালাতিপাত করিতেছিলেন। পরে মাতার দুঃখ ও কাতরোক্তি শ্রবণ করিয়া রূপরাম বিবাহ করিতে সম্মত হইলেন এবং বহু অর্থ দিয়া বিবাহ করিলেন। রূপরাম অধিক বয়স্ক না হইলে খ্যাতনামা কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের (বক্সীর) আত্মীয় বলিয়া দানে কন্যা পাইতেন সন্দেহ নাই। বিবাহের পূর্ব্বে রূপরাম কিছু গুপ্তধন প্রাপ্ত হন এবং ঐ গুপ্তধন সহায়ে পরিণত বয়সে বিবাহ করিয়া বেশ প্রতিপত্তির সহিত যুবতী ভার্য্যা লইয়া সংসারধর্ম্ম করিতে থাকেন। বিবাহের কিছুকাল পর হইতে রূপরাম দুর্গোৎসব পূজা আরম্ভ করেন। তাহার নিজের কিম্বা তদীয় জ্যেষ্ঠপুত্র কীর্ত্তিমান রাজীব-লোচন মজুমদারের রোপিত বিল্ববৃক্ষ ও 'বোধন তলা' বহুকাল লোকে নির্দ্দেশ করিয়া আসিতেছিল।

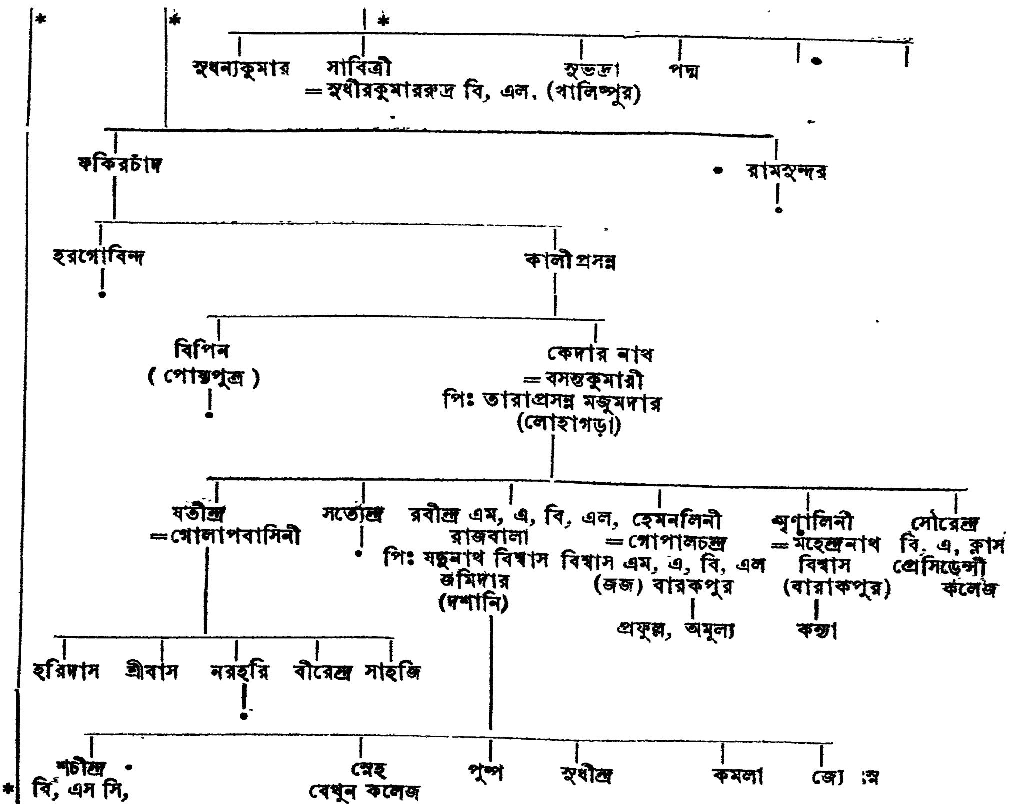
কালক্রমে রূপরামের রাজীবলোচন, রামদাস, নরসিংহ ও মহেশ নামে চারিপুত্র জন্ম গ্রহণ করে। এই চারিপুত্রের দ্বারা চারিটী বংশ সৃষ্ট হইয়া• মজুমদার, সরকার ও দুই ঘর ভৌমিক বংশ নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছে। মজুমদার বংশ কালক্রমে রায় ও অন্য তিন বংশে বিভক্ত হয়, এই তিন শাখা এখনও মজুমদার নামে অভিহিত হইয়া বর্ত্তমান রহিয়াছে। সরকার বংশ কালবশে পশ্চিম ও পূর্ব্ব পাড়ার সরকার এই দুই শাখায় বিভক্ত হইয়াছে। অতএব আমরা দেখিতে পাই যে স্বর্ব্বেশ্বরের সন্তান ১। রায়, ২। তিন শাখায় মজুমদার ৩। দুই শাখায় সরকার ৪। দুই শাখায় ভৌমিক এই মোট আট শাখায় বিভক্ত হইয়া লোহাগড়া গ্রামে বাস করিয়া আসিতেছে।

রাজীবলোচন মজুমদার।

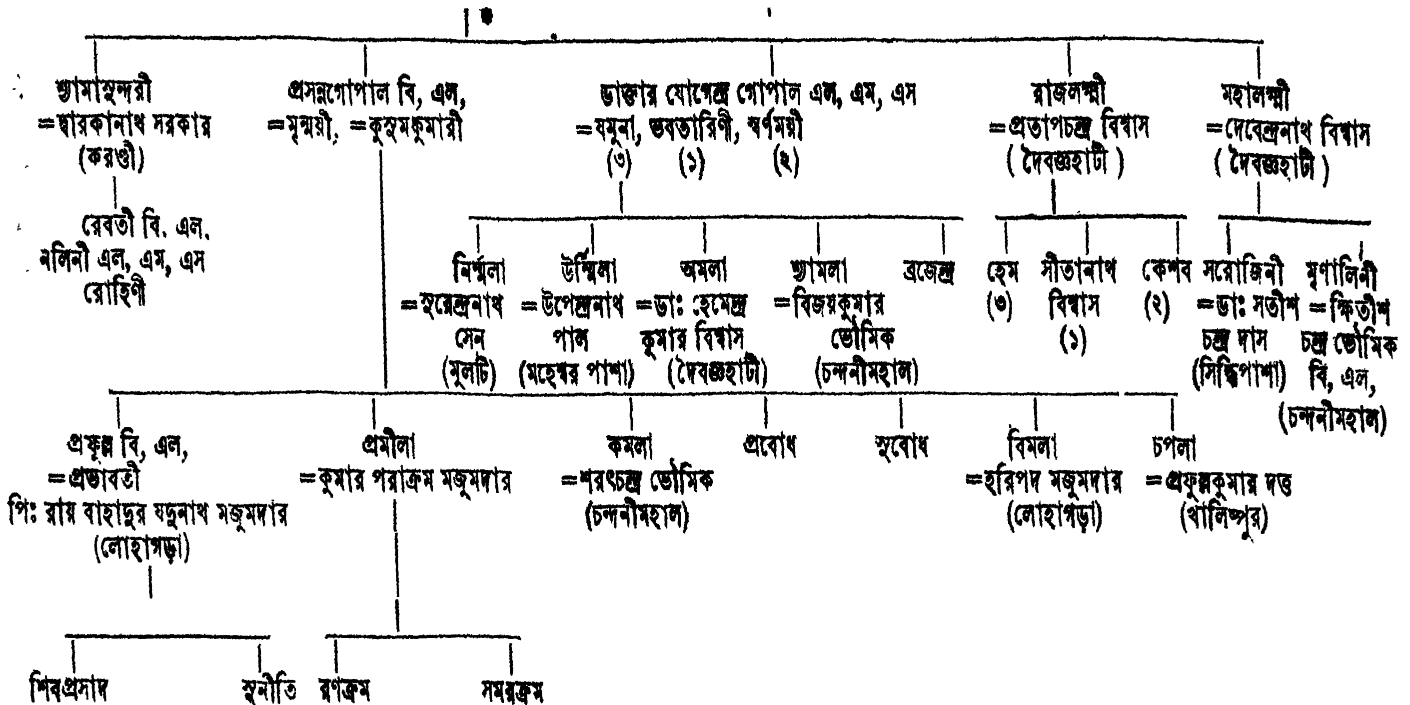
১৬০৮খৃঃ রূপরামের জ্যেষ্ঠপুত্র রাজীবলোচন জন্মগ্রহণ করেন। রূপরামের চারিপুত্র তন্মধ্যে রাজীব লোচন সমধিক কার্য্যক্ষম ও বিদ্বান্ ছিলেন এবং গুরুব্রাহ্মণকে সাতিশয় ভক্তি করিতেন। বোধহয় রূপরামের বৃদ্ধাবস্থায় রাজীব সমস্ত পৈত্রিক সম্পত্তি হস্তগত করেন; অধিকন্তু তিনি

"রায়বংশ"


সর্বেশ্বর দাসের পৌত্র রাজীবলোচন মজুমদার
হরেকৃষ্ণ মজুমদার
কৃষ্ণশরণ মজুমদার
বিদ্যাধর রায় (রায়বংশ)
দুর্গারাম মজুমদার ১নং মজুমদার বংশ
রামনাথ মজুমদার ২নং মজুমদার বংশ
রামকিশোর রায়
রামরাম রায়
রামপ্রসাদ
কৃষ্ণপ্রসাদ
গুরুপ্রসাদ
পদ্মলোচন
গঙ্গাপ্রসাদ
জয়চন্দ্র
নীলাম্বর
কাশীনাথ
কন্যা
সৃষ্টিধর
গিরিধর রায়
=ফুলমনী,
=তারামনী,
=
=মুক্তকেশী
শশীভূষণ
মহেশ
দীননাথ
মথুর
মোহন
হরগোবিন্দ
ঈশান (পোষ্য)
আনন্দ
বিশ্বনাথ
নিবারণ
হরিহরপদ
যদুনাথ
পরমানন্দ
দুর্গাচরণ
সারদাগোবিন্দ
বরদাকান্ত
জানকীনাথ
পঞ্চানন
প্রিয়
হরিপদ বি. এ.
কন্যা
কালিপদ
মালতী
মেনকা
খুদীরাম
হেমলতা
স্নেহলতা
তরুলতা
সুধীর
অধীর
নিতাই
অম্বিকাচরণ
বেণীমাধব
পার্ব্বতীচরণ
চন্দ্রকান্ত (পোষ্যপুত্র)
* = শৈলবালা
*



সুধন্যকুমার
সাবিত্রী
=সুধীরকুমাররুদ্র বি, এল. (খালিস্পুর)
সুভদ্রা
পদ্ম
ফকিরচাঁদ
রামসুন্দর
হরগোবিন্দ
কালীপ্রসন্ন
বিপিন
(পোষ্যপুত্র)
কেদার নাথ
=বসন্তকুমারী
পিঃ তারাপ্রসন্ন মজুমদার
(লোহাগড়া)
যতীন্দ্র
=গোলাপবাসিনী
সত্যেন্দ্র
রবীন্দ্র এম, এ, বি, এল,
রাজবালা
পিঃ যদুনাথ বিশ্বাস
জমিদার
(দশানি)
হেমনলিনী
=গোপালচন্দ্র
বিশ্বাস এম, এ, বি, এল
(জজ) বারকপুর
প্রফুল্ল, অমূল্য
মৃণালিনী
=মহেন্দ্রনাথ
বিশ্বাস
(বারাকপুর)
কন্যা
সৌরেন্দ্র
বি, এ, ক্লাস
প্রেসিডেন্সী
কলেজ
হরিদাস
শ্রীবাস
নরহরি
বীরেন্দ্র
সাহজি
শচীন্দ্র
বি, এস সি,
স্নেহ
বেথুন কলেজ
পুষ্প
সুধীন্দ্র
কমলা
জ্যো :স্ন


শ্যামাসুন্দরী
=দ্বারকানাথ সরকার
(করগুী)
রেবতী বি. এল.
নলিনী এল, এম, এস
রোহিণী
প্রসন্নগোপাল বি, এল,
=মৃন্ময়ী, =কুসুমকুমারী
ডাক্তার যোগেন্দ্র গোপাল এল, এম, এস
=যমুনা, ভবতারিণী, স্বর্ণময়ী
(৩) (১) (২)
রাজলক্ষ্মী
=প্রতাপচন্দ্র বিশ্বাস
(দৈবজ্ঞহাটী)
মহালক্ষ্মী
=দেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস
(দৈবজ্ঞহাটী)
নির্ম্মলা
=সুরেন্দ্রনাথ
সেন
(মুলাটি)
উর্ম্মিলা
=উপেন্দ্রনাথ
পাল
(মহেশ্বর পাশা)
অমলা
=ডাঃ হেমেন্দ্র
কুমার বিশ্বাস
(দৈবজ্ঞহাটী)
শ্যামলা
=বিজয়কুমার
ভৌমিক
(চন্দনীমহাল)
ব্রজেন্দ্র
হেম
(৩)
সীতানাথ
বিশ্বাস
(১)
কেশব
(২)
সরোজিনী
=ডাঃ সতীশ
চন্দ্র দাস
(সিদ্ধিপাশা)
মৃণালিনী
=ক্ষিতীশ
চন্দ্র ভৌমিক
বি, এল,
(চন্দনীমহাল)
প্রফুল্ল বি, এল,
=প্রভাবতী
পিঃ রায় বাহাদুর যদুনাথ মজুমদার
(লোহাগড়া)
প্রমীলা
=কুমার পরাক্রম মজুমদার
কমলা
=শরৎচন্দ্র ভৌমিক
(চন্দনীমহাল)
প্রবোধ
সুবোধ
বিমলা
=হরিপদ মজুমদার
(লোহাগড়া)
চপলা
=প্রফুল্লকুমার দত্ত
(খালিশপুর)
শিবপ্রসাদ
সুনীতি
রণক্রম
সমরক্রম

বিদ্বান ও বুদ্ধিমান ছিলেন, তাই দাসবংশে তাহারই সমধিক গৌরব ও প্রতিপত্তি দৃষ্ট হয়। তিনি গন্ধবাড়িয়া কিসমতির অন্তর্গত ৩৪৭ নং তৌজির পানাইল গ্রামের তালুকদারী সত্ব ক্রয় করেন। লোহাগড়া গ্রামের ।৶৹ সাত আনা ও ৷৷৴৹ নয় আনা মোট ষোল আনা তাহারই অর্জ্জিত তালুক-ভুক্ত। তদীয় পৌত্র স্বনামধন্য বিদ্যাধর রায় প্রবল পরাক্রান্ত হওয়ায় কালক্রমে ঐ সমস্ত পৈত্রিক তালুক তাহার সন্তান সন্ততিগণের হস্তগত হয়। হরেকৃষ্ণ মজুমদারের অন্য দুই পুত্র দুর্গারাম ও রামনাথ এবং ভ্রাতা কৃষ্ণশরণ উক্ত তালুকের অংশ হইতে বঞ্চিত হয়েন।

বর্ত্তমান ভৌমিকবাড়ীর দক্ষিণ-পূর্ব্বকোণে যে বাগিচা এবং উহার পূর্ব্ব-পার্শ্ব দিয়া রায়বাড়ী হইতে যে রাস্তা দক্ষিণমুখে বাজারের দিকে গিয়া ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তার সহিত মিশিয়াছে উহাই তৎকালে রাজীবলোচনের বসতবাড়ী ছিল। রাজীব নিজ বাসগৃহের জন্য কোনরূপ ইমারতাদি নির্ম্মাণ করেন নাই কিন্তু 'শিবমন্দির' ও পূজার অট্টালিকা এবং দোলমঞ্চে এক মন্দির প্রস্তুত করেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত শিবমন্দির বহুকাল পর্য্যন্ত উপরোক্ত বাগিচার ভিতর বিদ্যমান ছিল। গত ১৩০৪ সালের ৩০ জ্যৈষ্ঠ শনিবারের প্রবল ভূমিকম্পে ঐ মন্দির ভূমিসাৎ হইয়া রাজীবলোচনের কীর্ত্তি ঐ মন্দির আজ লোপ পাইয়াছে। তদবধি ঐ শিব জগন্নাথদেবের অট্টালিকায় তাঁহার সহিত একত্রে স্থাপিত হইয়া গত দুইশত বৎসরেরও অধিক নিত্যপূজা পাইয়া আসিতেছেন। রাজীব পৈত্রিক দুর্গোৎসবাদি পূজা প্রতিপালন করিয়া গিয়াছেন। ধর্ম্মে ও দানে রাজীবের প্রগাঢ় অনুরক্তি ছিল তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। শিবমন্দির ও পূজার দালান প্রস্তুত করিয়া শ্রীশ্রীশিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিতে তাহার যথেষ্ট অর্থব্যয় হইয়াছিল। ব্রাহ্মণপণ্ডিত নিমন্ত্রণ, দরিদ্রদিগকে দান এবং স্বজাতি ও সামাজিকগণকে পরিতোষমত ভোজন ইত্যাদিতে তিনি তৎকালে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। তাঁহার সময় নশীরাম চক্রবর্ত্তী নামক জনৈক রাঢ়ী শ্রেণীর ব্রাহ্মণ শিব ও জগন্নাথ দেবের পূজক ছিলেন। ৬৭ বৎসর বয়সে রাজীবলোচন স্বর্গারোহণ করেন।

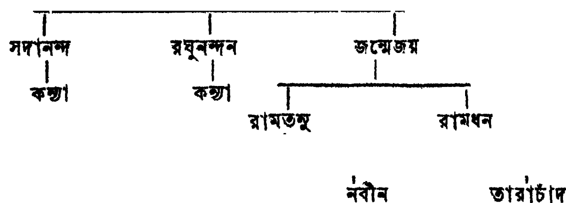
হরেকৃষ্ণ মজুমদার।

রাজীবের পুত্র হরেকৃষ্ণ। হরেকৃষ্ণের চারিপুত্র—বিদ্যাধর, দুর্গারাম,

রামনাথ ও জিতরাম। জিতরাম শৈশবেই পরলোক গমন করেন। দুর্গারাম ও রামনাথের বংশ অদ্যাপি মজুমদার উপাধিতে বর্ত্তমান রহিয়াছে। বিদ্যাধরের বংশ রায় উপাধি গ্রহণ করিয়াছেন, পরে এই বংশের বর্ণনা করিব। বিদ্যাধর রায়ের মধ্যম ভ্রাতা দুর্গারাম জ্যেষ্ঠের ন্যায় গুণী না হইলেও নিতান্ত মূর্খ ছিলেন না। পার্শী ও সংস্কৃত ভাষায় তাহার বিশেষ জ্ঞান ছিল। দুর্গারাম জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নামেই পরিচিত হইয়া পৈত্রিক বিষয়-সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন। যখন বিদ্যাধরের পুত্রদ্বয় এবং তাঁহার তিনপুত্র বয়ঃপ্রাপ্ত হন তখন তিনি বিদ্যাধরের সহিত বিভিন্ন হইয়া পৃথক বাটীতে বাস করিতে বাধ্য হন। রাজীবের সময় রূপরামের চারিপুত্র চারিখানি পৃথক বাটী নির্ম্মাণ করিয়া তথায় বাস করিতেন। রাজীব লোচনের মৃত্যুর বহুপরে তদীয় সুযোগ্য পৌত্র স্বনামধন্য বিদ্যাধর রাজীবের প্রতিষ্ঠিত "ঠাকুর বাড়ী" বর্ত্তমান জগন্নাথ দেবের অট্টালিকার উত্তরে স্বীয় বাসস্থান নির্ম্মাণ করেন। কৃষ্ণশরণ ও বিদ্যাধরের অন্যান্য ভ্রাতৃগণ রাজীবের পুরাতন বাটীতে বাস করিতে থাকেন। পরে কালক্রমে কৃষ্ণশরণের সন্তানগণ জগন্নাথদেবের মন্দির এবং বিদ্যাধরের বসতবাটীর পূর্ব্বাংশে আসিয়া বসতবাটী নির্ম্মাণ করিয়া তথায় বাস করিতে থাকেন।

সর্ব্বেশ্বর দাসের পৌত্র রাজীবলোচন মজুমদারের পুত্র হরেকৃষ্ণ মজুমদারের মধ্যম পুত্র দুর্গারাম মজুমদারের বংশ তালিকা।

দুর্গারাম মজুমদার (১নং মজুমদার বংশ)



মহেন্দ্রগোপাল =সুবাসিনী

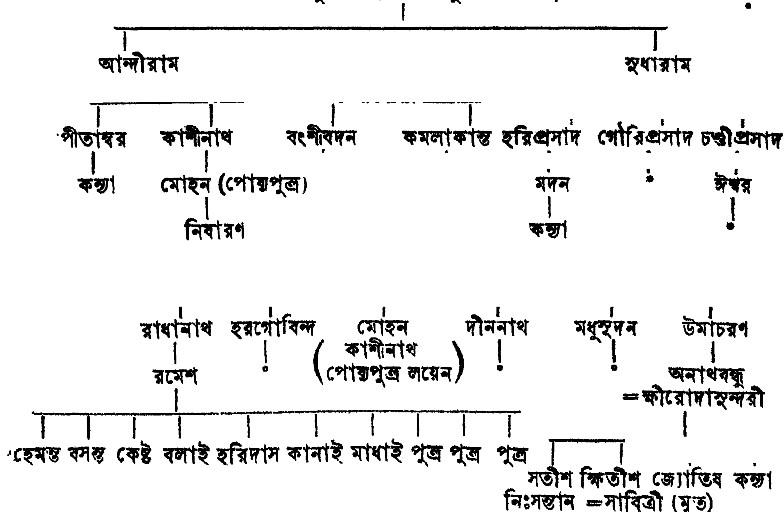
সুরেন্দ্রগোপাল =চারুবালা

কমলেশ অমরেশ কন্যা কন্যা কন্যা

দুর্গারামের তিন পুত্র সদানন্দ, রঘুনন্দ ও জন্মেঞ্জয়। জ্যেষ্ঠ ও মধ্যম

অপুত্রক। জ্যেষ্ঠ সমধিক ক্ষমতাবান ছিলেন। জন্মেজয় কবিরাজী ব্যবসায় করিতেন কিন্তু উক্ত ব্যবসায়ে বিশেষ সঙ্গতি সম্পন্ন হইতে পারেন নাই। জন্মেজয়ের দুই পুত্র রামতনু ও রামধন। রামতনুর পুত্র সন্তান ছিল না, তিনি একজন তীক্ষ্ণবুদ্ধি সম্পন্ন মামলাবাজ লোক ছিলেন। পদ্মলোচন ও গুরুপ্রসাদ রায় তাহার নামে বাকী খাজনার দাবীতে নালিশ করিয়া এক মোকদ্দমার সৃষ্টি করেন। এই মোকদ্দমা ১২২৭ সালে আরম্ভ হইয়া ১২৪৯ সালে শেষ হয়। এই ঘোরতর মামলার ফলে রামধনের পুত্রদ্বয় নবীন ও তারাচাঁদের স্কন্ধে সহস্র মুদ্রার ডিক্রী পতিত হইয়া অতি দুঃখে কালাতিপাত করেন। পরে তারাচাঁদ নিজ বুদ্ধি কৌশলে অবস্থার বিশেষ উন্নতি করিয়া গিয়াছেন। তিনি একজন তীক্ষ্ণবুদ্ধি সম্পন্ন লোক ছিলেন। তাঁহার দুই পুত্র। জ্যেষ্ঠ মহেন্দ্রগোপাল বাগেরহাট কোর্টে আমলার কাজ করিতেন। তিনি কমলেশ ও নাবালক অমরেশ পুত্রদ্বয় রাখিয়া ইহধাম পরিত্যাগ করেন। কমলেশ কলিকাতা আশুতোষ কলেজে বি, এ, অধ্যয়ন করিতেছেন। কনিষ্ঠ সুরেন্দ্রগোপাল স্থানীয় বাজারে ব্যবসায় করিতেছেন। ইনি একজন বৈষয়িক তীক্ষ্ণবুদ্ধি-সম্পন্ন ব্যক্তি।

হরেকৃষ্ণ মজুমদারের কনিষ্ঠ পুত্র রামনাথ মজুমদারের বংশ তালিকা।



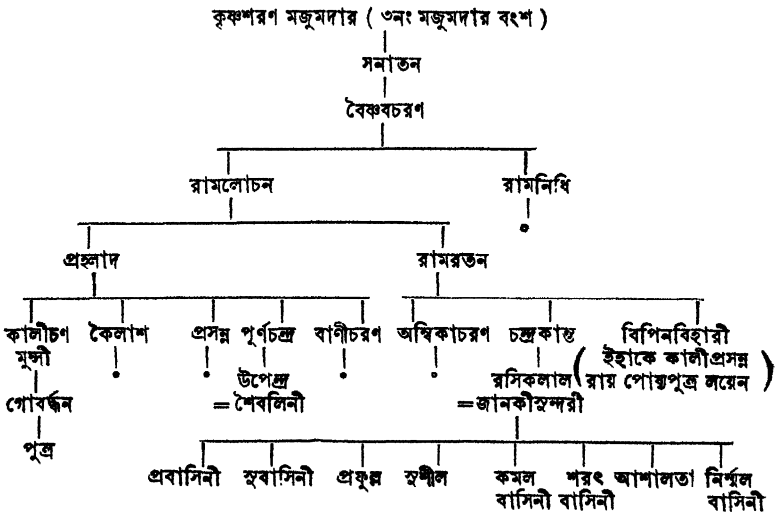
কাশীনাথ মজুমদার।

হরেকৃষ্ণের কনিষ্ঠ পুত্র রামনাথ বিশেষ ক্ষমতাবান লোক ছিলেন। তাহার প্রপৌত্র কাশীনাথের পোষ্যপুত্র মোহন পুরাতন বাটী পরিত্যাগ করিয়া অনাথ-বন্ধু মজুমদারের বর্ত্তমান যে বাটী আছে, ঐ বাটীতে এক অট্টালিকা প্রস্তুত করিয়া তথায় বাস করেন। ১২৫৯ সালে দুরন্ত কলেরা কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া তিনি স্বপরিবারে মৃত্যুমুখে পতিত হন। রাধানাথের পুত্র ও উমাচরণ পুরাতন বাটী পরিত্যাগ কবিয়া ঐ বাটীতে উঠিয়া আসেন। রামনাথের পুত্র আন্দীরাম ও সুধারাম। আন্দীরামের জ্যেষ্ঠপুত্র পীতাম্বর গুনশালী ছিলেন। বিদ্যাধর রায়ের পৌত্র গুরুপ্রসাদের সময় তিনি রায়বাড়ীর দেওয়ান ছিলেন, ঐ কার্য্যে তাহার যথেষ্ট প্রতিপত্তি ও অর্থাগম হইয়াছিল। মধ্যম কাশীনাথ ধনবান ও ধার্ম্মিক ছিলেন; কথিত আছে কাশীনাথ গচ্ছিত ধনে ধনবান। ইহার ন্যায় ধর্ম্মপরায়ণ ও দানশীল তৎকালে উক্তবংশে অতি অল্পই দৃষ্ট হয়। কাশীনাথের পুত্রসন্তান ছিল না, তিনি বংশীবদনের তৃতীয় পুত্র মোহনকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেন। মোহনের পুত্র নিবারণ অতি শৈশবেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। বংশীবদনের পুত্রদিগের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ ব্যতীত সকলেই নিঃসন্তান। জ্যেষ্ঠ রাধানাথ বিদ্বান্ ও বুদ্ধিমান লোক ছিলেন। প্রথমে নদীয়া জেলার অন্তঃপাতী শালঘরমধুয়ার নীলকুঠীর দেওয়ান ছিলেন পরে ক্রমান্বয়ে এনন কোহেন ডনলপ সাহেবের তেলজুড়ী, উলা ও মাঁদার তলার কুঠীর দেওয়ান নিযুক্ত হন। তিনি চাকুরী করিয়া যথেষ্ট অর্থোপার্জ্জন করেন। রাধানাথ ক্রিয়াবান ও ধার্ম্মিক ছিলেন। মধ্যম হরগোবিন্দ যশোহরে মোক্তারী করিতেন। কালে সৈদপুর বাবুদিগের বাটীর সদর দেওয়ান নিযুক্ত হন। ইনিও জ্যেষ্ঠের ন্যায় বিদ্বান্ ও বুদ্ধিমান ছিলেন। কনিষ্ঠ উমাচরণ ষ্ট্যাম্প বিক্রয় করিতেন। পরে কালেক্টরীতে আমিনীপদ প্রাপ্ত হইয়া যথেষ্ট অর্থোপার্জ্জন করেন কিন্তু চরিত্রদোষে অনেক অর্থ অপব্যয় করিয়া গিয়াছেন।

রাধানাথের পুত্র রমেশ দুর্ভাগ্যবশত পিতার ধন সবই খোয়াইয়া বসিয়া আছেন। জ্যেষ্ঠপুত্র হেমন্তের সহিত গোলযোগ হওয়ায় তাহার সহিত পৃথক হইয়াছেন। বংশীবদনের কনিষ্ঠ পুত্র উমাচরণের পুত্র অনাথবন্ধু ক্যাম্বেল হইতে

ডাক্তারী পাশ করিয়া উক্ত ব্যবসায় করিয়া আসিতেছেন। অনাথের জ্যেষ্ঠপুত্র সতীশের পঁচিশ বৎসর বয়সে অকাল মৃত্যু হয়। কনিষ্ঠ শৈশবেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। মধ্যম পুত্র ক্ষীতিশ জীবিত আছেন।

সর্ব্বেশ্বর দাসের পৌত্র রাজীবলোচন মজুমদারের কনিষ্ঠ পুত্র কৃষ্ণশরণের বংশ তালিকা।



কৃষ্ণশরণ মজুমদার।

কৃষ্ণশরণের পৌত্র বৈষ্ণবচরণ বিদ্বান্ ও ক্ষমতাশালী ব্যক্তি ছিলেন। কৃষ্ণশরণের অধস্তন ৬ষ্ঠ পুরুষ চন্দ্রকান্ত যশোহরে আমিনীর পদ প্রাপ্ত হইয়া চাকুরী করেন। ইঁহার পুত্র রসিকলাল এফ, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া প্লীডার সিপ পাশ করিয়া নড়াইলে ওকালতী করিতেছেন। প্রহ্লাদের পুত্র কালীচরণ গ্রামে "কালী মুন্সী" নামে খ্যাত ছিলেন। এই মুন্সী খেতাব লেখা-পড়ায় অমনোযোগিতার জন্য পাঠশালার গুরুমহাশয় কর্ত্তৃক শ্লেষ করিয়া প্রদত্ত হয়। কালীচরণের পুত্র গোবর্দ্ধন অল্প বয়সে প্রাণত্যাগ করেন। কালীচরণের ভ্রাতা পূর্ণচন্দ্রের পুত্র উপেন্দ্রগোপাল কম্পাউণ্ডারী পাশ করিয়া বাগেরহাট দাতব্য চিকিৎসালয়ে কম্পাউণ্ডারের চাকুরী করিতেছেন।

রায় বংশ।

স্বনামধন্য বিদ্যাধর রায়।

রাজীবলোচন মজুমদারের পৌত্র প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাধর রায় ১১২১ সালের বৈশাখ মাসে জন্মগ্রহণ করেন। বিদ্যাধর বাল্যকালে বাঙ্গলা, পার্শী ও সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিয়া বিদ্বান ও বুদ্ধিমান ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত ছিলেন। তাঁহার ন্যায় সুপুরুষ তৎকালে লোহাগড়া গ্রামে দৃষ্ট হইত না। তাঁহার উন্নত ললাট, সুদীর্ঘ নাসিকা এবং পূর্ণায়তন দেখিয়া পাত্র-মিত্র সকলেই ভীত ও আশ্চর্য্যান্বিত হইত। কথিত আছে তাঁহার মাতা তাহার সঙ্গে কথা বলিবার সময় ঘোমটা দিয়া সাক্ষাৎ করিতেন। বিদ্যাধর আত্মীয়স্বজনও সাধারণের নিকট এতদূর উন্নত ও শ্রেষ্ঠ ছিলেন যে সকলেই ইঁহাকে সম্মান ও বিস্ময়ের চক্ষে অবলোকন করিতেন। শৈশবকাল হইতেই বিদ্যাধর ভীষণ তেজস্বী ছিলেন। তিনি প্রথমে নাটোর রাজসরকারে প্রবেশ করিয়া অল্পকাল মধ্যে দেওয়ানের পদে নিযুক্ত হন এবং উক্ত সরকারে বিশেষ সুযশ ও সম্মানের সহিত দেওয়ানী কার্য্য পরিচালনা করিয়াছিলেন। পরে প্রৌঢ়াবস্থায় আমরা বিদ্যাধরকে বর্দ্ধমান রাজসরকারে দেওয়ানের পদে প্রতিষ্ঠিত দেখিতে পাই। বর্দ্ধমানে তিনি সম্পত্তি বন্দোবস্তের কর্ত্তা ছিলেন, বোধহয় Financial বা Legislative Minister ছিলেন। তাঁহার কৃত "বিদ্যাধরী বন্দোবস্ত" এখনও বর্দ্ধমানে অনেক স্থানে প্রচলিত আছে, কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় এরূপ মহাপুরুষের স্মৃতি মাত্র জনশ্রুতিতে বিদ্যমান আছে। তাঁহার বংশে এযাবত অনেক সক্ষম ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন কিন্তু কেহই তাঁহাদের প্রাতঃস্মরণীয় পূজ্যপাদ পূর্ব্বপুরুষের স্মৃতিরক্ষার চেষ্টা করেন নাই। বর্দ্ধমান রাজসরকারে বিশেষ দক্ষতার সহিত কার্য্য করায় মহারাজ সন্তুষ্ট হইয়া বিদ্যাধরকে পারিতোষিক দিতে ইচ্ছা করেন। বিদ্যাধর মহারাজ কর্ত্তৃক আনীত চারিটী সুন্দর জগন্নাথ মূর্ত্তির মধ্যে যেটী তাঁহার মনোমত সেইটী লইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। তখন মহারাজ সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে ঐ সুন্দর মূর্ত্তি প্রদান করেন। বিদ্যাধর ঐ মূর্ত্তি পাইয়া মহানন্দে স্বদেশে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক স্বীয় আলয়ে উহা প্রতিষ্ঠা করেন। বিদ্যাধরের প্রতিষ্ঠিত ৺জগন্নাথদেবের সহিত তাঁহার কথা-বার্ত্তা হইত এই প্রবাদ অদ্যাবধি রায় বংশে প্রচলিত আছে। তদবধি

৺শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবে যে 'জাগ্রত' ইহা গ্রামস্থ সকলেই স্বীকার করিয়া আসিতেছেন। বিদ্যাধর জগন্নাথদেবের প্রতি সম্মানের পরাকাষ্ঠাস্বরূপ এক উৎকৃষ্ট রথ প্রস্তুত করেন। এই রথ টানিয়া প্রায় অর্দ্ধ মাইল পথ পূর্ব্বাভিমুখে গুণ্ডিচাবাটি নামক স্থানে লইয়া যাওয়া হইত। রথসহ জগন্নাথদেব ঐ গুণ্ডিচাবাটীতে পুনর্যাত্রা পর্য্যন্ত অষ্ট দিবস বাস করিতেন। তথায় ঐ কয়েকদিন তাঁহার ষোড়শোপচারে পূজা ও নৃত্যগীতাদি হইত। রথ টানিয়া লইয়া যাইবার জন্য গ্রামের পশ্চিম প্রান্ত হইতে পূর্ব্ব প্রান্ত পর্য্যন্ত এক উৎকৃষ্ট রাস্তা প্রস্তুত করা হয়। এতদ্দেশের মধ্যে বিদ্যাধর রায় গমনাগমনের সুবিধার জন্য প্রথম রাস্তা নির্ম্মাণ করেন।

বিদ্যাধরের সময় হইতে মৃতা নবগঙ্গা নদীতে রায় বাড়ীর ঘাট "রাজঘাট" নামে প্রসিদ্ধ। রায় অর্থে 'রাজা' বুঝায় অন্ততঃ রাজার ন্যায় সম্মানিত ব্যক্তি। 'রাজঘাট' অর্থে রাজবাড়ীর বা রাজার ন্যায় সম্মানিত ব্যক্তির বাড়ীর ঘাট।

বিদ্যাধর লোহাগড়া নিবাসী প্রসিদ্ধ দত্ত-মজুমদার বংশের এক সুন্দরী রমণীকে বিবাহ করেন। গুরু ও ব্রাহ্মণে তাঁহার সাতিশয় ভক্তি ছিল। তিনি চারাবাড়ী নিবাসী গৌরমোহন চক্রবর্ত্তী ও শম্ভুচন্দ্র চক্রবর্ত্তীকে ব্রহ্মোত্তর প্রদানপূর্ব্বক স্থাপন করেন।

বিদ্যাধর দুর্গোৎসবের জন্য এক ইষ্টক নির্ম্মিত চণ্ডীমণ্ডপ প্রস্তুত করেন। তিনি বর্দ্ধমান রাজসরকারে মন্ত্রীত্ব করিয়া "রায়" উপাধি প্রাপ্ত হন, তদবধি তদীয় বংশধরগণ উক্ত উপাধিতে ভূষিত হইয়া আসিতেছেন। বিষয়সম্পত্তিতে বিদ্যাধরের বিশেষ স্পৃহা ছিল না; তিনি হামারোল নামে একখানি মাত্র বিষয় করিয়া যান।

রামপ্রসাদ রায়।

বিদ্যাধরের দুই পুত্র রামকিশোর ও রামরাম রায়। রামকিশোরের তিন পুত্র—রামপ্রসাদ, কৃষ্ণপ্রসাদ ও গুরুপ্রসাদ। রামকিশোরের পুত্রগণের মধ্যে জ্যেষ্ঠ রামপ্রসাদ ও মধ্যম কৃষ্ণপ্রসাদ গুণবান ও ক্ষমতাশালী ছিলেন। কনিষ্ঠ গুরুপ্রসাদ দাদার ভাই বলিয়া সম্মানিত হইতেন। রামপ্রসাদ তদীয় পিতামহ বিদ্যাধরের ন্যায় তেজস্বী, দুর্ব্বৃত্তগণের শাসনকারী ও বলবান পুরুষ ছিলেন। কথিত আছে এক দিবস অপরাহ্ণে তিনি

একটী অশ্বত্থ বৃক্ষের শাখা অবনত করিয়া পার্শ্বস্থ একটী গাভীকে উহার পল্লব খাওয়াইতেছিলেন, এমন সময়ে একজন কুস্তিগীর পালোয়ন রামপ্রসাদের সহিত মল্লযুদ্ধ করিবার জন্য ঐ পথে তাহার বাটী যাইতেছিল। পথে রামপ্রসাদকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল "মশায়, রামপ্রসাদ রায়ের বাড়ী কোন পথে?" তিনি তখন কারণ জিজ্ঞাসা করিলে কুস্তিগীর উত্তর করিল "শুনেছি তিনি নাকি ভারি পালোয়ান, তাহার সহিত আমার লড়িবার ইচ্ছা আছে।" রামপ্রসাদ তাহার স্পর্দ্ধার কথা শুনিয়া কৌশলে তাহাকে জব্দ করিবার অভিপ্রায়ে বলিলেন, আচ্ছা তুমি এই ডালটী ধরিয়া আমার গাভীটিকে পাতা খাওয়াও আমি রামপ্রসাদ রায়কে ডাকিয়া আনিতেছি, তিনি এই নিকটে আছেন।" এই বলিয়া উক্ত শাখাটী মল্লের হস্তে প্রদান করিলে মুহূর্ত্ত মধ্যে মল্লকে লইয়া শাখা উর্দ্ধে উত্থিত হইল। তখন রামপ্রসাদ ক্রোধে বলিয়া উঠিলেন "ব্যাটা রামপ্রসাদের সঙ্গে লড়াই করে, গাছের ডাল টানিয়া রাখিবার শক্তি নাই তবে রামপ্রসাদের সঙ্গে লড়িবি কেমনে? তখন মল্ল শাখা ছাড়িয়া দিয়া ভূমিতে পতিত হইয়া লজ্জিত ও বিমর্ষভাবে সে স্থান হইতে প্রস্থান করিল। মহম্মদপুর যখন এতদ্দেশের সদর বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হইত তখন রামপ্রসাদ নাটোর রাজসরকারে নায়েব স্বরূপ ঐ স্থানে বাস করিতেন; স্বদেশে ও মহম্মদপুরে তাঁহার সম্যক প্রতিপত্তি ও সম্মান ছিল। ইনি বানকাণা নদীর উপর বর্ত্তমান চরমল্লিকপুরে 'বানকাণার' কুঠী নামে এক নীলের কুঠী নির্ম্মাণ করেন। এই রামপ্রসাদ রায়ই বর্ত্তমান লোহাগড়া হাটের প্রতিষ্ঠাতা। স্থানীয় "ন'লো"দিগের সাহায্যে রামপ্রসাদ উক্ত হাটের প্রথম ভিত্তি স্থাপন করেন। লক্ষ্মীপাশার হাট এই হাটের বহুপরে স্থাপিত।

রামপ্রসাদের মধ্যম ভ্রাতা কৃষ্ণপ্রসাদ মহম্মদপুরে গভর্ণমেণ্টের মুন্সেফ্ ছিলেন। ১২২০ সালে ৭০ বৎসর বয়সে কৃষ্ণপ্রসাদের মৃত্যু হয়। রায় বাড়ীর অন্দরে যে অট্টালিকা আছে তাহা উভয় ভ্রাতার উপার্জ্জিত অর্থে গুরুপ্রসাদের তত্ত্বাবধানে বিনির্ম্মিত হয়। রামপ্রসাদ অপুত্রক পরলোক গমন করায় কৃষ্ণপ্রসাদ ও গুরুপ্রসাদের বংশধরগণ উক্ত ইমারতে তুল্যাংশে সত্ত্ববান ও দখিলকার আছেন। কৃষ্ণপ্রসাদের চারি পুত্র সৃষ্টিধর, হারাণ,

গৌর ও গিরিধর। হারাণ ও গৌরের বাল্যকালে মৃত্যু হয়। সৃষ্টিধর ও গিরিধরের বংশীয়গণ অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছেন—ইহারা উভয়েই কীর্ত্তিমান পুরুষ ছিলেন। সৃষ্টিধরের পুত্র শশিভূষণ। শশিভূষণের দুই স্ত্রী; প্রথমার গর্ভে সারদাগোবিন্দ এবং দ্বিতীয়ার গর্ভে বরদাকান্ত জন্মগ্রহণ করেন। দ্বিতীয়া পত্নী গত ১৩৩১।২০শে ভাদ্র তারিখে পরলোক গমন করেন। সারদাগোবিন্দের একমাত্র পুত্র জানকীনাথ এক পত্নী ও পিতামাতা বর্ত্তমানে মৃত্যুমুখে পতিত হন। গত ১৩৩৪।২২ আশ্বিন সারদাগোবিন্দের মৃত্যু হয়। বরদাকান্ত বর্ত্তমানে জীবিত আছেন। তিনি স্থানীয় বাজারে ঔষধ বিক্রয় করেন। বরদাকান্তের পুত্রেরা নাবালক।

স্বনামধন্য দানবীর গিরিধর রায়।

"সেই ধন্য নরকুলে, লোকে যারে নাহি ভুলে,
মনের মন্দিরে নিত্য সেবে সর্ব্বজন"

পল্লীসমাজে যে সকল মহাত্মা অসামান্য বুদ্ধি, ব্যক্তিত্ব ও ধর্ম্মনিষ্ঠা দ্বারা প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন, ৺গিরিধর রায় মহাশয় তাঁহাদিগের মধ্যে অন্যতম। সৃষ্টিধরের কনিষ্ঠ গিরিধরের নাম প্রাতঃস্মরণীয়। তিনি জ্যেষ্ঠাপেক্ষা সমধিক কীর্ত্তিমান পুরুষ ছিলেন। দান, ধ্যান, ক্রিয়া, কর্ম্ম, হোম, যজ্ঞ প্রভৃতি বৈদিক কর্ম্ম অল্পকালেই সুসম্পন্ন করিয়া গিয়াছেন। মাতৃশ্রাদ্ধ, কনিষ্ঠপুত্র যোগেন্দ্রগোপালের অন্নাশন, সুবৃহৎ রথ স্থাপন এবং চতুরগ্নি হোম এই চারি কার্য্যে অকাতরে অর্থব্যয় করেন। গিরিধর ক্রোরপতি হইলে ক্রোর টাকাই ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। এহেন ধনবান ব্যক্তির পুত্রগণকে গিরিধরের মৃত্যুর পর কিয়ৎকালের জন্য পরমুখাপেক্ষী হইতে হইয়াছিল। গিরিধর একজন প্রবীন ব্যবসায়ী ছিলেন; তাহার ত্রিশ চল্লিশ খানা বড় বড় চালানি নৌকা ছিল এতদ্ব্যতীত তিনি লোহাগড়ায় এক প্রকাণ্ড চিনির কারখানার সত্ত্বাধিকারী ছিলেন। ব্যবসায় বাণিজ্যে গিরিধর প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করেন। উপরোক্ত চারিটী মহৎকার্য্যে অজস্র অর্থ দান ও ব্যয় করিয়া এবং ৺জগন্নাথ দেবের পূজার জন্য সুন্দর অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া অমর কীর্ত্তি রাখিয়া যান। ১২৬২ সালের

২৭শে চৈত্র তারিখে মাতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে গিরিধর নবদ্বীপ, শান্তিপুর, বাকলা বিক্রমপুর, হাতীবাগান এবং কলিকাতা প্রভৃতি বঙ্গদেশের ও কাশীর ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগকে নিমন্ত্রণ পত্র প্রদান করেন। এইরূপ নিমন্ত্রণ তাঁহার জীবনে একবার নহে, দুইবার নহে সমভাবে চারিবার। এতদ্দেশে এরূপ মহৎ চারিটী কার্য্য একের জীবনে অতি বিরল; ঘটে নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। মাতার স্বর্গারোহণ কল্পে দানসাগর শ্রাদ্ধ করিয়া অতি মূল্যবান রৌপ্য বিনির্ম্মিত ১৭টী "ষোড়শ," ষোল টাকা পণ্ডিতদিগের সহচর বিদায় ও এক টাকা কাঙ্গালী বিদায় করেন। যখন রূপার দান সামগ্রী সভাস্থলে আনীত হয় তখন সেই বিরাট সভা "জয় জয়" ধ্বনিতে দেশ মাতাইয়া উঠাইয়াছিল। সহস্র সহস্র লোক এই শ্রাদ্ধবাসরে নিমন্ত্রিত হইয়া ভূরিভোজনে আপ্যায়িত হইয়াছিল। কথিত আছে কাঙ্গালী ভোজনের জন্য যে চিড়া দধি সংগৃহীত হইয়াছিল তন্মধ্যে একগোলা চিড়া ও একশত মন দধি উদ্বৃত্ত হইয়াছিল। বড় বড় জালা পোরা তেল ও গোলা পোরা চিনি কার্য্যান্তে পড়িয়াছিল। পাঠক এতদ্বারা কার্য্যের গুরুত্ব উপলব্ধি করিবেন।

চারি বৎসর পরে ১২৬৫ সালের আষাঢ় মাসে তিনি ধর্ম্মপ্রাণ বিদ্যাধরের প্রতিষ্ঠিত ৺জগন্নাথ দেবের জন্য সুবৃহৎ নূতন রথ প্রতিষ্ঠা করিয়া উহা টানিয়া লইয়া যাইবার জন্য গ্রামের পশ্চিম প্রান্ত হইতে পূর্ব্ব প্রান্ত পর্য্যন্ত ১৬ হাত বিস্তৃত এক উৎকৃষ্ট রাস্তা প্রস্তুত করেন। এই রাস্তা লইয়া ১২৬৬ সালে মজুমদার বংশীয় খ্যাতনামা হরিশ্চন্দ্র মজুমদারের সহিত বিদ্যাধর রায়ের পৌত্র গুরুপ্রসাদের এক মোকদ্দমার সৃষ্টি হয়। লোহাগড়া মুনসেফী আদালতে এই মামলার বিচার হয়, তাহার দলিলপত্র আমরা বর্ত্তমানেও দেখিতে পাই। গিরিধর যখন ঐ রাস্তার সংস্কার করেন তখন প্রাতঃস্মরণীয় তারাপ্রসন্ন মজুমদার ও দত্ত—মজুমদার বংশীয় অন্যান্য সকলে ঐ রাস্তা নির্ম্মাণে বাধা দেন, ফলে এক ভীষণ গোলযোগের সৃষ্টি হয়। গিরিধর অনন্যোপায় হইয়া তারাপ্রসন্ন মজুমদার ও দত্ত-মজুমদার বংশীয়দের ১২৬৬ সালে এক একরার নামা লিখিয়া দিয়া ঐ রাস্তা সুবিস্তৃত করেন তাহার প্রমাণ গিরিধরের নিজ স্বাক্ষরিত দলিল আমরা গৃহে প্রাপ্ত হইয়াছি। তদবধি ঐ রাস্তা 'গিরিধর রোড' নামে অভিহিত হইয়া



স্বর্গীয় বিদ্যাধর রায় প্রতিষ্ঠিত
শ্রীশ্রী৺জগন্নাথ দেব।



লোহাগড়ায় শ্রীশ্রী৺জগন্নাথ দেবের রথযাত্রা।

(শ্রীযুক্ত হৃদয় নাথ সমাদ্দারের সৌজন্যে)

পৃঃ ১২৯

আসিতেছে। গিরিধরের স্থাপিত সুবৃহৎ রথ যাঁহারা স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছেন তাঁহাদের নিকট শ্রবণ করিয়াছি যে ঐ রথের উচ্চতা পঁয়ত্রিশ ও প্রস্থ অন্যূন বিংশতি হস্ত হইবে। রথে ষোলটী শালকাষ্ঠ বিনির্ম্মিত চক্র ও বহুতর বৃহৎ কাষ্ঠ পুত্তলিকা ও মনোরম চিত্র ছিল; ঐ সমস্ত পুত্তলিকা উচ্চে মানব সদৃশ; ইহার দুএকটী পুত্তলিকা অদ্যাবধি গিরিধরের বংশ-ধরগণের গৃহে বিদ্যমান আছে। বহুতর পুত্তলিকা অযত্নে ভাঙ্গিয়া ও হারাইয়া গিয়াছে।

রথে সমান উচ্চ পাঁচটী থাক ও চারিটী সুঠাম ঘোটক ছিল। রথের সারথি উর্দ্ধে পাঁচ হাত। প্রতি থাকে ছোট ছোট চূড়া ও বহুসংখ্যক পুত্তলিকা ও সুন্দর সুন্দর চিত্র ছিল। রথে সুবৃহৎ পাঁচটী চূড়াছিল, সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎচূড়া উচ্চে অন্যূন পঞ্চদশ হস্ত। এরূপ কারুকার্য্য খচিত সুন্দর ও সুবৃহৎ রথ এতদ্দেশে দৃষ্ট হইত না। নড়াইলের জমিদার স্বনামধন্য শ্রীযুত রামরতন রায় মহাশয়ের দেশ বিখ্যাত রথও গিরিধরের রথ অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর ছিল না। স্বচক্ষে যিনি না দেখিয়াছেন তাঁহার মনোমধ্যে গিরিধরের রথ—সৌন্দর্য্যের সহস্রাংশ ক্ষুদ্র লেখনী দ্বারা অঙ্কিত করিতে পারা যায় না।

গিরিধর যখন অসুস্থ হইয়া পড়েন তখন আর তাঁহার রথ টানা হইত না। যথাস্থানেই পূজা হইত। যে তারিখে গিরিধর স্বর্গারোহণ করেন সেই তারিখে ঐ দেশ বিখ্যাত সুবৃহৎ রথ ভূতলশায়ী হয়। বর্ত্তমানে যে রথ টান হইয়া থাকে উহা ঐ সাবেক রথের পার্শ্বস্থ একটী চূড়া মাত্র। ইহা দ্বারা পাঠক গিরিধরের রথের উচ্চতা উপলব্ধি করিবেন।

পুনরায় ১২৭৫ সালের আষাঢ় মাসে পুত্রের নামকরণ ও অন্নপ্রাশনে গিরিধর বৃহদ্ব্যাপারের আয়োজন করেন। এ কার্য্যেও গিরিধরকে বঙ্গের ও কাশীর সমগ্র ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে নিমন্ত্রণ করিতে হইয়াছিল।

গিরিধরের শেষ কার্য্য "চতুরগ্নি হোম"। ১২৮৯ সালের চৈত্র মাসের মহাবিষুব সংক্রান্তির পুণ্যদিনে বঙ্গমাতার সুসন্তান স্বনামধন্য গিরিধর পুনরায় সমগ্র বঙ্গের ও কাশীধামের ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণকে সাদরে স্বীয় আলয়ে অভ্যর্থনা করেন।

গিরিধরের চারিবিবাহ; দ্বিতীয়ার গর্ভজাত কন্যা শ্যামাসুন্দরী—করগী

নিবাসী শ্রীযুত দ্বারকানাথ সরকার জমিদার মহাশয়ের সহিত ইহার বিবাহ হয়। ধনে পুত্রে ইনি লক্ষ্মীবতী। ইহার পুত্রত্রয় সকলেই কৃতবিদ্য। গিরিধরের চতুর্থা পত্নীর গর্ভে দুই পুত্র ও দুই কন্যা জন্ম গ্রহণ করে। যিনি দেশ বিখ্যাত, যশস্বী, পুণ্যাত্মা—সেই দানবীর গিরিধরের অর্দ্ধাঙ্গিনী অদ্যাপি জরাগ্রস্তা হইয়া জীবিতা আছেন। গিরিধরের পুত্রদ্বয় উভয়েই কৃতবিদ্য। জ্যেষ্ঠ প্রসন্নগোপাল বি, এল, যশোহরের উকীল এবং কনিষ্ঠ যোগেন্দ্র-গোপাল এল, এম, এস্ ডাক্তার। ১৩২২ সালের ১০ই আষাঢ় তারিখে যশোহরে প্রসন্নগোপালের এবং নেপাল রাজসরকারে ডাক্তারী কার্য্যে থাকিয়া ১৩২৬ সালের ১০ই ফাল্গুন তারিখে যোগেন্দ্রগোপালের মৃত্যু হয়। উভয় ভ্রাতা অতি স্থির, ধীর এবং মেধাবী ছিলেন। উভয়ে কর্ম্মকুশল, পরিশ্রমী এবং মিতব্যয়ী ছিলেন। পিতার মৃত্যুরপর যে কষ্টে ইহারা বিদ্যা অর্জ্জন ও গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন তাহাতে ইহাদিগকে ধন্যবাদ দিতে হয়। যাঁহাদের পিতা দানবীর হইয়া লক্ষাধিক টাকা সৎকার্য্যে ও দানে ব্যয় করিয়া গিয়াছেন তাঁহাদিগকে অন্নাভাবে অপরের সাহায্যের প্রত্যাশী হইতে হইয়াছিল, তাই উভয় ভ্রাতা মিতব্যয়িতা শিক্ষা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন এবং মৃত্যুকালে সন্তানগণের জন্য লক্ষাধিক টাকা রাখিয়া যাইতে সক্ষম হইয়াছিলেন। ওকালতী ব্যবসায়ে প্রসন্নগোপাল এবং ডাক্তারীতে যোগেন্দ্রগোপাল যথেষ্ট সুযশ অর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন। প্রসন্নগোপাল যশোহরে একটী পাকা বাসাবাটী এবং উভয় ভ্রাতা বাটীতে এক সুবৃহৎ অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া পুরাতন বাটী পরিত্যাগ করিয়া তথায় কিছুদিন বাস করিয়া গিয়াছেন কিন্তু ভগবান উহাদিগকে বহুদিন উহা ভোগ করিতে দেন নাই। বরং প্রসন্নগোপালের অভীষ্ট পূর্ণনা-হইতে ভগবান তাহাকে কর্ম্মক্ষেত্র হইতে সরাইয়া লইয়া যান। উভয় ভ্রাতা পূর্ব্বপুরুষ অনুষ্ঠিত পূজাপার্ব্বনাদি সুচারুরূপে সুসম্পন্ন করিয়া গিয়াছেন। প্রসন্নগোপালের দুই বিবাহ। প্রথমার গর্ভে প্রফুল্লকুমারের এবং দ্বিতীয়ার গর্ভে প্রবোধ ও সুবোধের জন্ম হইয়াছে। প্রফুল্লকুমার বি, এল, উকিল পিতার পশারে বসিয়া যশোহরে ওকালতি করিতেছেন। ইনি খুব তীক্ষ্ণ-বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তি। ওকালতি করিয়া বেশ সুখ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন। প্রফুল্লকুমার রায়বাহাদুর যদুনাথের মধ্যমা কন্যা প্রভাবতীকে বিবাহ

করিয়াছেন। তাহার পুত্র শিবপ্রসাদ নাবালক। যোগেন্দ্রগোপালের একমাত্র পুত্র ব্রজেন্দ্রগোপালও নাবালক। প্রসন্নগোপালের মধ্যম পুত্র প্রবোধ ও কনিষ্ঠ পুত্র সুবোধ বি, এ ও আই, এস সি, অধ্যয়ন করেন। দুঃখের বিষয় একটী কথা না বলিলে সত্যের অপলাপ করা হয়। যে বংশে ৺বিদ্যাধর রায়, ৺গিরিধর রায় ও ৺প্রসন্নগোপাল ও ৺যোগেন্দ্র-গোপাল রায় জন্ম গ্রহণ করিয়া শুধু বংশকে নয় বারুজীবি জাতিও স্বগ্রাম লোহাগড়াকে নানাভাবে গৌরবান্বিত করিয়া গিয়াছেন, যাঁহাদের কীর্ত্তিকলাপ, বৈদিক ক্রিয়া-কর্ম্ম স্বজাতি ও স্বদেশের সেবা সর্ব্বসাধারণের নিকট চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে, তাঁহাদের বর্ত্তমান বংশধরগণ কেহ কেহ কৃতবিদ্য হইয়াও লেখককে উক্ত পুস্তক সঙ্কলনে কোনরূপ সহায়তা করেন নাই।

খ্যাতনামা ফকিরচন্দ্র রায়।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে রামকিশোর রায়ের তিন পুত্র—রামপ্রসাদ, কৃষ্ণপ্রসাদ ও গুরুপ্রসাদ। গুরুপ্রসাদের দুইপুত্র ফকিরচন্দ্র ও রামসুন্দর। রামসুন্দর অপুত্রক, গোপালগঞ্জ মহকুমাএর ষ্ট্যাম্প বিক্রেতা ছিলেন। উক্ত কার্য্যে তিনি যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করেন। ফকিরচন্দ্র অতিশয় প্রতিভাশালী পুরুষ ছিলেন। ইনি যশোহরে সরকারী উকীল বা গভর্ণমেণ্ট প্লীডার ছিলেন। সরকার বাহাদুরের নিকট ইঁহার যথেষ্ট সম্মান ছিল। বর্ত্তমান সময় হইলে ফকিরচন্দ্রকে আমরা রাজসম্মানে ভূষিত দেখিতে পাইতাম। বিদ্যাবুদ্ধিতে ফকিরচন্দ্র তৎকালে এতদ্দেশে একজন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি বলিয়া পরিগণিত ছিলেন। রায়বাটীর বর্ত্তমান চণ্ডীমণ্ডপ ফকিরচন্দ্র রায় মহাশয়ের কৃত। ১২৫৫ সালের চৈত্রমাসে ৭৫ বৎসর বয়সে সন্ন্যাস রোগে যশোহর নগরীতে ইঁহার মৃত্যু হয়। মৃতদেহ চাকদহের সন্নিকটে গঙ্গাতীরে সৎকার করা হয়। ইনি তৎকালে একজন প্রসিদ্ধ আইনজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন বলিয়া মৃত্যুকালে প্রভূত অর্থ ও বহু সম্পত্তি রাখিয়া যান। কালিদাসপুর নিমাই দত্তের তালুকের একাংশ, রামসুন্দর চক্রবর্ত্তীর ব্রহ্মোত্তরের অন্তর্গত জোত, মহিষাপাড়া, খাঁরহাট্ প্রভৃতি জোত ও তালুক তাঁহারই স্বোপার্জ্জিত। এতদ্ভিন্ন তিনি লোহাগড়া গ্রামে আম্রকানন সম্বলিত মণ্ডলগণ কৃত গড়খাই

পুষ্করিণী (যাহা 'গড়ের বাগান' নামে অভিহিত) মণ্ডলদিগের নিকট হইতে ক্রয় করেন। বড়ই দুঃখের বিষয় যে ফকিরচন্দ্রের স্বোপার্জ্জিত অর্থ তাঁহার বংশধরগণের ভোগে আইসে নাই। ফকিরচন্দ্রের মৃত্যুর পর যে কারণেই হউক অধিকাংশ অর্থ নিকটাত্মীয়ের হস্তগত হয়। এমন কি ফকিরচন্দ্রের পুত্র কালীপ্রসন্ন রায় পর্য্যন্ত তাহা ভোগ করিতে পারেন নাই।

ফকিরচন্দ্রের দুই পুত্র হরগোবিন্দ ও কালীপ্রসন্ন. জ্যেষ্ঠ হরগোবিন্দ নিঃসন্তান। কনিষ্ঠ কালীপ্রসন্ন এতদ্দেশে প্রথম ইংরাজী ভাষা শিক্ষা করেন, ইনি তৎকালের 'জুনিয়র' পাশ। লেখাপড়ায় সুপণ্ডিত হইয়াও স্বপরিবার, স্বজাতি কি স্বদেশবাসী কাহারও কোন হিতকর কার্য্যে ইনি কখনও ব্রতী হন নাই। বিদ্যাগৌরব লইয়া নিতান্ত আলস্যপরায়ণের ন্যায় স্বগৃহে লুক্কায়িতভাবে কালযাপন করিতেন। ১২৪৫ সালে ইহার জন্ম হয়, মাত্র ৩০ বৎসর জীবিত থাকিয়া ইহধাম পরিত্যাগ করেন।

সাধক কেদারনাথ রায়।

কালীপ্রসন্নের পুত্র কেদারনাথ সাতিশয় ধার্ম্মিক, বুদ্ধিমান ও তীক্ষ্ণবুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। কেদারনাথের জন্মে লোহাগড়া সত্য সত্যই গৌরবান্বিত একথা অনেকে অস্বীকার করিবেন না। বিপিনবিহারী নামে কালীপ্রসন্নের এক পোষ্যপুত্র ছিল, ইনি কৃষ্ণশরণ মজুমদারের বংশীয় রামরতনের পুত্র। বিপিনকে পোষ্যপুত্র লইবার পর কেদারনাথের জন্ম হয়। বিপিন অবিবাহিত অবস্থায় পরলোক গমন করেন। কেদারনাথ অল্পবয়সে পিতৃমাতৃহীন হইয়া কিছু উচ্ছৃঙ্খল হইয়া পড়ায় পাড়াগেঁয়ে জুয়াখেলার দলে মিশিয়া পিতামহ ফকিরচন্দ্রের ত্যক্ত ঐশ্বর্য্যের যাহা কিছু পরহস্তগত হওয়ার পরে অবশিষ্ট ছিল, তাহার অধিকাংশ তিনি জুয়াখেলায় নষ্ট করিয়া ফেলেন। অল্পবয়সে আলস্যবশতঃ উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত হন নাই তথাপি সংস্কৃত, ইংরাজী ও বাঙ্গলা ভাষায় তাহার যথেষ্ট অধিকার ছিল। শ্বশুর ৺তারাপ্রসন্ন মজুমদার লেখাপড়া ও চাকুরীর জন্য চেষ্টা করিয়াও কেদারনাথের আলস্যবশতঃ কৃতকার্য্য হন নাই।

অতি অল্প বয়স হইতেই দেবদেবীর উপর তাঁহার প্রগাঢ় ভক্তি ছিল এবং

বাল্যকালেই দেবদেবীর পুতুল পূজা করিতেন। ক্রমে বয়সের সঙ্গে সঙ্গে উহা প্রকৃত ভক্তিতে পরিণত হয়। কেদারনাথের ধর্ম্মানুরাগ অতিশয় প্রবল ছিল। ধর্ম্মচিন্তায় তিনি অনেক সময় অতিবাহিত করিতেন। এই কারণে তিনি ব্রাহ্মসমাজ উপাসনায়, গীর্জ্জা, মন্দির প্রভৃতি স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতেন। কিন্তু কোথাও শান্তি না পাইয়া শশধর তর্কচূড়ামণির নিকট এবং হুগলী শ্রীরামপুরের কেশবচন্দ্র রায় কর্ম্মকারের নিকট ধর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্ব অবগত হওয়ার জন্য কিছুদিন ঘুরিয়া বিফল মনোরথ হইয়া কাশীধামে গমন করেন। তথায় অনেক সাধু সন্ন্যাসীর অনুসন্ধান করিয়া কোথায়ও মনোমত গুরু খুজিয়া না পাওয়ায় কাশীর পরমহংস ত্রৈলঙ্গ স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ করেন। এ সময় পরমহংসদেব নির্ব্বাক নিস্পন্দ অবস্থায় নির্ব্বিকল্প সমাধিতে অবস্থিত ছিলেন। পরমহংসের সহিত কোনরূপ আলাপাদি না হইলেও তাঁহাকে দেখিয়া কেদারনাথ যে শান্তি পাইলেন জীবনে তৎপূর্ব্বে আর কখনও সেইরূপ শান্তি প্রাপ্ত হন নাই। স্বামিজীর সহিত আলাপ পরিচয়ের সুবিধা না হওয়ায় তিনি গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া মনে মনে তাঁহাকে গুরুদেবে বরণ করিয়া সাধন ভজন আরম্ভ করেন। ১২৯৫ সালের ১৫ই শ্রাবণ তারিখে মৌনব্রত অবলবম্বন করেন। ঐ সালের ১০ই ভাদ্র তারিখে অন্নত্যাগ করিয়া দুগ্ধের উপর নির্ভর করেন। ১লা আশ্বিন হইতে দুগ্ধ ত্যাগ করিয়া ছানার জল ও মিষ্টের উপর নির্ভর করেন। তৎপর ছানার জল ত্যাগ করিয়া শুধু মিষ্টের উপর জীবন ধারণ করিতেন। তিনি সাধনের জন্য ভাঙ্গ, ধুতুরা ও বেলের পাতার রস ব্যবহার করিতেন। এই সময় তিনি একদিন গৃহত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। পরে আত্মীয়স্বজনে ধরাধরি করিয়া গৃহে আনয়ন করেন। তাঁহার স্বহস্ত লিখিত আত্মজীবনীতে আমরা দেখিতে পাই যে ১২৯৪ সালের ৩রা ফাল্গুন তারিখে তিনি তাহার গুরুদেবকে দেখিতে পান। এ সময় স্বামিজী দেহরক্ষা করিয়াছেন। কেদারনাথ কখনও ইষ্টমন্ত্র গ্রহণ করেন নাই, তথাপি তাঁহার ন্যায় সাধুপুরুষ এতদ্দেশে দৃষ্ট হয় না। কেদারনাথকে সিদ্ধপুরুষ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইঁহার ন্যায় সংযমী, মিতভাষী, সৎস্বভাব ও সাধু প্রকৃতির লোক লোহাগড়া গ্রামে কখনও জন্মগ্রহণ করেন নাই, সর্ব্বদাই সাধুসঙ্গপ্রিয়, সাধুসঙ্গলাভাশায় বহুবার তিনি গোপনে গৃহত্যাগ করিয়া নানাদেশ পরিভ্রমণ করেন। সাধুসঙ্গে বাস করিয়া ধর্ম্মচর্চ্চা এবং ভগবৎ-প্রসঙ্গে

কালাতিপাত করাই তাঁহার জীবনের একমাত্র আকাঙ্ক্ষা। তিনি নীরব কর্ম্মী, মান ও যশের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন।

বহু শাস্ত্র ইহার আয়ত্ব ছিল। বহু ধর্ম্ম গ্রন্থ ও পুরাণাদি পাঠ করিয়া আত্মার উৎকর্ষ সাধন ও আধ্যাত্মিক উন্নতি করিয়া বিগত ১৩২৪ সালের ১২ই বৈশাখ তারিখে সুস্থ শরীরে হরিনাম করিতে করিতে স্বজ্ঞানে স্বর্গারোহণ করেন।

কেদারনাথ প্রসিদ্ধ মজুমদার বংশীয় ৺তারাপ্রসন্ন মজুমদারের জ্যেষ্ঠা কন্যা বসন্তকুমারীকে বিবাহ করেন। এই নারী সাতিশয় অমায়িক ও সরল প্রকৃতির রমণী। ইঁহার গর্ভে কেদারনাথের চারিপুত্র ও দুই কন্যার জন্ম হয়।

কেদারনাথ একজন আধ্যাত্মিক কবি ছিলেন। 'সাহিত্য-সম্পদ' অধ্যায়ে তাঁহার কবিত্ব প্রতিভা সমালোচনা করিব। কেদারনাথের চারিপুত্র—যতীন্দ্র, সত্যেন্দ্র, রবীন্দ্র ও সৌরেন্দ্র। সত্যেন্দ্রের অল্প বয়সে মৃত্যু হয়। যতীন্দ্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এফ, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া পনর টাকা বৃত্তি লাভ করেন। যতীন্দ্রের পিতা ধার্ম্মিকপ্রবর কেদারনাথ যখন গৃহত্যাগ করিয়া তীর্থ পর্য্যটনে বহির্গত হন তখন সংসার রক্ষণাবেক্ষণ তাঁহার উপর বর্ত্তে কাজেই বি, এ, পরীক্ষার্থী না হইয়া কিছুদিন লোহাগড়া এণ্ট্রান্স স্কুলে তৃতীয় শিক্ষকের কার্য্য করিয়া রায় এষ্টেটের কমন ম্যানেজার হয়েন। অধুনা শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন বাটীতে থাকিয়া বিষয়-সম্পত্তি রক্ষা করেন। রবীন্দ্রনাথ এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় লোহাগড়া স্কুল হইতে ১৯০২ সালে সর্ব্বপ্রথম পনর টাকা বৃত্তি লাভ করেন। এফ, এ, পরীক্ষায় ও রবীন্দ্রনাথ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে কুড়ি টাকা বৃত্তি লাভ করিয়া বি, এ, পরীক্ষায় ইংরাজী ও গণিত শাস্ত্রে সম্মানের সহিত উপাধি প্রাপ্ত হন। অবশেষে এম, এ ; বি, এল, পরীক্ষায় ও বিশেষ কৃতিত্বের সহিত পাশ করিয়া বর্ত্তমানে আলিপুরে ব্যবহারাজীবের কার্য্য করিতেছেন। উক্ত ব্যবসায়ে রবীন্দ্রনাথ বিশেষ সুযশ অর্জ্জন করিয়া প্রভূত অর্থোপার্জ্জনে সক্ষম হইয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ মেধাবী ও তীক্ষ্ণবুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তি। আলিপুর জজকোর্টে সহস্রাধিক উকিলগণের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ স্বীয় ধীশক্তি বলে অন্যতম শ্রেষ্ঠ উকিল। সর্ব্বকনিষ্ঠ সৌরেন্দ্র (দুর্থীরাম) ও মেধাবী ছাত্র। ইনিও প্রবেশিকা পরীক্ষায় পনর টাকা বৃত্তি লাভ করিয়া



শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র নাথ রায়।



শ্রীযুক্ত রবীন্দ্র নাথ রায়
এম, এ ; বি, এল :
এড্‌ভোকেট্‌।

পঃ ১৩৫

জ্যেষ্ঠ ও মধ্যমের সম্মান বজায় রাখিয়াছেন। সৌরেন্দ্র বর্ত্তমানে কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে বি, এ, অধ্যয়ন করিতেছেন।

যতীন্দ্রের পাঁচ পুত্র—হরিদাস, শ্রীবাস, নরহরি, বীরেন্দ্র ও সাহজি। নরহরির বাল্যকালেই মৃত্যু হয়। জ্যেষ্ঠ হরিদাস বি, এস সি, পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করিয়া শেয়ার মার্কেটে ব্রোকারী করিতেছেন। মধ্যম শ্রীবাস প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া আই, এ অধ্যয়ন করিতেছেন। ৪র্থ বীরেন্দ্র প্রথম শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিতেছেন। কনিষ্ঠ নাবালক। রবীন্দ্রের পুত্র শচীন্দ্র (গদাধর) প্রবেশিকা পরীক্ষায় দশ টাকা বৃত্তি লাভ করিয়া প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে রসায়ন শাস্ত্রে সম্মানের সহিত বি, এস সি, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। বর্ত্তমানে তিনি ইউনিভার্সিটি কলেজে এম, এস সি ; বি, এল অধ্যয়ন করিতেছেন। রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী স্নেহলতা প্রবেশিকা পরীক্ষায় দশ টাকা বৃত্তি লাভ করিয়া বেথুন কলেজে আই, এ অধ্যয়ন করিতেছেন। কেদারনাথের সন্তান সন্ততি সকলেই মেধাবী। লোহাগড়া গ্রামে বাগ্‌দেবীর কৃপাদৃষ্টিলব্ধ পরিবার এরূপ আর একটী ও দৃষ্ট হয় না।

রামরাম রায়।

বিদ্যাধরের দুই পুত্র রামকিশোর ও রামরাম। রামরামের পাঁচ পুত্র—পদ্মলোচন, গঙ্গাপ্রসাদ, জয়চন্দ্র, নীলাম্বর ও কাশীনাথ। দ্বিতীয় গঙ্গাপ্রসাদ পরম নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব ছিলেন। তিনি শ্রীশ্রী৺চৈতন্য মহাপ্রভুর প্রবর্ত্তিত বৈরাগ্যধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া গৃহত্যাগ করিয়া জীবনের অবশিষ্ট কাল নবদ্বীপে মহাপ্রভুর উপাসনায় অতিবাহিত করেন। পদ্মলোচন ও জয়চন্দ্র উভয়ে ক্ষমতাবান পুরুষ ছিলেন। স্বর্গীয় কেদারনাথ রায়ের বাটীর পশ্চিমে যে সুন্দর অট্টালিকা আছে, পদ্মলোচন ঐ বাটীর চতুষ্পার্শ্বে প্রাচীর বেষ্টিত করেন। ঐ অট্টালিকা তদুপার্জ্জিত অর্থে তৎপুত্রদ্বয় মহেশ ও দীননাথ কর্ত্তৃক বিনির্ম্মিত হয়। লোহাগড়া স্কুলের দশ রশি পূর্ব্বে বর্ত্তমান সর্দ্দার (বুনা) পাড়ার দক্ষিণে পদ্মলোচন রায়ের কৃত এক প্রসিদ্ধ আম্রকানন আছে, উহার আম্র অতি সুমিষ্ট। এই আম্রকানন অদ্যাপি "পদ্মরায়ের বাগান" নামে অভিহিত। পদ্মলোচনের পাঁচ পুত্র—মহেশচন্দ্র, দীননাথ, মথুরানাথ, মোহনচন্দ্র ও হরগোবিন্দ। শেষোক্ত তিনজন নিঃসন্তান। মহেশের তিন পুত্র—

অম্বিকাচরণ, বেণীমাধব ও পার্ব্বতীচরণ। তিনজনই নিঃসন্তান। অম্বিকাচরণ মজুমদার-বংশীয় রামতারণ মজুমদারের এক পুত্রকে দত্তক পুত্ররূপে গ্রহণ করেন দীননাথের পুত্র নিবারণ। দীননাথ জোড়াদহ কনসরণের মোতালক সাহাপুর কুঠীর দেওয়ান ছিলেন, পরে ডনলপ সাহেবের বিজয়নগর কুঠীর দেওয়ান নিযুক্ত হন। ইনি সাতিশয় ধার্ম্মিক ও বুদ্ধিমান ছিলেন। অম্বিকাচরণের দত্তক পুত্র চন্দ্রকান্ত। ইনি দত্ত-মজুমদার বংশীয় রামতারণ মজুমদারের পুত্র। চন্দ্রকান্ত অতি দৈন্য অবস্থায় কালাতিপাত করিতেছেন। ইহার পুত্রেরা নাবালক। পার্ব্বতীচরণ বহুদিন ভগ্নীর বাটীতে বাস করিয়া ভাগীনেয়দিগকে উত্তরাধিকারী রাখিয়া পরলোক গমন করেন। নিবারণ পৈত্রিক ও মাতুল সম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়া যাত্রা-গানের দল গঠন প্রভৃতি নানা কার্য্যে উহা অপব্যয় করিয়া ফেলেন। তাহার একমাত্র পুত্র হরিহরপদ পিতার মৃত্যুর অতি অল্পকাল পরই বাইশ বৎসর বয়সে কালাজ্বরে আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। হরিহরের ন্যায় পরোপকারী বালক লোহাগড়া গ্রামে অতি অল্পই দৃষ্ট হইত।

সৌখীন জয়চন্দ্র রায়।

পদ্মলোচনের ভ্রাতা জয়চন্দ্র একজন সক্ষম পুরুষ ছিলেন। ১১৭৮ সালে ইহার জন্ম হয়। ইনি প্রথমতঃ ঝিনাইদহের অন্তর্গত জোড়াদহ নীলকুঠীর দেওয়ান এবং পরে তেলজুড়ী ও বড়জিয়ালা কন্‌সারণের দেওয়ানের পদ প্রাপ্ত হন। শেষ বয়সে যশোহরে মোক্তারী কার্য্য করিয়া যথেষ্ট অর্থ রাখিয়া ৯৬ বৎসর বয়সে ১২৭৪ সালে পরলোক গমন করেন। জয়চন্দ্র অতিশয় সৌখীন প্রকৃতির লোক ছিলেন। বৃদ্ধদের নিকট শুনিয়াছি তাহার রঙমহলের ঘর এক অপূর্ব্ব পদার্থ। যে স্থানে রাজীবলোচন মজুমদারের ৺শিবমন্দির ছিল, উহার পূর্ব্বে রায়বাড়ীর রাস্তার পশ্চিমে যে স্থান বর্ত্তমানে পচা গর্ত্তে পরিণত, ঠিক ঐ স্থানে জয়চন্দ্রের 'রঙমহল' গৃহ নির্ম্মিত হয়। ঐ রাস্তার পূর্ব্বে ও রাইচরণ বৈরাগীর বসতবাটীর উত্তরে জয়চন্দ্র এক অতি সুন্দর বাগান বাড়ী প্রস্তুত করেন। ঐ কাননের ভিতর জয়চন্দ্র পাকাঘাট নির্ম্মাণ করত এক পুষ্করিণী খনন করিয়া উহার চতুষ্পার্শ্বে আম, লিচু, কুল, পেয়ারা, জামরুল, কামরাঙ্গা, বিলাতী গাব প্রভৃতি ফলের ও নানা রং বেরং এর ফুলের

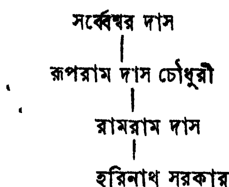
দ্বারা ঐ কানন সজ্জিত করেন। তিনি উহার মধ্যে এক মনোরম গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া সময় সময় আমোদ-প্রমোদ করিতেন। ঐ কাননের দৃশ্য অতি মনোহর ছিল। লোকে বলে জয়চন্দ্রের সাজান বাগানের উপর দিয়া কখনও পাখী উড়িতে পারিত না। জয়চন্দ্রের পুত্র সন্তান ছিল না। তিনি ঈশানচন্দ্রকে পোষ্য পুত্র গ্রহণ করেন। জয়চন্দ্রের ভ্রাতা নীলাম্বর, নীলাম্বরের পুত্র আনন্দ, তাহার পুত্র পরমানন্দ ও দুর্গাচরণ। পরমানন্দ অপুত্রক। দুর্গাচরণ বহুদিন বিদেশে সামান্য চাকুরীতে কাটাইয়া প্রৌঢ় বয়সে বাটীতে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন। তিনি ও অপুত্রক অবস্থায় মানবলীলা সম্বরণ করেন।

নীলাম্বরের ভ্রাতা কাশীনাথ, তাহার পুত্র বিশ্বনাথ। বিশ্বনাথের পুত্র ক্ষুদিরাম, ইঁহার অতি অল্প বয়সে মৃত্যু হয়। কাশীনাথ অতিশয় ধার্ম্মিক ছিলেন। তিনি গয়াধামে গমন করিয়া আর গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করেন নাই। ঈশান পিতার ন্যায় দীর্ঘজীবী ছিলেন। জয়চন্দ্র ও ঈশান উভয়ে সুপুরুষ। ঈশান কোন অর্থকরী বিদ্যা শিক্ষা করেন নাই। তিনি বাটীতে বসিয়া পিতৃ-অর্থ ভোগ করিতেন কিন্তু মৃত্যুকালে সন্তান সন্ততির জন্য তাঁহার পিতার ন্যায় অর্থ রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। ঈশানের পুত্র যদুনাথ। যদুনাথের চারি পুত্র —জ্যেষ্ঠ পঞ্চানন বি, এ, পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করিয়া বর্ত্তমানে রেলিব্রাদাস´ এর বাড়ী চাকুরী করেন। পঞ্চাননের ধর্ম্মানুরাগ অতিশয় প্রবল। মধ্যম প্রিয়নাথ গভর্ণমেণ্ট ই, বি, রেলওয়ের ভিতর এসিষ্ট্যাণ্ট্ ষ্টেশন্ মাষ্টারের চাকুরী করেন। তৃতীয় হরিপদ ১৯২৭ সালে বি, এ, পাশ করেন। কনিষ্ঠ নাবালক।

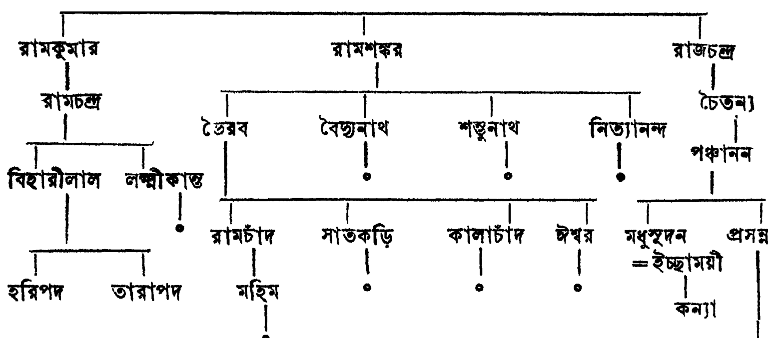
হরিনাথ সরকার।

রামদাসের একমাত্র পুত্র হরিনাথ বুদ্ধিমান ও ক্ষমতাশালী ছিলেন। হরিনাথের যৌবনের প্রারম্ভেই তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়। বিহারীলাল সরকারের বাটীর অতি সন্নিকটে হরিনাথ স্বীয় বাসভবন নির্ম্মাণ করেন। হরিনাথের ভাগ্যে বহুকাল শিক্ষালাভ ঘটে নাই। পিতৃবিয়োগের সঙ্গে সঙ্গে তাহাকে ঘোর সংসারী সাজিতে হইয়াছিল। রামদাস মৃত্যুকালে কিছু অর্থ রাখিয়া যান। হরিনাথ ঐ অর্থ প্রাপ্ত হইয়া নিজের সাংসারিক অবস্থার উন্নতিকল্পে যত্নবান হন। হরিনাথ গোরাবতীকে বিবাহ করেন। এই গোরাবতীর গর্ভে তাহার পাঁচ পুত্র জন্মে। হরিনাথ পৃথক হইবার

সরকার বংশ।



সর্ব্বেশ্বর দাসের প্রপৌত্র হরিনাথ সরকারের জ্যেষ্ঠ পুত্র চোখারাম সরকারের বংশ তালিকা।



পর হইতে দুর্গোৎসবাদি বার্ষিক ক্রিয়া আরম্ভ করেন। হরিনাথ অবস্থাপন্ন হইয়াও চিরদিনই অতি সামান্য অবস্থায় বাস করিয়া গিয়াছেন। কথিত আছে ইনি রাজা সীতারামের দেওয়ান ছিলেন। সীতারামের রাজত্বের শেষ অবস্থায় তদীয় জমিদারীভুক্ত রামপুর শ্যামপুর মোতালকে হরিনাথ নায়েবী পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। হিন্দুরাজ্যের ধ্বংসের অল্পকাল পূর্ব্বে হরিনাথ মহম্মদপুরে রাজ সরকারে দেওয়ানী পদে প্রতিষ্ঠিত হন। তাঁহার এই পদ সীতারামের ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে বিলুপ্ত হয়। এই সময় তিনি সরকার উপাধি ধারণ করেন।

পশ্চিমপাড়ার সরকার বংশ।

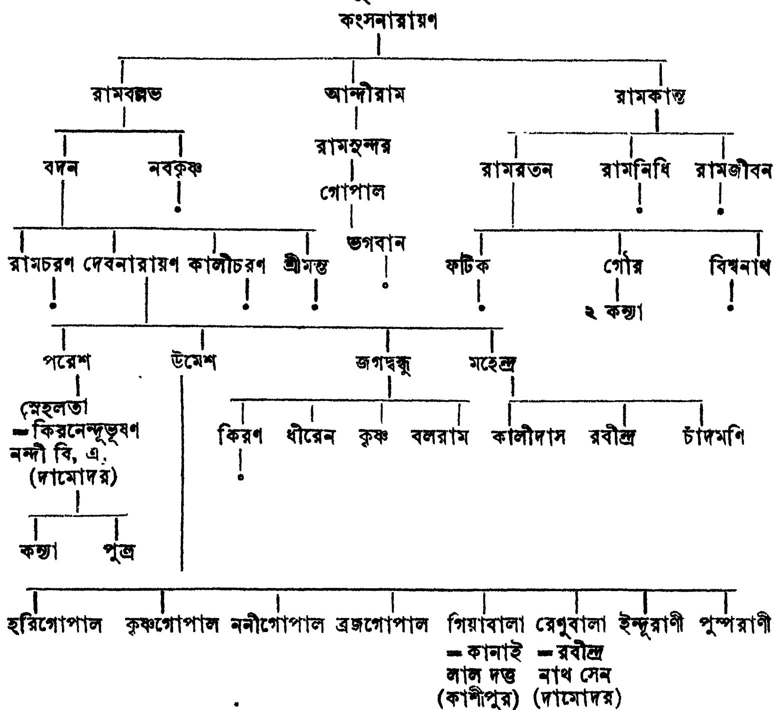
হরিনাথের ছয়পুত্র—চোখারাম, কংসনারায়ণ, দেবানন্দ, রামচাঁদ, রামেশ্বর

ও নন্দরাম। জ্যেষ্ঠ চোখারামের তিনপুত্র—রামকুমার, রামশঙ্কর ও রাজচন্দ্র। রামকুমার মহম্মদপুরে নাটোর রাজসরকারে আমিনী করিতেন। বাঙ্গলা ও পার্শীতে ইহার যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি ছিল। আমিনী চাকুরী করিয়া রামকুমার অনেক অর্থোপার্জ্জন করেন। ইনি কীর্ত্তিমান ও ক্ষমতাশালী ছিলেন। তখন প্রবল প্রতাপ রায়বংশের প্রতিবেশী হইয়াও দেশের ভিতর সবিশেষ প্রতিপত্তি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। রামকুমার অতি নিষ্ঠাবান্ ও ধার্ম্মিক ছিলেন, নিয়মমত দুর্গোৎসবাদি ক্রিয়াকলাপ সম্পন্ন করিয়া পূর্ব্বপুরুষের স্মৃতি জাগরূক রাখিয়া গিয়াছেন। ইনি ভুলবাড়িয়াদিগের তালুক ক্রয় করেন। রামকুমারের পুত্র রামচন্দ্র গুণবান ও বুদ্ধিমান ছিলেন। রামচন্দ্র ভাল মুসাবিদাকারক ছিলেন এবং উৎকৃষ্ট হিসাব নিকাশ করিতে পারিতেন। বাঙ্গলা লেখাপড়ায় তৎকালে একজন বিদ্বান্ বলিয়া পরিচিত ছিলেন। অতিবৃদ্ধবয়সে রামচন্দ্র পরলোক গমন করেন। রামচন্দ্রের দুই পুত্র বিহারীলাল ও লক্ষ্মীকান্ত। বিহারীলাল প্রথমতঃ দেশে গুরুগিরির কার্য্য করিতেন, পরে নড়াইলের উকিল শ্রীযুত বিধুভূষণ ভৌমিক মহাশয়ের মহুরীগিরি কার্য্য করিতেন। বিহারীলালের দুই পুত্র—হরিপদ ও তারাপদ। হরিপদ বাঙ্গলা পুলিশ বিভাগে কনষ্টবলের চাকুরী করেন। লক্ষ্মীকান্ত অবিবাহিত ও দেশত্যাগী।

চোখারামের মধ্যমপুত্র রামশঙ্করের চারিপুত্র—ভৈরব, বৈদ্যনাথ, শম্ভুনাথ ও নিত্যানন্দ। ভৈরব ব্যতীত সকলেই নিঃসন্তান। ভৈরবের চারিপুত্র—রামচাঁদ, সাতকড়ি, কালাচাঁদ ও ঈশ্বর। রামচাঁদের পুত্র মহিম; মহিম অপুত্রক। অন্য সকলেই নিঃসন্তান। চোখারামের কনিষ্ঠ পুত্র রাজচন্দ্র, ইহার পুত্র চৈতন্য। চৈতন্য অতিশয় ধার্ম্মিক ও নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন। মৃত্যুকালে ইনি কিছু সম্পত্তি রাখিয়া যান। চৈতন্যের পুত্র পঞ্চানন, ইহার অবস্থাও মন্দ ছিল না; ইনি পৈত্রিক সম্পত্তিতে ধনবান ছিলেন। পঞ্চাননের দুইপুত্র—মধুসূদন ও প্রসন্ন। মধুর চরিত্র দোষ ছিল—অতি অল্প বয়সে কুসংসর্গে পড়িয়া নানাবিধ কুঅভ্যাসের বশবর্ত্তী হইয়া পৈত্রিক সম্পত্তি অপব্যয় করিয়া ঋণজালে জড়িত হইয়া পড়েন। মৃত্যুর পূর্ব্বে ভয়ঙ্কর কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত হইয়া মধু যৎপরোনাস্তি ক্লেশ ভোগ করেন। মধুর পুত্রসন্তান ছিল না, ইঁহার তিনকন্যা।

প্রসন্ন লোহাগড়া গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া শ্বশুরালয় পরমেশ্বরপুরে বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়া তথায় বাস করেন। শেষ বয়সে নড়াইল ফৌজদারী আদালতে সামান্য কার্য্য করিয়া তথায় প্রসন্নের মৃত্যু হয়। প্রসন্ন অমায়িক ও পরোপকারী ছিলেন। তাঁহার পুত্র প্রিয়নাথ ও কিরণ। হরিনাথের পুত্রগণের মধ্যে সর্ব্বকনিষ্ঠ নন্দরাম, ইহার পুত্র গোকুল। গোকুলের পুত্র বংশীবদন ও দাতারাম। ইহারা উভয়েই নিঃসন্তান।

হরিনাথ সরকারের দ্বিতীয় পুত্র কংসনারায়ণের বংশ তালিকা।

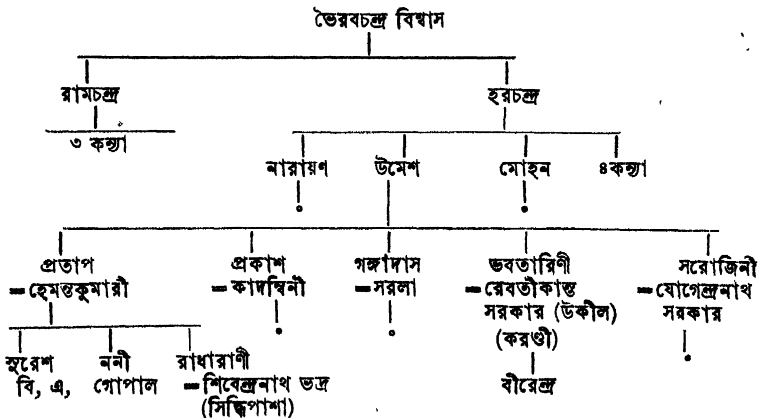


হরিনাথের দ্বিতীয়পুত্র কংসনারায়ণের তিনপুত্র—রামবল্লভ, আন্দিরাম ও রামকান্ত। রামবল্লভের পুত্র রামজয়, রামজয়ের পুত্র বদন ও নবকৃষ্ণ; বদনের চারিপুত্র—রামচরণ, দেবনারায়ণ, কালীচরণ ও শ্রীমন্ত। দেবনারায়ণ ব্যতীত অন্য সকলেই নিঃসন্তান। দেবনারায়ণের চারিপুত্র—পরেশ, উমেশ, জগদ্বন্ধু ও মহেন্দ্র। রামবল্লভ অতিশয় ধার্ম্মিক ও নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন।

রামজয় চাকুরী করিয়া কিছু অর্থ রাখিয়া যান। দেবনারায়ণ স্বীয়বাটীতে বাসের জন্য এক অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া গিয়াছেন। তদীয় জ্যেষ্ঠপুত্র পরেশ রেলে চাকুরী করিতেন, চাকুরীস্থলেই তাঁহার মৃত্যু হয়। পরেশ অপুত্রক, তাহার একটি মাত্র কন্যা। মধ্যম উমেশচন্দ্র জলপাইগুরী মহুরীগিরির কার্য্য ও তৎসঙ্গে কাঠের ব্যবসায় করেন। তৃতীয় জগদ্বন্ধু বাড়ীতে থাকিয়া তেজারতি করেন। কনিষ্ঠ মহেন্দ্রনাথ বাড়ীতে বসিয়া থাকেন কোন কর্ম্মই করেন না। জগদ্বন্ধুর চারিপুত্র—কিরণ, ধীরেন, কৃষ্ণ ও বলরাম। জ্যেষ্ঠ কিরণ টাইফয়েড্ রোগে আক্রান্ত হইয়া বর্ত্তমান বর্ষে ১৫ই জ্যৈষ্ঠ মৃত্যুমুখে পতিত হন।

আন্দীরামের বংশধর কেহই জীবিত নাই। ইহার পুত্র রামসুন্দর ভাল পার্শী জানিতেন; রামসুন্দরের পুত্র গোপাল, গোপালের পুত্র ভগবান ও রামচন্দ্র উভয়েই নিঃসন্তান। কনিষ্ঠ রামকান্ত ক্ষমতাবান পুরুষ ছিলেন। ইহার তিন পুত্র—রামরতন, রামনিধি ও রামজীবন। শেষোক্ত দুইনজন নিঃসন্তান। রামরতনের তিন পুত্র—ফটিক, গৌর ও বিশ্বনাথ; জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ নিঃসন্তান; গৌরের দুই কন্যা।

দৈবজ্ঞহাটী হইতে আগত বিশ্বাস বংশ।



৺ভৈরবচন্দ্র বিশ্বাস খুলনা দৈবজ্ঞহাটী গ্রাম নিবাসী ৺মধুবিশ্বাস মহাশয়ের নিকট-আত্মীয় ছিলেন। অতিশৈশবে পিতৃমাতৃহীন হওয়ায় তাঁহার দাদা মহাশয় (মায়ের বাপ) লোহাগড়া রায় বংশের কোন সম্ভ্রান্ত

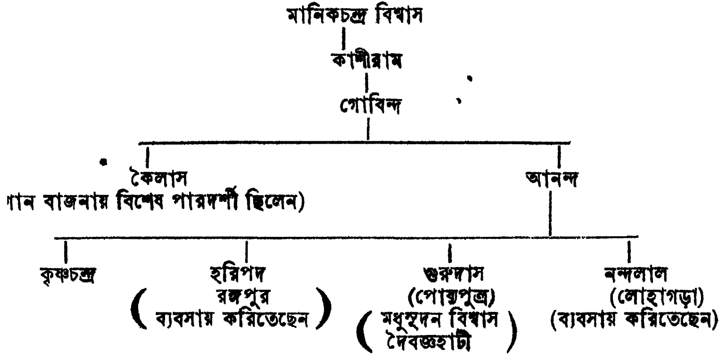
ব্যক্তি (সম্ভবতঃ গুরুপ্রসাদ রায়) তাঁহাকে আনিয়া স্বীয় পুত্রের ন্যায় পালন করেন। কালক্রমে ভৈরবচন্দ্র দাদামহাশয়ের বিশেষ প্রিয়পাত্র হন। উক্ত দাদামহাশয় স্নেহবশতঃ তাঁহাকে কিছু জমাজমি ও একটী বাড়ী দান করেন। ভৈরবচন্দ্রের বংশধরগণ অদ্যাপি উক্ত জমাজমি ও বসতবাটী ভোগ-দখল করিতেছেন।

ভৈরবচন্দ্রের কনিষ্ঠ পুত্র হরচন্দ্র রায়বাটীর নায়েব, বিশেষতঃ ৺কালীপ্রসন্ন রায়ের বাটীর সর্ব্বময় কর্ত্তা ছিলেন। রায় বাটীতে ইঁহার বিশেষ প্রতিপত্তি ও সম্মান ছিল। ইনি দীর্ঘজীবী হইয়া পুত্র-পৌত্রাদি রাখিয়া পরলোক গমন করেন। হরচন্দ্র এবং তাঁহার ভ্রাতা রামচন্দ্রের সাত কন্যা ছিল। প্রত্যেককেই ইনি বিনাপণে সুপাত্রস্থ করেন। সিদ্ধিপাশা গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র দাস মহাশয় হরচন্দ্রের দৌহিত্র। হরচন্দ্রের তিন পুত্র—নারায়ণ, উমেশ ও মোহন। নারায়ণ এবং মোহন অকালে নিঃসন্তান অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হন। নারায়ণ ৺অম্বিকাচরণ মজুমদারের এবং মোহন শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ ভৌমিক মহাশয়ের ভগ্নীকে বিবাহ করেন। মোহন নড়াইল মহকুমায় মোক্তারী করিতেন। উমেশ কচুবাড়িয়া নিবাসী বংশী সমাদ্দার মহাশয়ের কন্যাকে বিবাহ করেন। তিনি নলদী কাছারীতে চাকুরী করিয়া সংসার প্রতিপালন করিতেন। ইঁহার তিনপুত্র ও দুই কন্যা। জ্যেষ্ঠা কন্যা ভবতারিণীর সহিত মাগুরার উকীল শ্রীযুক্ত রেবতীকান্ত সরকারের বিবাহ হয়। জ্যেষ্ঠ-পুত্র প্রতাপ জলপাইগুড়ি জেলায় আলিপুর মহকুমার আদালত পেস্কার ছিলেন। তিনি লোহাগড়া নিবাসী ৺ভোলানাথ দত্তের কনিষ্ঠা কন্যা হেমন্তকুমারীকে বিবাহ করেন। ইঁহার দুই পুত্র—জ্যেষ্ঠ সুরেশ ১৯২৯ খৃঃ বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে এম, এ ; বি, এল্ অধ্যয়ন করিতেছেন। কনিষ্ঠ ননীগোপাল নাবালক।

উমেশের মধ্যম পুত্র প্রকাশ আব্‌গারী বিভাগে সব্‌ইনস্‌পেক্টর ছিলেন। তিনি শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ ভৌমিকের কন্যা কাদম্বিনীকে বিবাহ করেন। সর্ব্বকনিষ্ঠ গঙ্গাদাস শ্রীযুক্ত অনাথবন্ধু মজুমদারের মধ্যমা কন্যাকে বিবাহ করেন। ইহাদের পুত্র কন্যা কেহই বর্ত্তমান নাই।

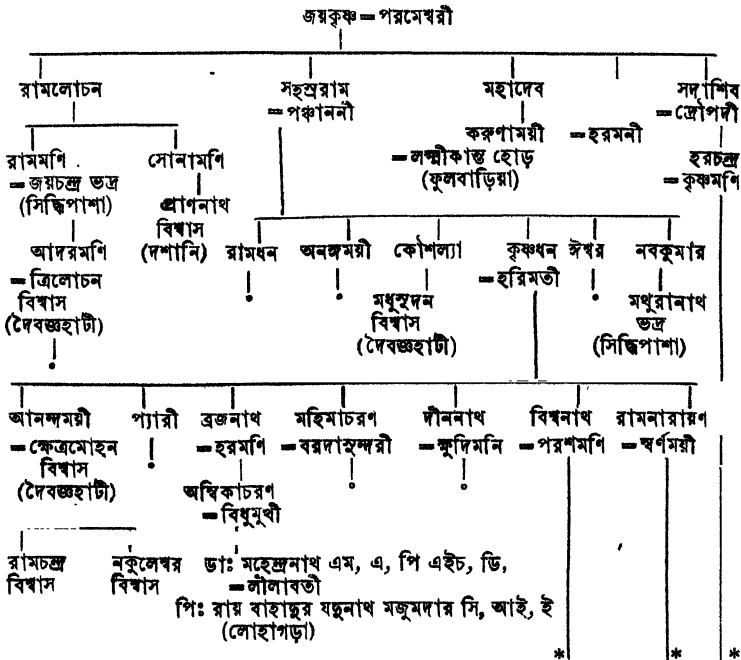
প্রতাপ ১৩২৩ সালে, প্রকাশ ১৩২০ সালে এবং গঙ্গাদাস ১৩২১ সালে অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

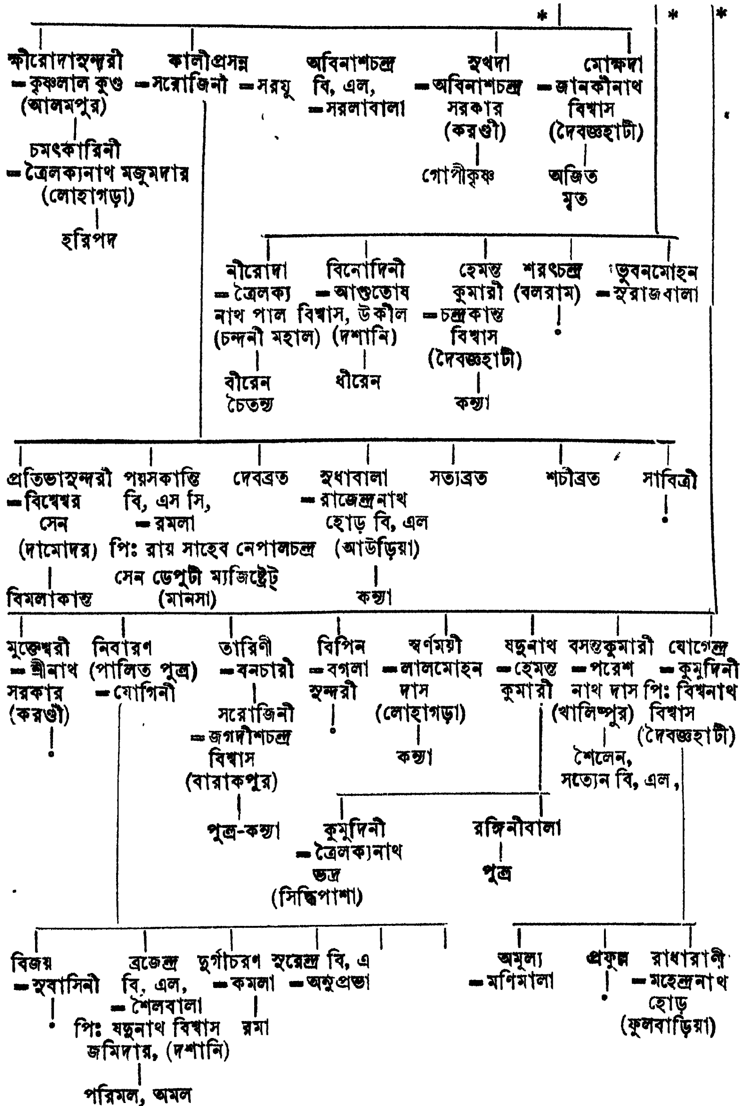
খুলনা জেলার অন্তর্গত সুলতানাবাদ হইতে আগত বিশ্বাস বংশ।



পূর্ব্বপাড়া সরকার বংশ।

র্বেশ্বর দাসের প্রপৌত্র হরিনাথ সরকারের তৃতীয় পুত্র দেবানন্দের জ্যেষ্ঠ পুত্র জয়কৃষ্ণ সরকারের বংশ তালিকা।





পূর্ব্বপাড়া সরকার বংশ।

দেবানন্দ সরকার।

হরিনাথের তৃতীয় পুত্র দেবানন্দ সর্ব্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান, সুচতুর ও কর্ম্মঠ

ছিলেন। দেবানন্দ বিদ্যাধর রায় অপেক্ষা ৮ বৎসরের বড় ছিলেন। রাজীবের মৃত্যুর পর সর্ব্বেশ্বরের বংশে দেবানন্দের ন্যায় বুদ্ধিমান তৎকালে আর কেহ ছিলেন না, কিন্তু কালে স্বনামধন্য বিদ্যাধর রায় সকলকেই পরাভূত করেন। বিদ্যাধরের ন্যায় পুরুষ এতদ্দেশে অতি অল্পই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। দেবানন্দ পিতার ধনে ধনী ছিলেন। কথিত আছে দেবানন্দের পত্নী চম্পাবতীর ন্যায় সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী রমণী তৎকালে অতি অল্পই দৃষ্ট হইত। তাঁহার বর্ণ কনকচাপা ফুলের ন্যায় গৌরবর্ণ ছিল, তাই তাঁহার পিতামাতা আদর করিয়া "চম্পাবতী" নাম রাখিয়াছিলেন। চম্পাবতী লোহাগড়া নিবাসী প্রবলপ্রতাপান্বিত দত্ত-মজুমদার বংশোদ্ভবা। ইহাকে বিবাহ করিয়া দেবানন্দ পূর্ব্বপাড়ার সরকার বাটীর দক্ষিণ পূর্ব্ব কোণে যে ধোপাবাড়ী আছে ঐ স্থান যৌতুক স্বরূপ প্রাপ্ত হন।

দেবানন্দ রামচাঁদ ও রামেশ্বরকে সঙ্গে করিয়া পশ্চিম পাড়া পরিত্যাগ করিয়া পূর্ব্বপাড়ায় উঠিয়া আসেন। বর্ত্তমান সরকার বংশের তিনিই পূর্ব্বপুরুষ। বর্ত্তমানে যে স্থানে সরকার বাটী অবস্থিত, দেবানন্দ প্রথম আসিয়া অন্য দুই ভ্রাতার সহিত ঐ স্থানে বসতবাটী নির্ম্মাণ করেন। রামচাঁদ ও রামেশ্বর চিরকাল দেবানন্দের বাধ্য ছিলেন। চারাবাড়ী তালুকের অন্তর্গত কতিপয় বিঘা জমি জমা লইয়া দেবানন্দ বসবাস করেন। উহার পরিমাণ অন্যূন ৭০ বিঘা হইবে। দেবানন্দ ধার্ম্মিক ও ভ্রাতৃবৎসল ছিলেন। তিনি রামচাঁদ ও রামেশ্বরকে বাসোপযোগী উপযুক্ত স্থান দিয়াছিলেন—বোধ হয় দেবানন্দ স্বীয় অর্থে উহাদিগের আবাস গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া থাকিবেন।

দেবানন্দের অর্দ্ধাঙ্গিনী সাধ্বী চম্পাবতী সধবাবস্থায় স্বর্গারোহণ করেন। দেবানন্দ বৃদ্ধ বয়সে ধর্ম্মপরায়ণা লক্ষ্মীস্বরূপিণী পত্নীর শোকে সাতিশয় শোকাকুল হন। নিষ্ঠাবান্ বৃদ্ধ সহধর্ম্মিণীর স্বর্গকামনায় বহু অর্থ ব্যয়ে দানসাগর ও চন্দনধেনু শ্রাদ্ধ করিয়া আত্মীয় বন্ধুবান্ধব ও স্বজাতীয় এবং ব্রাহ্মণগণকে পরিতোষ ভোজন এবং বহুসংখ্যক দরিদ্রকে আহার ও অর্থদান করেন। কথিত আছে গুণবতী ভার্য্যা চম্পাবতীর অনুরোধেই দেবানন্দ স্বীয় আলয়ে ৺শ্রীধর বিগ্রহ নামক নারায়ণ দেবকে প্রতিষ্ঠা করিয়া তাঁহার সেবার জন্য দেবোত্তর সম্পত্তি নির্দ্দেশ করিয়া দেন। এই নারায়ণ স্থাপন

ব্যাপারে দেবানন্দ বহু অর্থ ব্যয় করেন। দেবানন্দ একজন ক্রিয়াবান হিন্দু ছিলেন।

রামলোচন সরকার।

দেবানন্দের তিন পুত্র জয়কৃষ্ণ, জগন্নাথ ও রামকানু। দেবানন্দের জ্যেষ্ঠ পুত্র জয়কৃষ্ণের স্কন্ধে অল্প বয়সেই সংসারের সমস্ত ভার নিপতিত হয়। মাতৃ-বিয়োগের কিছুকাল পরে জয়কৃষ্ণ পরমেশ্বরীর পাণি গ্রহণ করেন। পরমেশ্বরীর গর্ভে তাহার চারিপুত্র জন্মে—রামলোচন, সহস্ররাম, মহাদেব ও সদাশিব।

জয়কৃষ্ণের পুত্রগণের মধ্যে রামলোচন সর্ব্বজ্যেষ্ঠ ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ইনি বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ ব্যক্তি ছিলেন। সরকার বাটীর মান-সম্ভ্রম ও শ্রীবৃদ্ধি বজায় রাখিতে তাঁহার ন্যায় কেহই যত্নবান ছিলেন না। রামলোচনের ন্যায় তেজস্বী, ধার্ম্মিক ও সর্ব্বগুণযুক্ত পুরুষ তৎকালে সরকার বংশে দৃষ্ট হইত না। তিনি সর্ব্বপ্রথমে যশোহরে মোক্তারী করিতে আরম্ভ করেন। অর্থোপার্জ্জনে তখনকার মোক্তার বর্ত্তমানের উকিল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন। আমরা যখনকার কথা বলিতেছি তখন ওয়ারেন হেষ্টিংস বাঙ্গলার মসনদে উপবিষ্ট। তখন রাজস্ব আদায়ের সৌকর্য্যার্থে কতিপয় বৎসর পূর্ব্বে মাত্র জেলার সৃষ্টি হইয়াছিল। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অব্যবহিত পরে রামলোচন যশোহরে মোক্তারী করিতেন। তখনকার দিনে যাঁহাদের বাঙ্গলা ও পার্শীভাষায় একটু জ্ঞান ছিল তাঁহারাই মোক্তারী করিতে পারিতেন। ১২২৪ সালে ৬৬ বৎসর বয়সে রামলোচন মানবলীলা সম্বরণ করেন। যশোহর জেলখানার ঠিক অপর পাড়ে রামলোচনের বাসস্থান ছিল। এই বাসাবাটীতে দুরন্ত কলেরা রোগে রামলোচনের মৃত্যু হয়। রামলোচন যখন যশোহর মোক্তারী করেন তখন এরূপ স্বাধীন মোক্তারী প্রথা ছিল না, কোন জমিদারের উপলক্ষ করিয়া এখনকার 'আম মোক্তারের' ন্যায় বসিতে হইত। রামলোচনও বগচর বাবুদের উপলক্ষ করিয়া যশোহরে মোক্তারী করিতেন। তখন বগচর পোদ্দার বাবুদের প্রবল প্রতাপ। সুতরাং তিনি এক প্রবল জমিদারের আশ্রয়েই ছিলেন। উক্ত বাবুদের বহু সম্পত্তি রামলোচনের নামে খরিদ হইয়াছিল, আজিও তাহার নামীয় বহু সম্পত্তি উক্ত জমিদার বংশীয়গণের দখলে আছে।

রামলোচনের যশোহরের বাসাবাটী আজিও সেই স্থানে আছে, কিন্তু আজ তাঁহার বংশধরগণ সেই বাসাবাটীর অধিকার হইতে বঞ্চিত।

রামলোচন ১২১২ সালে লোহাগড়ায় তাহার বহির্ব্বাটীতে এক চক প্রস্তুত করিয়া উত্তরের অট্টালিকায় চণ্ডীমণ্ডপ (দুর্গোৎসব পূজাদির গৃহ), পশ্চিমের অট্টালিকায় দেবানন্দের প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীধর বিগ্রহ ও রামলোচনের ভ্রাতা মহাদেবের' প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ বিগ্রহ এখনও সংরক্ষিত আছেন। পূর্ব্ব ও দক্ষিণের পোতায় অট্টালিকাদ্বয়ের আরম্ভ মাত্র পরিলক্ষিত হয়। জগদীশ্বর রামলোচনকে দীর্ঘায়ু করিলে তাহাও বৈঠকখানা বা 'ঠাকুর দালান' রূপে পরিণত হইত। ভিতর বাটীতেও তদুপার্জ্জিত অর্থে এক সুবৃহৎ অট্টালিকা বিনির্ম্মিত হয়। এই ইমারত বর্ত্তমানে ৺বিশ্বনাথ ও ৺বিপিনবিহারী সরকার মহাশয়গণের অধিকার ভুক্ত। এই অন্দর ও বাহির উভয় স্থানের অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিতে রামলোচনের বহুসহস্র অর্থ ব্যয় হইয়াছিল। অন্দরের বাসগৃহ অতিশয় উচ্চ, প্রকাণ্ড ও সুন্দর উপকরণে নির্ম্মিত দরজা, জানালা ও কামরা সমূহ সমস্তই "খিলান করা।" চণ্ডীমণ্ডপ ও ঠাকুরদালান নানাবিধ কারুকার্য্যে বিভূষিত; শেষোক্তের গাঁথনী খিলান, প্রত্যেকের ভিত্তি উচ্চে অন্যূন আটফুট্। সরকার বাটীর দক্ষিণে ময়দানের উত্তরে যে প্রশস্ত পুষ্করিণী যাহা বর্ত্তমানে ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের সাহায্যে সংস্কার হইয়াছে, তাহাও রামলোচন খনন করাইয়া তাহার উত্তরাংশে এক সুমিষ্ট আম্রকানন প্রস্তুত করেন। রামলোচনের কোন পুত্রসন্তান ছিল না। রামমণি ও সোনামণি নামে তাঁহার দুই কন্যা ছিল। রামমণির ন্যায় দয়াশীলা ও ধার্ম্মিকা রমণী তৎকালে লোহাগড়ায় অতি অল্পই দৃষ্ট হইত।

সহস্ররাম সরকার।

রামলোচন, মহাদেব ও সদাশিব তিন ভ্রাতায় চাকুরীস্থলে থাকিতেন, সুতরাং সহস্ররামকে বিষয়াদির তত্ত্বাবধানার্থ অধিকাংশ সময় বাটীতে বাস করিতে হইত। কোন সরকারী চাকুরী করিতেন না বলিয়া সহস্ররাম নিরক্ষর ছিলেন না, বাঙ্গলা ও পার্শীতে ইহার যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি ছিল। বিষয়াদির কার্য্যে ইঁহাকে সর্ব্বদা মহম্মদপুর ও যশোহর যাতায়াত করিতে হইত। ইনি স্বগ্রামে বিশেষ প্রতিপত্তিশালী ছিলেন। রামলোচন ইঁহাকে

যৎপরোনাস্তি বিশ্বাস ও স্নেহ করিতেন। সহস্ররামের ঔরসে পঞ্চাননীর গর্ভে তিন পুত্র ও তিন কন্যা জন্মগ্রহণ করে—রামধন, আনন্দময়ী, কৌশল্যা, কৃষ্ণধন, ঈশ্বরী ও নবকুমার। রামধন বুদ্ধিমান ও সুচতুর ছিলেন। ইনি বাঙ্গলা ও পার্শীভাষা জানিতেন এবং যশোহরে মোক্তারী করিতেন। রামধন নিঃসন্তান ও ঈশ্বর অল্প বয়সে প্রাণ ত্যাগ করেন। আমরা কৃষ্ণধনের কথা পরে বর্ণনা করিব।

মহাদেব সরকার।

জয়কৃষ্ণের তৃতীয় পুত্র মহাদেব বিদ্বান্ ও বুদ্ধিমান্ ছিলেন। তিনি তৎকালে বাঙ্গলা ও পার্শী ভাষায় একজন পণ্ডিত বলিয়া গণ্য ছিলেন। মহাদেব দীর্ঘকাল নাটোর রাজ কাছারীতে কার্য্যকারক ছিলেন। নাটোর সরকারে থাকিয়া মহাদেব সবিশেষ প্রতিপত্তি ও যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করেন। ইনি অপুত্রক। ইঁহার করুণানাম্নী একমাত্র কন্যা ছিল। মহাদেব উপযুক্ত পাত্র দেখিয়া করুণার বিবাহ দেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় বৃদ্ধের জীবদ্দশায় করুণা পুত্রগণ সহিত অকালে মানবলীলা সম্বরণ করেন। মহাদেব নবতিবর্ষবয়ঃক্রম কালে ১২৬৩ সালে ইহধাম পরিত্যাগ করেন। মহম্মদপুর অবস্থানকালে বৃদ্ধের একটী রক্ষিতা স্ত্রীলোক ছিল, মহাদেবের জীবদ্দশায় এবং তাঁহার মৃত্যুর পরও সহস্ররাম ও সদাশিবের বংশধরগণ এই রমণীকে অর্থ সাহায্য করিয়াছেন।

সদাশিব সরকার।

সর্ব্ব কনিষ্ঠ সদাশিব প্রথমে অতি সামান্য বাঙ্গলা লেখাপড়া শিক্ষা করেন, পরে একটী ঘটনায় ইনি পার্শীভাষা শিক্ষা করিতে বাধ্য হন। সহস্ররাম কোন একটী মোকদ্দমা সংক্রান্ত দলিল পত্রের নকল আনিবার জন্য একদা সদাশিবকে মহম্মদপুরে প্রেরণ করেন। মূল দলিল পার্শী ভাষায় লিখিত থাকায় উহার নকল করা সদাশিবের ক্ষমতার অতীত হইয়া পড়ে, উহাতে আমলাগণ সদাশিবকে যথেষ্ট বিদ্রূপ করে। এই ঘটনার পর সদাশিব গৃহে প্রত্যাগমন না করিয়া কামালপ্রতাপ নামক গ্রামে কোন এক মৌলবীর নিকট পার্শীভাষা শিক্ষা করিতে থাকেন। রামলোচনের মৃত্যুর

পর সদাশিব তাহার স্থলে যশোহর বগচর জমিদারগণের মোক্তার নিযুক্ত হন। সদাশিবের ঔরসে দ্রৌপদীর গর্ভে হরচন্দ্রের জন্ম হয়।

হরচন্দ্র সরকার।

সদাশিবের পুত্র হরচন্দ্র। ইনি পার্শীতে একজন পণ্ডিত ছিলেন। হরচন্দ্র তাঁহার পিতার স্থানে যশোহরে বকচর বাবুদের মোক্তারী করিতেন। হরচন্দ্র একজন শিক্ষিত ও বীর্য্যবান পুরুষ। ইহার শরীরে সিংহের ন্যায় বল ছিল। ১২৯৫ সালের কার্ত্তিক মাসে ৮২ বৎসর বয়সে ইহার মৃত্যু হয়। হরচন্দ্রের দুই বিবাহ। জ্যেষ্ঠা ধনমণির গর্ভে একমাত্র কন্যা মুক্তেশ্বরী এবং কনিষ্ঠা কৃষ্ণমণির গর্ভে চারিপুত্র ও তিনকন্যা জন্মগ্রহণ করে। মুক্তেশ্বরী বাল-বিধবা। ধনমণি অপুত্রক বলিয়া নিবারণকে পালিত পুত্ররূপে গ্রহণ করেন। নিবারণের চারিপুত্র ও তিনকন্যা। জ্যেষ্ঠ বিজয়কুমার ও তৃতীয় উপেন্দ্রকুমার অকালে পরলোক গমন করেন। মধ্যম ব্রজেন্দ্রকুমার ও কনিষ্ঠ সুরেন্দ্রকুমার জীবিত। ইঁহারা উভয়েই বিদ্বান্ ও বুদ্ধিমান। ব্রজেন্দ্র বি, এল্, খুলনায় ওকালতী করেন। সুরেন্দ্র ১৯২০ খৃঃ বি, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতা মহানগরীতে ব্যবসায় করিতেছেন। ব্রজেন্দ্র ও সুরেন্দ্রের ন্যায় বিনয়ী, শান্ত ও সরল প্রকৃতির লোক লোহাগড়া গ্রামে বর্ত্তমানে দৃষ্ট হয় না। ব্রজেন্দ্র দশানি নিবাসী জমিদার ৺যদুনাথ বিশ্বাসের তৃতীয়া কন্যাকে বিবাহ করিয়াছেন। ইঁহার পুত্রেরা নাবালক।

হরচন্দ্রের কনিষ্ঠা পত্নীর গর্ভে তারিণীচরণ, বিপিনবিহারী, যদুনাথ ও যোগেন্দ্রের জন্ম হয়। তারিণীচরণ সরল ও মধুরভাষী ছিলেন। ১২৯৮ সালে একমাত্র পত্নী ও কন্যা সরোজিনীকে রাখিয়া পরলোক গমন করেন। মধ্যম বিপিন বিহারী রেলে চাকুরী করিয়া ভগ্নস্বাস্থ্য হইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করেন। গত ১৩৩০ সালে ইঁহার মৃত্যু হয়। তৃতীয় যদুনাথ সবিশেষ অধ্যবসায়ী ছিলেন। ইনি এণ্ট্রান্স পাশের দশ বৎসর পরে এফ্, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। যদুনাথ পরশ্রীকাতর ছিলেন। ইহার দুই কন্যা কুমুদিনী ও রঙ্গিনীবালা। রঙ্গিনীবালা দুইটি নাবালক পুত্র রাখিয়া পরলোক গমন করেন। কুমুদিনী স্বামীগৃহে সিদ্ধিপাশায় বাস করিতেছেন।

হরচন্দ্রের কনিষ্ঠপুত্র যোগেন্দ্রনাথ অতিশয় সরলপ্রকৃতির লোক ছিলেন। ইনি লোহাগড়া উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে ক্লার্কের কার্য্য করিতেন। গত ১৯১৭ খৃঃ অগ্রাশয়ের গ্যান্‌গ্রিন রোগে পীড়িত হইয়া অস্ত্রোপচারের জন্য কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজে গিয়া অকালে জীবনলীলা সম্বরণ করেন। তাঁহার দুইপুত্র—অমূল্য ও প্রফুল্ল এবং এককন্যা রাধারাণী। জ্যেষ্ঠ অমূল্য কলিকাতা গবর্ণমেণ্ট আর্টস্কুলে চিত্র বিদ্যা শিক্ষা করিতেছেন। কনিষ্ঠ প্রফুল্ল বর্ত্তমান বর্ষে কলেরা রোগে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। তিনি অতি সরল অন্তঃকরণ বিশিষ্ট বলশালী যুবক ছিলেন।

৺কৃষ্ণধন সরকার।

সহস্ররামের মধ্যমপুত্র কৃষ্ণধন অতিশয় সরল, কৌতুকপ্রিয় ও উচিতবক্তা ছিলেন। ইনি বাটীতে থাকিয়া বিষয়াদি পর্য্যবেক্ষণ করিতেন এবং অতিশয় নির্ম্মল চরিত্রের ও অমায়িক স্বভাবের লোক ছিলেন। কৃষ্ণধনের পাঁচপুত্র ও দুই কন্যা। কন্যাদ্বয় আনন্দময়ী ও প্যারী। প্যারী নিঃসন্তান, আনন্দময়ীর পুত্রদ্বয় দৈবজ্ঞহাটীর রামচন্দ্র ও নকুলেশ্বর বিশ্বাস। কৃষ্ণধনের পাঁচ পুত্র যথা ব্রজনাথ, মহিমাচরণ, দীননাথ, বিশ্বনাথ ও রামনারায়ণ। কৃষ্ণধনের পত্নী যখন পাঁচটী শিশু সন্তান রাখিয়া পরলোক গমন করেন তখন রামলোচনের কন্যা রামমণি তাহাদিগকে স্তন্যদানে রক্ষা করিয়াছিলেন। ইহার অল্পকাল পরে কৃষ্ণধন যখন নাবালক সন্তানগণকে পিতৃমাতৃহীন করিয়া ইহধাম পরিত্যাগ করেন, তখন এই দয়াশীলা রমণী তাহাদিগকে সদুপদেশ দানে উৎসাহিত করিতেন এমন কি শরিকগণের বজ্রমুষ্টি হইতে এই বীরা রমণী ব্রজনাথকে রক্ষা করিয়াছিলেন। এমন রমণী জগতে দুর্ল্লভ। ১২৯১ সালের আষাঢ় মাসে রথের দিনে ঠিক যে সময় ৺জগন্নাথদেব রথে আরোহণ করেন, সেই শুভদিনে শুভক্ষণে এই পুণ্যবতী স্বর্গারোহণ করেন। কৃষ্ণধনের চতুর্থ পুত্র ৺বিশ্বনাথ সরকার এই দয়াবতীর শ্রাদ্ধে বহু অর্থ ব্যয় করিয়া নবদ্বীপ, শান্তিপুর, বাকলা প্রভৃতি স্থানের ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া ও সহস্রাধিক দরিদ্রকে অন্নবস্ত্র দান করিয়া তাহার যথোপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

রামলোচনের দ্বিতীয়া কন্যা সোনামণির পুত্র দশানি নিবাসী প্রাণনাথ বিশ্বাস।

কৃষ্ণধনের জ্যেষ্ঠ পুত্র ব্রজনাথ অমিততেজা ও দুর্দ্ধর্ষ ছিলেন। ইহার ন্যায় রূপবান ও ক্ষমতাশালী পুরুষ তৎকালে লোহাগড়ায় অতি অল্পই দৃষ্ট হইত। তাঁহার উন্নত ললাট ও আকর্ণ-বিস্তৃত চক্ষু আপামর সাধারণের ভীতি উদ্দীপক ছিল। ব্রজনাথ বিদ্বান ও বুদ্ধিমান ছিলেন। তাঁহার ন্যায় অসীম সাহসী পুরুষ তৎকালে অতি বিরল ছিল; লোকে তাহাকে "বাঘরাশে পুরুষ" বলিত; কি দুর্ব্বল কি বলবান সকলেই তাঁহার আশ্রয় পাইতে লালায়িত হইত। অল্পবয়সে ব্রজনাথের পিতৃবিয়োগ ঘটে এবং তৎসঙ্গে বিষয় সম্পত্তির সমগ্র ভার তদীয় স্কন্ধে পতিত হয়। বহুদিন এই গুরুভার বহন করিতে না করিতে ১২৭০ সালের কার্ত্তিক মাসে স্ত্রী হরমণি ও একমাত্র নাবালক পুত্র অম্বিকাচরণকে রাখিয়া তিনি অমরধামে গমন করেন।

ব্রজনাথের পুত্র অম্বিকাচরণ পিতার ন্যায় সাহসী ও কার্য্যকুশল ছিলেন। বহুস্থানে ইংরাজী ভাষা শিক্ষা করিয়া ঘটনাচক্রে তাঁহার ভাগ্যে এণ্ট্রান্স পাশ করা ঘটে নাই। শুধু বিদ্যালয়ের শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াও অম্বিকাচরণের ন্যায় বুদ্ধিমানও বিবেচক ব্যক্তি অতি অল্পই দৃষ্ট হইত। ইনি উচ্চাভিলাষী ও ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন। ১২৯৭ সালে ফাল্গুন মাসে দুরন্ত কলেরা রোগে মাত্র ৩৪ বৎসর বয়সে শোকসন্তপ্ত পরিবার-বর্গকে দুঃখনীরে ভাসাইয়া স্বর্গধামে চলিয়া যান। মৃত্যুকালে পত্নী বিধুমুখী ও নাবালক পুত্র মহেন্দ্রনাথকে ৺বিশ্বনাথ সরকারের হস্তে সমর্পণ করিয়া যান। অম্বিকাচরণ বিশ্বনাথের দক্ষিণ হস্তস্বরূপ ছিলেন। তিনি তাঁহাকে পুত্রনির্ব্বিশেষে গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। অম্বিকাচরণ আরও কিছুদিন জীবিত থাকিলে এই পরিবারের সাংসারিক বিশেষ উন্নতি সাধিত হইত। অম্বিকাচরণের স্ত্রী মহেন্দ্রনাথের জননী পরম সৌভাগ্যবতী নারী। ইঁহার ন্যায় ধর্ম্মপ্রাণা, নিরহঙ্কারা ও করুণহৃদয়া অতি অল্পই দৃষ্ট হয়। সকলের সহিত সমানভাবে মেলামেশা করিতে তিনি কখনই কুণ্ঠিত হন নাই, একারণ গ্রামস্থ মহিলাগণ তাঁহাকে অদ্যাবধি শ্রদ্ধা ও সম্মানের চক্ষে অবলোকন করেন। তিনি বহুতীর্থ পরিভ্রমণ করিয়া বর্ত্তমানে জীবনের অবশিষ্ট কাল শ্রীধাম নবদ্বীপে অতিবাহিত করিবার অভিপ্রায়ে তথায় অবস্থান করিতেছেন।

কৃষ্ণধনের দ্বিতীয় পুত্র মহিমাচরণ খুলনা ও যশোহর কালেক্টরীতে

চাকুরী করিয়া ১২৭১ সালের বৈশাখ মাসে যশোহর নগরীতে মানবলীলা সম্বরণ করেন। মহিমাচরণ নিঃসন্তান।

কৃষ্ণধনের তৃতীয় পুত্র দীননাথ ১২৭৬ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁহার ও পুত্রসন্তান ছিল না।

ডাঃ মহেন্দ্রনাথ সরকার এম, এ, পি এইচ, ডি।

বিংশ শতাব্দীতে যাঁহারা স্বীয় সাধনা, গভীর গবেষণা ও অসামান্য প্রতিভা-বলে সুধী সমাজে সুপণ্ডিত বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছেন, ডাক্তার মহেন্দ্রনাথ তাঁহাদের অন্যতম।

অম্বিকাচরণের একমাত্র পুত্র মহেন্দ্রনাথ ১২৯২ সালের ১১ই জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার জন্মগ্রহণ করেন। মহেন্দ্রনাথের জন্মে লোহাগড়া গ্রাম সত্য-সত্যই ধন্য হইয়াছে। মহেন্দ্রনাথ জ্ঞানে, চরিত্রে ও ধর্ম্মনিষ্ঠায় শুধু সরকার বংশ নয় স্বজাতি ও স্বগ্রামকে পবিত্র করিয়াছেন। ৺অম্বিকাচরণ মৃত্যুকালে নাবালক পুত্র মহেন্দ্রনাথকে ৺বিশ্বনাথ সরকারের হস্তে সমর্পণ করিয়া যান। বাল্যকালে মহেন্দ্রনাথের লেখাপড়ার উপর বিশেষ যত্ন ছিল না, ক্রমে বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার জ্ঞান পিপাসা বৃদ্ধি হইতে থাকে। তিনি ক্রমান্বয়ে এফ, এ ; বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে সম্মানের সহিত এম, এ উপাধি প্রাপ্ত হন। তৎপর ১৯০৯ খৃঃ কলিকাতা গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত কলেজে দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। অধ্যাপনা কার্য্যে মহেন্দ্রনাথের বিশেষ সুখ্যাতি আছে। তিনি ১৯১৯ খৃঃ স্বীয় সাধনায় গভীর গবেষণাপূর্ণ দার্শনিক প্রবন্ধ লিখিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে দর্শনশাস্ত্রে সর্ব্বোচ্চ উপাধি Ph, D, (Doctor of Philosophy) আখ্যা প্রাপ্ত হন।

ডাক্তার মহেন্দ্রনাথ বৈশ্য-বারুজীবি জাতির উজ্জ্বলতম রত্ন—সুন্দর ও সাম্য তাহার মূর্ত্তি, যেমন তিনি সুলেখক তেমনই সুবক্তা। ইঁহার ন্যায় বিদ্বান, বুদ্ধিমান ও ধার্ম্মিক এতদ্দেশে দৃষ্ট হয় না। গৃহী হইয়াও সন্ন্যাসীর ন্যায় সর্ব্বদা ভগবৎ চিন্তায় জীবন অতিবাহিত করিতেছেন। মহেন্দ্রনাথের অনুগ্রহে সারদাপীঠাধ্যক্ষ জগদ্‌গুরু শ্রীশ্রীশঙ্করাচার্য্যের পদধূলিতে লোহাগড়া গ্রাম পবিত্র হইয়াছে। দীন, দুঃখী ও আর্ত্তের দুঃখ দূর করিতে মহেন্দ্রনাথ সতত সযত্ন। মহেন্দ্রনাথ জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে সকলকে ভালবাসেন। তিনি তাঁহার কাছে



ডাঃ শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ সরকার

এম এ, পি, এইচ, ডি.

(অধ্যাপক গভর্ণমেণ্ট সংস্কৃত কলেজ কলিকাতা।)

পৃঃ ১৫৩

রাখিয়া বহু ছাত্রকে মানুষ করিয়া দিয়াছেন। তাঁহারই উদ্যোগে লোহাগড়া লাইব্রেরীর প্রথম ভিত্তি স্থাপিত হয়। সাধু সন্ন্যাসীকে আশ্রয় দিয়া যথাসাধ্য দান করিতে তিনি কখনও কুণ্ঠিত নহেন।

ডাঃ মহেন্দ্রনাথের নির্ম্মল চরিত্র ও অসীম জ্ঞানভাণ্ডার অবলোকন করিয়া গ্রামস্থ আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই তাহাকে ভক্তি ও শ্রদ্ধা করেন। ইঁহার ন্যায় জ্ঞানী, পূতচরিত্র, সংযমী, মিতভাষী, সৎস্বভাব ও সাধু প্রকৃতির লোক কখনও লোহাগড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন নাই। মহেন্দ্রনাথ লোহাগড়া নিবাসী প্রসিদ্ধ মজুমদার বংশীয় রায় যদুনাথ মজুমদার বাহাদুর সি, আই, ইর জ্যেষ্ঠা কন্যা লীলাবতীকে বিবাহ করেন। ইহার গর্ভে মহেন্দ্রনাথের একটী মাত্র কন্যা জন্মগ্রহণ করিয়া অতি অল্পবয়সে মানবলীলা সম্বরণ করে।

ইংরাজী দার্শনিক গ্রন্থ লিখিয়া ডাঃ মহেন্দ্রনাথ দেশ বিদেশে বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। তিনি কলিকাতা, ঢাকা, কাশী, আগ্রা ও হরিদ্বারে গুরুকুল বিশ্ববিদ্যালয়ে বি, এ, ও এম, এ, পরীক্ষার পরীক্ষক নিযুক্ত হইয়াছেন। ইউরোপীয় ও হিন্দু দর্শনের বিশেষজ্ঞ মিষ্টার এ, বি, কিথ্ তাঁহার History of Sanskrit literature পুস্তকে ভারতবর্ষের আধুনিক দার্শনিক লেখক-দিগের ভিতর সসম্মানে ডাঃ সরকারের নাম উল্লেখ করিয়াছেন এবং তাঁহার পুস্তক হইতে অনেক Reference উল্লেখ করিয়াছেন। বিশ্ববিশ্রুত ফরাসী লেখক রোমান রোলা (Romain Rolland) তাঁহার মায়া ও মুক্তির যাত্রা প্রবন্ধে ডাক্তার সরকারের 'Comparative Studies in vedantism' প্রামাণিক পুস্তকরূপে গ্রহণ করিয়াছেন এবং তাহা সাধারণ সমক্ষে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। (vide Prabuddha Bharata June 1930, P. 298)

দার্শনিক ক্ষেত্রে মহেন্দ্রনাথের স্থান কোথায়, তাহা আলোচনার সময় এখনও আসে নাই সত্য; কিন্তু একথা অসঙ্কোচে বলা যাইতে পারে যে, উত্তরকালে সুধী সমালোচককে মহেন্দ্রনাথের প্রতিভার যোগ্য সমাদর অবশ্যই করিতে হইবে। তাঁহার রচিত গ্রন্থগুলি দার্শনিক সাহিত্য ভাণ্ডারে সুদীর্ঘকালের জন্য অমূল্য সম্পদরূপে সঞ্চিত থাকিবে একথা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি। তাঁহার রচিত (১) System of Vedantic Thought and Culture (২) Comparative studies in Vedantism, (৩) Mysticism in Bhagabat Gita দার্শনিক সমাজে শুধু চিত্ত বিনোদন করিবে না,

চিরন্তন চিন্তার যথেষ্ট অবকাশ ও প্রদান করিবে। তিনি পাশ্চাত্য দর্শন-শাস্ত্রে সুপণ্ডিত বলিয়া ভারতের অতিবৃদ্ধ ব্রাহ্মণদিগের দর্শন-শাস্ত্র সমূহের প্রতি অনাদর বা উপেক্ষা প্রদর্শন করেন নাই। প্রত্যুত, ভক্ত শিষ্যের ন্যায় প্রাচীন আর্য্য ঋষিগণের দর্শন-শাস্ত্র গুলি সম্যক্ অধ্যয়ন করিয়া প্রাচ্য দর্শন-শাস্ত্রে পারংগম হইয়াছেন। তাঁহার প্রথম পুস্তকখানি (System of Vedantic Thought and Culture) কলিকাতা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম, এ, পরীক্ষার পাঠ্যরূপে নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

সরল মধুর স্বভাব—ভক্তিবিনম্র ব্যবহার, অকলঙ্ক চরিত্র মহেন্দ্রনাথের জীবনের একমাত্র বিশেষত্ব। তিনি যে প্রতিভা লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাহা ভগবানের দান ও পূর্ব্বজন্মের সাধনার নিদর্শন। কালে হয়ত ডাঃ মহেন্দ্রনাথকে লোকে ভুলিয়া যাইবে কিন্তু দার্শনিক মহেন্দ্রনাথ ভারতের দর্শন গগনে উজ্জ্বল নক্ষত্ররূপে চিরকাল বিরাজ করিবেন।

তৎপ্রকাশিত পুস্তক সমূহ সম্বন্ধে লণ্ডনের বিশেষজ্ঞ পত্রিকাসমূহে যে সকল অনুকূল সমালোচনা, স্তুতিবাদ ও ওজস্বিনী ভাষায় উচ্চ প্রশংসা প্রকাশিত হইয়াছে তাহা অস্মদ্দেশীয় অতি অল্প লোকের ভাগ্যেই ঘটিয়া থাকে।

ডাঃ মহেন্দ্রনাথ তাঁহার পুস্তকের জন্য পাশ্চাত্য প্রদেশ হইতে যে সমস্ত উচ্চ প্রশংসাবাদ প্রাপ্ত হইয়াছেন ও হইতেছেন উহার ২।১টী আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

ASIATICA OF LONDON.

June-July, 1929.

Sircar (Mahendra Nath) Comparative studies in Vedantism, 8vo, P,P xii & 314, 14s.

Dr. Sircar gives us in this volume a concise interpretation of the Philosophical concepts involved in Vedantism according to the different main Schools which have made these concepts their special study. It is a difficult book to follow, inspite of great clearness in presentation, because the European mind must always find difficulty in understanding the technical expressions of a weltasschanung entirely remote from its own. There have been but few scholars of the type and with the qualifications of M. Masson—oursel, to prepare the way for a really intelligent study of oriental Philosophies.

Philosophy, says Dr. Sircar Knows no barrier .... unfailing consoling.' All this is true enough, but there is perhaps no greater danger than the development of an attachment to a philosophical system without the most profound understanding of its fundamental principles. We have in the west too many unfortunate examples of attempts to adapt Eastern theories to Western facts. Fortunately, Dr. Sircar's book is one, not for such dilettanti but for the scientific student who is as ready to labour over its 'termini technici' as the chemist over the elements of the compound he is studying. "Vedantism is the Philosophy of the self-conscious. It is preeminently the search for the self." We have been repeatedly impressed by the similarity of aim, though upon different planes, between Vedantism & certain other oriental Philosophies and the most modern school of Psychology in the west. Both are concerned with consciousness from the dynamic point of view, both consider the development and extension of consciousness their essential aim, each we imagine, would do well to learn something of the other.

We can not here do more than draw the attention of the reader to Dr. Sircar's very interesting section on Dialectic in love, in which he explains the ideas of the Vaisnava school upon the development of consciousness through love and joy, and his remarks in the final chapter, Realization and Disciple, upon the same subject.

CHURCHES TIMES OF LONDON.

27th September, 1929.

THE VEDANTA.

Comparative studies in Vedantism. By Mahendra Nath Sircar, M.A.PH.D. Professor of Philosophy, Sanskrit College (Oxford University Press. 14s.)

Vedantism is the name of the most widespread of the six philosophical systems of the Brahmans, representing the common belief of nearly all reflective Hindus. It grew out of the teachings of Upanishads ; the first formal presentation of the doctrine was given by Badarayana, though it was Samkara who gave the system the form in which it is accepted by the majority of its adherents.

* * * * * *

The Vedanta is the philosophy of the self conscious, the search

for the inner and true essence animating our being. Thus even in its theistic or Vaisnavistic form, it represents God—consciousness, as metaphysically an implication of self consciousness and psychologically involved in it.

* * * * * *

It must be admittted, however, that the system proceeds from a cosmogony that is not easy to reconcile with our modern evolutionary outlook. True, as our author points out, Vedantism conceives successive stages in the emergence of the cosmos as a cyclic movement of the Divine consciousness in time and space. Becoming is the expression of the Divine in the Upanishads; Brahman having created the world, enters it through the individual soul. In this conception the germs of the empirical and metaphysical doctrines of Vedantism lay side by side till they were developed as separate doctrines into the identity of the soul with Brahman on the one hand, and the unfolding of the world of sense on the other. But instead of an evolutionary process as the expression of Divine creative activity, a periodic cycle of creation and re-absorption is postulated which must repeat itself without ceasing and without changing the stability of a world without beginning. Into this epistemological and metaphysical scheme the atomicity of matter does not enter. In such a very specialized department of research as that which this learned volume deals we do not feel competent to pass judgment on the technical questions involved in the discussion of the complex material here brought under survey but Professor Sircar is manifestly a master of his subject, and he writes with the clearness and insight of the trained scholar in a difficult and obscure, but by no means unimportant field of Indian culture. The book well repays the intellectual demands it makes upon the reader.

ডাক্তার সরকারের বেদান্ত-দর্শন সম্বন্ধে জানুয়ারী মাসের "Quest" পত্রিকার সম্পাদক Mr. D. R. S. Mead তাঁহার "Reasonable Relative Reality" প্রবন্ধের মধ্যে যাহা লিখিয়াছেন, তাহার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল।—

I have nowhere else come across so penetrating an insight as is the above, into the fundamental features of these two great

systems; and they are,—do not let us forget,—typical of the conflict about the ultimate problems philosophy and theology wherever it is found. Prof. Sircar's exposition is a valuable and impartial corrective to the usual run of such studies and takes the whole dispute into a clear and same atmosphere. It rounds off very happily also, I venture to think my own tentative considerations in endeavouring to express the meaning of what I have called 'Reasonable Relative Reality moreover I am the more happily grateful to Prof. Sircar for his help, because I penned the rest of my paper before turning to his arresting volume, and after donig so found I had nothing essential to unsay. But we should not forget that we are all prone to praise what we find ourselves already in agreement with, we always like to find our 'pre-judices' confirmed.'

অবশেষে তিনি এই প্রবন্ধের ফুটনোটে লিখিয়াছেন।

It is difficult but highly informative work by an admirable scholar, who has at his finger-ends all the many commentaries, most of which have never been translated, and who is also well-read in western philosophizing, I would recommend it heartily to serious students of Indian Philosophy, who desire to obtain a clear insight into the subtleties of these two great modes or systems of Vedantic thinking, but who, I must add, have also the courage not to be frightened off by technical Sanskrit terms.

গীতা সম্বন্ধে ভূয়সী প্রসংশাপূর্ণ রিভিউ নানাবিধ পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে তাহা সম্পূর্ণ প্রকাশ করা এখানে সম্ভব নহে। আমরা এই সমস্ত রিভিউ হইতে কিছু কিছু অংশ উদ্ধৃত করিলাম। যথা—

Maha-Bodhi July 1930; "We are bound to say that Dr. Sircar's work is a masterly analysis of the teachings of the Gita as they are. We are certain that this work, along with Sj. Auro Bindo Ghose's well known introduction to the Gita will be read, for a long time to come, with much profit and interest by all those who want to understand the teachings of the Bhagavat Gita—a monumental work in Sanskrit.

Prabuddha Bharata (June), says:—"* * * The writing is characterised by the depth and sublimity of a sermon. * * *"

The Indian Review (April, 1930), says:—"* * * Professor Sircar has penetrated to the core of the Geeta.

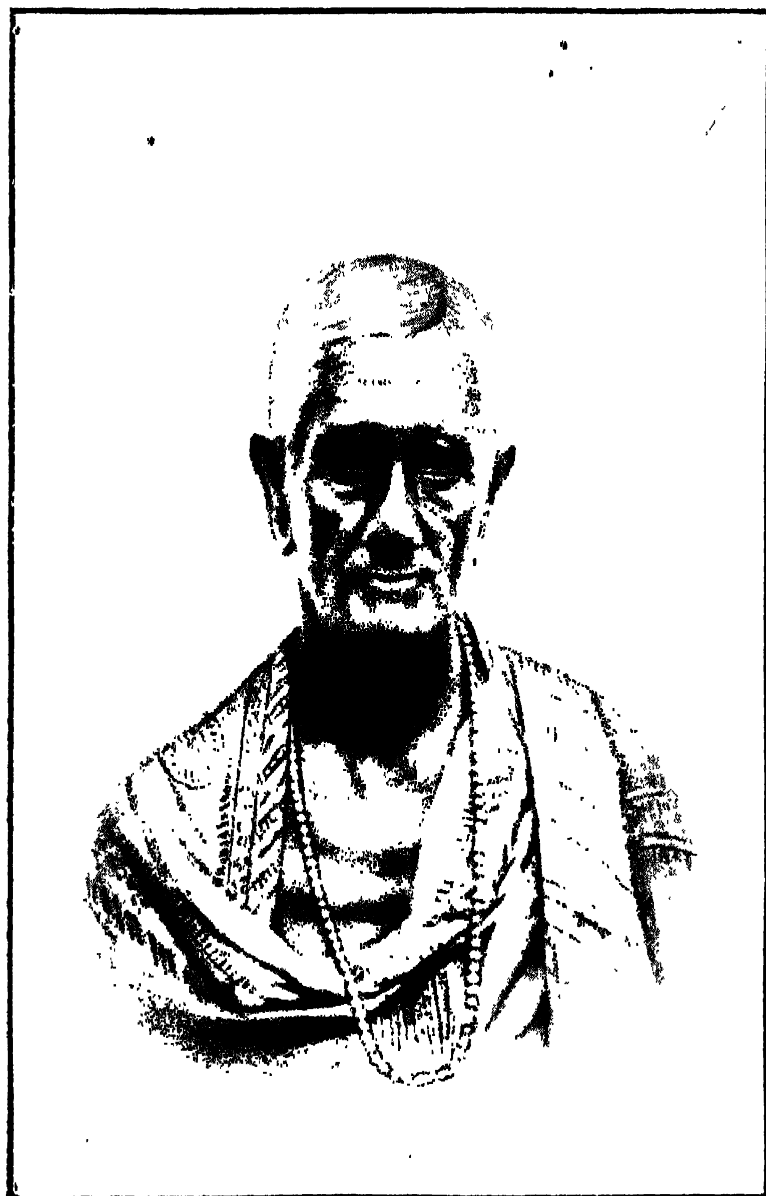
The Guardian (Feb. 27, 1930), says :—"* * * The account which Professor gives of mysticism in the Geeta bears the stamp of a thoughtful mind and has the impress of experience that knows no conflict. The author is in tune with the mystic vision he describes with such consummate skill. * * *"

The Hindu (Literary Supplement, Feb. 29, 1930). writes :—"The book is a clear and careful presentation of all the salient points in the Mysticism of the Bhagavat Geeta.* * *"

The Calcutta Review (May, 1930), writes :—"* * * The pages of the book are replete with observations, which are striking and arresting alike for their philosophical cogency and intuitive realisation which they indicate.* * *"

স্বর্গীয় বিশ্বনাথ সরকার।

১২৫১ সালের আষাঢ় মাসে কৃষ্ণধনের চতুর্থপুত্র বিশ্বনাথের জন্ম হয়। ইহার দুই পুত্র ও চারিকন্যা—ক্ষীরোদা, কালীপ্রসন্ন, অবিনাশ, সুখদা, মোক্ষদা, ও জ্ঞানদা। বিশ্বনাথ গ্রাম্য পাঠশালায় সামান্য শিক্ষালাভ করিয়া পরে বাটীতে পণ্ডিতের নিকট কিছুদিন অধ্যয়ন করেন, কিন্তু ১৬।১৭ বৎসর বয়সে তাঁহার জ্যেষ্ঠ তিন সহোদরের মৃত্যু হওয়ায় সমগ্র সংসারের ভার তাহার স্কন্ধে পতিত হয়। অতি অল্প বয়সে বিশ্বনাথ জটিল বৈষয়িক কার্য্যে বুদ্ধিমত্তা প্রদর্শন করেন এবং কালক্রমে সংসারে বিশেষ উন্নতি করিয়া বিষয়-সম্পত্তি দশগুণ বৃদ্ধি করিয়া যান। ব্যবসায়িক ও বৈষয়িক বুদ্ধি তাঁহার অত্যন্ত প্রখর ছিল। বিশ্বনাথ অতিশয় স্থির, ধীর, বুদ্ধিমান ও বিবেচক লোক ছিলেন। কুটিল বিষয়জ্ঞ হইলেও অতি সরল স্বভাব এবং সর্ব্বদা পরহিতে রত তাহার ন্যায় অতি অল্পই দৃষ্ট হইত। বিশ্বনাথ অতিশয় অমায়িক ও ধার্ম্মিক ছিলেন। ১৩২৯ সালের ১৯শে বৈশাখ তারিখে নিজ বাটীতে ৺শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করত তাহাতে 'বিশ্বনাথ শিব' স্থাপন করিয়া তাঁহার নিত্য পূজার ব্যবস্থা করিয়াছেন। তিনি দেবদ্বিজে বিশেষ ভক্তিমান্ ছিলেন। নবদ্বীপ হইতে পণ্ডিত আনাইয়া ১৩৩১ সালের মাঘ মাসে একমাসকাল বাটীতে শ্রীভাগবত পাঠ করাইয়াছেন। বিশ্বনাথ শুধু বিষয়-সম্পত্তি বৃদ্ধি করেন নাই, তেজারতি, মহাজনী ও কারবার করিয়া বহু অর্থ অর্জ্জন করিয়াছেন। লোহাগড়া ও নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহে বিশ্বনাথ বিশেষ সুখ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন।



স্বর্গীয় বিশ্বনাথ সরকার

পৃঃ ১৫৯

যেখানে যে কোন বৃহৎ কার্য্য অনুষ্ঠিত হইয়াছে সেখানেই তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম দ্বারা উহা সুসম্পন্ন করিয়া দিয়াছেন। দান, ধ্যান তীর্থপর্য্যটন প্রভৃতি বহুসৎকার্য্যে বহু অর্থ ব্যয় করিয়াছেন।

১৩২২ সালে স্বীয় আলয়ে বিশ্বনাথ স্বজাতির উন্নতিকল্পে বঙ্গীয় বৈশ্যবারুজীবি সভা আহ্বান করিয়া স্বজাতিপ্রীতিপ্রদর্শন করেন। ১২৯২ সালের মাঘ মাসে পিসিমাতা রামমণি দাসীর জন্য দান সাগর শ্রাদ্ধ ও তদুপলক্ষে নবদ্বীপ, বাকলা, বিক্রমপুর নিবাসী একশত পণ্ডিত, ব্রাহ্মণ, স্বজাতি ও সহস্রাধিক দুঃখী ও প্রজাবর্গকে পরিতোষমত ভোজন করান। বিশ্বনাথ তাঁহার পিতার স্মৃতি রক্ষার্থে নড়াইলে তাঁহার পিতার নামে 'কৃষ্ণধন ওয়ার্ড' নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন।

বিশ্বনাথ দশানি (বাগেরহাট) নিবাসী ৺মহেশচন্দ্র বিশ্বাস মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা পরশমণির পাণি গ্রহণ করেন। ১৩১১ সালের ভাদ্র রবিবার দশমী তিথিতে বিশ্বনাথের পত্নী পরম সৌভাগ্যবতী পরশমণি স্বর্গারোহণ করেন। বহুতীর্থ পর্য্যটন করিয়া সতীর আরাধ্যভূমি রাজপুতনার অন্তঃপাতী ৺পুষ্কর তীর্থে গমন কালে দুরন্ত কলেরা রোগে ইহার মৃত্যু হয়। ইঁহার ন্যায় দানশীলা, পরহিতকারিণী, ধর্ম্মপরায়ণা সতী রমণী অল্পই দৃষ্ট হইত। নিরক্ষরা হইয়াও ইনি প্রায় প্রত্যহ রামায়ণ, মহাভারত ও অন্যান্য ধর্ম্মপুস্তক শ্রবণ করিয়া আত্মার উৎকর্ষ সাধন ও জীবন চরিতার্থ করিতেন।

বিশ্বনাথ জিদি পুরুষ ছিলেন। স্থানীয় রায়বংশের সহিত ১৩০২।৩ সালে তাহার ভীষণ গোলযোগের সৃষ্টি হয়। ৺প্রসন্নগোপাল রায় যখন রায় এষ্টেটের কমন্ ম্যানেজার তখন বিশ্বনাথ জয়পুরের চরে একটি হাট মিলাইবার চেষ্টা করেন। এই হাট লইয়া রায়বংশের সহিত সরকার বংশের দলাদলির সৃষ্টি হয়। সরকার বংশীয়রা ও রায় বংশীয়রা পরস্পর পরস্পরের বাড়ীতে খাওয়া বন্ধ করিলেন, কিন্তু উভয়েই দত্ত-মজুমদার বংশীয়দের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতেন। রায়বংশীয়দের বাজার যখন বিশ্বনাথের প্রতাপে ধ্বংস পথে চলিতে বসিল তখন রায়বংশীয়রা অনন্যোপায় হইয়া মজুমদার বংশোদ্ভব মহাপুরুষ যদুনাথ মজুমদারের শরণাপন্ন হন। বিপন্নকে সাহায্য করিতে যদুনাথ চিরদিনই মুক্তহস্ত। তিনি স্বীয় বুদ্ধি

কৌশলে রায়বংশীয়দের বাজার রক্ষা করিয়া দেন। এই রায় ও মজুমদার বংশীয়দের যোগাযোগ হওয়ায় বিশ্বনাথ হাইকোর্ট পর্য্যন্ত মামলা চালাইয়া জয়লাভ করেন বটে, কিন্তু হাট মিলাইতে অকৃতকার্য্য হন। তাঁহার হাট মিলাইবার চেষ্টা ফলবতী হয় না। কিন্তু রায়-সরকার বংশীয়দের দলাদলি বহুদিন যাবৎ চলিতে থাকিয়া অবশেষে শ্রীযুত কেদারনাথ সরকার ও ডাঃ যোগেন্দ্র গোপাল রায় মহাশয়দ্বয়ের কন্যার বিবাহ উপলক্ষে ঐ দলাদলির নিষ্পত্তি হইয়া যায় এবং তৎসময় হইতে পরস্পর পরস্পরের বাড়ীতে নিমন্ত্রণাদি গ্রহণ করিয়া থাকেন।

১৩৩২ সালের ৪ঠা কার্ত্তিক তারিখে বিশ্বনাথ তাহার কনিষ্ঠ পুত্র অবিনাশচন্দ্রের যশোহরস্থ বাসাবাটীতে দিবা দ্বিপ্রহরে সজ্ঞানে স্বর্গারোহণ করেন। তৎপর তাহার মৃতদেহ কলিকাতায় গঙ্গাতীরে আনয়ন করিয়া নিমতলা শ্মশানঘাটে অতি সমারোহের সহিত সৎকার করা হয়। ঐ সনের ৪ঠা অগ্রহায়ণ লোহাগড়া গ্রামে অতি সমারোহের সহিত তাঁহার আদ্যশ্রাদ্ধ সুসম্পন্ন হইয়াছিল। নবদ্বীপ, কলিকাতা প্রভৃতি স্থান হইতে বহু পণ্ডিত নিমন্ত্রিত হইয়া শ্রাদ্ধবাসরে যোগদান করিয়াছিলেন। তাঁহার শ্রাদ্ধবাসরে যেরূপ সভার অধিবেশন হইয়াছিল এরূপ এতদ্দেশে অল্পই দৃষ্ট হয়। দান-সাগর ও তোরণ বৃষোৎসর্গ হইয়াছিল এবং বহু সহস্র লোক নিমন্ত্রিত হইয়া ভুরিভোজনে বিশেষ আপ্যায়িত হইয়াছিল।

বিশ্বনাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র * কালীপ্রসন্ন এই পরিবারের কর্ত্তা এবং লোহাগড়া সরকার এষ্টেটের কমন্ ম্যানেজার ছিলেন। সর্ব্বদা দেবদ্বিজে ভক্তিমান। সন ১৩২৮ সালের আষাঢ় মাসে ৺জগন্নাথক্ষেত্র হইতে সুদূর ওয়ালটিয়ার, গোদাবরী, রামেশ্বর এবং ত্রিপদী মহকুমার অন্তর্গত পার্ব্বতির দুরারোহ বালাজি পর্ব্বতে আরোহণ করত চতুর্ভুজ নারায়ণ দর্শন করেন। এবং ১৩৩০ সালে প্রয়াগে কুম্ভমেলা উপলক্ষে গমন করত আগ্রা, বৃন্দাবন, জয়পুর, পুষ্কর, আজমীর, দ্বারকা ইত্যাদি বহু তীর্থ ভ্রমণ করিয়া আসেন এবং মাতার স্মৃতি উপলক্ষে আজমীরে বাঙ্গালী ধর্ম্মশালায় বাঙ্গালীদিগের থাকিবার জন্য একটি সুন্দর গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দেন এবং উভয় ভ্রাতা মাতৃস্মৃতিকে সর্ব্বদা

* ১৩৩৭ সালের ৪ঠা বৈশাখ দুরন্ত কলেরা রোগে আক্রান্ত হইয়া কালীপ্রসন্ন ৫৫ বৎসর বয়সে লোহাগড়া বাসভবনে প্রাণত্যাগ করেন।



স্বর্গীয় কালী প্রসন্ন সরকার

পৃঃ ১৬১

জাগরূক রাখিবার জন্য জয়পুর চরের শ্মশান ক্ষেত্রে তাঁহাদের মাতার নামে ১৩১২ সালের ফাল্গুন মাসে এক বিশ্রাম গৃহ ও চুল্লী এবং নবগঙ্গা নদীতে এক বাঁধাঘাট প্রতিষ্ঠা করিয়া দেশের মহান্ উপকার সাধিত করেন।

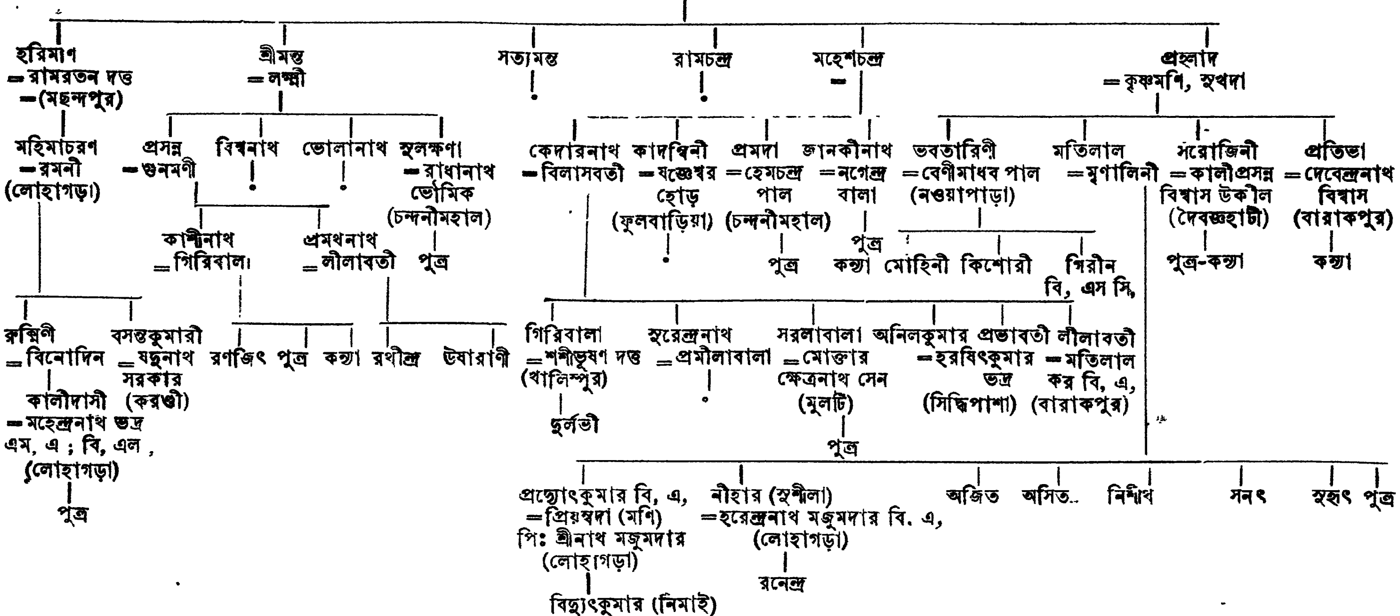
কালীপ্রসন্নের চারিপুত্র ও তিনকন্যা। জ্যেষ্ঠপুত্র পয়সকান্তি বি, এস-সি, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম, এ; বি, এল অধ্যয়ন করিতেছেন। শ্রীমান্ পয়স্কান্তির পত্নী শ্রীমতী রমলাবালা বর্ত্তমান বর্ষে প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণা হইয়াছেন। মধ্যম পুত্র দেবব্রত বঙ্গবাসী কলেজে আই, এস সি, অধ্যয়ন করিতেছেন।

বিশ্বনাথের কনিষ্ঠ পুত্র অবিনাশচন্দ্র কলিকাতা হাইকোর্টের এডভোকেট্, যশোহরে ওকালতী করেন। ইনি কচুবাড়িয়া নিবাসী ৺অভয়াচরণ সমাদ্দারের কন্যা সরলাবালার পাণিগ্রহণ করেন। অবিনাশচন্দ্রের পুত্র সন্তান নাই, মাত্র দুইটী কন্যা জন্মগ্রহণ করিয়া অল্পদিনেই পরলোক গমন করে। অবিনাশচন্দ্র ওকালতী ব্যবসায়ে সুযশ অর্জ্জন করিয়াছেন। ইনি বৈশ্য-বারুজীবি জাতির মুখপত্র বৈশ্যপত্রিকার সম্পাদকের কার্য্য করিয়া স্বজাতি-প্রীতি প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি পিতার স্মৃতি চিরস্মরণীয় করিবার জন্য যশোহরে 'বিশ্বনাথ হল' নামে বহু অর্থ ব্যয়ে একটী রিডিং রুম প্রস্তুত করিয়া সাধারণের প্রসংশাভাজন হইয়াছেন।

বিশ্বনাথের জ্যেষ্ঠা কন্যা ক্ষীরোদার সহিত নদীয়া জেলার অন্তর্গত আলামপুর গ্রামের প্রসিদ্ধ কুণ্ডু বংশীয় কৃষ্ণলাল কুণ্ডুর বিবাহ হয়। ১৩১২ সালে ক্ষীরোদা একটি পুত্র ও একটি কন্যা সহ পিত্রালয় লোহাগড়া গ্রামে কলেরা কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া পরলোক গমন করেন। তাহার একমাত্র কন্যা চমৎকারিণী। বিশ্বনাথের দ্বিতীয়া কন্যা সুখদা ১৩১৭ সালে একমাত্র পুত্র গোপীকৃষ্ণ সরকারকে রাখিয়া পরলোক গমন করেন। তৃতীয়া কন্যা মোক্ষদা একমাত্র পুত্রকে হারাইয়া জীবন্মৃত অবস্থায় বাঁচিয়া আছেন।

কৃষ্ণধনের কনিষ্ঠ পুত্র রামনারায়ণ। ১২৫৪ সালে রামনারায়ণ জন্মগ্রহণ করেন। ১৩১৭ সালের ১৭ই শ্রাবণ তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার তিন কন্যা ও দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করে। জ্যেষ্ঠ পুত্র শরৎচন্দ্রের ১২৯৩ সালে জন্ম হয় ও ১৩১০ সালে উদ্বন্ধনে মৃত্যু হয়। কনিষ্ঠ ভুবনমোহন ১২৯৬ সালে জন্মগ্রহণ করেন। ভুবনমোহন দশানি নিবাসী শশীভূষণ বিশ্বাসের কন্যা সুরাজবালাকে বিবাহ

দেবানন্দ সরকারের মধ্যম পুত্র জগন্নাথের বংশ তালিকা।





শ্রীযুক্ত অবিনাশ চন্দ্র সরকার, বি, এল,

এ্যাড্‌ভোকেট

পৃঃ ১৬০, ১৬১

করেন; অদ্যাপি ইঁহার সন্তানাদি হয় নাই। ভুবনমোহন একজন স্বদেশ-হিতৈষী ব্যক্তি। দেশহিতকর কার্য্যে বিশেষ যত্নবান্। ইনি পিতার স্মৃতি চিরস্মরণীয় করিবার জন্য লোহাগড়ার সাধারণ পাঠাগারটীকে একটী দ্বিতল অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া স্বগ্রামের উন্নতির পথ প্রশস্ত করিয়া সকলেরই ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন। ভুবনমোহন অতি সরল স্বভাব ও অমায়িক প্রকৃতির লোক। স্বগ্রামের উন্নতির জন্য ইঁহার আন্তরিক যত্ন ও চেষ্টা পরিলক্ষিত হয়।

জগন্নাথ সরকার।

দেবানন্দের মধ্যম পুত্র জগন্নাথ তদীয় পুত্রগণের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষমতাশালী ছিলেন। ইনি গ্রাম্য পাঠশালায় বাঙ্গলা, অঙ্ক ও পার্শী অধ্যয়ন করেন। মহম্মদপুর নগরে নাটোর রাজসরকারে নায়েবী কার্য্য করিয়া শেষ বয়সে সদরে বদলী হন। এই চাকুরীতে জগন্নাথ যথেষ্ট অর্থ ও সুযশ অর্জ্জন করিয়াছিলেন। সরকার বংশীয়গণ বর্ত্তমানে যে সমস্ত সম্পত্তি পুরুষানুক্রমে ভোগ করিয়া আসিতেছেন তাহার অধিকাংশই এই মহাপুরুষের স্বোপার্জ্জিত। আমডাঙ্গা, আস্তাইল, বীরমান্দলা, পানাইল, রামপুর, শ্যামপুর, নন্দীবয়রা, হামারোল, বাকাইল, সেখপুর, সূর্য্যার্ঘী এবং মধুখালী প্রভৃতি বারখানি তালুক জগন্নাথের অর্জ্জিত; ইহার অধিকাংশ দিঘাপতিয়া রাজার জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত। জগন্নাথ অপুত্রক ছিলেন কিন্তু তজ্জন্য তাঁহার বিন্দুমাত্র দুঃখ ছিল না। তিনি ভ্রাতৃদ্বয়ের সহিত একান্নে সুখে কালাতিপাত করেন। জগন্নাথ অতিশয় সদাশয় ছিলেন। ভ্রাতৃদ্বয় ও পত্নী অম্বিকাদাসীর অনুরোধে বাধ্য হইয়া তিনি কনিষ্ঠ ভ্রাতার কনিষ্ঠ পুত্র কৃষ্ণমঙ্গলকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেন। কৃষ্ণমঙ্গলের পাঁচ পুত্র ও এক কন্যা। কন্যা হরমণির সহিত মচন্দপুর নিবাসী রামরতন দত্তের বিবাহ হয়। পাঁচ পুত্র—শ্রীমন্ত, সত্যমন্ত, রামচন্দ্র, মহেশ ও প্রহ্লাদ। জ্যেষ্ঠ শ্রীমন্ত বাড়ীতে থাকিয়া বিষয়কর্ম্ম দেখিতেন। জগন্নাথের অর্জ্জিত সমস্ত অর্থ কৃষ্ণমঙ্গলের হস্তে পতিত হয়। কৃষ্ণমঙ্গল হইতে তাহার পুত্রগণ এই বিপুল ধনের অধিকারী হন। শ্রীমন্তের তিন পুত্র ও এক কন্যা—প্রসন্ন, বিশ্বনাথ, ভোলানাথ ও সুলক্ষণা। বিশ্বনাথ ও ভোলানাথ বাল্যকালে

ইহধাম পরিত্যাগ করেন। সুলক্ষণার পুত্রগণ চন্দনীমহাল গ্রামে বাস করেন। প্রসন্নকুমার বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ ছিলেন। তিনি যশোহরে কালেক্টরীর চাকুরী করিয়া অর্থোপার্জ্জন করেন। চল্লিশ বৎসর বয়সে কলেরা রোগে, আক্রান্ত হইয়া শ্বশুরালয়ে ফরিদপুর জেলার ফুলবাড়িয়া গ্রামে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার পুত্র কাশীনাথ ও প্রমথনাথ। জ্যেষ্ঠ কশীনাথ অতি তীক্ষবুদ্ধিসম্পন্ন ও প্রফুল্লচিত্ত ব্যক্তি। ইনি বর্ত্তমানে লাইফ্ এসুয়েরেন্স্ কোম্পানীর এজেন্টের কার্য্য করিয়া স্বীয় অবস্থার উন্নতি সাধন করিয়াছেন। কনিষ্ঠ প্রমথনাথ অতি সরল স্বভাব ও অমায়িক প্রকৃতির লোক। ইনি কলিকাতায় চাকুরী করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করেন।

লক্ষপতি সত্যমন্ত সরকার।

সত্যমন্ত সাতিশয় বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ ব্যক্তি ছিলেন। যৌবনের প্রারম্ভে এনন্—কোহেন ডনলপ্ সাহেবের মীরগঞ্জ কুঠীর দেওয়ানের কার্য্য করিয়া বহু অর্থ উপার্জ্জন করেন। জনশ্রুতি সত্যমন্ত এক জীবনে লক্ষ টাকা উপার্জ্জন করিয়া যান। সত্যমন্ত মিত্যব্যয়িতা গুণে মৃত্যুকালে ভ্রাতা ও ভ্রাতুষ্পুত্রগণের জন্য বহু অর্থ রাখিয়া পরলোক গমন করেন। তিনি স্বীয় সুখ স্বচ্ছন্দে কপর্দ্দক ও ব্যয় করেন নাই।

সত্যমন্ত তীক্ষবুদ্ধি সম্পন্ন ছিলেন। কুঠীর কার্য্যে অবস্থান কালে মতিচ্ছন্ন হইয়া তিনি বাটী প্রত্যাবর্ত্তন করেন, কিন্তু সম্পূর্ণ জ্ঞানহীন হন নাই, মধ্যে মধ্যে তাঁহার উন্মাদ অবস্থা দৃষ্ট হইত। তিনি নিঃসন্তান ছিলেন—৭৭ বৎসর বয়সে ১৩০২ সালে পরলোক গমন করেন। তিনি মাতৃ-শ্রাদ্ধোপলক্ষে বহু অর্থ ব্যয় করেন। সত্যমন্ত জীবনে বহু অর্থোপার্জ্জন করেন সত্য, কিন্তু তাহা ভোগ করিতে পারেন নাই। তিনি এই অর্থ চণ্ডীমণ্ডপ ও ঠাকুরদালান সংশ্লিষ্ট একটী ক্ষুদ্র দ্বিতল প্রকোষ্ঠে আবদ্ধ রাখেন। একদিন রাত্রিযোগে কাঠের জানালা ভাঙ্গিয়া চোরে ঐ অর্থ অপহরণ করে। ভাগ্যক্রমে চোর সমস্ত টাকার অনুসন্ধান পায় না, কতকাংশ মাত্র অপহরণে সমর্থ হয়। অপহৃত টাকার পরিমাণ দশ সহস্রের ন্যূন নহে। কিছুকাল পরে এই হেতু সত্যমন্তের সহিত হরচন্দ্রের পুত্রগণের তুমুল বিবাদের সৃষ্টি হয়। কৃষ্ণধনের পুত্রগণ হরচন্দ্রের পুত্রগণকে সাহায্য করেন। এদিকে রামকানুর



শ্রীযুক্তা স্বর্ণময়ী সরকার।



শ্রীযুক্ত ভুবন মোহন সরকার।
লোহাগড়া রামনারায়ণ পাবলিক
লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠাতা)

৬ ৬৩ দ্রষ্টব

সন্তানগণ সত্যমন্তদিগের সহিত যোগদান করেন। এই গৃহবিবাদ কয়েক বর্ষ-ব্যাপী হইয়া উভয়পক্ষের বহুল অনিষ্ট সাধন করে। এই বিবাদে বিশ্বনাথ ও অম্বিকাচরণ হরচন্দ্রের পক্ষ সমর্থন করেন। সত্যমন্তের এই বিপুল ধন যে জ্ঞাতিবর্গের দ্বারা অপহৃত হইয়াছিল সে বিষয়ে কাহারও কোন সন্দেহ নাই।

তৃতীয় পুত্র রামচন্দ্রের বাল্যকালে মৃত্যু হয়। তিনি নিঃসন্তান ছিলেন। চতুর্থ মহেশচন্দ্র বাটী থাকিয়া বিষয়কর্ম্ম পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। মহেশের দুই পুত্র ও দুই কন্যা—কেদারনাথ, কাদম্বিনী, প্রমদা ও জানকীনাথ। জ্যেষ্ঠ কেদারনাথ বাড়ীতে থাকিয়া বৈষয়িক কর্ম্ম পরিচালন ও সংসার প্রতিপালন করেন। ইহার পাঁচ কন্যা ও দুই পুত্র—সুরেন্দ্রকুমার ও অনিলকুমার। জ্যেষ্ঠ সুরেন্দ্রকুমার গত ১৩২০ সালে অল্প বয়সে পত্নী প্রমীলাবালাকে রাখিয়া পরলোক গমন করেন। কনিষ্ঠ অনিলকুমার শক্তিশালী যুবক। ইনি রেল বিভাগের চাকুরীতে লিপ্ত আছেন। কেদারনাথ শরিকী বাসভবন পরিত্যাগ করিয়া তাহার দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে নূতন বাড়ী নির্ম্মাণ করিয়া তথায় বসতি-বাস করিতেছেন। মহেশের কনিষ্ঠ পুত্র জানকীনাথ ব্যবসায় বানিজ্যে অর্থোপার্জ্জন করত স্বীয় অবস্থার বিশেষ উন্নতিসাধন করিয়া সুখে কালাতিপাত করিতেছেন।

স্বর্গীয় প্রহ্লাদচন্দ্র সরকার।

কৃষ্ণমঙ্গলের সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্র প্রহ্লাদ। প্রহ্লাদের দুই বিবাহ, প্রথমার গর্ভে এক কন্যা ভবতারিনী; কনিষ্ঠার গর্ভে এক পুত্র ও দুই কন্যা। কথিত আছে যৌবনের প্রারম্ভে প্রহ্লাদ প্রায় নিরক্ষর ছিলেন, লেখাপড়ায় কিছুমাত্র যত্ন ছিল না। প্রহ্লাদের এইরূপ স্বভাবে কৃষ্ণমঙ্গল তাহাকে একদিন যৎপরোনাস্তি প্রহার করেন। অভিমানী প্রহ্লাদ তাহাতে অত্যন্ত অপমানিত ও রাগান্বিত হইয়া গৃহপরিত্যাগ করিয়া নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়া অবশেষে যশোহরে হরগোবিন্দ মজুমদারের বাসায় যাইয়া উপস্থিত হন। তথায় কিছুকাল নানাবিধ সামান্য সামান্য চাকুরী করিয়া কালেক্টরীর নাজিরী পদ প্রাপ্ত হন। অবশেষে সিবিল্ কোর্টের আমিন হইয়া বহু অর্থ উপার্জ্জন করেন।

লোহাগড়া কাহিনী

লোহাগড়া নিবাসী প্রসিদ্ধ মজুমদার বংশীয় ৺তারাপ্রসন্ন মজুমদারের সহিত প্রহ্লাদচন্দ্রের বিশেষ সদ্ভাব ছিল। একই সময়ে উভয়ে যশোহরে চাকুরী করিতে যান। ১৮৫৯ খৃঃ দুই বন্ধু মিলিত হইয়া উকীল হইবার জন্য রাজসরকারে আবেদন করেন। পরে উকীল না হইয়া কালেক্টরীতে প্রহ্লাদচন্দ্র নাজীর ও তারাপ্রসন্ন মহাফেজের পদে প্রতিষ্ঠিত হন। যশোহরে চাকুরী করিয়া এই বন্ধুদ্বয় সুখ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। এই চাকুরীতে অবস্থান কালে উভয়েই একই বাসায় সপরিবারে বাস করিতেন এবং পরস্পর পরস্পরকে বিশেষ সম্মান ও শ্রদ্ধা করিতেন। মৃত্যু সময় পর্য্যন্ত তারাপ্রসন্ন ও প্রহ্লাদের মধ্যে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব অটুট ছিল।

প্রহ্লাদ অতিশয় শান্তস্বভাব, বুদ্ধিমান ও মিতভাষী ছিলেন। ইনি কার্য্য-কুশল ও বৈষয়িক লোক, নিজবুদ্ধি বলে অনেক সম্পত্তি ও বহু অর্থ উপার্জ্জন করিয়া গিয়াছেন। তিনি যশোহর অবস্থান কালে রামলোচনের কৃত বাসাবাটী স্বীয় অধিকার ভুক্ত করিয়া লন এবং বহুকাল ঐ বাসাবাটীতে অবস্থান করায় ঐ বাসাবাটী হইতে রামলোচনের উত্তরাধিকারীগণ বঞ্চিত হন। প্রহ্লাদের অর্জ্জিত বিষয়ের মধ্যে উমেদপুর, সত্যবানপুর, তরফ রতডাঙ্গার একাংশ, ব্রহ্মাণ্ডীনগর, ছাপড়ী ও রায়মঙ্গল অন্যতম। সত্যমন্তের মৃত্যুর পর প্রহ্লাদ কৃষ্ণমঙ্গলের সমস্ত সম্পত্তির অর্দ্ধাংশ এবং শ্রীমন্ত ও মহেশের উত্তরাধিকারীগণ অপরাংশ প্রাপ্ত হন। এই সূত্রে উভয়পক্ষের মধ্যে তুমুল বিবাদের সম্ভবনা ঘটিয়া উঠে। ১৩০৮ সালে প্রহ্লাদের মৃত্যুর পর এই গৃহ-বিবাদ ঘনীভূত হয়, কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে রায়বাহাদুর যদুনাথের মধ্যস্থতায় এই প্রলয়কারী বিবাদ অতি সহজে নিষ্পত্তি হয়।

যশোহর সহরে যেখানে প্রহ্লাদ তাহার জীবনের উৎকৃষ্ট অংশ অতিবাহিত করিয়াছিলেন, সেই যশোহর সহরেই প্রহ্লাদ তাঁহার একমাত্র পুত্র মতিলালকে রাখিয়া পরলোক গমন করেন। তথা হইতে তাঁহার মৃতদেহ রেলযোগে কলিকাতা নিমতলা ঘাটে গঙ্গাতীরে লইয়া যাইয়া সৎকার করা হয়। প্রহ্লাদের জ্যেষ্ঠা কন্যা ভবতারিণীর সহিত ফরিদপুর নওয়াপাড়া নিবাসী শ্রীযুত বেণীমাধব পালের বিবাহ হয়। মধ্যমা কন্যা সরোজিনীর সহিত দৈবজ্ঞহাটী নিবাসী শ্রীযুত কালীপ্রসন্ন বিশ্বাস উকীলের বিবাহ হয় এবং কনিষ্ঠা কন্যা প্রতিভাসুন্দরীর সহিত বারাকপুর নিবাসী ৺দেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাসের বিবাহ হয়।



শ্রীযুক্ত মতিলাল সরকার।

লোহাগড়া ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট।)

পৃঃ ১৬৭

শ্রীযুক্ত মতিলাল সরকার।

লোকপ্রিয় মতিলাল ১২৮৭ সালের—পৌষ মাসে জন্মগ্রহণ করেন। মতিলাল প্রথমে নড়াইল স্কুলে কিছুদিন অধ্যয়ন করেন, পরে রাজসাহী কলেজিয়েট্ স্কুল হইতে ১৯০০ খৃঃ এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তৎপর বঙ্গবাসী কলেজে এফ, এ অধ্যয়ন কালে তাঁহার পিতা ৺প্রহ্লাদচন্দ্র সরকারের মৃত্যু হওয়ায় বিষয়-সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ ও সাংসারিক সমস্ত ভার তাঁহার উপর বর্ত্তে। মতিলাল অতি অমায়িক, মিষ্টভাষী, কার্য্যকুশল ও ধার্ম্মিক। গ্রামের বহু সদনুষ্ঠানে সহায়তা করিয়া দেশে বিশেষ সুযশ অর্জ্জনে সক্ষম হইয়া সকলেরই প্রিয়পাত্র হইয়াছেন। মতিলাল সত্যবাদী ও তীক্ষ্ণবুদ্ধি সম্পন্ন—ইঁহার ন্যায় সরলস্বভাব এবং সর্ব্বদা পরহিতে রত ব্যক্তি বর্ত্তমানে লোহাগড়া গ্রামে অতি অল্পই দৃষ্ট হয়। স্বগ্রাম ও পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামে মতিলালের আধিপত্য ও সুযশ বিশেষভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। দেবদ্বিজে সদাভক্তিমান্—তিনি নিত্য পূজা আহ্নিক সমাপন করিয়া আত্মার উৎকর্ষ সাধন করেন।

মতিলাল বহুদিন যাবৎ লোহাগড়া ইউনিয়নের প্রেসিডেণ্ট্ পঞ্চায়েত নিযুক্ত ছিলেন। তিনি লোহাগড়া ইউনিয়ন বোর্ডেরও প্রেসিডেণ্ট্ নির্ব্বাচিত হন। বর্ত্তমানে লোহাগড়া হাইস্কুলের মেম্বর ও পীতাম্বর দাতব্য চিকিৎসালয়ের সেক্রেটারী পদে প্রতিষ্ঠিত আছেন। ইঁহার কার্য্যপ্রণালী প্রসংশনীয়।

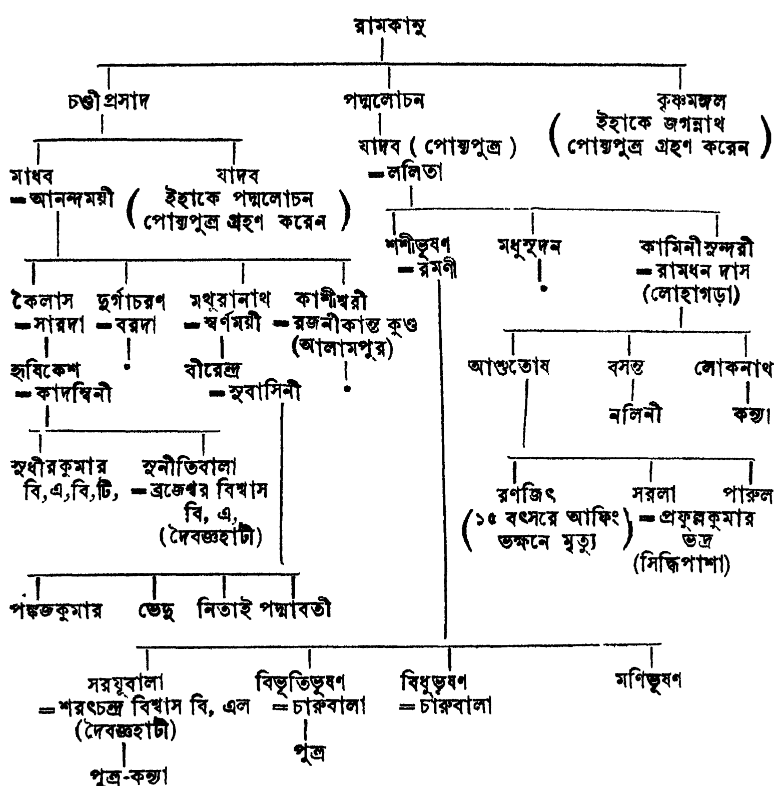
মতিলাল বর্ত্তমানে পিতার বিপুল ধনসম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারী। তিনি পূর্ব্বপুরুষ অনুষ্ঠিত পূজাপার্ব্বনাদি সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া আসিতেছেন।

মতিলাল দামোদর নিবাসী শ্রীযুত যোগেন্দ্রনাথ নন্দী মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা মৃণালিনীকে বিবাহ করেন। ইহার গর্ভে মতিলালের সাত পুত্র ও এক কন্যা জন্মগ্রহণ করে। কন্যা সুশীলাসুন্দরীর সহিত লোহাগড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রনাথ মজুমদার বি, এর বিবাহ হয়। ইহার গর্ভে হরেন্দ্রনাথের একটী নবকুমারের জন্ম হইয়াছে।

সাত পুত্র—প্রদ্যোৎ, অজিৎ, অসিত, নিশীথ, সনৎ, সুহৃৎ ও পুত্র। জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রদ্যোৎকুমার ১৯২৭ খৃঃ বাগেরহাট কলেজ হইতে বি, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বর্ত্তমানে কলিকাতা ইউনিভার্সিটী কলেজে বি, এল, অধ্যয়ন

করিতেছেন। প্রদ্যোৎকুমার লোহাগড়া নিবাসী প্রসিদ্ধ মজুমদার বংশীয় শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ মজুমদারের কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী প্রিয়ম্বদাকে বিবাহ করেন। ইহার গর্ভে প্রদ্যোৎকুমারের এক পুত্র শ্রীমান বিদ্যুৎকুমারের জন্ম হইয়াছে। মধ্যম অজিৎ কলিকাতায় টাইপ-রাইটিং শিক্ষা করিতেছেন। তৃতীয় অসিত ম্যাট্রিকুলেশান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতা ক্যাম্বেল মেডিক্যাল্ স্কুলে অধ্যয়ন করিতেছেন। ৪র্থ, ৫ম, ৬ষ্ঠ, ৭ম সকলেই নাবালক।

দেবানন্দ সরকারের কনিষ্ঠ পুত্র রামকানুর বংশতালিকা।



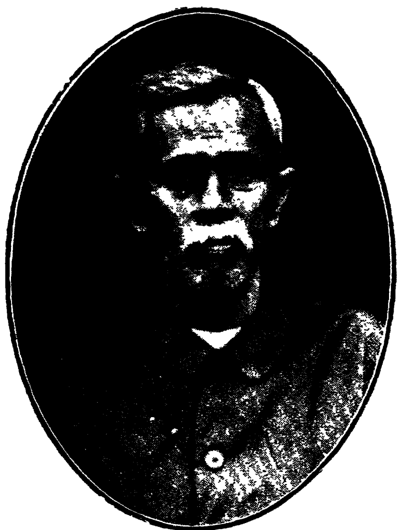
রামকানুর সন্তানগণ

রামকানুর তিনপুত্র চণ্ডীপ্রসাদ, পদ্মলোচন ও কৃষ্ণমঙ্গল। কৃষ্ণমঙ্গলকে জগন্নাথ পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেন। পদ্মলোচন নিঃসন্তান। চণ্ডীপ্রসাদের দুই

শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্র নাথ সরকার।

(লোহাগড়া ইউনিয়ন বোর্ডের ভাইস প্রেসিডেন্ট)

পৃঃ ১৬৯



স্বর্গীয় মথুরানাথ সরকার

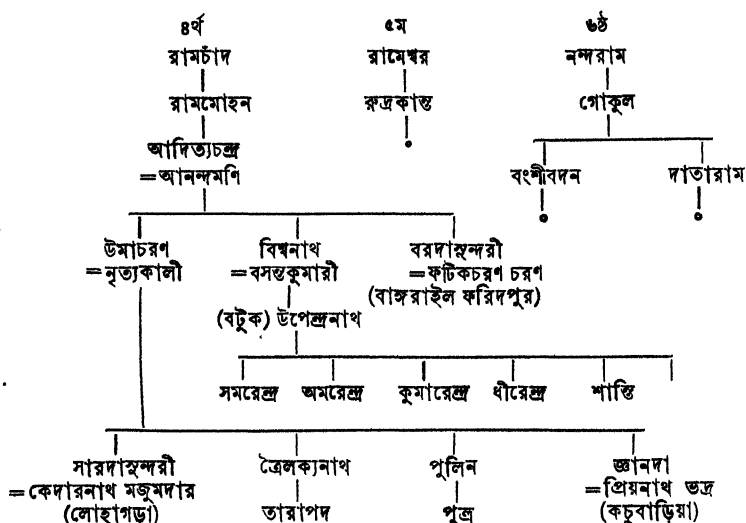
পুত্র—মাধব ও যাদব। পদ্মলোচন যাদবকে দত্তকপুত্র গ্রহণ করেন। মাধবের পুত্র কৈলাস, দুর্গাচরণ ও মথুরানাথ; কন্যা কাশীশ্বরী। দুর্গাচরণ ও কাশীশ্বরী অপুত্রক। কৈলাস ৪০ বৎসর বয়সে বৃদ্ধ পিতামাতার সম্মুখে দুরন্ত কলেরা রোগে প্রাণত্যাগ করেন। কৈলাসের পুত্র হৃষীকেশ অতিশয় ধার্ম্মিক ও নিষ্ঠাবান্ পুরুষ। ইনি অতি নিঃস্ব অবস্থায় কালযাপন করিতেছেন। হৃষীকেশ শুচিবায়ুগ্রস্ত এবং অতি সরল প্রকৃতির লোক। ইহার একমাত্র পুত্র সুধীর-কুমার ১৯২২ খৃঃ লোহাগড়া স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় ১৫৲ টাকা বৃত্তিলাভ করেন ও প্রেসিডেন্সি বিভাগে ইংরাজী বিষয়ে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া একটী স্বর্ণপদক প্রাপ্ত হন। ১৯২৬ খৃঃ সুধীরকুমার সংস্কৃত কলেজ হইতে সম্মানের সহিত বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এই যুবক মহাপ্রাণ ডাঃ মহেন্দ্রনাথ সরকারের সাহায্যে ও যত্নে উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হইতে সক্ষম হইয়াছেন। সম্প্রতি ইনি বি, টি পরীক্ষায়ও উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

দুর্গাচরণের বিধবা পত্নী বরদাসুন্দরী ১৩১৫ সালের অগ্রহায়ণ মাসে পরলোক গমন করেন। মথুরানাথের পুত্র বীরেন্দ্রনাথ। মথুরানাথ দুর্জ্জয় সাহসী পুরুষ ছিলেন। তিনি যশোহর কালেক্টরীতে কার্য্য করিতেন। বহুদিন যাবৎ ফৌজদারীতে ডেপুটীর পেস্কারী কার্য্য করিয়া পরিপক্ক হইয়া-ছিলেন। পুত্র বীরেন্দ্রনাথের জন্য বহু অর্থ ও দ্বিতল বাটী রাখিয়া ১৩২৯ সালে কঠিণ কাঁশরোগে মথুরানাথের মৃত্যু হয়। বীরেন্দ্রনাথ অমায়িক, শান্ত-স্বভাব ও শক্তিশালী পুরুষ। ইনি লোহাগড়া কমারশিয়াল ব্যাঙ্কের ক্লার্কের কার্য্যে নিযুক্ত আছেন। বীরেন্দ্রনাথ দশানি নিবাসী শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র বিশ্বাস বি, এল, উকীল মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী সুবাসিনীকে বিবাহ করেন। এই নারী রূপবতী ও গুণবতী ছিলেন। বর্ত্তমান বর্ষে কলেরা রোগে আক্রান্ত হইয়া কতকগুলি নাবালক পুত্র-কন্যা রাখিয়া তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন।

যাদবের দুই পুত্র ও এক কন্যা—শশীভূষণ, মধুসূদন ও কামিনীসুন্দরী। মধুসূদন বাল্যকালে প্রাণত্যাগ করেন; কামিনীর সন্তানগণ এই গ্রামে নিজ বাটীতে বাস করিতেছেন। জ্যেষ্ঠ আশুতোষ বাড়ীতে থাকিয়া বিষয়-সম্পত্তি রক্ষা করেন। মধ্যম বসন্ত; তাহার পুত্র নলিনী জ্যেষ্ঠতাতের সহিত বাস করিতেছেন। কনিষ্ঠ লোকনাথ ডাক্তারী করেন।

শশীভূষণের তিনপুত্র ও এক কন্যা। কন্যা সরযুবালার সহিত দৈবজ্ঞহাটী নিবাসী শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বিশ্বাস বি, এল উকীলের বিবাহ হয়। পুত্রগণ— বিভূতিভূষণ, বিধুভূষণ ও মণিভূষণ। শশীভূষণ এজমালী বসতবাড়ী পরিত্যাগ করিয়া উহার দক্ষিণ দিকে এক পাকাবাড়ী নির্ম্মাণ করিয়া রাখিয়া যান। তিনি রাজসাহী কোর্টে পেশকারের চাকুরী করিয়া পেনসান্ লাভ করেন, পরে ঐ রাজসাহীতে কোর্ট অব ওয়ার্ড ষ্টেটে চাকুরী করেন। ১৩২৭ সালে শশীভূষণ পরলোক গমন করেন। শশীভূষণের জ্যেষ্ঠপুত্র বিভূতিভূষণ কলিকাতা কর্পোরেশন স্কুলে সহকারী শিক্ষকের কার্য্য করেন। মধ্যম বিধুভূষণ বাড়ীতে থাকিয়া বিষয়াদি পরিদর্শন ও সংসার রক্ষা করেন। কনিষ্ঠ মণীভূষণ জলপাইগুড়ি চা বাগানে চাকুরী করিতেছেন।

হরিনাথ সরকারের চতুর্থ, পঞ্চম, ও ৬ষ্ঠ পুত্র রামচাঁদ, রামেশ্বর ও নন্দরামের বংশতালিকা।



রামচাঁদ, রামেশ্বর ও নন্দরাম।

দেবানন্দ রামচাঁদ ও রামেশ্বরকে সঙ্গে করিয়া পশ্চিমপাড়া পরিত্যাগ পূর্ব্বক পূর্ব্বপাড়ায় আসিয়া বসতি বাস করেন, একথা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। রামচাঁদ দেবানন্দের স্নেহভাজন ছিলেন। রামচাঁদের স্বভাব

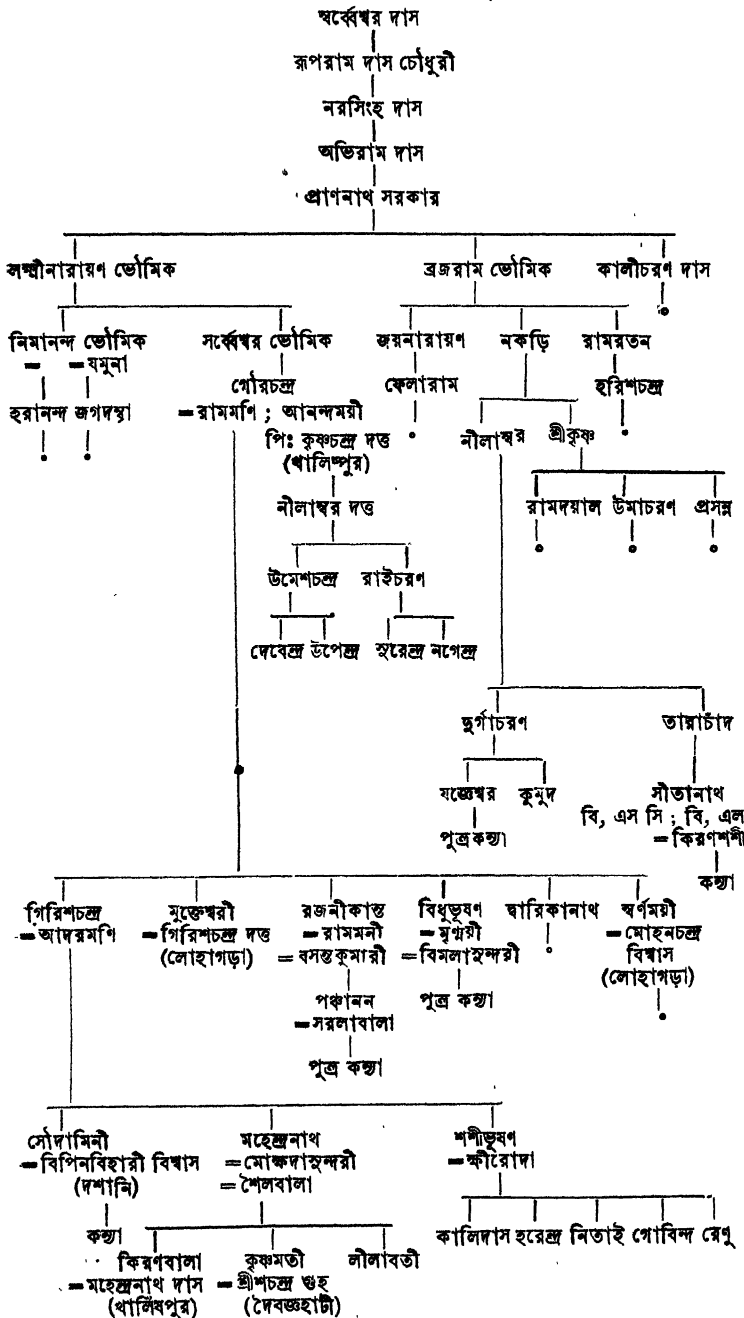
অতিশয় নম্র ও সুন্দর ছিল। দেবানন্দ যখন যাহা বলিতেন তিনি অম্লান বদনে তাহা প্রতিপালন করিতেন। ইনি নিষ্ঠাবান্ ও ধার্ম্মিক ছিলেন। রামচাঁদের পুত্র রামমোহন একজন সুলেখক ছিলেন। ইহার স্বহস্ত লিখিত অনেক পুঁথি ছিল। ইহার স্বহস্ত লিখিত রামায়ণ ও ইহার বংশধরগণের গৃহে বহুকাল বিদ্যমান ছিল। উহা কীর্ত্তিবাস প্রণীত অতি প্রাচীন গ্রন্থদৃষ্টে লিখিত, কিন্তু এই পুস্তকের পদাবলীর সঙ্গে কীর্ত্তিবাসের বর্ত্তমান রামায়ণের পদাবলী অনেক স্থলে বিভিন্ন। হস্তাক্ষরগুলি অতি সুন্দর যেন তুলি দিয়া অঙ্কিত করিয়া রাখা হইয়াছে। এই গ্রন্থ অন্যূন একশত বৎসরের পুরাতন হইবে।

রামমোহনের পুত্র আদিত্যচন্দ্র। ইহাকে গ্রামবাসী সকলে আতুরাম বলিয়া ডাকিত। আতুরাম অতি বৃদ্ধ বয়সে পরলোক গমন করেন। ইহার ন্যায় অমায়িক চরিত্র অতি বিরল ছিল। আতুরাম বিদ্বান না হইয়াও সর্ব্বজনাদৃত ছিলেন। ইহার শরীরে অতিশয় সামর্থ্য ছিল। কথিত আছে কোন সময় গ্রামে ব্যাঘ্রের দৌরাত্ম্যবৃদ্ধি পায়। একদা রাত্রিকালে ব্যাঘ্র ঘরে প্রবেশ করিয়া আতুরামের স্ত্রীকে ভীষণভাবে আক্রমণ করে, আতুরাম ইহা দেখিতে পাইয়া সবলে স্ত্রীর স্কন্ধদেশ ধরিয়া বসেন। প্রায় অর্দ্ধঘণ্টাকাল আদিত্যের সহিত ব্যাঘ্রের বল পরীক্ষা চলিতে থাকে পরে ব্যাঘ্র রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হয়।

আদিত্যচন্দ্রের পুত্র উমাচরণ ও বিশ্বনাথ। উমাচরণের পুত্র ত্রৈলোক্য ও পুলিন। ত্রৈলোক্য স্থানীয় বাজারে ব্যবসায় করেন। তাঁহার পুত্র তারাপদ দৌলৎপুর কলেজে আই, এস সি, অধ্যয়ন করেন। পুলিন লোহাগড়া গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া চোরখালি শ্বশুরালয়ে বাস করিতেছেন। বিশ্বনাথের একমাত্র বংশধর উপেন্দ্রনাথ (বটুক) অল্প বয়সে মাতৃহীন। ইহার পুত্রেরা সকলেই নাবালক। উমাচরণ যশোহর কালেক্টরীতে কার্য্য করিতেন। যশোহর টাউনে তাহার এক বাসা বাটী ছিল। বিশ্বনাথ চিরদিন বাটীতে থাকিয়া জমিজমা পরিদর্শন করিতেন। উপেন্দ্রনাথ মাতামহ সম্পত্তি পাইয়া লোহাগড়া গ্রামে মাতামহালয়ে বাস করিতেছেন।

এই সম্পর্কে মাতামহ সম্পত্তি পাইয়া দীনবন্ধু সরকার ও বেণীমাধব সরকার করগুী গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া লোহাগড়া গ্রামে বসতিবাস করিতেছেন। ত্রৈলোক্যনাথ পৈত্রিক ভিটায় বাস করিতেছেন।

ভৌমিকবংশ (প্রথমশাখা)



হরিনাথের পঞ্চমপুত্র রামেশ্বর নিরীহ ও বুদ্ধিমান ছিলেন। ইহার একমাত্র পুত্র রুদ্রেশ্বর সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। তিনি এতদ্দেশের একজন শূদ্র পণ্ডিত বলিয়া আখ্যাত ছিলেন। হরিনাথের ৬ষ্ঠ পুত্র নন্দরাম। নন্দরামের একমাত্র পুত্র গোকুল। গোকুলের দুই পুত্র—বংশীবদন ও দাতারাম। ইহারা উভয় ভ্রাতাই নিঃসন্তান।

ভৌমিক বংশ।

(প্রথম শাখা)

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে সর্ব্বেশ্বর দাসের পুত্র রূপরাম দাস চৌধুরীর চারিপুত্র। এই চারিপুত্র হইতে কালক্রমে চারিটী পৃথক বংশ গঠিত হইয়াছে। রূপরামের জ্যেষ্ঠপুত্র রাজীবলোচন মজুমদার রায় বংশের; দ্বিতীয় পুত্র রামদাস সরকার বংশের এবং তৃতীয় ও চতুর্থ পুত্র নরসিংহ ও মহেশ্চন্দ্র ভৌমিক বংশের আদিপুরুষ। আমরা এখন নরসিংহের বংশাবলী বর্ণনা করিব। রূপরামের পুত্রগণ মধ্যে রামদাস ও নরসিংহ বিশেষ ক্ষমতাপন্ন পুরুষ ছিলেন না। আমরা নরসিংহ ও রামদাসকে পৈত্রিক উপাধি ভিন্ন অন্য কোন সম্ভ্রমবাচক পদবীতে বিভূষিত দেখিতে পাই না, কালক্রমে ইহারা চৌধুরী উপাধিও পরিত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র 'দাস' উপাধিতে অভিহিত হইতেন।

প্রাণনাথ সরকার।

নরসিংহের পুত্র অভিরাম, তাহার পুত্র প্রাণনাথ বিদ্বান ও বুদ্ধিমান ছিলেন। প্রাণনাথ নাটোর রাজসরকারে খাজাঞ্চির কার্য্য করিয়া বিশেষ সম্মান, প্রতিপত্তি ও অর্থোপার্জ্জনে সক্ষম হইয়াছিলেন। এই কার্য্যে তিনি 'সরকার' উপাধি প্রাপ্ত হন। কিন্তু আমরা প্রাণনাথের পুত্রগণকে ভৌমিক উপাধিতে ভূষিত দেখিতে পাই। বিষয়সম্পত্তি জমাজমির মালিক হইলে তাহাকে 'ভূঁয়া' 'ভূঁইয়া' 'ভূমিক' বা 'ভৌমিক' বলা হয়। রায়, মজুমদার, সরকার, ভৌমিক প্রভৃতি পদবী জাতি বা অর্থ বোধক নহে। ইহা মুসলমান বাদশাহের আমলের খেতাব বিশেষ।

প্রাণনাথের তিনপুত্র—লক্ষ্মীনারায়ণ, ব্রজরাম ও কালীচরণ। কালীচরণ অপুত্রক, তিনি কলিকাতায় কোন কোম্পানীর বাড়ী কার্য্য করিতেন, ঐ

স্থানেই তাহার মৃত্যু ঘটে। লক্ষ্মীনরায়ণ ও ব্রজরাম একত্রে ঢুসাহাটীর জলা ও জঙ্গলা জমি ক্রয় করিয়া আবাদ করেন। ইহাতে তাঁহাদের যথেষ্ট অর্থাগম হয়। এই জমি ক্রয় করিয়া ইহারা ভৌমিক উপাধি গ্রহণ করেন। লক্ষ্মী-নারায়ণ ও ব্রজরাম ক্ষমতাশালী, উৎসাহী ও বুদ্ধিমান ছিলেন। ইহারাই প্রকৃতপ্রস্তাবে ভৌমিক বংশের স্থাপয়িতা। আমরা ইহাদের সময় হইতেই এই বংশে 'ভূমিক' (ভৌমিক) পদবীর উল্লেখ দেখিতে পাই।

লক্ষ্মীনারায়ণ ও ব্রজরাম উভয় ভ্রাতাই উদ্যোগী পুরুষ ছিলেন। ইঁহাদের বংশধরগণ আজিও ভৌমিক বলিয়া পরিচিত। কালীচরণ সম্পত্তির কোন অংশ ক্রয় করেন নাই, সুতরাং আমরা তাঁহাকে 'দাস' উপাধিতে দেখিতে পাই। লক্ষ্মীনারায়ণের দুই পুত্র—নিমানন্দ ও সর্ব্বেশ্বর। লক্ষ্মীনারায়ণের স্বোপার্জ্জিত অর্থে নিমানন্দ ও সর্ব্বেশ্বর পদ্মলোচন রায় মহাশয়ের সহিত ছাগলছিঁড়ার নিকটবর্ত্তী মধুমতী নদীতীরে কৃষ্ণপুরে এক নীলকুঠী নির্ম্মাণ করেন। ভ্রাতৃদ্বয়ের মধ্যে নিমানন্দ অধিকতর কীর্ত্তিমান ও ক্ষমতাশালী ছিলেন। সর্ব্বেশ্বর বহুবার নীল বিক্রয়ার্থ কলিকাতা গমন করেন। ১২২৬।২৭ সালের নীল বিক্রয়ের হিসাব আজিও ইহাদের গৃহে বিদ্যমান আছে। সর্ব্বেশ্বর পুণ্যাত্মা ছিলেন। কলিকাতা নগরীতেই তাঁহার গঙ্গাপ্রাপ্তি হয়। ৮৫ বৎসর বয়সে নিমানন্দ মানবলীলা সম্বরণ করেন। নিমানন্দের একমাত্র পুত্র হরানন্দ পিতা বর্ত্তমানে পরলোক গমন করেন। ডনলপ সাহেব যখন এতদ্দেশে আসিয়া নীলের কারবার আরম্ভ করেন তখন নিমানন্দ তাহার নিকট কৃষ্ণপুরের কুঠী বিক্রয় করেন। ভৌমিক বাটীর যে অট্টালিকা বর্ত্তমানে শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র, ৺রজনীকান্ত ও শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ ভৌমিক উকীল মহাশয়গণের অধিকারভুক্ত, ঐ ইমারত নিমানন্দ ও সর্ব্বেশ্বরের উপার্জ্জিত অর্থে প্রস্তুত হইয়াছিল। নিমানন্দের পুত্র হরানন্দ মকিমপুর কাছারীর নায়েব ছিলেন। এই কার্য্যে হরানন্দ যথেষ্ট প্রতিপত্তি ও অর্থলাভ করেন। হরানন্দ নিঃসন্তান।

সর্ব্বেশ্বরের পুত্র গৌরচন্দ্র, গৌরের দুই বিবাহ। প্রথমার গর্ভে গিরিশচন্দ্র, মুক্তেশ্বরী ও রজনীকান্ত এবং দ্বিতীয়ার গর্ভে বিধুভূষণ, দ্বারিকানাথ ও স্বর্ণময়ী জন্মগ্রহণ করেন। গৌরচন্দ্র পিতৃসম্পত্তির অধিকারী হইয়া সমস্ত অর্থ অপব্যয় করেন। জ্যেষ্ঠপুত্র গিরিশচন্দ্র বৈষয়িক বুদ্ধিসম্পন্ন লোক। জমিদারী সেরেস্তায় চাকুরী করিয়া বর্ত্তমানে বার্দ্ধক্য



শ্রীযুক্ত গিরিশ চন্দ্র ভৌমিক।



স্বর্গীয় তারাচাঁদ মজুমদার।

পৃঃ ১১৫, ১২১ দ্রষ্টব্য।

অবস্থায় উপনীত হইয়া জীবিত আছেন। বর্ত্তমানে ইঁহার বয়স ৯৫ বৎসর। এই অভিজ্ঞতা সম্পন্ন অতিবৃদ্ধ পরমপূজনীয় গিরিশচন্দ্রের অসাধারণ স্মরণশক্তি লেখককে এই পুস্তক-প্রণয়নে বিশেষ সহায়তা করিয়াছে। গিরিশের দুই পুত্র—মহেন্দ্র ও শশীভূষণ। মহেন্দ্র স্থানীয় বাজারে ঔষধ বিক্রয় করেন। শশীভূষণ অতিশয় বৈষয়িক তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন লোক। ইহার জ্যেষ্ঠপুত্র কালিদাস ম্যাট্রীকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বঙ্গবাসী কলেজে অই, এস সি, অধ্যয়ন করিতেছেন।

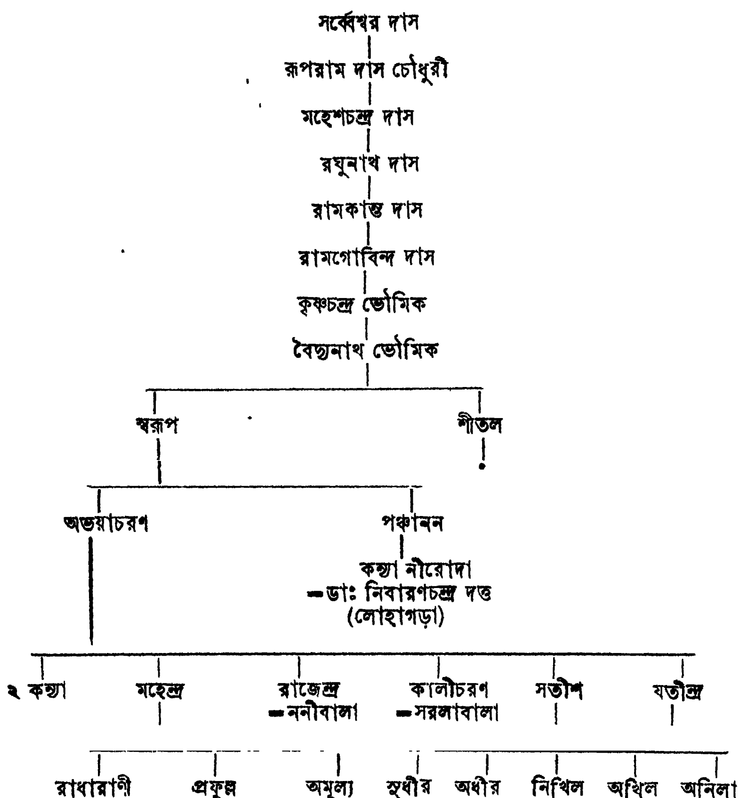
গৌরচন্দ্রের মধ্যম পুত্র রজনীকান্ত তীক্ষ্ণবুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। তিনি রায় বাটীতে নায়েবী চাকুরী করিতেন। বর্ত্তমান ভৌমিক বাটীর শ্রীবৃদ্ধি রজনীকান্তের দ্বারাই সম্পাদিত হয়। তাহার পুত্র পঞ্চানন অতিশয় স্থূলবুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তি। তৃতীয় বিধুভূষণ নড়াইলের একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকিল। ওকালতী করিয়া বিশেষ সুখ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন। বিধুভূষণের দুই বিবাহ—প্রথমার গর্ভে কাদম্বিনী; দ্বিতীয়ার গর্ভে তাহার দুই পুত্র ও এক কন্যা জন্ম গ্রহণ করিয়াছে। সর্ব্বকনিষ্ঠ দ্বারিকানাথ অল্পবয়সে পরলোক গমন করেন। ব্রজরাম কীর্ত্তিমান ও ক্ষমতাশালী ছিলেন। ইহার পুত্র জয়নারায়ণ, নকড়ি ও রামরতন। জয়নারায়ণের পুত্র ফেলারাম বাল্যকালেই ইহধাম পরিত্যাগ করেন। রামরতনের পুত্র হরিশ্চন্দ্র নিঃসন্তান। নকড়ির দুই পুত্র—নীলাম্বর ও শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণের তিনপুত্র—রামদয়াল, উমাচরণ ও প্রসন্ন; ইহারা সকলেই নিঃসন্তান।

নীলাম্বরের পুত্র দুর্গাচরণ ও তারাচাঁদ। নীলাম্বরের সময় হইতে ইহাদের সাংসারিক অবস্থা নিঃস্ব হইয়া পড়ে। দুর্গাচরণের দুই পুত্র—যজ্ঞেশ্বর ও কুমুদ। যজ্ঞেশ্বর আবগারী বিভাগে কার্য্য করিতেছেন। ইহার দ্বারা ইহাদের সাংসারিক অবস্থা পুনরায় বিশেষ উন্নত হইয়াছে। তারাচাঁদের পুত্র সীতানাথ বি, এল, পাশ করিয়া নড়াইলে ওকালতী ব্যবসায়ে সুখ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন। ইনি একজন তীক্ষ্ণবুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তি। গণিতশাস্ত্রে ইঁহার বিশেষ পারদর্শিতা আছে। ইঁহার পঞ্চ কন্যা-রত্ন জন্মগ্রহণ করিয়াছে।

ভৌমিক বংশ (দ্বিতীয় শাখা)।

সর্ব্বেশ্বরের পুত্র রূপরাম; রূপরামের কনিষ্ঠ পুত্র মহেশচন্দ্র বিদ্বান্ ও

ভৌমিক বংশ (দ্বিতীয় শাখা)



ক্ষমতাশালী ছিলেন। কথিত আছে মহেশ বাঙ্গলার তৎকালীন রাজধানী জাহাঙ্গীর-নগরে নবাব-সরকারে চাকুরী করিতেন। পৈত্রিক বাড়ী পরিত্যাগ করিয়া মহেশই সর্ব্বপ্রথমে নবগঙ্গা নদী-তীরে স্বীয় আবাস গৃহ নির্ম্মাণ করেন। মহেশের উপার্জ্জিত যে সমস্ত বিষয় ছিল, তাহার বংশধরগণের অপব্যবহারে তৎসমুদয় নিঃশেষিত হইয়াছে। মহেশের বংশে তাহার ন্যায় কীর্ত্তিমান একজনও জন্মগ্রহণ করেন নাই। এক কৃষ্ণচন্দ্র ব্যতীত আমরা কাহাকেও কোনপ্রকার সৎকার্য্যে মনোনিবেশ করিতে দেখি না। মহেশের পুত্র রঘুনাথ, রঘুনাথের পুত্র রামকান্ত, ইহার পুত্র রামগোবিন্দ। রামগোবিন্দের পুত্র কৃষ্ণচন্দ্র। কৃষ্ণচন্দ্রই এই বংশে প্রথম ভূমিক

(ভৌমিক) উপাধি ধারণ করেন। কৃষ্ণচন্দ্র ঢুসাহাটী সম্পত্তি ক্রয় করিয়া 'ভুইয়া' উপাধি প্রাপ্ত হন কৃষ্ণচন্দ্র ভূম্যধিকারী ছিলেন।

কৃষ্ণচন্দ্রের পুত্র বৈদ্যনাথ। বৈদ্যনাথের পুত্র—স্বরূপ ও শীতল। শীতল অপুত্রক, বহুকাল কলিকাতায় দালালী কার্য্য করিয়া বিস্তর অর্থোপার্জ্জন করেন। স্বরূপের পুত্র অভয়াচরণ ও পঞ্চানন। পঞ্চানন অল্পবয়সে উপার্জ্জনক্ষম হইয়া একমাত্র মাতৃহীনা কন্যা রাখিয়া পরলোক গমন করেন। এই বালিকা অতিশয় বুদ্ধিমতী ছিলেন। পঞ্চাননের পত্নী কলিকাতা বাসায় আত্মহত্যা করিলে এই নির্ভীক বালিকা মুক্তকণ্ঠে দারোগার নিকট সকল কথা প্রকাশ করিয়া বলায় পঞ্চানন অব্যাহতি পান। লোহাগড়া নিবাসী ডাক্তার নিবারণচন্দ্র দত্ত এই বালিকাকে বিবাহ করেন। ১৩১৯ সালে ইঁহার মৃত্যু হয়।

ভ্রাতৃ-বিয়োগের পর হইতে অভয়াচরণ অতি নিঃস্ব অবস্থায় পতিত হন। অভয়াচরণ নানারূপ কার্য্য করিয়া জীবনে উন্নতি লাভে অসমর্থ হন। অভয়কে দরিদ্রাবস্থায় সমস্ত জীবন যাপন করিতে হয়। অবশেষে ১৩১২ সালের কার্ত্তিক মাসে তাঁহার মৃত্যু হয়।

অভয়ের দুই কন্যা ও পাঁচ পুত্র মহেন্দ্র, রাজেন্দ্র, কালীচরণ, সতীশ ও যতীন্দ্র। বর্ত্তমানে রাজেন্দ্র ও কালীচরণ জীবিত আছেন। ইহারা উদ্যোগী, উৎসাহী ও কার্য্যকুশল। লোহাগড়া বাজারে ব্যবসায় করিয়া আর্থিক অবস্থার বিশেষ উন্নতি সাধন করিয়াছেন। কারবারে যথেষ্ট অর্থাগম হওয়ায় বসত বাটীতে এক সুন্দর অট্টালিকা প্রস্তুত করিয়াছেন। উভয় ভ্রাতার সমবেত চেষ্টা ও ঐকান্তিক যত্নে দিন দিন ইহাদের শ্রীবৃদ্ধি বর্দ্ধিত হইতেছে। মহেন্দ্র, সতীশ ও যতীন্দ্র প্রত্যেকেই যৌবন অবস্থায় পদার্পণ করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। ইঁহাদের অকাল মৃত্যু না ঘটিলে এই বংশের অধিক উন্নতি আমরা দেখিতে পাইতাম।

চতুর্থ অধ্যায়।

গ্রাম সংগঠন-(অন্যান্য জাতি)।

বহুকাল হইতে লোহাগড়া গ্রামে বৈশ্যসাহা, সুবর্ণবণিক, তিলি, মালাকার, কর্ম্মকার, কুম্ভকার, স্বর্ণকার, প্রামাণিক, রজক, বেহারা, নমঃশূদ্র, কাড়ার, বাস্তকর, হাড়ী, সর্দ্দার (বুনা) ও চর্ম্মকার প্রভৃতি সম্প্রদায়ের লোক বাস করিতে দেখা যায়। কোন্ সম্প্রদায় কোন্ সময় আসিয়া লোহাগড়ায় বাস করেন তাহা বিশেষ করিয়া জানা যায় না। দত্ত-মজুমদার, রায়-সরকার বংশীয় প্রধান প্রধান ব্যক্তি যে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকদিগকে যত্ন করিয়া আনাইয়া নিজ নিজ এলেকার জমিতে বাস করিতে দিয়া তাহাদিগকে নিজ গ্রামবাসী করিয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই।

যশোহর, খুলনা, ফরিদপুরের মধ্যে এপ্রকার সর্ব্বশ্রেণীর লোকের একত্রে একই গ্রামে বসতিবাস, লোহাগড়া ব্যতীত অন্য কোথায়ও বড় দৃষ্ট হয় না। গ্রামকে সজীব ও সমৃদ্ধিশালী করিবার জন্যই এরূপ সর্ব্বসম্প্রদায়ের একত্র সমাগম হইয়াছিল একথা সত্য। যাহারা লোহাগড়ার শ্রীবৃদ্ধি সাধনের জন্য ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক আনাইয়া এরূপ গ্রাম সংগঠন করিয়াছিলেন তাহারা প্রকৃত বুদ্ধিমান ও সূক্ষদর্শী ছিলেন। বর্ত্তমানে আমরা গ্রাম সংগঠনে বহুশ্রেণীর লোকসমাগম করিবার প্রবৃত্তি কাহারও দেখিতে পাই না। কোন বাড়ী ছাড়াভিটায় পরিণত হইলে তাহা বনজঙ্গলে আবৃত করিয়া রাখাই আমাদের প্রবৃত্তি হইয়াছে।

বৈশ্যসাহা—বৈশ্যসাহা জাতির মধ্যে বহু শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিও জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইঁহাদের ব্যবসায় বাণিজ্যের বিস্তৃতি সকল সম্প্রদায় অপেক্ষা শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করিয়া আসিতেছে। ব্যবসায়ই ইহাদের একমাত্র উপজীবিকা। ইহারা কেহই চাকুরী করেন না, সকলেই ব্যবসায়

বাণিজ্যে লিপ্ত। এই বৈশ্যসাহা জাতি বহুকাল হইতে চিনি-গুড়, তামাক, তুলা, সুতা ও বস্ত্র, ধান-চাউল, তৈল, ঘৃত, ময়দা, রাই, খেসারী, মটর, ধনিয়া ও নারিকেল প্রভৃতি জিনিষের আমদানী ও রপ্তানি করিয়া আসিতেছেন। ইহা ব্যতীত স্বর্ণ-রৌপ্য, কাঁসা-পিত্তলের কারবারও ইহারা করিয়া থাকেন। ব্যবসায় বাণিজ্যে ইঁহাদের যথেষ্ট জ্ঞান ও দক্ষতা আছে একথা বঙ্গদেশে প্রসিদ্ধ। ইহারা সদাচারী, শান্তপ্রকৃতির পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন জাতি—অথচ কেন ইঁহাদের জল আচরণীয় নহে এ কথার জবাব দিবার কিছুই নাই। ইঁহারা প্রকৃত বৈশ্যজাতি; সামাজিক্ কোপে পড়িয়া সামাজিক নির্য্যাতন ভোগ করিতেছেন। শীঘ্রই উহার উপশম হইবে এরূপ দিন দিন দেখা যাইতেছে।

সুবর্ণ বণিক—সুবর্ণবণিক সম্প্রদায়ও বৈশ্যসাহার ন্যায় ব্যবসায় বাণিজ্য লইয়া আছেন। ইঁহারাও চাকুরী জীবন যাপন করেন না—সাহা সম্প্রদায়ের ন্যায় ইঁহারা সমস্ত ব্যবসায় করিয়া থাকেন অধিকন্তু ইঁহারা অনেকে শাঁখা প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করিতেন। ঢাকাই শাঁখার অত্যধিক কাটতি হওয়ায় ইহাদের শাঁখার ব্যবসায় নষ্ট হইয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে। ব্যবসায় বাণিজ্যে ইঁহাদের যথেষ্ট ধন-সম্পত্তি হইয়াছে।

তিলি—তিলি সম্প্রদায় এ গ্রামে ২।৩ ঘরের বেশী না থাকিলেও ইঁহাদের অবস্থা ব্যবসায়-বণিজ্যে যথেষ্ট উন্নতি লাভ করিয়াছে। আমরা, উপরোক্ত তিন সম্প্রদায়ের প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ বংশতালিকা নিম্নে প্রদান করিব।

মালাকার—মালাকার গ্রামে ২।৩ ঘর ছিল; তাহারা শোলার সর্ব্বপ্রকার কার্য্য এবং বাজী প্রস্তুত করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করিত। বর্ত্তমানে মালাকার গ্রামে নাই বলিলেও চলে। অনেকে এস্থান পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবার পর নূতন মালাকার আনাইয়া বসতি করাইবার চেষ্টা কেহই করিতেছেন না। দু-একজন যাহারা আছেন তন্মধ্যে শ্রীশচন্দ্র মালাকারের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইনি বি, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতায় চাকুরী করেন। মধ্যে মধ্যে লোহাগড়া আসিয়া বাস করিয়া থাকেন।

কর্ম্মকার ও কুম্ভকার—কর্ম্মকার ও কুম্ভকার লোহাগড়ার দক্ষিণে যথেষ্টই

আছেন ; ইহারা সকলেই স্বীয় স্বীয় কার্য্য করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছেন। বিদেশী লৌহের জিনিষের এবং ষ্টীলের বাসনাদির যথেষ্ট প্রচার হইলেও কর্ম্মকার ও কুম্ভকারদিগের ব্যবসায়ে বিশেষ অনিষ্ট না হওয়ায় ইহারা এখনও বিদেশী ব্যবসায়ের স্রোতে টিকিয়া আছেন। বর্ত্তমানে কর্ম্মকার পাড়ায় ভুবনমোহন কর্ম্মকারদিগের বাটীতে বার্ষিক দুর্গোৎসব পূজা হয়। কুম্ভকার বাটীতে শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ পাল বর্ত্তমানে আলিপুরে মোক্তারী করিতেছেন।

গোপ বা গোয়ালা—বহু প্রাচীন সময় হইতে গ্রামে ৩।৪ ঘর গোয়ালার বসতি ছিল। দধি-দুগ্ধ, ঘৃত, মাখন সর্ব্বদাই প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যাইত। বর্ত্তমানে মাত্র এক ঘর গোয়ালার বসতি আছে। সময়-অসময় গ্রামবাসীর ঘৃত-মাখনের অভাব ইহাদের দ্বারা দূরীভূত হইয়া থাকে।

প্রামাণিক—পূর্ব্বে লোহাগড়ায় দুই ঘর প্রামাণিক বাস করিত ; বর্ত্তমানে এক ঘরও নাই। চেষ্টা করিয়া গ্রামবাসীর এ অভাব পূরণ করা উচিত।

রজক—প্রাচীন সময় হইতেই লোহাগড়ায় রজকের বাস দেখা যায়। ইহারা কাপড় ধোলাই ব্যতীত কৃষিকার্য্য, চাষ-আবাদ করিয়া আসিতেছে। বর্ত্তমানে আট দশ ঘর রজক গ্রামে বাস করিতেছে।

বেহারা—এ গ্রামের বেহারা প্রায় ধ্বংসপথে চলিতে বসিয়াছে। রায়বাড়ী হইতে বাজার যাইতে রাস্তার উভয় পার্শ্বে বেহারাদের বাস ছিল। চার পাঁচ খানা পালকীর বেহারা সর্ব্বদাই পাওয়া যাইত, বর্ত্তমানে একখানা পালকীর বেহারা গ্রামে নাই। বেহারার কার্য্যে সংসার চলেনা দেখিয়া ইহারা তরকারী খরিদ বিক্রয়ের কার্য্য আরম্ভ করিয়াছে। শ্রীনাথের পুত্র কিরণ (কেনা) প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বাঙ্গলা পুলিশ বিভাগে এ, এস, আই এর চাকুরী করিতেছেন।

নমঃশূদ্র—নমঃশূদ্রও এ গ্রামে বহুসংখ্যক ছিল ; ক্রমে ক্রমে ইহারাও ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইতেছে। লোহাগড়ার বাছাড় বংশও ধ্বংসমুখী হইয়াছে ; এক ঘর ব্যতীত সবই ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। প্রসিদ্ধি আছে যে বাছাড়ি নৌকা বাছাড়দের দ্বারা প্রথম প্রস্তুত হয় বলিয়া উহার নাম বাছাড়ি বর্ত্তমানে বাচাড়ি কথায় পরিণত হইয়াছে। সেই বংশজাত বাছাড় লোহাগড়া গ্রাম হইতে একেবারে লোপ পাইতে বসিয়াছে। পূর্ব্বে নমঃশূদ্রদের প্রত্যেকই লাঠি, সড়কি, ঢাল, তলোয়ার খেলায় বিশেষ নৈপুণ্য দেখাইয়াছে। বর্ত্তমানে

২।১ জন সামান্য লাঠিখেলা ভিন্ন অন্য কিছুই জানে না। পূর্ব্বে ইহারা চাষাবাদের কার্য্য, ঘরামির কার্য্য ও কাঠ চেরাই, মাটিকাটা ইত্যাদি গৃহস্থের সমস্ত কার্য্য করিত; বর্ত্তমানে চাষাবাদের কার্য্য কেহই করে না। ঘরামির কার্য্যে কৃষাণ দিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছে। কাঠ চেরাই ও মাটিকাটা বিশেষ অপমানের কার্য্য মনে করিয়া ইহারা উহা ত্যাগ করিয়াছে।

কলু বা তেলি—হিন্দু কলু কোন দিনই গ্রামে নাই। গত ৮।১০ বৎসর পূর্ব্বে জয়পুর হইতে উঠিয়া আসিয়া এখানে প্রায় ৫।৭ ঘর মুসলমান কলু বাস করিতেছে। ঘাইন ভাঙ্গিয়া তেল বাহির করিয়া বিক্রয় ভিন্ন অন্য ব্যবসায় ইহাদের নাই। ইহাদের অবস্থা সচ্ছল তবে বংশ-বৃদ্ধি নাই। মৃতা নবগঙ্গা নদীর দক্ষিণ পাড়ে বর্ত্তমান আদুগাছীর বাড়ীতে পূর্ব্বে গোপালগাছীর ঘাইন ছিল বলিয়া জানা যায়।

স্বর্ণকার—স্বর্ণকার ও বহুদিন হইতে গ্রামে বাস করিয়া আসিতেছে। কিন্তু ইহাদের ও বংশ ক্রমে ক্রমে লোপ পাইতে বসিয়াছে। ইহাদের সংখ্যা বেশী না হইলেও ২।১ ঘর যাহা আছে তাহারা নিজ নিজ ব্যবসায়ের দ্বারা সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে।

কাড়ার—লোহাগড়া স্কুলের সম্মুখে রাস্তার দক্ষিণে প্রায় ১৫।২০ ঘর কাড়ার বহুদিন যাবৎ বাস করিয়া আসিতেছে। মৎস্য বিক্রয়ই ইহাদের একমাত্র ব্যবসায়। এই ব্যবসায় দ্বারা ইহারা স্বীয় স্বীয় অবস্থা সচ্ছল করিয়া সংসার চালাইতেছে।

ধীবর—লোহাগড়া সদরে ধীবর না থাকিলেও গন্ধবাড়িয়াতে ২৫।৩০ ঘর এখনও বসতি বাস করিতেছে। ইহাদেরও অবস্থা বেশ ভাল। মৎস্য ধরিয়া কাড়ারের নিকট বিক্রয় করা ভিন্ন ইহাদের অন্য ব্যবসায় নাই।

বাদ্যকর—লোহাগড়া গ্রামে প্রকৃত মুসলমানের বাস নাই তবে বাদ্যকর যাহারা বসতিবাস করিতেছে তাহারা জাতিতে মুসলমান হইলেও তাহাদের আচার ব্যবহার মুসলমানের মত আদৌ দৃষ্ট হয় না, বরং হিন্দুর ন্যায় পরিলক্ষিত হয়। পূর্ব্বে বহু ঘর বাদ্যকর ছিল বর্ত্তমানে অনেক মরিয়া-ছাড়িয়া মাত্র ৫।৭ ঘর বাস করিতেছে। ইহারা ঢোল-শানাই, ঢাক ও কাঁসির বাজনা বাজাইয়া থাকে; শুধু বাজনা বাজাইয়া সংসার প্রতিপালন করা কষ্টসাধ্য বলিয়া ইহারা অন্যান্য ব্যবসায়ও আরম্ভ করিয়াছে।

হাড়ি—হাড়ি গ্রামে বহুকাল হইতেই বাস করিয়া আসিতেছে। ইহাদের বংশের বৃদ্ধি নাই বরং দিন দিন ধ্বংস হইয়া যাইতেছে। পূর্ব্বে ইহারা ঝাড়ুদারের কার্য্য করিত। লোহাগড়া বাজার, রায়বাটী ও মজুমদার বাটী ঝাড়ু দেওয়াই ইহাদের নিত্যকর্ম্ম ছিল। বর্ত্তমানে ২।১ ঘর অবশিষ্ট থাকিয়া কৃষাণের কার্য্য করিয়া কোন প্রকারে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছে।

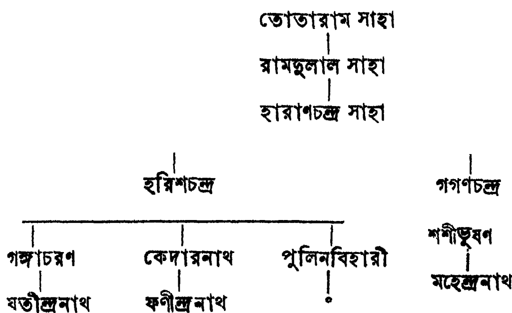
মেথর—মেথর পূর্ব্বে কখনও এ গ্রামে ছিল না। গত আট দশ বৎসর কাল এখানে মেথর দেখা যাইতেছে। সুযোগ্য ইউনিয়ন কমিটীর চেয়ারম্যান মহোদয়ের যত্ন ও ঐকান্তিক চেষ্টায় এক ঘর মেথর লোহাগড়ায় বাস করিতেছে।

চর্ম্মকার—চর্ম্মকার ও বহু প্রাচীন সময় হইতে এ গ্রামে বসতিবাস করিতেছে। লোহাগড়া বাজারের পূর্ব্বাংশে ইহাদের প্রায় পনর-কুড়ি ঘর বসতি দেখা যায়। চামড়ার ব্যবসায়ই ইহাদের জীবিকা অর্জ্জনের প্রধান সম্বল। ইহা ব্যতীত ঢাক বাজান ও বেত-বাঁশের ঝাঁকা, ধামা, ডালা, কুলা প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া সংসার প্রতিপালন করিতেছে। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ চামড়ার ব্যবসায় দ্বারা লাভবান হইয়া স্ব স্ব অবস্থার বিশেষ উন্নতি করিয়াছে।

সর্দ্দার বা (বুনো)—লোহাগড়া গ্রামে সর্দ্দারের সংখ্যা ত্রিশ ঘর। ইহারা প্রকৃত অনার্য্য জাতি। ইহারা সাঁওতাল পরগণার অধিবাসী। নীলকর সাহেবরা নীলের চাষ করিবার জন্য উহাদের এদেশে আনয়ন করেন। বহুকাল হইতে এখানে আসিয়া বসতিবাস করিতেছে। কাঠ চলা করা, মাটিকাটা, ঘরে মাটি তোলা প্রভৃতি কার্য্য করিয়া সংসার প্রতিপালন করে। বহুদিন হইতে ভদ্র লোকের সংশ্রবে আসিয়া ইহারা বর্ত্তমানে আর্য্য সভ্যতা অনুকরণ করিয়া আসিতেছে। ইহারা শিকারে অভ্যস্ত। বরশা লইয়া বন জঙ্গল হইতে শূকর, সজারু শিকার করিয়া মাংস ভক্ষণ করিয়া থাকে। অন্যান্য স্থানের সর্দ্দার অপেক্ষা ইহারা অনেক উন্নত। ইহাদের অনেকেরই অবস্থা সচ্ছল। অনেকেই চৌকিদারের চাকুরী করে। আমোদ প্রমোদে ইহারা স্ত্রী পুরুষ একত্র হইয়া মৃদাং বাজাইয়া নৃত্যগীত করিয়া থাকে। প্রত্যেকেই মদ্যপান করিয়া নেশায় বিভোর হয়। ইহাদের শরীর বেশ সবল। ইহারা সর্ব্বদা হিন্দুয়ানী বজায় রাখিয়া চলে। হিন্দুদিগের ন্যায় পূজা পার্ব্বণ করিয়া থাকে। ক্রমশঃই ইহাদিগকে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে দেখা

যাইতেছে। ইহাদের মধ্যে সামাজিক গণ্ডগোল নিবারণ করিবার জন্য মোড়ল বা সর্দ্দার স্থিরীকৃত আছে। পূর্ব্বে বন্দিরাম সর্দ্দার ও সীতানাথ সর্দ্দার প্রভৃতি মোড়লের কার্য্য করিত। বর্ত্তমানে লক্ষণের পুত্র হৃদয় এবং সীতানাথ, শিবু, মেঘনাদ ও কেষ্ট এই পাঁচজনই সমস্ত গোলযোগ মীমাংসা করিয়া থাকে। আধুনিক যুগে নব্য সম্প্রদায়ের মাতুব্বর সীতানাথের পুত্র পঞ্চানন্দ। লক্ষ্মণের পুত্র হৃদয় ও সীতানাথের পুত্র পঞ্চানন্দ উভয়েই চৌকিদার; শিকারে উভয়েই অভ্যস্ত। ইহা ব্যতীত বসন্ত, অভয়া ও বন্দিরামের শ্যালক রাইচরণ শিকার করিতে বেশ পটু। বন্দুক চালাইতে ইহারা সকলেই পারদর্শিতা লাভ করিয়াছে। বর্ত্তমানে সর্দ্দার পাড়ায় শিবু সর্দ্দারের অবস্থা সবার চেয়ে ভাল। বাড়ীতে টিনের ঘর নির্ম্মাণ করিয়াছে। সীতানাথের অবস্থাও মন্দ নয়। কবিরাজী ব্যবসায় দ্বারা অনেক অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছে। আমরা দিন দিন ইহাদের শ্রীবৃদ্ধি ও ক্রমোন্নতি আশা করি।

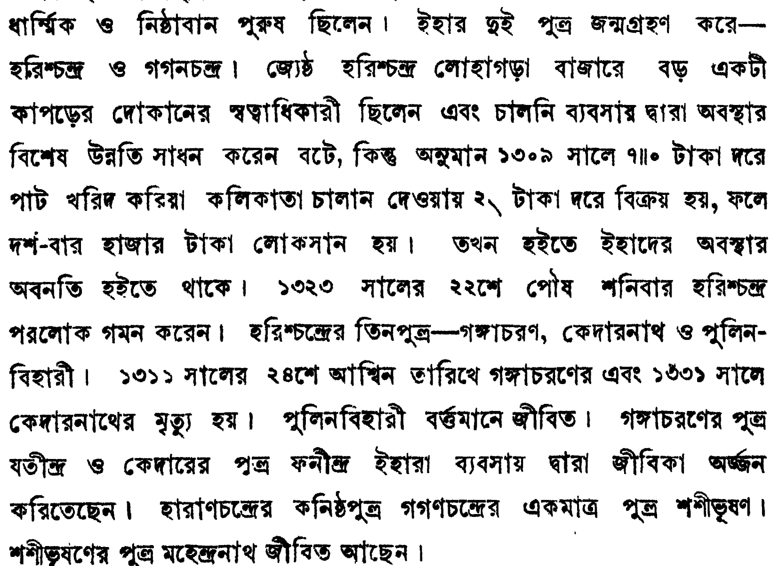
আড়িন্দিয়া বংশের বংশতালিকা।



হারাণচন্দ্র সাহা।

লোহাগড়ার আড়িন্দিয়া সাহা বংশ বহুদিন হইতে দেশ বিদেশে পরিচিত। ইহাদের আচার-ব্যবহার, কীর্ত্তিকলাপ, বৈদিক ক্রিয়াকর্ম্ম স্বজাতি সমাজে চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। তোতারামের পূর্ব্বে আমরা আর কাহারও নাম জানিতে পারি না। তোতারামের পুত্র রামদুলাল; রামদুলালের পুত্র হারাণ-চন্দ্রই এই বংশের কীর্ত্তিমান পুরুষ। ইনি চতুরাগ্নি যাগ করিয়া বহু অর্থ ব্যয় করেন ও ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে স্বীয়ালয়ে অভ্যর্থনা করেন। হারাণচন্দ্র

মাতুব্বর বাটীর বংশতালিকা



ধার্ম্মিক ও নিষ্ঠাবান পুরুষ ছিলেন। ইহার দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করে—হরিশ্চন্দ্র ও গগনচন্দ্র। জ্যেষ্ঠ হরিশ্চন্দ্র লোহাগড়া বাজারে বড় একটী কাপড়ের দোকানের স্বত্বাধিকারী ছিলেন এবং চালনি ব্যবসায় দ্বারা অবস্থার বিশেষ উন্নতি সাধন করেন বটে, কিন্তু অনুমান ১৩০৯ সালে ৭॥০ টাকা দরে পাট খরিদ করিয়া কলিকাতা চালান দেওয়ায় ২৲ টাকা দরে বিক্রয় হয়, ফলে দশ-বার হাজার টাকা লোকসান হয়। তখন হইতে ইহাদের অবস্থার অবনতি হইতে থাকে। ১৩২৩ সালের ২২শে পৌষ শনিবার হরিশ্চন্দ্র পরলোক গমন করেন। হরিশ্চন্দ্রের তিনপুত্র—গঙ্গাচরণ, কেদারনাথ ও পুলিন-বিহারী। ১৩১১ সালের ২৪শে আশ্বিন তারিখে গঙ্গাচরণের এবং ১৩৩১ সালে কেদারনাথের মৃত্যু হয়। পুলিনবিহারী বর্ত্তমানে জীবিত। গঙ্গাচরণের পুত্র যতীন্দ্র ও কেদারের পুত্র ফনীন্দ্র ইহারা ব্যবসায় দ্বারা জীবিকা অর্জ্জন করিতেছেন। হারাণচন্দ্রের কনিষ্ঠপুত্র গগণচন্দ্রের একমাত্র পুত্র শশীভূষণ। শশীভূষণের পুত্র মহেন্দ্রনাথ জীবিত আছেন।

রামকেশব সাহা ও হারাণচন্দ্র সাহা।

রামকেশব সাহা ও তদীয় ভ্রাতা হারাণচন্দ্র সাহা প্রথমতঃ কালনা গ্রামে বাসস্থান নির্দ্দেশ করিয়া তথায় বসতিবাস করেন, পরে বানকানা নদীর পাড়ে চিনি-গুড় প্রভৃতির বড় বড় কারখানা প্রস্তুত করিয়া সঙ্গে সঙ্গে তূলা ও কাপড়ের ব্যবসায় দ্বারা বিশেষ লাভবান হইয়া অবস্থার উন্নতিসাধন করেন। কালক্রমে সেই বানকানা নদী বর্ত্তমান নবগঙ্গার পাড়ে উহাদের বসতবাটী হইয়া যায়। ইহাদের সময় বাটীতে দোলপূজা প্রচলন বা সিংহাসন স্থাপন হয় এবং উহা অদ্যাবধি বংশ পরম্পরায় সমারোহের সহিত পূজা হইয়া আসিতেছে।

রামকেশবের চারিপুত্র—সর্ব্বেশ্বর, শিরোমণি, শিবচন্দ্র ও ঠাকুরদাস। সর্ব্বেশ্বরের পুত্র মহাভারত। তাহার পুত্র উমাচরণ। ইহার সময়ও ব্যবসায় বাণিজ্যের উন্নতিতে সংসারের শ্রীবৃদ্ধি সাধন হইয়াছিল। উমাচরণের তিন পুত্র—রাজেন্দ্র, যদুনাথ ও পূর্ণচন্দ্র। রাজেন্দ্র নিঃসন্তান। যদুনাথের দুইপুত্র —বিজয়কৃষ্ণ ও বিনয়কৃষ্ণ। পূর্ণচন্দ্রের দুই পুত্র—মনিমোহন ও কানাইলাল।

রামকেশবের মধ্যমপুত্র শিরোমণির দুইপুত্র—গোবিন্দচন্দ্র ও গোপীমোহন। গোবিন্দচন্দ্র একজন সামাজিক বুদ্ধিমান লোক ছিলেন। ইনি চিনি-গুড়, সূতা ও বস্ত্রের ব্যবসায় করিয়া সংসার প্রতিপালন করেন। ইহার সময় ও সাংসারিক অবস্থা বিশেষ উন্নত ছিল। গোবিন্দের তিনপুত্র—দ্বারিকানাথ, হৃদয় ও শশীভূষণ। দ্বারিকানাথ নিঃসন্তান। হৃদয়ের পুত্র জ্যোতিন্দ্রনাথ; তাহার পুত্র অখিলচন্দ্র। শশীভূষণও নিঃসন্তান। গোবিন্দের কনিষ্ঠ ভ্রাতা গোপীমোহন; তাহার পুত্র অধরচন্দ্র। অধরচন্দ্র হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার। অধরের পুত্র রণজিৎকুমার নাবালক।

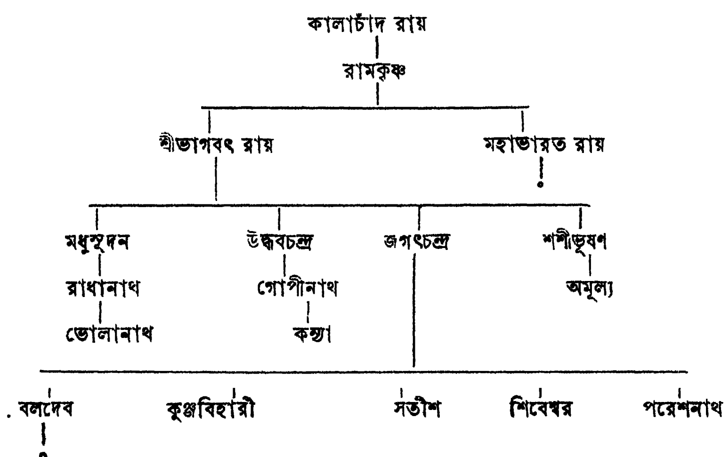
রামকেশবের তৃতীয় পুত্র শিবচন্দ্র। ইহার জীবিতকালে দেশে অত্যন্ত মগের প্রাদুর্ভাব হয়। ইনি বাটীতে টিকারা (alarm signal) রাখিতেন এবং বহু বাধ্য লোকদ্বারা মগের হাত হইতে স্থানীয় পল্লীবাসীর প্রাণ রক্ষা করিয়াছিলেন। শিবচন্দ্র একজন সমাজের কর্তৃপক্ষীয় লোক ছিলেন। ইহার সময় হইতেই গ্রামবাসী ইহাদের 'মাতুব্বর' বাটী বলিয়া সম্বোধন করেন। ইহার সময়ও এবাটীর সাংসারিক অবস্থা বিশেষ উন্নত ছিল। শিবচন্দ্রের দুই পুত্র—হরিশ্চন্দ্র ও চন্দ্রকান্ত ইহারা উভয়েই নিঃসন্তান।

রামকেশবের কনিষ্ঠ পুত্র ঠাকুরদাস ; ঠাকুরদাসের দুই পুত্র—শ্রীধর ও মহেশচন্দ্র। শ্রীধর একজন সরল প্রকৃতির লোক ছিলেন। ইহার জীবিত-কালেও সংসারের কোনরূপ ক্ষতি সাধিত হয় নাই। শ্রীধরের একমাত্র পুত্র কেদারনাথ নিঃসন্তান। মহেশ্চন্দ্রের একমাত্র পুত্র তারিণীচরণও নিঃসন্তান।

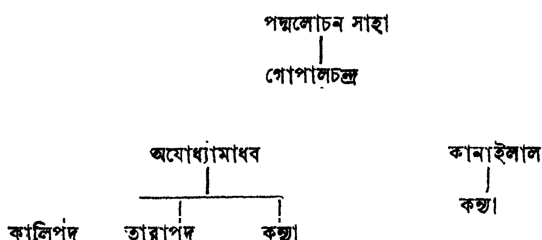
রামকেশবের কনিষ্ঠ ভ্রাতা হারাণচন্দ্রের দুইপুত্র—তীর্থরাম ও সুখচাঁদ। তীর্থরামের দুই পুত্র—কাঙ্গিরাম ও দুখীরাম। সুখচাঁদ নিঃসন্তান। দুখীরাম ও নিঃসন্তান ; বর্ত্তমানে এবংশের বিশেষ দুর্দ্দশা। ব্যবসায়-বাণিজ্য কিছুই নাই। জমাজমির দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ চলিতেছে।

পশ্চিমপাড়া সাহা বংশ।

কালাচাঁদ রায়ের বংশ তালিকা।



পদ্মলোচন সাহার বংশ তালিকা।



শ্রীভাগবৎ রায়।

সৈদপুরের নিকটবর্ত্তী ধোপাঘাটা নামক স্থান পরিত্যাগ করিয়া কালাচাঁদ রায় লোহাগড়া আসিয়া বাসস্থান নির্ম্মাণ করেন। কালাচাঁদের পুত্র রামকৃষ্ণ। রামকৃষ্ণের দুইপুত্র; জ্যেষ্ঠ শ্রীভাগবৎ রায় ব্যবসায়-বাণিজ্যে যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করেন। ইনি লোহাগড়ায় এক প্রকাণ্ড চিনির কারখানার স্বত্বাধিকারী ছিলেন। ইহা ব্যতীত চালানি নৌকা, স্বর্ণ ও রৌপ্যের ব্যবসায় ও কাপড়ের কাজ করিয়া অবস্থার বিশেষ উন্নতিসাধন করেন। কনিষ্ঠ মহাভারত লক্ষ্মীপাশা নীলকুঠীতে চাকুরী করিতেন। ইনি নিঃসন্তান ছিলেন।

শ্রীভাগবতের চারিপুত্র—মধুসূদন, উদ্ধবচন্দ্র, জগৎচন্দ্র ও শশীভূষণ। মধুসূদনের পুত্র রাধানাথ; তাহার পুত্র ভোলানাথ। উদ্ধবচন্দ্রের পুত্র গোপীনাথ। গোপীনাথ অপুত্রক। জ্যেষ্ঠ ও মধ্যম উভয়েই পরলোক গমন করিয়াছেন। তৃতীয় জগৎচন্দ্র ও কনিষ্ঠ শশীভূষণ বর্ত্তমানে জীবিত আছেন। উভয় ভ্রাতাই স্বর্ণ-রৌপ্যের ব্যবসায় দ্বারা বহু অর্থোপার্জ্জনে সক্ষম হইয়াছেন।

জগৎচন্দ্রের পাঁচপুত্র—বলদেব, কুঞ্জবিহারী, সতীশ, শিবেশ্বর ও পরেশনাথ। জ্যেষ্ঠ বলদেবের অল্পবয়সে মৃত্যু হয়। মধ্যম কুঞ্জবিহারী ও তৃতীয় সতীশ প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া পিতার সহিত ব্যবসায় করিতেছেন। চতুর্থ শিবেশ্বর প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া আই, এস সি, অধ্যয়ন করেন। কনিষ্ঠ পুত্র নাবালক।

শশীভূষণের একমাত্র পুত্র অমূল্যও প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া আই, এ অধ্যয়ন করেন।

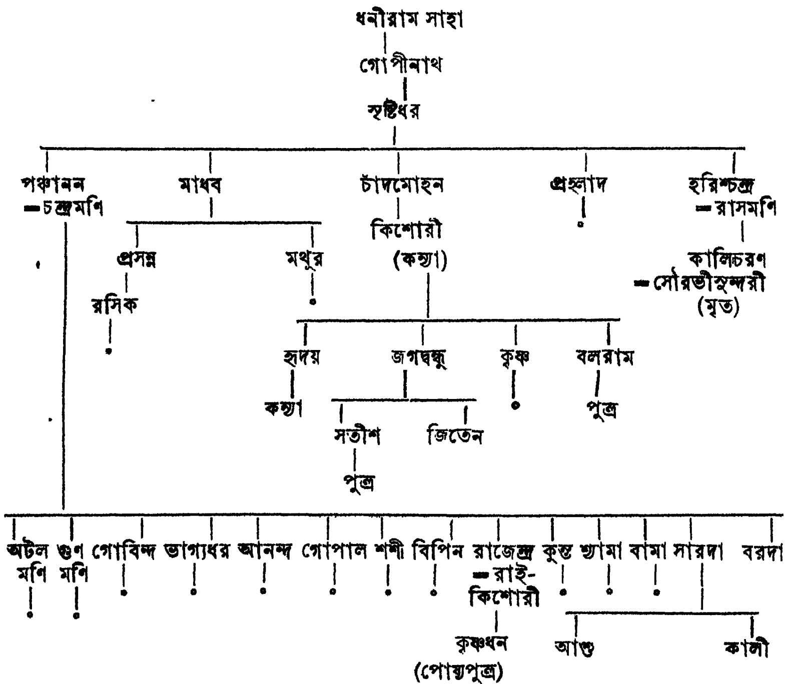
পদ্মলোচন সাহা।

পদ্মলোচন সাহার পূর্ব্বপুরুষগণ কোথা হইতে আসিয়া লোহাগড়া বাসস্থান নির্ম্মাণ করেন তাহা আমরা অবগত নহি। এই বংশে বর্ত্তমানে যাহারা জীবিত আছেন তাহারাও তাহাদের পূর্ব্বপুরুষগণের বিষয় বিশেষ কিছুই অবগত নহেন। পদ্মলোচনের একমাত্র পুত্র গোপালচন্দ্র। গোপালচন্দ্রের দুই পুত্র—অযোধ্যামাধব ও কানাইলাল। ইঁহারা উভয় ভ্রাতা ব্যবসায়-বাণিজ্যের

দ্বারা সাংসারিক অবস্থার বিশেষ উন্নতি-সাধন করিয়াছেন। উভয় ভ্রাতার সমবেত চেষ্টায় বসত বাটীতে এক প্রকাণ্ড অট্টালিকা নির্ম্মিত হইয়াছে এবং সম্প্রতি ইঁহারা লোহাগড়া বাজারের দোকান-ঘরকে দালানে পরিণত করিয়াছেন। আমরা দিন দিন ইঁহাদের শ্রীবৃদ্ধি আশা করি।

এই পশ্চিম পাড়ার অনেকেই নিজ নিজ পূর্ব্বপুরুষের নাম ধাম পর্য্যন্ত জানেন না, কাজেই ইহাদের সকলের বংশতালিকা বাহির হইল না। বর্ত্তমানে যাঁহারা উন্নতিশীল তন্মধ্যে ডাক্তার রজনীকান্ত সাহার নাম বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। ইনি বহুকাল কলিকাতায় ডাক্তারী ব্যবসায়ে বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া বর্ত্তমানে স্বগ্রামেই উক্ত ব্যবসায়ে লিপ্ত আছেন। অস্ত্রোপচারে রজনীকান্তের সুখ্যাতি আছে।

ধনীরাম সাহার বংশ তালিকা।



পঞ্চানন সাহা।

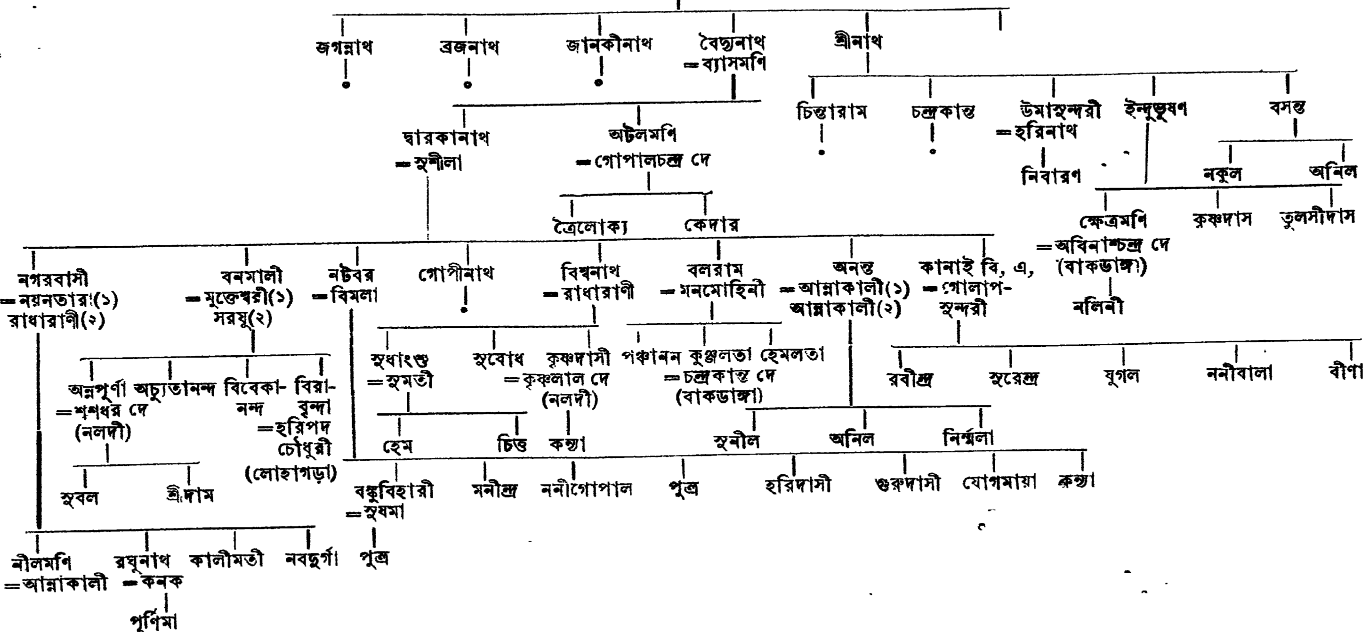
ধনীরাম সাহার বংশধরগণের মধ্যে পঞ্চাননই কীর্ত্তিমান পুরুষ। ধনীরামের

পুত্র গোপীনাথ তাহার পুত্র সৃষ্টিধর। সৃষ্টিধরের পাঁচ পুত্র—পঞ্চানন, মাধব, চাঁদমোহন, প্রহ্লাদ ও হরিশ্চন্দ্র। পঞ্চানন বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ লোক ছিলেন; গ্রামস্থ লোক তাহাকে সম্মান করিত। তিনি লোহাগড়া গ্রামে এক চিনির কারখানার স্বত্বাধিকারী ছিলেন। এই ব্যবসায় দ্বারা বহু অর্থ উপার্জ্জনে সক্ষম হন ও সঙ্গে সঙ্গে বার্ষিক দুর্গোৎসব ও শ্যামাপূজার প্রচলন করেন। এই পূজা উপলক্ষে প্রতি বৎসর যাত্রাগান দিতেন এবং বৎসরান্তে একবার বাটীতে মহোৎসবের আয়োজন করিতেন। এই চিনির ব্যবসায়ে পঞ্চাননের বিশেষ লোকসান্ হওয়ায় স্বীয়াবস্থার অনেক পরিবর্ত্তন ঘটে এবং দুর্গোৎসব পূজা বন্ধ হইয়া যায়। পঞ্চাননের সাত কন্যা ও সাত পুত্র সকলেই নিঃসন্তান। মাত্র কনিষ্ঠ পুত্র রাজেন্দ্র মৃত্যুর কিছুকাল পূর্ব্বে কৃষ্ণধনকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেন এবং কনিষ্ঠা কন্যা সারদার দুই পুত্র—আশু ও কালী লোহাগড়াই বসতিবাস করিতেছেন। সৃষ্টিধরের মধ্যম পুত্র মাধব। মাধবের দুই পুত্র—প্রসন্ন ও মথুর। প্রসন্নের পুত্র রসিক নিঃসন্তান। মথুরও নিঃসন্তান। তৃতীয় চাঁদমোহন অপুত্রক। চতুর্থ প্রহ্লাদ নিঃসন্তান। সর্ব্বকনিষ্ঠ হরিশ্চন্দ্র। হরিশ্চন্দ্রের একমাত্র পুত্র কালিচরণও নিঃসন্তান। কালিচরণ বর্ত্তমানে জীবিত আছেন এবং পূর্ব্বপুরুষ অনুষ্ঠিত বার্ষিক শ্যামাপূজা সুসম্পন্ন করিয়া আসিতেছেন।

প্রবীণ ব্যবসায়ী দ্বারকানাথ পোদ্দার।

মুক্তারাম পোদ্দার নলদী হইতে আসিয়া লোহাগড়া গ্রামে বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতে থাকেন। মুক্তারামের পুত্র তোতারাম। তাহার পুত্র রামনাথ। রামনাথের পাঁচপুত্র—জগন্নাথ, ব্রজনাথ, জানকীনাথ, বৈদ্যনাথ ও শ্রীনাথ। জ্যেষ্ঠ, মধ্যম ও তৃতীয় নিঃসন্তান। ৪র্থ বৈদ্যনাথের পুত্র দ্বারকানাথ মুক্তারামের অধস্তন ৫ম পুরুষ।

দ্বারকানাথের শিক্ষা যৎসামান্য হইয়া থাকিলেও, তিনি নিজ জীবনে অক্লান্ত পরিশ্রম, প্রভূত অধ্যবসায়, বিচক্ষণতা ও ন্যায় নিষ্ঠা দ্বারা যথেষ্ট অর্থ অর্জ্জন করিয়া দেশ বিদেশে ধনবান বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়া যান। প্রথম জীবনে অতি সামান্য ব্যবসায় আরম্ভ করিয়া ক্রমে শেষ জীবনে লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জ্জন করিতে দ্বারকানাথ যেরূপ সক্ষম হইয়াছিলেন এরূপ



মুক্তারাম পোদ্দারের বংশ তালিকা
মুক্তারাম পোদ্দার
তোতারাম পোদ্দার
রামনাথ পোদ্দার
জগন্নাথ
ব্রজনাথ
জানকীনাথ
বৈদ্যনাথ =ব্যাসমণি
শ্রীনাথ
দ্বারকানাথ =সুশীলা
অটলমণি =গোপালচন্দ্র দে
ত্রৈলোক্য
কেদার
চিন্তারাম
চন্দ্রকান্ত
উমাসুন্দরী =হরিনাথ
নিবারণ
ইন্দুভূষণ
বসন্ত
নকুল
অনিল
ক্ষেত্রমণি =অবিনাশচন্দ্র দে (বাকডাঙ্গা)
নলিনী
কৃষ্ণদাস
তুলসীদাস
নগরবাসী =নয়নতারা(১) রাধারাণী(২)
বনমালী =মুক্তেশ্বরী(১) সরযূ(২)
নটবর =বিমলা
গোপীনাথ
বিশ্বনাথ =রাধারাণী
বলরাম =মনমোহিনী
অনন্ত =আন্নাকালী(১) আন্নাকালী(২)
কানাই বি, এ, =গোলাপ-সুন্দরী
অন্নপূর্ণা =শশধর দে (নলদী)
অচ্যুতানন্দ
বিবেকা-নন্দ
বিরা-বৃন্দা =হরিপদ চৌধুরী (লোহাগড়া)
সুবল
শ্রীদাম
সুধাংশু =সুমতী
সুবোধ
কৃষ্ণদাসী =কৃষ্ণলাল দে (নলদী)
হেম
চিত্ত
কন্যা
পঞ্চানন
কুঞ্জলতা =চন্দ্রকান্ত দে (বাকডাঙ্গা)
হেমলতা
সুনীল
অনিল
নির্ম্মলা
রবীন্দ্র
সুরেন্দ্র
যুগল
ননীবালা
বীণা
বঙ্কুবিহারী =সুষমা
পুত্র
মনীন্দ্র
ননীগোপাল
পুত্র
হরিদাসী
গুরুদাসী
যোগমায়া
কন্যা
নীলমণি =আন্নাকালী
রঘুনাথ =কনক
পূর্ণিমা
কালীমতী
নবদুর্গা

এতদ্দেশে অতি অল্পই দৃষ্ট হয়। কলিকাতা, দৌলতপুর, লোহাগড়া, নলদী, গাঙ্গনালে, কামারখালি, বোয়ালমারী ও ভাটিয়াপাড়া প্রভৃতি স্থান সমূহ দ্বারকানাথের ব্যবসায় ক্ষেত্র। দ্বারকানাথ অতি সরল ও অমায়িক প্রকৃতির লোক ছিলেন। তিনি স্বোপার্জ্জিত সমস্ত ঐশ্বর্য্যই পুত্রগণের জন্য রাখিয়া পরলোক গমন করেন।

দ্বারকানাথের আটপুত্র জন্মগ্রহণ করে। জ্যেষ্ঠ নগরবাসী অতিশয় সরল প্রকৃতির লোক। ইহার দুই পুত্র—নীলমণি ও রঘুনাথ পিতার সহিত ব্যবসায় করিতেছেন। মধ্যম বনমালী একজন সাধুপ্রকৃতির লোক। ইহার দুইপুত্র অচ্যুতানন্দ ও বিবেকানন্দ উভয়েই নাবালক। তৃতীয় নটবরও পিতার ত্যক্ত ব্যবসায় করিয়া আসিতেছেন। ইহার চারিপুত্র; জ্যেষ্ঠ বঙ্কুবিহারী বি, এ, অধ্যয়ন করেন। দ্বারকানাথের ৪র্থ পুত্র গোপীনাথ নিঃসন্তান। পঞ্চম বিশ্বনাথ ও ৬ষ্ঠ বলরাম উভয়েই নাবালক পুত্রগণ রাখিয়া পরলোক গমন করেন। বিশ্বনাথের দুইপুত্র; জ্যেষ্ঠ সুধাংশু ব্যবসায় লিপ্ত ও কনিষ্ঠ সুবোধ প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া আই, এস সি, অধ্যয়ন করেন। বলরামের একমাত্র নাবালক পুত্র পঞ্চানন।

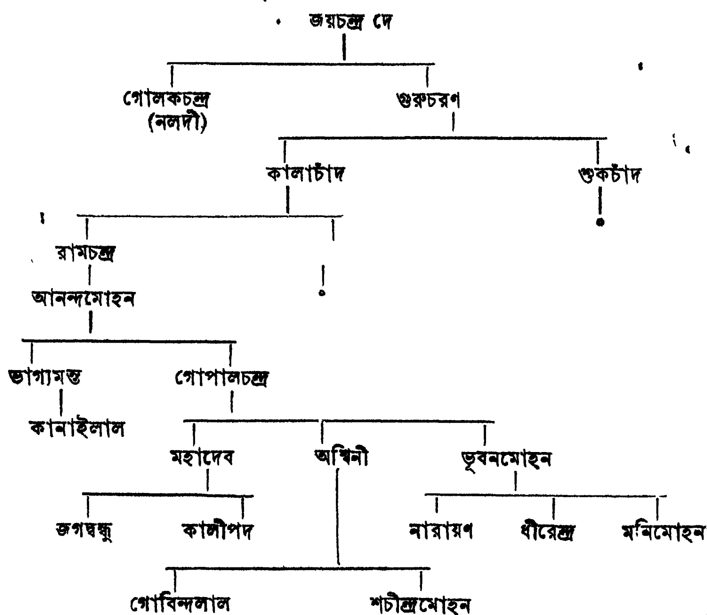
দ্বারকানাথের পুত্রগণের মধ্যে বলরামই অতিশয় বুদ্ধিমান ছিলেন। ব্যবসায় তাঁহার জ্ঞান সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিলক্ষিত হইত। কলিকাতায় পিতার আড়তে অবস্থান করিয়া বলরাম ব্যবসায় ক্ষেত্রে বিশেষভাবে পরিচিত হইয়াছিলেন। সপ্তম পুত্র অনন্তও সাধু প্রকৃতির লোক। ইনিও পৈত্রিক ব্যবসায় লিপ্ত আছেন। ইহার দুই পুত্র—সুনীল ও অনিল। সর্ব্ব কনিষ্ঠ কানাই উচ্চশিক্ষিত ও তীক্ষ্ণবুদ্ধি সম্পন্ন। কানাই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ব্যবসায় ক্ষেত্রে প্রবেশ করেন। ইহার তিন পুত্র—রবীন্দ্র, সুরেন্দ্র ও যুগল সকলেই নাবালক।

দ্বারকানাথ নিজবাটীতে এক সুবৃহৎ অট্টালিকা নির্ম্মাণ করেন ও বার্ষিক ৺শ্যামাপূজা প্রচলন করিয়া বহু অর্থ ব্যয় করেন। ইহার পুত্রগণ পিতার বিপুল ঐশ্বর্য্যের উত্তরাধিকারী হইয়াও বাষিক দুর্গোৎসব পূজা রক্ষা করিতে পারেন নাই।

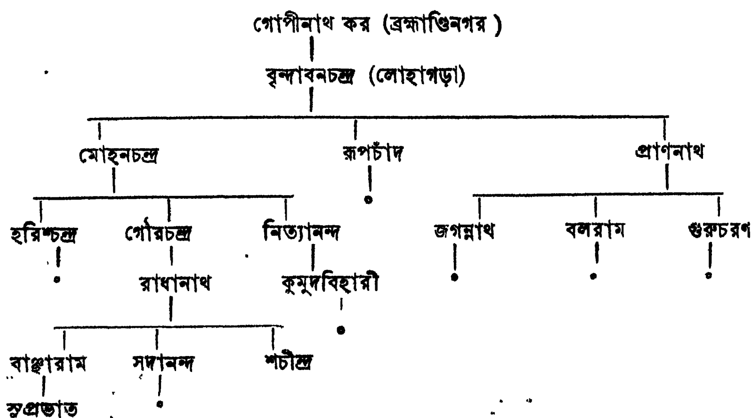
রামনাথের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীনাথ। শ্রীনাথের চারিপুত্র—চিন্তারাম, চন্দ্রকান্ত, ইন্দুভূষণ ও বসন্ত। জ্যেষ্ঠ ও মধ্যম নিঃসন্তান। তৃতীয় ইন্দুভূষণ সৎপ্রকৃতির

লোক। ইহার দুই পুত্র—কৃষ্ণদাস ও তুলসীদাস। কৃষ্ণদাস ডাক্তারী পড়িতেছেন। সর্ব্ব কনিষ্ঠ বসন্ত। বসন্তের দুই পুত্র—নকুল ও অনিল।

জয়চন্দ্র দের বংশ তালিকা।



গোপীনাথ করের বংশ তালিকা।



জয়চন্দ্র দে।

অনুমান ১১১৯ সালে জয়চন্দ্র দে ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত ধোপাঘাটা গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া লোহাগড়া গ্রামে আসিয়া বসতিবাস করেন। জয়চন্দ্রের দুই পুত্র—গোলক ও গুরুচরণ। গোলক লোহাগড়া ত্যাগ করিয়া নলদী যাইয়া বাস করেন। গুরুচরণের দুই পুত্র—কালাচাঁদ ও শুকচাঁদ। শুকচাঁদ নিঃসন্তান। কালাচাঁদের পুত্র রামচন্দ্র; তাহার পুত্র আনন্দমোহন। আনন্দমোহনের দুই পুত্র—ভাগ্যমন্ত ও গোপালচন্দ্র। ভাগ্যমন্তের একমাত্র পুত্র কানাইলাল। গোপালচন্দ্রের তিন পুত্র—মহাদেব, অশ্বিনী ও ভুবনমোহন। ইহারা তিন ভ্রাতাই ব্যবসায় করিতেছেন। জ্যেষ্ঠ মহাদেব স্থানীয় বাজারে ব্যবসায় করিয়া বিশেষ লাভবান হইয়াছেন। ইহার দুই পুত্র—জগদ্বন্ধু ও কালিপদ। অশ্বিনীর দুই পুত্র—গোবিন্দলাল ও শচীন্দ্রমোহন। ভুবনমোহনের তিনপুত্র—নারায়ণ, ধীরেন্দ্র ও মণিমোহন ইহারা সকলেই নাবালক।

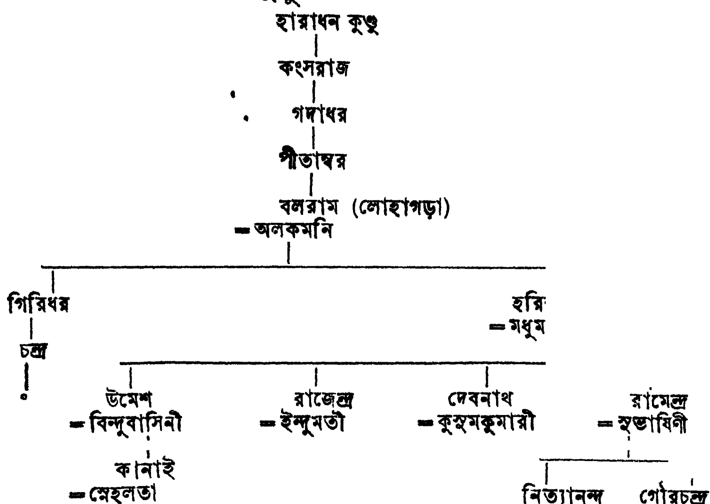
গোপীনাথ কর।

নলদীর নিকটবর্ত্তী ব্রহ্মাণ্ডিনগর গ্রামে গোপীনাথ কর বাস করিতেন। গোপীনাথের একমাত্র পুত্র বৃন্দাবনচন্দ্র লোহাগড়া আসিয়া বসতিবাস করেন। বৃন্দাবনের তিনপুত্র—মোহন, রূপচাঁদ ও প্রাণনাথ। রূপচাঁদ নিঃসন্তান। মোহনের তিনপুত্র—হরিশচন্দ্র, গৌরচন্দ্র ও নিত্যানন্দ। হরিশচন্দ্র নিঃসন্তান। গৌরচন্দ্রের একমাত্র পুত্র রাধানাথ সাধু প্রকৃতির লোক। দেব-দ্বিজে সদাই ভক্তিপরায়ণ। ইনি স্থানীয় বাজারে ব্যবসায় করেন। পিত্তল, কাঁসা ও শাঁখার ব্যবসায় করিয়া রাধানাথ বহু অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছেন। ইহার তিন পুত্র—বাঞ্ছারাম, সদানন্দ ও শচীন্দ্র। জ্যেষ্ঠ বাঞ্ছারাম আই, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ব্যবসায় ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছেন। বাঞ্ছারামের পুত্র সুপ্রভাত নাবালক। রাধানাথের মধ্যম পুত্র সদানন্দের বাল্যকালেই মৃত্যু হয়। সর্ব্ব-কনিষ্ঠ শচীন্দ্র নাবালক। নিত্যানন্দের পুত্র কুমুদবিহারী নিঃসন্তান। প্রাণনাথের তিন পুত্র—জগন্নাথ, বলরাম ও গুরুচরণ ইহারা সকলেই নিঃসন্তান।

প্রবীণ ব্যবসায়ী হরিশচন্দ্র কুণ্ডু।

হারাধন কুণ্ডুর পুত্র কংসরাজ, তাহার পুত্র গদাধর, তাহার পুত্র পীতাম্বর;

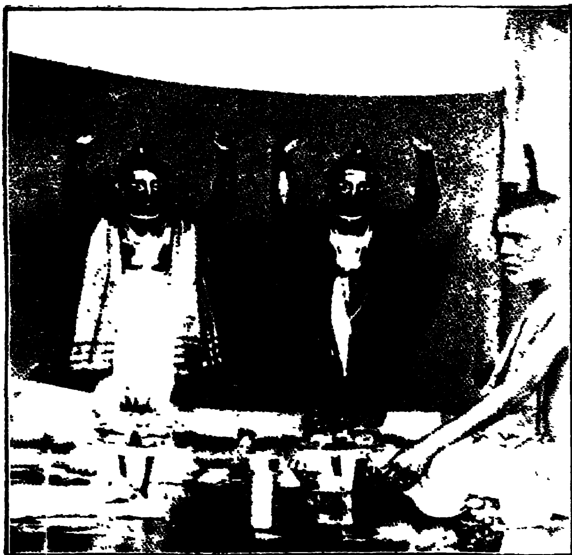
হারাধন কুণ্ডুর বংশতালিকা।



ইহারা মণ্ডলভাগ হইতে পুরুষানুক্রমে নলদী আসিয়া বাস করেন। পীতাম্বরের পুত্র বলরাম নলদী গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া লোহাগড়া আসিয়া বাসস্থান নির্ম্মাণ করেন এবং তৎকাল হইতে ইহার পুত্র পৌত্রাদি লোহাগড়ার অধিবাসী বলিয়া পরিচিত হইয়া আসিতেছেন। বলরামের দুই পুত্র—গিরিধর ও হরিশচন্দ্র। গিরিধরের একমাত্র পুত্র চন্দ্র নিঃসন্তান।

হরিশচন্দ্র অতিশয় সরল, অমায়িক ও উদার প্রকৃতির লোক ছিলেন। তিনি ব্যবসায়-বাণিজ্যে প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করেন। বাণিজ্য বিষয়ে অসাধারণ জ্ঞান থাকায় অতি অল্পকাল মধ্যে একজন ধনী বলিয়া পরিচিত হন। তিনি লোহাগড়া থাকিয়া ব্যবসায় দ্বারা দেশ বিদেশে বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন।

হরিশচন্দ্রের চারি পুত্র—উমেশ, রাজেন্দ্র, দেবনাথ ও রামেন্দ্র। জ্যেষ্ঠ উমেশ নাবালক পুত্র কানাইকে রাখিয়া পরলোক গমন করেন। মধ্যম রাজেন্দ্র অতিশয় মিষ্টভাষী, সরল স্বভাব ও কার্য্যকুশল ব্যক্তি। তিনি পিতার ত্যক্ত ঐশ্বর্য্যের উত্তরাধিকারী হইয়া নিজবাটীতে এক সুবৃহৎ অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া বার্ষিক দুর্গোৎসব পূজার প্রচলন করিয়াছেন। তৃতীয় দেবনাথ ও কনিষ্ঠ রামেন্দ্র উভয়েই মধ্যম ভ্রাতা রাজেন্দ্রের অনুগত ও তাহার সহিত ব্যবসায় লিপ্ত আছেন। রাজেন্দ্র ও দেবনাথ উভয়েই অপুত্রক; রামেন্দ্রের দুই পুত্র—নিত্যানন্দ ও গৌরচন্দ্র ইহারা নাবালক।



শ্রীশ্রী৺ গৌর নিতাই বিগ্রহ

(৺মধুসূদন দাস প্রতিষ্ঠিত



শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র নাথ কুণ্ডু

মধুমিলন মন্দির প্রতিষ্ঠার প্রধান উদ্যোক্তা

পৃ: ১৯৫

পঞ্চম অধ্যায়।

(বিবিধ)

শিক্ষা ও উন্নতি।

কোন দেশের প্রকৃত উন্নতির বিষয় সম্যক্‌রূপে অবগত হইতে হইলে, তিন প্রকার কার্য্যে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। প্রথম সে দেশের লোকে দেবমূর্ত্তি, মন্দির বা মসজিদ কিরূপ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল; দ্বিতীয় সে দেশে সাহিত্য ও জ্ঞান চর্চ্চা এবং গান ও পুস্তকাদির রচনা কেমন হইয়াছে; তৃতীয় সে দেশের লোকের শিক্ষা লাভের কিরূপ ব্যবস্থা আছে। এই ত্রিবিধ কার্য্যের পরিচয় পাইলে এবং সেই সম্পর্কে যে সব বড় বড় লোক জন্মগ্রহণ করিয়া দেশকে পবিত্র করিয়াছেন তাঁহাদের কথা জানিতে পারিলে আমরা সত্য সত্যই সে দেশের গৌরব কাহিনী জানিতে পারি। লোহাগড়া সম্বন্ধে এই ৩টী বিষয়ের কিছু কিছু বিবরণ দিয়া এই প্রসঙ্গ শেষ করিতেছি।

দেশ উন্নত হইলে তাহার চিহ্ন দালান ইমারতে বা মূর্ত্তি রচনায় পাওয়া যায়। প্রাচীন কালের কোন মন্দির এখানে নাই। যাহা আছে তাহার বয়স ৩।৪ শত বৎসরের বেশী হইবে না। মজুমদার বাটীর জোড় বাঙ্গলা মোগল আমলের শিল্প প্রকাশ করে। ইহা শিল্প কার্য্যে পূর্ণ ও পুরাতন দোচালা মন্দিরের নিদর্শন। রাঘবেন্দ্র দত্তের দোলমঞ্চ ও শিবমন্দির প্রাচীন কীর্ত্তি। বর্ত্তমান দাসেদের বাড়ীতে দত্ত-বংশীয় দোলমঞ্চের দ্বারাও পুরাতন নমুনা পাওয়া যায়। (লক্ষ্মীপাশার ৺কালী-মন্দির বহুকাল হইতে সমগ্র যশোহর জেলার তীর্থস্থান হইয়া আছে)। তহবিলদার বাটীতে ৺বাসুদেব বিগ্রহের জন্য যে সুবৃহৎ কারুকার্য্য খচিত মন্দির নির্ম্মিত হয় তাহার অস্তিত্ব লোপ হইয়া গিয়াছে। পণ্ডিত রামভদ্র সিদ্ধান্তের বাটীর ও রায় বাটীর শিব-মন্দির-দ্বয় বেশ সুন্দর ছিল। ৺জগন্নাথদেবের মন্দির; গৌর-নিতাই মন্দির ও সরকার বাটীর শিবমন্দির আধুনিক কালের মন্দির। মূর্ত্তির সৌন্দর্য্য হিসাবে ধরিতে গেলে রায় বাটীর জগন্নাথদেবের মত বিগ্রহ শুধু

যশোহর জেলায় কেন বোধহয় সমগ্র বঙ্গে অন্য কোথায়ও নাই। মধু মিলন মন্দিরে গৌর-নিতাই বিগ্রহের তুলনা নাই। ইহা ব্যতীত ছোট ছোট চতুর্ভুজ বাসুদেব মূর্ত্তি, রাধাকৃষ্ণ মূর্ত্তি, শিবলিঙ্গ, গোপাল ও শ্রীশ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ-শিলা দত্ত-মজুমদার, রায়-সরকার বংশীয় ঘরে ঘরে গৃহদেবতারূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়া নিত্য পূজা পাইতেছেন।

পূর্ব্বে এই গ্রামে ব্রাহ্মণ বাড়ীতে বহু বড় বড় অধ্যাপক জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহারা নিজ নিজ বাটীতে চতুষ্পাঠী খুলিয়া ছাত্র রাখিয়া তাহাদের সংস্কৃত ব্যাকরণাদি শাস্ত্র পড়াইতেন। পূর্ব্বে লোহাগড়ায় কথকতা, রামায়ণ-গান, পাঁচালী, ঢপ, যাত্রা, ভাষান ও কবির গান হইত। রামাই স্বর ও নিবারণ চন্দ্র রায় যাত্রার দল গঠন করিয়া অধিকারী হইয়াছিলেন। লেখাপড়া শিখিলেই লোকে কবি হয় না। এদেশের অনেক এক প্রকার নিরক্ষর লোক সুন্দর কবিতা ও মধুর গান রচনা করিয়া পাঁচালী ও জারীর গানের দলের সাহায্যে দশের কাছে প্রচার করিতেন। সে সকল কবিদের কথা আমাদের স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। কবিদার তারক কাড়ালের কথা অনেকেই অবগত আছেন। ইহার বহু পূর্ব্বে স্বভাবকবি গোবিন্দ চন্দ্র স্বর জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সুন্দর সুন্দর কবিতা রচনা করিয়া গ্রামবাসীকে শ্রবণ করাইয়া তাহাদিগকে মুগ্ধ করিতেন। পূর্ব্বে বংশ পরিচয়ে পাঠক পাঠিকা তাঁহার রচিত কবিতার মাধুর্য্য অবলোকন করিবেন।

আধুনিক যুগেও এই গ্রামে বহু বাঙ্গলা ও ইংরাজী দার্শনিক গ্রন্থ লিখিয়া বেদান্ত বাচস্পতি রায় যদুনাথ মজুমদার বাহাদুর সি, আই, ই ও অধ্যাপক ডাক্তার মহেন্দ্রনাথ সরকার এম, এ; পি এইচ, ডি, মহোদয়গণ দেশ বিদেশে খ্যাতি লাভ করিয়া যশোহরের যশোবৃদ্ধি করিয়াছেন। ইহা ব্যতীত ফলাহার তত্ত্ব, শনির পাঁচালী, স্কুলপাঠ্য বাঙ্গলা ব্যাকরণ প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা ৺পণ্ডিত জগদ্বন্ধু বিদ্যাবিনোদ ও চিন্তা-নির্ঝরিণী, প্রবন্ধমালা প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা কুমার বিক্রম মজুমদার লোহাগড়ার গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন।

বর্ত্তমান সময়েও নব্যনব্য যুবকদের মধ্যে সাহিত্য চর্চ্চার প্রবল আকাঙ্খা পরিলক্ষিত হয়। তন্মধ্যে ধীরেন্দ্রনাথ মজুমদার ও বিভূতিভূষণ সরকারের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখ যোগ্য।



রায়বাহাদুর যদুনাথের উর্দ্ধতন ৭ম পুরুষ স্বর্গীয় কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার প্রতিষ্ঠিত গৃহদেবতা শ্রীশ্রী৺ লক্ষ্মীনারায়ণ শিলা ও



স্বর্গীয় দেবানন্দ সরকার প্রতিষ্ঠিত সরকার বাটীর গৃহদেবতা শ্রীশ্রী৺শ্রীধর বিগ্রহ।

লোহাগড়া কাহিনী

লোহাগড়ায় প্রাচীন কাল হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত কি ভাবে শিক্ষা বিস্তার হইয়া আসিতেছে তাহা এখন পাঠককে অবগত করাইব। অনুমান ১০৩০ সালে কমললোচন দত্তের জ্যেষ্ঠপুত্র পণ্ডিত শ্রেষ্ঠ বংশীধর মিরবহর লোহাগড়া গ্রামে এক পার্শী পাঠশালা স্থাপন করত গ্রামের তদানীন্তন বালকগণের পার্শী শিক্ষার সুব্যবস্থা করেন। সম্ভবতঃ এই পাঠশালায় ক্রমান্বয়ে খ্যাতনামা স্বর্গীয় কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার, ৺খ্যাতনামা রামচন্দ্র মিরবহর, ৺খ্যাতনামা চন্দ্রশেখর মজুমদার, ৺রাধাকান্ত দত্ত, ৺শ্যামলাল দত্ত, ৺গণেশচন্দ্র দত্ত, ৺তিলকচন্দ্র দত্ত, ৺বিষ্ণুচরণ দত্ত, ৺খ্যাতনামা রূপরাম দাস চৌধুরী প্রভৃতি অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী সময়ে ৺রাজীবলোচন মজুমদার, ৺হরিবল্লভ মজুমদার, ৺স্বনামধন্য বিদ্যাধর রায়, ৺বৈষ্ণব দাস মজুমদার, ৺দেবানন্দ সরকার, ৺দর্পনারায়ণ মজুমদার, ৺রাঘবচন্দ্র দত্ত, ৺দাতারাম মজুমদার, ৺পদ্মলোচন মজুমদার, ৺খ্যাতনামা ফকিরচন্দ্র রায়, ৺হরিশচন্দ্র মজুমদার, ৺বংশীধর স্বর, ৺স্বভাব কবি গোবিন্দচন্দ্র স্বর, প্রভৃতি পার্শী ও বাঙ্গলা ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া বিদ্বান ও বুদ্ধিমান বলিয়া সুপরিচিত ছিলেন। ইহা ব্যতীত প্রায় ২৫০ বৎসর হইতে লোহাগড়া গ্রামে সংস্কৃত চর্চ্চা হইয়া আসিতেছে। স্বর্গীয় পণ্ডিত নারায়ণচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, ৺পণ্ডিত কালিনাথ বিদ্যাভূষণ, ৺পণ্ডিত বিষ্ণুরাম সিদ্ধান্ত, ৺পণ্ডিত হরিনারায়ণ বিদ্যালঙ্কার, ৺পণ্ডিত ভৈরবচন্দ্র বিদ্যানিধি, ৺পণ্ডিত রামদাস বিদ্যালঙ্কার, ৺পণ্ডিত ষষ্ঠিদাস ন্যায়লঙ্কার, ৺পণ্ডিত কমলাকান্ত বিদ্যালঙ্কার, ৺পণ্ডিত প্রাণনাথ শিরোমণি, ৺পণ্ডিত হরানন্দ বিদ্যাভূষণ প্রভৃতি স্ব স্ব জীবিতাবস্থায় নিজ নিজ বাটীতে চতুষ্পাঠী খুলিয়া সংস্কৃত ব্যাকরণাদি শিক্ষা দিয়াছেন এবং বর্ত্তমান সময়ও ঐ প্রথানুযায়ী সংস্কৃত শিক্ষার ব্যবস্থা চলিয়া আসিতেছে। তবে আধুনিক যুগের ন্যায় পূর্ব্বকালে সংস্কৃত চর্চ্চার বিশেষ প্রসার লাভ দৃষ্ট হয় না। তখন সাধারণতঃ লোকে সংস্কৃত চর্চ্চা আদৌ করিতেন না। ইহা শুধু পণ্ডিতদিগের গণ্ডীর ভিতরই আবদ্ধ ছিল। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সময় হইতেই এতদ্দেশে সংস্কৃত চর্চ্চার প্রভাব বিস্তার হইতে দেখা যায়।

শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ভৌমিকের পিতা ৺গৌরচন্দ্রের বাড়ীতে অনুমান ১২২৫ সালে ধর্ম্মদেব পাড়া নিবাসী মুন্সী গয়জদ্দী পার্শী পাঠশালা স্থাপন করিয়া

গ্রামের তদানীন্তন বালকবৃন্দকে পার্শী শিক্ষা প্রদান করিতেন। এই স্কুলে ৺গৌরচন্দ্র ভৌমিক, ৺হরচন্দ্র সরকার প্রভৃতি পার্শী শিক্ষা করিয়া পার্শী-ভাষায় বিশেষ দক্ষতা লাভ করেন। তৎপরে ৺তারাপ্রসন্ন মজুমদারের বাড়ীতে প্রথম বাঙ্গলা পাঠশালা স্থাপিত হয়। ইহার পূর্ব্বে এ গ্রামে বাঙ্গলা পাঠশালার সৃষ্টি হয় নাই। এই পাঠশালায় জয়পুর নিবাসী প্রহ্লাদচন্দ্র কাড়ার পণ্ডিতের কার্য্য করিতেন। প্রহ্লাদচন্দ্রের গণিত শাস্ত্রে তদানীন্তন সময়ে বিশেষ পাণ্ডিত্য ছিল। সকলে তাহাকে 'শুভঙ্কর' বলিত ; গণিতশাস্ত্রে তাহার সমকক্ষ কেহই ছিল না। কথিত আছে যে সময় প্রথম বাঙ্গলা পাটীগণিত ছাপা হইয়া পুস্তকাকারে বাহির হয় তখন তিনি তাহা দেখিয়া পড়িয়া বলিতেন, যে ইহার সমস্তই মুখে মুখে সমাধান করিয়া দিতে পারি এজন্য ছাপা বহির দরকার কি ? এই পাঠশালায় ৺প্রহ্লাদচন্দ্র সরকার, ৺তারাপ্রসন্ন মজুমদার, ৺দুর্গাচরণ চক্রবর্ত্তী, ৺তারিণীচরণ মুখোপাধ্যায়, ৺রজনীকান্ত মজুমদার, ৺বিশ্বনাথ সরকার, ৺জগৎচন্দ্র দত্ত, ৺গিরিশচন্দ্র দত্ত, ৺সত্যমন্ত সরকার, গিরিশচন্দ্র ভৌমিক, ৺মোহনচন্দ্র দত্ত প্রভৃতি প্রহ্লাদ গুরুমহাশয়ের নিকট বাঙ্গলা শিক্ষা করিয়াছিলেন। তৎপর ঐ স্কুলে আব্দুল খা (সিদ্ধিপাশা) ও খায়রু মুন্সী (কুমারকান্দা) পণ্ডিত ছিলেন। ইহাদের পর গঙ্গাধর বিশ্বাস এখানে পণ্ডিতি করেন। এই স্কুলে মথুরানাথ মজুমদার, কৈলাশচন্দ্র মজুমদার প্রভৃতি রায়-সরকার ও মজুমদার বংশীয়রা সকলে লেখাপড়া শিখিতেন। তৎপরেও বৃদ্ধ প্রহ্লাদচন্দ্র কাড়ার পুনরায় এই স্কুলে আসিয়া গুরুগিরি করেন। রায় বাহাদুর যদুনাথও বাল্য বয়সে এই স্কুলে গঙ্গাধর বিশ্বাস ও প্রহ্লাদচন্দ্র কাড়ারের নিকট কিছুদিন পড়িয়াছিলেন, পরে ঐ স্কুল লোপ হইয়া যাওয়ায় রায় বাটীতে ৺গিরিধর রায় মহাশয় এক পাঠশালা স্থাপন করেন। এই স্কুলে কুমিরা সাকিনের গিরিশচন্দ্র ঘোষ পণ্ডিতি করিতেন। এখানে শ্রীনাথ মজুমদার, পার্ব্বতীচরণ দত্ত, বরদাকান্ত দত্ত, নিবারণচন্দ্র দত্ত ৺নিবারণচন্দ্র সমাদ্দার, ৺প্রসন্নগোপাল রায়, ৺শশীভূষণ সরকার প্রভৃতি লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন।

রায় বাহাদুর যদুনাথ যখন বি, এ, ক্লাসের ছাত্র তখন তিনি কালনা গ্রামের ছাত্রবৃত্তি স্কুলের হেড্পণ্ডিত উমাচরণ চক্রবর্ত্তী (বোড়াবাহুড়া) ও সেকেণ্ড পণ্ডিত প্রসন্নকুমার সিকদার (মিরাপাড়া) কে আনাইয়া কালনা স্কুল এই



শ্রীযুক্ত আশুতোষ চক্রবর্ত্তী বি, এ,
হেড্‌মাষ্টার।

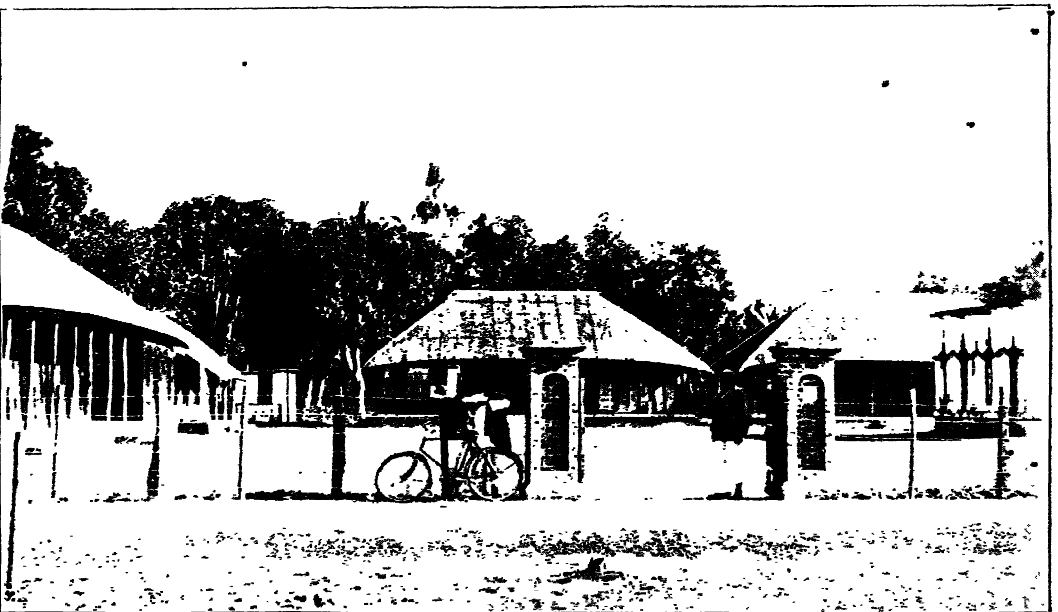
পৃঃ ১৯৯

গ্রামে স্থাপন করিলেন এবং লোহাগড়া স্কুল কাগজপত্রে কালনা স্কুল নামে অভিহিত ছিল। প্রথম ছাত্রবৃত্তি স্কুল ৺জগৎচন্দ্র দত্তের দালানে স্থাপিত হয়। ক্রমে ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়ায় ৺তারাপ্রসন্ন মজুমদারের বাটীতে স্থানান্তরিত হইয়া কিছুকাল চলিতে থাকে ; তৎপর নানাপ্রকার অসুবিধা হওয়ায় যে স্থানে প্রফুল্লকুমার রায়ের বসতবাটী ঐ স্থানে গ্রামের লোকের সমবেত চেষ্টায় একখানা খড়ের ঘর প্রস্তুত হইয়া কিছুদিনের জন্য স্কুল ঐ স্থানেই চলিতে থাকে। কিছুকাল পরে ছাত্রবৃত্তি স্কুলকে যদুনাথ মাইনর স্কুলে পরিবর্ত্তন করেন। সে সময় কালনা গ্রামের উমেশচন্দ্র সাহা স্কুলের হেড্‌মাষ্টার এবং প্রসন্নকুমার শিকদার সেকেণ্ড পণ্ডিত ছিলেন। ছাত্রবৃত্তি স্কুলের হেডপণ্ডিত উমাচরণ চক্রবর্ত্তীর বাড়ী বোড়াবাদুড়া থাকায় এবং নড়াইল মহকুমায় নূতন এণ্ট্রান্স স্কুল হওয়ায় তিনি তথায় হেড পণ্ডিতের পদ গ্রহণ করিয়া এ স্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। যে সময় লোহাগড়ায় প্রথম ছাত্রবৃত্তি স্কুল হয় সে সময় লক্ষ্মীপাশায় এণ্ট্রান্স স্কুল চলিতেছে। পূর্ব্বে যে মাইনর স্কুল ছিল তাহাই এণ্ট্রান্সে পরিণত হয়। কিছুদিন পরে ঐ এণ্ট্রান্স স্কুল উঠিয়া গিয়া পূর্ব্বের ন্যায় মাইনর স্কুলে পরিণত হয় ; পরে লোহাগড়া এণ্ট্রান্স স্কুল স্থাপনের ৫।৭ বৎসর পূর্ব্বে পুনরায় এণ্ট্রান্স স্কুলে পরিবর্ত্তিত হয়।

বেদান্তবাচস্পতি যদুনাথ ১৯০২ খৃষ্টাব্দে লোহাগড়া এণ্ট্রান্স স্কুল স্থাপন করেন। সাবেক মাইনর স্কুল ঘরেই উহার কার্য্য চলিতে থাকে। তিন চারি মাস ঐ স্থানে স্কুল চলিবার পর ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধি না হওয়ায় স্কুলের প্রধান উদ্যোক্তা শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ মজুমদার ও পণ্ডিত অন্নদাচরণ বিদ্যাভূষণ লোহাগড়া হইতে স্কুল জয়পুরের চরে ৺বিশ্বনাথ সরকার মহাশয়ের ভাঙ্গা হাটের যে সমস্ত গৃহ ভগ্নাবস্থায় পতিত ছিল সেই সমস্ত গৃহে বিশ্বনাথ বাবুর আদেশ লইয়া মেরামত করিয়া তাহাতে স্কুল স্থানান্তরিত করেন। ক্রমে ৩।৪ মাসের মধ্যে স্কুলের ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধি হইয়া স্কুল নিজ ব্যয় সঙ্কুলান করিতে সমর্থ হয়। সাবেক মাইনর স্কুলের পণ্ডিত প্রসন্নকুমার সিকদার ও মাষ্টার উমেশচন্দ্রসাহা বেতনভোগী শিক্ষক ছিলেন। ইহা ব্যতীত শ্রীনাথ মজুমদার, অন্নদাচরণ বিদ্যাভূষণ, যতীন্দ্রনাথ রায়, মতিলাল সরকার ও ৺মহেন্দ্র গোপাল মজুমদার স্কুল নিজের আয়ে ব্যয় সঙ্কুলান করিতে সক্ষম না হওয়া পর্য্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষকের কার্য্য করিয়া স্কুলের বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন। স্কুলের ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ

মজুমদার ও অন্নদাচরণ বিদ্যাভূষণ উভয়ে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া গ্রামে গ্রামে ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধি করিতে বিশেষ কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। জয়পুর নিবাসী শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এই স্কুলের জন্য বিশেষভাবে যত্ন ও চেষ্টা করিয়াছিলেন। সেনহাটী নিবাসী বাবু সুরেন্দ্রমোহন সেন বি, এ, মহাশয়কে এই স্কুলের হেডমাষ্টার করিয়া ১৯০৩ খৃঃ প্রথম পরীক্ষার জন্য ছাত্র পাঠান হয়। পরীক্ষার ফলে এই স্কুল হইতে প্রথম বৎসরই শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ রায় এম, এ ; বি, এল, এড্‌ভোকেট্‌ ১৫৲ টাকা বৃত্তি পাইয়া স্কুলের গৌরব অক্ষুন্ন রাখিয়াছেন। রবিবাবু বর্ত্তমানে আলিপুরে ব্যবহারাজীবের কার্য্য করিয়া বিশেষ সুযশ অর্জ্জন করিয়াছেন।

এই স্কুল স্থাপনের সময় ছাতড়া নিবাসী ৺পরীক্ষিৎচন্দ্র সাহা দুই শত টাকা মূল্যের টিন্‌, লোহাগড়া নিবাসী প্রবীণ ব্যবসায়ী ৺দ্বারকানাথ পোদ্দার ১০০৲ টাকা, ৺হরিশ্চন্দ্র কুণ্ডু ১০০৲ টাকা, ৺নিবারণচন্দ্র সাহা পঞ্চাশ টাকা ও কুন্দশীর ৺হরগোবিন্দ আড়িন্দা সাহা পঞ্চাশ টাকা দিয়া রায় বাহাদুর যদুনাথকে সাহায্য করিয়াছিলেন। ইহা ব্যতীত সমস্ত অর্থই রায় বাহাদুর নিজে দিয়া স্কুল স্থাপন করিয়াছিলেন, এমন কি স্কুল স্থাপনের পরও দুই এক বৎসর কাল স্কুলের সমস্ত খরচ তিনি নিজেই বহন করিয়াছিলেন। মৃতা নবগঙ্গা নদী পুনরায় লোহাগড়া বাজারের নিম্নে ক্রমে প্রবল হওয়ায় ছাত্রদের পারাপারের বিশেষতঃ বর্ষাকালে বিশেষ অসুবিধা ঘটায় পুনরায় রায় বাহাদুর ঐ স্কুল জয়পুর চর হইতে লোহাগড়া আনিয়া বর্ত্তমান স্থানে ১৯১৮ খৃঃ স্থাপন করিয়া দেন। বর্ত্তমানে যেস্থানে স্কুল স্থাপিত উহা রায় বাহাদুর যদুনাথ ও তদীয় ভ্রাতা শ্রীযুত শ্রীনাথ মজুমদারের অধীন শ্রীযুত রমেশচন্দ্র ও অনাথবন্ধু মজুমদারের জমাই সত্ত্বে প্রকাণ্ড আম্রকানন ছিল। স্কুলের জন্য রমেশ বাবু ও অনাথ বাবু স্কুল কমিটীকে উক্ত স্থান জমা দিয়া যথেষ্ট স্বার্থত্যাগ করিয়াছেন। এই স্কুল যখন স্থাপিত হয় তখন লোহাগড়া স্কুল নামেই পরিচিত পরে জয়পুর নিবাসী শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অন্যান্য সকলে স্কুলের প্রতি যথেষ্ট সহানুভূতি দেখাইয়া স্কুলের উন্নতির চেষ্টা করিয়াছিলেন তাই স্কুলের নাম জয়পুর লোহাগড়া বলিয়া পরিচিত হইয়া আসিতেছে। উক্ত স্কুলের বর্ত্তমান হেডমাষ্টার গোবরডাঙ্গা নিবাসী শ্রীযুক্ত আশুতোষ চক্রবর্ত্তী বি, এ,। ইনি ১৯০৩ খৃঃ হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত সুশৃঙ্খলা



লোহাগড়া হাই স্কুল।

(রায়বাহাদুর যদুনাথ প্রতিষ্ঠিত)

পৃঃ ২০১

ও বিশেষ দক্ষতার সহিত স্কুলের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন।

পূর্ব্বে এই গ্রামে স্ত্রী শিক্ষার বিশেষ কোন সুব্যবস্থা ছিল না। প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে উমাচরণ চক্রবর্ত্তীর শিক্ষকতায় এক বালিকা বিদ্যালয়ের সৃষ্টি হয় এবং মাত্র তিনচারি বৎসর স্থায়ী হইয়া লুপ্ত হইয়া যায়। পরে ১৯১৭ খৃঃ শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রনাথ মজুমদার বি, এ, মহাশয়ের চেষ্টা ও যত্নে তাহাদের নিজ বাটীতে প্রথম বালিকাবিদ্যালয় স্থাপিত হয়; কিছুদিন তিনি নিজেই শিক্ষকের কার্য্য করেন। এই সময় বালকদের শিক্ষারও কোন বিশেষ উপযুক্ত ব্যবস্থা ছিল না।" যাহা ছিল তাহার দ্বারা বালকদিগের প্রকৃত শিক্ষা হইত না। হরেন বাবু বালিকা বিদ্যালয়ের সঙ্গে বালকদেরও শিক্ষা দিতে আরম্ভ করেন। তৎপরে ইতিনা নিবাসী পণ্ডিত বসন্তকুমার দত্তকে আনাইয়া এই বালক-বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষারভার ন্যস্ত করেন। পরে রায়বাহাদুর যদুনাথের চেষ্টায় ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের সাহায্যে রায়বাহাদুর ও শ্রীনাথ বাবুর প্রদত্ত মূল্যবান জমির উপর বর্ত্তমান বালিকাবিদ্যালয়ের পাকা গৃহ নির্ম্মিত হয়; এবং স্থানীয় মহিলাদিগের ও ইউনিয়ন কমিটীর চেয়ারম্যানের সাহায্যে উক্ত জমিখণ্ডের উপর বর্ত্তমান পাঠশালার জন্য একখানি গৃহ ও নির্ম্মিত হয়। পণ্ডিত বসন্তকুমার দত্ত উক্ত পাঠশালার শিক্ষকের কার্য্য করিয়া আসিতেছেন। পণ্ডিত বরদাকান্ত দত্ত উক্ত বালিকাবিদ্যালয়ের শিক্ষার ভার গ্রহণ করিয়া বালিকাদিগকে শিক্ষা দিতেছেন।

পূর্ব্বে এই গ্রামে কোন দাতব্য চিকিৎসালয় ছিল না। সাধারণের পক্ষে ব্যাধি চিকিৎসা করা সুকঠিন ছিল। ১৯০৩ খৃঃ মহাপ্রাণ যদুনাথ এই দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করেন। এই দাতব্য চিকিৎসালয়ের উন্নতি সাধনোদ্দেশ্যে সদাশয় রায়বাহাদুর ও তদীয় ভ্রাতা শ্রীনাথবাবু বার্ষিক তিনশত টাকা আয়ের মাতামহ প্রাপ্ত সম্পত্তি দান করিয়া মাতামহের নামে উক্ত দাতব্য চিকিৎসালয় 'পীতাম্বর দাতব্য চিকিৎসালয়' নামে অভিহিত করেন। প্রথম পাঁচবৎসর ধরিয়া উক্ত চিকিৎসালয়ের সমস্ত ব্যয়ভার রায়বাহাদুর নিজেই বহন করেন। ক্রমে রোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় সদাশয় ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড ১৯০৮ খৃঃ হইতে সর্ব্বপ্রকার দায়িত্ব ভার গ্রহণ করিয়া পরিচালনা করিয়া আসিতেছেন।

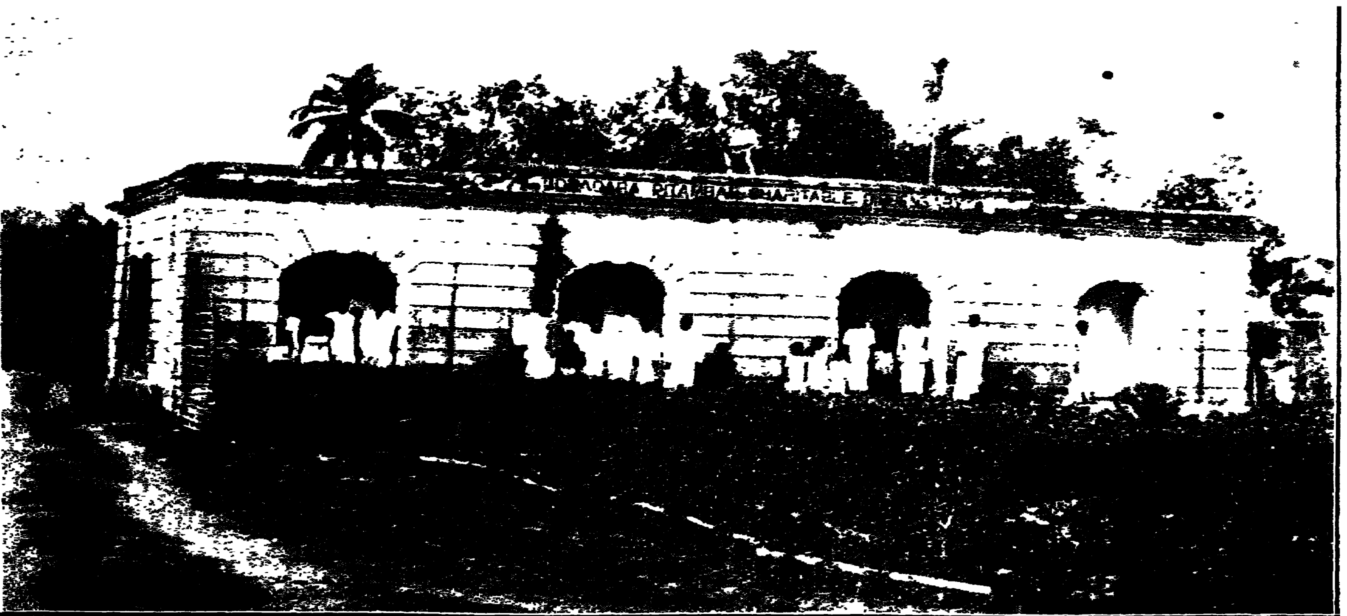
গত ৩ বৎসরের রোগীর সংখ্যা ন্যূন কল্পে—

১৩৩৪ সাল	New cases	৯৫৪৫	Old cases	৩০৪৯৪
১৩৩৫ "	"	৮৭৩৪	"	২৭৯০২
১৩৩৬ "	"	৮৫১১	"	২৬৭২৯

সাতক্ষিরা নিবাসী ডাক্তার শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এই দাতব্য চিকিৎসালয়ে ১৯০৩ খৃঃ হইতে ১৯১৯ খৃঃ পর্য্যন্ত সবএসিষ্ট্যাণ্ট সার্জ্জেনের কার্য্য করিয়াছেন। বর্ত্তমানে মল্লিকপুর নিবাসী ডাক্তার শ্রীযুক্ত অমূল্যচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় উক্ত চিকিৎসালয়ে চিকিৎসকের কর্য্য করিয়া আসিতেছেন। স্থানীয় কবিরাজ শ্রীযুক্ত কালিচরণ দত্ত অল্পকালের জন্য উক্ত চিকিৎসালয়ে কম্পাউণ্ডারের কার্য্য করেন। তৎপর হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত শ্রীযুক্ত কেদারনাথ দত্ত কম্পাউণ্ডারের কার্য্য করিয়া আসিতেছেন।

সাহিত্য সম্পদ।

লোহাগড়ার সাহিত্য সম্পদ আলোচনার পূর্ব্বে প্রকৃত সাহিত্য বিষয় যৎকিঞ্চিৎ বর্ণনা করা প্রয়োজন। "সুললিত সুব্যক্ত সুচারু রচনাই সাহিত্য। চিরন্তন হৃদয়ের রসে, শাশ্বত আনন্দ-বেদনায় ইহার প্রতিষ্ঠা। যে আত্মপ্রকাশের প্রয়োজনে মানুষের ভাষা স্ফূর্ত্ত হইয়াছে, সেই আত্মপ্রকাশের ব্যাকুলতাতেই সাহিত্যের সৃষ্টি। মানুষ আপনাকে ব্যক্ত করিতে চায়। হৃদয়ের এই আগ্রহেই আর্টের উৎপত্তি। আর্ট হইতেছে প্রকাশের সৌষ্ঠব, প্রকাশের সৌন্দর্য্য। যেখানে রচনা আর্টে পরিণত হইয়াছে—লেখা সেইখানেই সাহিত্য। সাহিত্যের সহিত হৃদয়ের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। মানসিক অনুভূতিই সাহিত্যের প্রাণ। কবির মনোভাব রচনার ভিতর দিয়া পাঠকের অনুভূতিকে উদ্বুদ্ধ করে। প্রকৃত সাহিত্য কবির মনোভাবে রূপান্বিত, রসে প্রতিষ্ঠিত। তাই কাব্য, নাটক, উপন্যাস প্রভৃতি হৃদয়-প্রধান রচনাই সম্পূর্ণভাবে সাহিত্য। সাহিত্যের দুইটী বড় বিভাগ আছে—রস-সাহিত্য ও জ্ঞান-সাহিত্য। হৃদয়প্রধান রচনা রস-সাহিত্যের এবং বিচার প্রধান রচনা জ্ঞান সাহিত্যের অন্তর্গত। গদ্য ও কাব্য দুইই রস-সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত। সাহিত্য যে উপকরণ লইয়াই রচিত হউক সাহিত্যের অন্তর্নিহিত বস্তু চিরকাল রস বলিয়াই পরিগণিত



লোহাগড়া পীতাম্বর দাতব্য চিকিৎসালয়।

(রায়বাহাদুর যদুনাথ প্রতিষ্ঠিত)

পৃঃ ২০৩

হইবে। রস হইতেছে মনের অনুভূতি বিশেষ। কবির মনোভাবই রসে পরিণত হয়। এই রসের আস্বাদ কবির রচনার ভিতর দিয়া পাঠকের হৃদয়ে সঞ্চারিত হইয়া আনন্দের সৃষ্টি করে। সাহিত্যের অন্তর্নিহিত বস্তু দেশ-কাল-জাতিকে অতিক্রম করিয়া অবস্থান করে। তাই কালিদাসকে আমরা ভালবাসি, হোমরকে ভক্তি করি, শেলীকে আত্মীয়জ্ঞান করি। তাই বিংশ শতাব্দীতেও বঙ্কিম সাহিত্য আদরের বস্তু।"

দর্শন-বিজ্ঞান প্রভৃতি বিচার প্রধান রচনা জ্ঞান সাহিত্যের অন্তর্গত ও অতি উচ্চস্তরের সাহিত্য সন্দেহ নাই। সাধারণতঃ ভাব, ভাষা ও শব্দমাধুর্য্য একত্রিত হইলে আমরা সাহিত্য বলিয়া থাকি। তৎসঙ্গে ছন্দের মিলন হইলে উহা আরও সুন্দর ও কমনীয় বলিয়া পরিগণিত হয়।

বঙ্গসাহিত্যে লোহাগড়ার দান।

স্বভাব কবি গোবিন্দচন্দ্র—প্রায় শতাধিক বর্ষ পূর্ব্বে লোহাগড়া গ্রামের ৺গোবিন্দচন্দ্র স্বর উপস্থিতমত সভায় বসিয়া যে সমস্ত কবিতা রচনা করিয়া স্বাভাবিক কবিত্বপ্রতিভার পরিচয় দিয়াছিলেন তাহাতে সে যুগে বহুলোকে তাঁহার গুণমুগ্ধ হইয়াছিলেন। পল্লীজীবন যাপন করিয়া উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত না হইয়া শুধু ঈশ্বর প্রদত্ত শক্তিবলে শক্তিমান্ হইয়া কবি গোবিন্দচন্দ্র যে সাহিত্যসেবার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন তাহা লোহাগড়ার গৌরব। লোহাগড়া গ্রামে এই প্রথম সাহিত্যসেবক জন্মগ্রহণ করিয়া জন্মভূমিকে চিরস্মরণীয় করিয়াছেন। আজও গ্রামের বালক-বালিকারা তাঁহার সরল মনোমুগ্ধকর কবিতা কণ্ঠস্থ করিয়া থাকে।

গোবিন্দচন্দ্রের কয়েকটী কবিতা নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

(১)

"স্বকর্ম্মে যা লেখা থাকে কে খণ্ডাইতে পারে

*　　*　　*　　*

শিবের বাহন বৃষ কৈলাসেতে বাস
তার অদৃষ্টে আহার নাই খায় বনের ঘাস
স্বয়ং ব্রহ্মা তিনি কত মিষ্টি সৃষ্টি করে
তার বাহন হংস ডুবে ঝিল খেয়ে মরে॥"

(২)

"হরির নামে ত'রবো বলে মনে ছিল আশা
ভেবে দেখি সে নামেতে অশেষ দুর্দ্দশা
বলি রাজা দান করেন তিনপদ ভূমি
ছল ক'রে হরি তারে দিলেন অধোগামী ॥"

(৩)

"লক্ষ্মীপাশা অতিথাসা মহামায়া স্থান
কুলীন সমাজ তথা অতি মান্যমান্
হেরিয়া মায়ের পদ মনে হ'ল সুখ
শ্রীচরণে রক্তজবা লাল টুকটুক্ ॥"

(৪)

"প্রেমকথা কহে কৃষ্ণ রাধিকার তরে
দুইজন ভাসিলেন আনন্দ সাগরে
হেনকালে কুটীলা আসি বলে আয়ানে
কুলটা হয়েছে বধূ দেখনা নয়নে
নন্দের বেটা বড় ঠেটা নিত্য আসে ঘরে
বধূর সঙ্গে রস রঙ্গে ননী চুরি করে
বাথানেতে থাক দাদা কিছু নাহি দেখ
কেশে ধ'রে আনে করে ঘরে বা'ন্ধে রাখ
ভগ্নীর বয়ান শুনিয়া আয়ান অগ্নি হেন জ্বলে
কুটীলাকে সঙ্গে লয়ে বিপিনেতে চলে
এদিকে আয়ান দেখে কাঁপিলেন কিশোরী
কর ত্রান রাখ প্রাণ ওহে বংশীধারী
শুনি বনমালী হইলেন কালীর বেশ
হাতের বাঁশী করে আনি আলুম্বিত কেশ
আয়ান শাক্ত কালীভক্ত কালীরূপ মন
দেখেন শ্রীমতী পূজে কালীরই চরণ
কুটীলাকে কটুভাষি আয়ান গৃহে যায়
কবিতা পয়ার ছন্দে স্বর গোবিন্দ কয় ॥"

হাস্যরসের কবিতা।

(১)

"সুধারাণীরে বিয়ে ক'রলো রামভদ্র মাঝি
বাঁশের আগায় ঝুনি জ্বলে ঐত বিয়ের বাজি
শঙ্খ বিনে রাঙ্গা সুতা বাদ্যি বিনে উলু
আঁধার ঘরে ক্ষীর ভোজন তেল দিল না কলু।"

(২)

"নিবারণ রায়ের শেষ বিয়ে আ'য়ে কর্ম্মভঙ্গ
হরচন্দ্র বিশ্বাসের পৌত্রের অন্নপ্রাসন তাতে নবঢঙ্গ
গান-বাজনা রং তামাসা চ'লবে সারা রাতি
ওগো বা'ছে বা'ছে কিনে নেও গোটাদুচ্চার বাতি।"

(৩)

"কাকের গলায় কণ্ঠমালা ব্যাঙে্ বাজায় বাঁশী
গ'বুরে পোকায় মান ধরেছে চ'ল্ল গয়া কাশী।"

(৪)

"হরির নামের সম্পর্ক নাই ফটিক-রাঙ্গা ধোপ
চাকরী নাই বাকরি নাই ধামাভরা গোফ্।"

(৫)

"মজুমদার বাড়ীর পূজার বড় ঘটা
বাড়ীর মধ্যে ব'লে এস সজমসল্লা বাটা।"

সাধক কেদারনাথঃ—

কেদারনাথ গ্রাম্যজীবন অতিবাহিত করিয়াও যেরূপ আধ্যাত্মিক কবিত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন তাহা বাস্তবিকই বিস্ময়প্রদ। তাঁহার কবিতাবলী যেরূপ আধ্যাত্মিকভাবে পরিপূর্ণ সেরূপ ভাবসৌন্দর্য্য ও শব্দমাধুর্য্যে মহিমান্বিত। উদাহরণ-স্বরূপ দু-একটী যাহা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি তাহাই নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

(১)

"শ্রী পতি রমণী ভবে করিয়াছি সার
কে শব মোহিনী বিনে কে আছে আমার।
দা সের দুর্গতি হের, ওগো বরাঙ্গনে,
র য়েছে পড়িয়া মন ভৃঙ্গ ও চরণে
না ঠেল চরণে মাত করি নিবেদন
থ রহরি ভয়েতে মা, কাঁপি অনুক্ষণ
রা খহ দাসেরে মাত নিরাশার ভয়ে
য ভুপতি-রমণিগো, নির্ব্বেদ ওপায়ে ॥"

(২)

"হে জননী কেশব * *
আবির্ভূতা হও মাত, দাসেরে কর
যেমতি রতনাকরে
কৃতার্থিলা কৃপালেশ বিতরণ ক'রে
হে চতুর্ব্বর্গ ফলপ্রসূতে।
বিতর করুণা সতি, তুমি মাত দয়াবতী
বরদা শোভনে শ্বেত-বাসিনি-বাসিনি !

(খ)

তোমার প্রসাদে বাগদেবী !
ভারত-নিবাসী কবিকুল-চূড়ামণি,
জড় ছিল, কালিদাস,
কৃতবিদ্য হ'ল শেষে হ'য়ে তব দাস,
শ্বেতভূজে, অজিত রমণি !
লভিল অমূল্য-ধন মানব মন-রঞ্জন
বিদ্যানিধি, তব পদ কোকনদ সেবি।

(গ)

বঙ্গবাসী যত কবিগণে
সদা ঐক্যতান্‌মনে পূজিছে তোমায় ;
দিয়ে কাব্য পুষ্পদাম
সফল করিছে অবিশ্রান্ত মনস্কাম,
বাগবাণী তব রাঙ্গা পায়।
তুমিও অভীষ্ট মত প্রদানিছ বরকত,
অতুল করুণা তব ওগো বরাঙ্গনে !

(ঘ)

যত ভূমণ্ডল বাসিগণ * *
* * ইংরাজ কিবা দিনেমার,
* * রুষ, প্রুষ, ওলন্দাজ,
* * জর্ম্মণ আর তুরকি সমাজ
* * সেবিতেছে চরণ তোমার
অবিরত মনোমত, বাসনা যাহার যত
পূরিছ, করিছ মাত, কৃপাবিলোকন।

(ঙ)

অধিক কি কব সরস্বতি !
আমেরিকা বাসী যত, আছিল বর্ব্বর
পূর্ব্বে তোমার প্রভাবে
অমর বাঞ্ছিত দিব্যজ্ঞান লভি এবে
ভুঞ্জিতেছে প্রসাদ তোমার।
তুমি মাত অবহেলে অসভ্যরে সুসভ্যিলে ;
ধন্য গো তোমার দয়া বানী দয়াবতী !

(চ)

মাত ! বিষ্ণুবক্ষো বিলাসিনী
তুমি বাগীশ্বরী, মোক্ষফল প্রদায়িকে !
প্রসীদ প্রসীদ, মাত,
সুখদে, জ্ঞানদে, বরদিয়ে অভিমত
পুর মম কামনা অম্বিকে !
শুনগো, দেবী অভয়া, দেহি মোরে
পদছায়া
গাইব নব সঙ্গীত মঙ্গল দায়িনী !!"

(৩)

"ও মন কেন কর ভুতের ভয়।
ভুতের ভিতর বাস ক'রে তোর গেলনা ভুতের ভয়॥
যার ভুতের সঙ্গে অবিরত ব্যবহার করিতে হয়।
সে ভুতে ডরে এত ওরে দেখে আমার হাসি পায়॥
কেহ কেহ কয়, মানুষ ম'লে ভুত হয়;
ভেবে দেখ ওরে ওমন কথা মিথ্যা নয়;
পঞ্চভুতে পঞ্চভুত তোর ওরে মিশায়ে যায়।
তোর আত্মা যে সে ভুতাতীত পরমাত্মায় হয় লয়॥
যত দেখ চরাচর, সব ভুতের অবতার;
ভুত বিনেরে এসংসারে কিছু নাহি আর;
পঞ্চতত্ত্ব খুজে দেখ ঘুচিবে তব বিস্ময়।
জানতে পাবে এজগতে সব ওরে ভুতময়॥
গ'ড়ল যেই কর্ম্মকার, এই ভুতের আকার;
সে বিনেত ভুতছাড়ারে কেহ নহে আর;
(তাই) পাগল বলে সে অভুতেরে ভাব ওরে সব সময়।
কেন ছায়াভুত কল্পনা ক'রে অন্তরেতে পাও ভয়॥"

(৪)

"এখন কেউ মোরে দেখেনা ভাল।
যাদের জন্য ভেবে ভেবে দেহ মম কালি হ'ল॥
আমি ক'রলেম আমার আমার, কেউত নহে আমার হ'ল
অসময় দেখিয়া মোরে সবাই ত্যজিয়া গেল॥
যবে অর্জ্জন করিবার, সাধ্য আছিল আমার;
তখন মোরে বাসত ভাল যত পরিবার;
এবে অসমর্থ দেখে মোরে তাদের ঘৃণা উপজিল।
আমার দুঃখে তাদের চোখের জল বিন্দু না পড়িল॥
ভুতের বেগার খেটে নিরন্তর;
জীর্ণ শীর্ণ হ'ল আমার সোনার কলেবর;

কিসের তরে কি করিলাম কিছু নাহি কাজে এল।
মিছে কাজে দিন ফুরাল সাধন ভজন নাহি হ'ল ॥
(তাই) ভেবে দেখি এখন, বিনে তুমি নিরঞ্জন ;
অসময়ে বন্ধু আর নহে কোনজন ;
ভ'জব ব'লে তোমার চরণ এ বড় আক্ষেপ রহিল।
শুধু বেগার্ খেটে এবার ও নাথ পাগল নিকেশ্ হ'ল ॥"

(৫)

"কেনরে মন-ভ্রমর ভ্রমণ কর নানা ফুলে।
মজ'ওরে মহানন্দে ব্রহ্মচরণ কমলে ॥
ব্রহ্মবিনে কে তারিবে তোরে ওরে অন্তকালে।
তাই এক মনে সযতনে পড়ে থাক তার পদতলে ॥
তুমি ভাবি দেখ মন সকলি অসার, ভবে শুধু সার তার চরণ ;
অসার ছেড়ে সারধনে ভাব ওরে সর্ব্বকালে।
পাগল বলে ও মন তাই ভুলনারে কোন কালে ॥"

গ্রামবাসী কেহ এই সমস্ত পুরাতন কবিতাবলী সংগ্রহ করিয়া পুস্তিকাকারে বাহির করিলে তাহা অবশ্যই সাহিত্য ভাণ্ডারে উপাদেয় বস্তু বলিয়া সঞ্চিৎ থাকিবে সন্দেহ নাই, পরন্তু ভাবপ্রবণ পাঠকের চিত্তবিনোদন করিবে।

বেদান্তবাচস্পতি যদুনাথ ঃ—

যদুনাথ বঙ্গসাহিত্যক্ষেত্রে একজন শক্তিশালী সাহিত্যিক। বেদ-বেদান্তাদি শাস্ত্রে সুপণ্ডিত। তাঁহার শাস্ত্রজ্ঞানের পরিচয় পাইয়া বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার পণ্ডিতমণ্ডলী তাহাকে 'বেদান্ত বাচস্পতি' উপাধিতে ভূষিত করেন। কাশী ভারতধর্ম্ম-মহামণ্ডল তাঁহাকে 'বিদ্যাবারিধি' উপাধি প্রদানে ধন্য করেন। কর্ম্মবীর যদুনাথের অসাধারণ চেষ্টায় যশোহরে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের নবম অধিবেশন সম্ভব হইয়াছিল। যদুনাথ বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের হাওড়া অধিবেশনে দর্শন-শাখাসভার সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করিয়া তাঁহার মূল্যবান অভিভাষণে যে গভীর পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়াছিলেন তাহা দর্শন-সাহিত্যের জ্ঞান-ভাণ্ডারে চিরদিন দীপ্যমান থাকিবে। বঙ্গভাষায় যদুনাথ দর্শন, ধর্ম্মতত্ত্ব, রাজনীতি, সমাজতত্ত্ব, স্বাস্থ্যতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ে বহু উৎকৃষ্ট গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। তাঁহার "আমিত্বের প্রসার"

"ব্রহ্মসূত্র" "পরিব্রাজক সূক্তমালা" "সাংখ্যকারিকা" "শাণ্ডিল্যসূত্র" "রণগাথা" প্রভৃতি গ্রন্থ তাঁহাকে সাহিত্যক্ষেত্রে উচ্চাসন প্রদান করিয়াছে। ইংরেজী ভাষায়ও যদুনাথ বহু সুচিন্তিত সারসন্দর্ভময় গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। তাঁহার কীর্ত্তিপতাকা "হিন্দুপত্রিকা" সমাজের আদরের বস্তু ছিল। লাহোর ট্রিবিউন পত্রিকার ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সদস্য, বঙ্গসাহিত্যের একনিষ্ঠ সেবক, যশোহরের কর্ম্মবীর, বেদান্তবাচস্পতি রায় যদুনাথ মজুমদার বাহাদুর সি, আই, ই; এম, এ; বি, এল; এড্ভোকেট্, বিদ্যাবারিধি রচিত নিম্নলিখিত গ্রন্থাবলী বঙ্গসাহিত্যাকাশে তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিবে।

(১) আমিত্বের প্রসার ১ম খণ্ড, (২) আমিত্বের প্রসার ২য় খণ্ড, (৩) ব্রহ্মসূত্র ১ম খণ্ড (দ্বিতীয় সংস্করণ), (৪) ঋগ্বেদ ভাষ্যোপোদঘাত প্রকরণম্ (৫) সাংখ্যকারিকা, (৬) পরিব্রাজক-সূক্তমালা, (৭) গীতাসপ্তক (৮) পল্লীস্বাস্থ্য (৯) গীতাত্রয়, (১০) উপবাস, (১১) গীতাপঞ্চক, (১২) বৈদিক শ্রীকৃষ্ণ (গোপালতাপনী), (১৩) হিন্দুসমাজের সমস্যা, (১৪) রণগাথা (War song), (১৫) নমঃশূদ্রাচারচন্দ্রিকা, (১৬) Appeal to young Hindu gentlemen of Bengal (against anarchy), (১৭) Hinduism and Buddhism, (১৮) Essays and Addresses, (১৯) Religion of Love (শাণ্ডিল্যসূত্র), (২০) Expansion of self, (২১) How to live in God।

প্রবীণ দার্শনিক মহেন্দ্রনাথ ঃ—

মহেন্দ্রনাথ সাহিত্যক্ষেত্রে একজন উজ্জ্বলতম রত্ন। বেদান্তাদি শাস্ত্রে সুপণ্ডিত। তাঁহার সুচিন্তিত গভীর গবেষণাপূর্ণ দার্শনিক প্রবন্ধে মুগ্ধ হইয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে দর্শনশাস্ত্রে সর্ব্বোচ্চ উপাধি 'ডাক্তার' আখ্যায় ভূষিত করেন। মহেন্দ্রনাথ পাশ্চাত্য দর্শনশাস্ত্রে সুপণ্ডিত বলিয়া লণ্ডনের বিশেষজ্ঞ পত্রিকা সমূহ ('Asiatica of London' June, July 1929, Churches times of London 27th. Sep. 1929) তৎপ্রকাশিত পুস্তকাবলী সম্বন্ধে যে সকল অনুকূল সমালোচনা, স্তুতিবাদ ও ওজস্বিনী ভাষায় উচ্চ প্রশংসাবাদ করিয়াছেন তাহাতে মহেন্দ্রনাথ দর্শনগগনে উজ্জ্বল নক্ষত্ররূপে চিরকাল বিরাজ করিবেন। মহেন্দ্রনাথের রচিত গ্রন্থ গুলি System of vedantic thought and culture, Comparative studies

in vedantism, Mysticism in Bhagabat Gita, দার্শনিক সাহিত্য ভাণ্ডারে সুদীর্ঘকালের জন্য অমূল্য সম্পদরূপে থাকিবে। ১৯৩০ খৃঃ আগামী ডিসেম্বর মাসে ঢাকা নগরীতে All India philosophical congressএর সভাপতি পদ অলঙ্কৃত করিয়া তাঁহার জ্ঞানগর্ভ অভিভাষণে যে শাস্ত্রজ্ঞান, যে যুক্তি তর্কের অসাধারণ বিন্যাস শক্তি প্রদর্শন করিবেন, তাহা তাঁহার নেতৃত্বের পদোচিত গাম্ভীর্য্য ও পাণ্ডিত্য রক্ষার সহায়ক হইবে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

ভাবুক প্রবর কুমার বিক্রম ঃ—

কুমার বিক্রম প্রণীত "চিন্তা নির্ঝরিণী" বাঙ্গলা সাহিত্যে এক অমূল্য সম্পদ। যেমন ভাবে ভরা তেমনই শব্দমাধুর্য্যে পরিপূর্ণ। তাঁহার রচিত সরলগ্রন্থ "প্রবন্ধমালা" বালকগণের বড়ই প্রিয়। এই সুলেখকের সুচিন্তিত ভাবপরিপূর্ণ 'চিন্তা ধারা' 'ফটিকজল' 'শ্মশান' 'দ্বীপ-বালিকা' 'অশ্রু' 'জীবন-ঊষা' 'বউ কথা কও' 'পুষ্পোদ্যান' 'স্নেহ' 'শ্মশানে শান্তি' 'নীরবতা' 'বিভূতি দর্শন' 'পোতত্যক্ত' 'চোখ্ গেল' 'মানবজীবন' 'সময়' 'অধ্যয়ন' 'চিত্রশালা' 'বীর-পরাজয়' 'অশ্রু ও সঙ্গীত' 'অতৃপ্ত সংসার' 'আত্মোৎসর্গ' 'সঙ্গীত' 'বীর-চিন্তা' 'জীবনাহুতি' 'বসন্তে পিক' "চিন্তা-নির্ঝরিণী" রূপে প্রকাশিত হইয়া সুধীর ভাব-বিহ্বল সাহিত্য সুধাপায়ীকে মুগ্ধ করিয়াছে সন্দেহ নাই। আমরা নিম্নে এই লেখকের 'শ্মশান' 'বসন্তে পিক' ও 'বউ কথা কও' হইতে কয়েকটী প্যারা উদ্ধৃত করিলাম।

"শ্মশান! কি বিভীষিকাময় নাম! স্মরণ মাত্র সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠে! হৃদয়ের নিভৃত কন্দর দুর্ দুর্ করে। শ্মশানে কি ভয়াবহ দৃশ্য! কোন স্থানে অর্দ্ধদগ্ধ মানব-মূর্ত্তি, কোন স্থানে নির্মস্তক নরকঙ্কাল শ্মশানভূমির শত শত কণ্ঠহার স্বরূপ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত। শ্মশান! তোমার প্রীতিদানার্থে শিবাগণ মানবের সেই চরম লীলাক্ষেত্রে মহোল্লাসে রত! তোমার বিভীষিকাময় স্থান আরও বিভীষিকাময় করিবার নিমিত্ত শকুনী গৃধিনীগণ সতত নৃত্য-গীতে নিরত। নবনীত দেহধারী ক্ষুদ্র শিশু হইতে সেই লোলচর্ম্ম জীর্ণশীর্ণ কঙ্কালসার শত বৎসরের বৃদ্ধ পর্য্যন্ত তোমার সনাতন অতিথিশালার অতিথি! জানিনা, তোমার এই ভাবময় মহানাম শ্রবণে ও স্মরণে মানবের মনে কেন এরূপ ভাবের সঞ্চার হয়; জানি না, কেন তুমি মানবের এত ভীতিপ্রদ, অনাদৃত এবং ঘৃণিত। শ্মশান! তোমার

ঐ চিতা ভস্মময় দেহ একবার মানসপটে উদিত কর; একবার তোমার ঐ মনোমোহন মূর্ত্তি হৃদয় শ্মশানে জাগরিত কর; একবার সংসার সম্মোহরূপ কুটীর ছিদ্রপথে তোমার রূপচ্ছটার বিকাশ কর!"

"স্বপ্নময় জগতে সেই মধুর স্বপ্ন ফুরাইল। মুদিত চক্ষু উন্মীলিত হইল। বৈরাগ্যময় জীবনের সেই পুরাতন বৈরাগ্যকলঙ্ক হৃদয়চক্র হইতে ধৌত হয় নাই। বন-বংশী পক্ষীকুলের মধুর কূজন-নিস্বনে, নির্ঝরিণীর স্নিগ্ধ বায়ু হিল্লোলে, তরু-লতা-ফল-ফুলের মধুর নিকুঞ্জে মধুকরের করুণ গুন্ গুন্ গুন্ তন্ত্রী-বাদনে নি সর্গসুন্দরী অন্ধ বৈরাগ্যময়ী। কুহু কুহু কুহু! ঐ আবার কুহু কুহু কুহু! নিসর্গবালার বৈরাগ্যকুঞ্জ ঝঙ্কারিত; সেই কুহুধ্বনি গাছের ডালে ডালে—বনের পাতায় পাতায় স্নিগ্ধ আকাশের স্নিগ্ধ শূন্যতলে উত্থিত হইল। * * * * * * ঐ আবার লতা-পাদপ, পুষ্প-তৃণ, বন-উপবন, গিরি-কন্দর, শৈল-প্রস্রবন, অনন্ত অম্বর, প্রতিধ্বনিত করিয়া নিসর্গদেবীর অমলকুঞ্জ ঝঙ্কারিত করতঃ, অলিবীণাশোভিতা পাপীয়াসখী বসন্তরাণীর সেই তারার পঞ্চমগ্রামমিশ্রিত পাপিয়ারবধ্বনিত ঐ সেই সঙ্গীত অশ্রুসংমিশ্র বসন্তসংবাদ—

কুহু কুহু কুহু—আবার কুহু কুহু কুহু! উদারার সেই পঞ্চম তান—
কুহু কুহু কুহু!"

"নীল নীরদমালা ভেদ করিয়া গগনের অনন্ত বায়ুসাগরে সন্তরণ করিতে করিতে সুস্বর বনবিহঙ্গম মুক্ত প্রাণে অনন্ত ভাবমাখা "বউ কথা কও" "বউ কথা কও" ধ্বনি করিতে করিতে নয়নপথ বহির্ভূত হইল। নির্ম্মল সন্ধ্যা-সমীরণ মৃদু মৃদু প্রবাহিত হইয়া মধ্যাহ্ন—মার্ত্তণ্ডদগ্ধ মানবপ্রাণ শীতল করিতেছে। নীরব প্রকৃতির বৃক্ষশ্রেণী নীরবে দণ্ডায়মান হইয়া নীরবতার অসীম সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিতেছে। কি এক শান্তির অমল প্রস্রবণ পাপময় পৃথিবীকে প্লাবিত করিয়াছে! এই মধুর প্রকৃতি মধুরতর সঙ্গীত-সমাবেশে মধুরতম হইতেছে! বিহঙ্গ-সঙ্গীত স্তরে স্তরে ক্রমোচ্চ পাদপশ্রেণী অতিক্রমপূর্ব্বক অস্তমিতপ্রায় সবিতৃকিরণজালে পরিব্যাপ্ত স্বর্ণময় দেবভূমিতে উত্থিত হইল। * * * * * * ঐ দেখ, গগনকোলে তোমাদের প্রিয়সখা বনবিহঙ্গম ভাবুক-হৃদয়তোষিণী ভাষায় বিমানপথ প্রতিধ্বনিত করিয়া, সংসার-দাবদগ্ধ প্রাণ শীতল করিয়া গাহিতেছে—"বউ কথা কও"; তোমরা কি উহার হৃদয় বেদনা দূর করিবে না? ঐ যে, নীল-লাল-হরিৎ নভঃ!—ঐ যে

বহু চিত্রে চিত্রিত বিস্তৃত পট, উহাতে দৃষ্টিপাত কর, দেখিবে বায়ু-তরঙ্গায়িত অম্বর সাগরে ধূসরাম্বর পক্ষী কর্ণকুহরে "বউ কথা কও" পীযূষকণা সিঞ্চন করিতেছে; একবার গগনবিহারী ঐ সরল পক্ষীর সরল সঙ্গীতে তোমাদের অসরল হৃদয়ের অন্তস্তলে সরলতার সরল প্রস্রবণ প্রবাহিত কর।"

নবীন নাট্যকার ধীরেন্দ্রনাথ ঃ—

ধীরেন্দ্রনাথের সাহিত্যানুরাগ সত্যই প্রশংসনীয়। তিনি "বিজয়া" "পতিঘাতিনী সতী" "প্রমীলা" "কৃষ্ণপাণ্ডব" প্রভৃতি নাটক রচনা করিয়া নাট্যসাহিত্যে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার "পারিজাত" উপন্যাস হইতে আমরা তাঁহার লেখনী শক্তির পরিচয় পাই। তাঁহার কবিতাবলী সন্নিবিষ্ট "খেয়াল" উপহার প্রদানের উপযুক্ত। ধীরেন্দ্রনাথের কবিত্ব শক্তি ও কম প্রশংসনীয় নহে। এই লেখকের লেখনী নিঃসৃত "দেশের বাণী" হইতে তাহার স্বদেশ প্রেমের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার কবিতাবলীর কয়েকটী নির্ব্বাচিত অংশ পাঠক পাঠিকার অবগতির জন্য নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

"আবেগভরে প্রাণ খুলে দাঁড়িয়ে কেন উপেক্ষিতা
তোমায় আমি চিনি ওগো তুমি যে আমার পরিচিতা,
সান্ধ্য দীপের আলোকিত তুলসীবনের অঙ্গনা
ভক্তিভরে দিচ্ছ সেথায় নীরব ভাষার বন্দনা,
পবিত্রতার মূর্ত্তি সে যে মানস মনের কল্পনা
কোন সুরেতে পূজি তোমা হৃদয় বনের চন্দনা,
আবেগভরে অমনি ক'রে আর থেকোনা উপেক্ষিতা
প্রাণ হতে প্রিয় তুমি (ওগো) তুমি যে আমার পরিচিত।"
(পরিচিতা)

"এতদিনে ঘুমিয়েছিলেম অন্ধ কুয়াশায়
কে আমাকে জাগাল এসে হাত বুলিয়ে গায়,
তর তরে এই ঢেউয়ের মাঝে
মনটী আমার সদাই রাজে,
ফুর ফুরে এই দখিন বায় উঠল উথলায়
ফাগুন ঋতু উঠল হেসে রূপের মোহনায়।" (জাগরন)

"যে দেশে নারী ধরিত কৃপাণ শত্রু রক্ত করিতে পান
আজ গো তাদের কি দুর্গতি হিন্দু গর্ব্ব হয়েছে ম্লান,
যে দেশের নারী এলায়ে বেণী অশ্বপৃষ্ঠে সাজিত বেশ
ধরিয়ে ধনু রোপিত জ্যা, ছিঁড়িয়ে তাদের মাথার কেশ,
দেশের জন্য দিয়েছে প্রাণ রাখিতে তারা দেশের মান
আপন হাতে সাজিয়ে চিতা, স্বামীর সঙ্গে নিজের প্রাণ।"

(হিন্দু)

"বিশ্ব জননীর স্নিগ্ধ আগারে
আমরা ত কেহ নয়,
দুঃখীর মত চিরদুঃখী মোরা
তোমারে করি যে ভয়।
শ্মশানের শব অথবা মৃত
পিঞ্জরে নাহিত প্রাণ,
আর্ত্তের নাদ উঠিছে নিনাদি
তোমারে করিতে দান।
দুঃখের পশরা মস্তকে রাখি
ছুটেছি তোমার পানে,
প্রলয়ের ঢেউ নাচিছে তা থৈ
আসিছে ঝঞ্ঝার সনে।
তাণ্ডব নৃত্যে করিছে খেলা
মহাকাল মহারোষে,
ডমরু বাজায়ে তালে তালে ধায়
বিনাশ করিতে শেষে।
তোমারি চক্রে শুধু কোলাহল
শান্তির নাহিক লেশ,
মরীচিকা ভ্রমে ছুটেছে মানব
তা'দেখে হাসিছ বেশ।
চকিত নয়নে বিজলী বার্ত্তা
গুরু গুরু দেয়া ডাকে,
হাসিটি তোমার উঠিছে ফুটি
বিদ্রূপ হানিছ কাকে?
বজ্র নিনাদে উঠিলে গর্জ্জি
কড় কড় শব্দে গড়া,
প্রলয় ঝঞ্ঝা নাচিল সঙ্গে
চমকে উঠিল ধরা।

কে তুমি সংসার! দুঃখের আগার
প্রলয়ের বধ্য ভূমি,
তুমি সে ঝঞ্ঝা ভাগ্য নিয়ন্তা
জীবের মৃত্যুকামী।
কাঙ্গালের ছেলে আমরা কাঙ্গাল
তোমারে করি যে ভয়,
বিশ্ব জননীর স্নিগ্ধ আগারে
আমরা ত কেহ নয়।"

(সংসার)

"দেশ-প্রীতি জাগিয়ে দিয়ে
ভারতবাসীর চিত্ত পটে
উড়ল যে দিন জাতির নিশান
রেবা নদীর পুণ্য তটে;
প্রীতির পূত অর্ঘ্য নিয়ে
গৌরবের সেই মূর্ত্তি মহান

ভবের ভাবুক গাইল সেদিন
নূতন সুরের একটী গান ;
দূরে ফেলে দেও দুঃখ শোক
ভারত স্বাধীন আকাঙ্ক্ষাতে
আত্ম বলিদান দেশের কাজে
হও আগুয়ান ঐ পথেতে ;
স্মৃতির ডোরে বেধে রেখো ভাই
অহিংসা মোদের মূলমন্ত্র
উচ্চ কণ্ঠে ধ্বনিয়া উঠুক
আজ হতে ভারত-স্বাতন্ত্র্য ;
আশীষ বাণী পেয়েছি মাতার
মৃত্যুরে মোরা করি না ভয়
লুপ্ত গৌরব জাগিয়ে তোল
ভাগ্য পটে মোদের জয় ;
ভেঙ্গে ফেলে দেও অলস স্বপন
ছিড়ে ফেল ভাই সীমার তার
সুপ্ত জাতির বক্ষ মাঝে
কেটে গেছে সেই অন্ধকার ;
যৌবনের ঢেউ নাচিয়ে উঠুক
জীবন নদীর খরস্রোতে
শোণিত ধারা উষ্ণ হউক
শিরায় শিরায় এই ভারতে ;
ধ্বনিয়া উঠুক কণ্ঠে মোদের
সুদিনের এই শুভক্ষণে
স্বাধীন ভারত আমরা স্বাধীন
দাগটি রেখে জাতির মনে ;
করে ধরি ঐ বিজয় নিশান
বিজয় তিলক ললাটে পরি—
বক্ষে নিয়ে অসীম সাহস
(এস সবে) কর্ম্ম আহবে ঝাপিয়ে পড়ি।"

(দেশের বাণী)

কবি বিভূতিভূষণ—বিভূতিভূষণের কবিত্ব শক্তি সত্যই প্রশংসনীয়। নিম্নলিখিত কবিতায় এই কবির স্বদেশপ্রীতি প্রকাশ পাইয়াছে। জন্মভূমির প্রতি টান প্রকৃতিগত। তাই এই নবীন কবি মাতৃভূমিকে উদ্দেশ্য করিয়া লিখিয়াছেন :—

"কাহার কানন এমন ধারা ফল-ফুলে ভরা,
কোথায় এমন স্নিগ্ধ ছায়া কায়া-শীতল-করা,
কোথায় এমন শ্যামল দৃশ্য হৃদয়-ক্লান্তি-হরা,
শ্যামল দেশটী আমার সে যে গো পাখীর গানে ভরা।
আমার মধুর স্বদেশ সে যে গো 'সকল দেশের সেরা'
স্বদেশ আমার স্বদেশ আমার নামটী "লোহাগড়া" ॥
"আবার গাছের ছায়ায় বসে ওগো কত ঘুঘু পাখী
করুণস্বরে হৃদয়ভরে ঘু-ঘু ঘু-ঘু ডাকি।

লোহাগড়া কাহিনী

বৈরাগ্যেরই ভাব কত জাগায় প্রাণের মাঝে
হৃদয় মাঝে কত ওগো পবিত্র গান বাজে।
আমার মধুর......................."লোহাগড়া"

কবি মাত্রেই তার কবিত্ব শক্তির দ্বারা সর্ব্বত্র দেশভক্তি ছড়াইয়া থাকেন। বাস্তবিক কবিতার সাহায্যে জাতীয়ভাব কিরূপে প্রকাশ করা যায় তাহা পাঠক পাঠিকা এই কবির "জাগৃহি" কবিতাতে প্রমাণ পাইবেন। স্বাধীনতার সুখ ও পরাধীনতার দুঃখ এই কবিতায় পরিস্ফুট হইয়াছে।

(১)

"জাগৃহি, জাগৃহি, জাতির প্রতীক—শিরায় শোণিমা উঠুক নাচি';
ধ্বক্-ধ্বক্-ধ্বক্, নেত্র-তারকা—উঠুক জ্বলিয়া বহ্নির রাশি।
লক্-লক্-লক্, লেলিহান্ জিভ্—অট্ট—অট্টহাস উঠুক্ ধ্বনি'।
আকাশে বাতাসে, জীবনের গীতি—ভৈরব-সুরে উঠুক রণি'।
সুপ্ত জাতির বক্ষের 'পর,—রক্ষা-চণ্ডী উঠুক নাচি'
তাথৈ-তাথৈ-থিয়া-থৈ-থৈ,—হুঙ্কার দিয়ে উঠুক্ বাজি'।
মরণ-জাতির শবের শ্মশানে,—চেতায়ে দিয়ে জীবন-খেলা,
নটরাজ শিব ডমরু বাজায়ে,—তাণ্ডব নাচে বসাক্ মেলা—
ওরে ওরে ওরে, ওরে ও ভীরু,—কাপুরুষ-জাতির কলঙ্ক-ভার,
কতকাল তুই, মরণ-শয়নে—সুপ্ত রহিবি এমনি আর।
কতকাল আর পিছনে তাকাবি,—মেষের মত, ভীরুর বেশে,
দুর্ব্বলের মত হা-হুতাশ ফেলে,—কাঁদিয়া অশ্রু ফেলিবি শেষে।

*　　*　　*　　*

কতকাল র'বি কারাগার মাঝে,—বদ্ধ খাঁচার অন্ধকার!
কতকাল র'বি পশুর মত—পিঁজরায় বাঁধা জীবন-ভার!

ভেঙ্গে ফেল্ তোর পিঁজরার শিক্, ছিড়ে ফেল্ তোর পায়ের
অনন্ত শকতি রুদ্র-নৃত্যে,—নাচাক্ তোর চরণ ঘেরি'।
আগুন জ্বলুক তীব্র তেজে,— ছুটুক্ শোণিত শিরায় শিরায়;
জীবন জাগুক্ যৌবন হোয়ে,—প্রতি অঙ্গের কাণায় কাণায়

*　　*　　*

লোহাগড়া কাহিনী

ওরে ছিড়ে ফেল্ তোর পায়ের বেড়ী,—দূরে ফেলে দেরে চোখের ঠুলি ;
কোথা কারাগার-সীমার বাঁধন,—চা' দেখিরে তোর নয়ন খুলি'।

*　　　　*　　　　*　　　　*

আগেতে, পিছেতে, উপরে নীচেতে,—চৌদিকে তাকা মেলিয়া চোক্ ;
দেখ্, দেখ্, দেখ্—বেশ করে দেখ,—দূরে ফেলে দিয়ে দুঃখ-শোক্।
কি দেখিস জাতি ভাল ক'রে দেখ—কোথা গেল তোর অন্ধকার ?
কোথা গেল তোর দুর্ব্বলতা ?—দুর্ব্বহ কি তোর জীবন—ভার ?
দাঁড়া, দাঁড়া, তুই—সোজা হ'য়ে দাঁড়া,—পায়ের পেশী শক্ত করে ;
দাঁড়া, দাঁড়া, তুই নির্ভরে দাঁড়া,—আঁকড়ি' অনন্ত জীবন ধরে।
চল, চল, জাতি,—অগ্রসর হ'—শোণিতের টীকা ললাটে পরি'
করে ধরি' তোর বিজয়-নিশান,—দীক্ষা-মন্ত্র হৃদয়ে স্মরি',
কর্ম্ম-আহবে, পড়্রে ঝাঁপায়ে,—"জয়-জয়-জয়"—ধ্বনিয়া ভাষা,
যুদ্ধ—যুদ্ধ—যুদ্ধই ওরে,—জাতির জীবনে জাগুক্ আশা।

*　　　　*　　　　*　　　　*

বক্ষ বিদারি' তপ্ত শোণিত—জীবন যজ্ঞে দাও বলি ;
মাংস ছিড়িয়া, দাও আহুতি,—পুরিয়া তব অঞ্জলী।
অনলে দহিয়া, খাঁটি সোণা হও,—জাগুক জীবন গৌরবে ;
ধূপের মত জ্বলিয়া জ্বলিয়া,—মাতাও বিশ্ব সৌরভে।
আত্ম-দানের কীর্ত্তি-কাহিনী,—ধ্বনিয়া উঠুক্ আজ আকাশ ;
ত্যাগের শিখাটী উজ্জ্বল হ'য়ে,—বিশ্বমাঝে হ'ক প্রকাশ।

*　　　　*　　　　*　　　　*

ওরে, ভায়ে, ভায়ে, ভায়ে, দ্বেষ-হিংসা, অপরাধ জাতি ভুলিয়া যা' ;
স্নেহালিঙ্গনে, মর্ম্মের মাঝে, মিলন বাঁশরী, আজ বাজা।
ওরে কিসের দুঃখ, কিসের সরম, কিসের শঙ্কা যাক্ দূরে !
শুন জাতি ওই ভগবান্ জাগে, জীবনের প্রতি সুরে সুরে।

*　　　　*　　　　*　　　　*

আনন্দ আজি, অযুত পরাণে, ফুটায়ে তুলুক পরম কান্তি ;
মিলিত কণ্ঠে ধ্বনিয়া উঠুক্ "জয় জয় ওম্ স্বস্তি ! শান্তি !!"

"জাগৃহি"

আমরা এই কবির 'শিব-তাণ্ডব' হইতে ২।১টী ছত্র উদ্ধৃত করিলাম—

"ধূর্জ্জটীর আজ দুর্জ্জয় রূপ—
তীব্র-বহ্নি ভরা,
অতীব রুদ্র করা,
ভেদ বন্ধন ছিন্ন করিয়া সর্ব্ব জগতময়,—
ওরে, মরণে মথিয়া হয়েছে যে ভোলা
শিব-মৃত্যুঞ্জয়।

বিশ্বের চরাচরে ;—
থাকি' থাকি' থাকি'—
হুঙ্কার ভরা ওঙ্কার ওঠে
শঙ্কর-অধরে।
ওই, পুঞ্জে পুঞ্জে,—
শূন্যে শূন্যে—
ঝঞ্ঝা রুষিয়া
প্রলয়ে ভরিয়া,
গর্জ্জি' গর্জ্জি' ওঠে,—
গ্রহগুলি সব ছোটে,—
কক্ষচ্যুত হয়ে,—
অনুপরমাণু বয়ে,—
তীব্র-গতিতে ছোটে ;—
ওরে, নিদ্রালস-মগ্ন-বিশ্ব চেতনা লভিয়া ওঠে।
মহাকাল ওই নাচে,—
মুখে, -গাল বাদ্য বাজে,—
"হিয়া—হৈ-হৈ-হৈ—
থিয়া—থৈ-থৈ-থৈ"—
প্রেত-পিশাচের সনে,
আত্ম-বিহ্বলা মনে,
উর্দ্ধে-সূর্য্য-চন্দ্র-সোম্,—
কাঁপে নিম্নে পৃথ্বী—ব্যোম ;—" "শিব-তাণ্ডব"

হাস্য রসিক পণ্ডিত জগদ্বন্ধু ঃ—

জগদ্বন্ধু স্কুলপাঠ্য বাঙ্গলা ব্যাকরণ, শণির পাঁচালী, ফলাহার তত্ত্ব প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ফলাহার তত্ত্ব প্রণয়ণে বিদ্যাবিনোদ মহাশয় রসসাহিত্যে প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন। আমরা নিম্নে উক্ত গ্রন্থের দুই-এক-ছত্র উদ্ধৃত করিলাম।

ফলাহারের পূর্ব্বে সংযম।

"ফলাহার-পূর্ব্বদিনে শুন দ্বিজগণ,
একাহারী থাকিবেক, হয়ে হৃষ্ট মন।
জোলাপ লইয়া অগ্রে করি বিরেচন ;
লবণ আদ্রক পরে করিবে ভক্ষণ।"

ফলাহারেরর গমন-বিধি।

"বালক, বালিকা, ঘটী লইয়া সহিত,
নিমন্ত্রয়িতার-গৃহে হবে উপনীত।"

উপবেশন-প্রণালী।

"নিশ্ছিদ্র কদলীপত্র লবে ফলাহারে।
ছিদ্র হলে দুইখানি রাখি পরে পরে ;—
অন্য দুইখানি পত্র করিয়া গ্রহণ ;—
সুখে তাহে করিবেক সমুপবেশন।
নিরাসনে ফলাহার করে যেই জন ;
মহাপাপে সেই জন হয় নিগমন।"

ফলাহারের প্রারম্ভ।

"প্রথমতঃ পত্রোপরি পড়িবে যখন
ফলাহার-উপযোগী দ্রব্য অগণন ;—
অনাচমনীয় কিছু উঠায়ে তখন ;
শিশুর অঞ্চলে দিবে করিয়া বন্ধন ;—
অনন্তর আরম্ভ করিবে ফলাহার,
শাস্ত্রের নির্দ্দেশ আছে এমত প্রকার।
রিক্ত-হস্তে বাটী গেলে প্রেয়সী আসিয়া
উপহাস করিবেক হাসিয়া হাসিয়া ;—
"একা একা খেয়ে এলে মণ্ডা-মতিচুর ;
বোঝা গেছে ভালবাসা আছে যতদূর।"
তখন ভোজনে তুমি দিবে শত ধিক্ ;
সেই উপহাস হবে মরণ অধিক।
অতএব প্রেয়সীর ব্যবস্থা করিয়া ;
ফলাহারে ব্রতী হবে নয়ন মুদিয়া।
তাবৎ খাইবে, মূর্চ্ছা যাবৎ না হয় ;
মূর্চ্ছায় (ও) খাইবে ত্যজি দেহের মায়ায়
আকণ্ঠ ভোজন বিপ্র করিবে নিশ্চয় ;
না হয় বমন শেষে করিলেও হয়।
ফলাহার-কালে যদি জিহ্বা-জড়তায়
উপাদেয় ভক্ষ্যচয় নাহি খাওয়া যায় ;
কিঞ্চিৎ অম্বল খেলে জড়তা সারিবে,
পুনশ্চ ভোজন-শক্তি দ্বিগুণ বাড়িবে।

কালোন্মাত্ত চন্দ্রকান্ত ঃ—

চন্দ্রকান্ত বাদ্ধটী গান রচনা করিয়া সুপরিচিত হইয়াছেন। তাঁহার রচিত গান এতদ্দেশে সংকীর্ত্তনে গীত হইয়া থাকে। উক্ত গানের দুই একটী নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

।

তাল গড় খেমটা

"ভবে আসা যাওয়া সার—
যত ধনকড়ি, করিছ দেরী, পড়ে রবে সব তোমার।
তুমি যারে আপন ভাব, সেত ভাবে পর,
তার ছলনায় ভুলনা মন, বলছি বারে বার।
ও মন হরির চরণ শরণ বিনে, সংসারে নাই সার, (১)
তুমি বাহু তুলে হরিবল, হতে পারবে ভবপার।
ভবনদীর তুফান ভারি, নাইকো পারাপার,
যদি পারে যাবার আশা থাকে ডাক কর্ণধার।
তাই বলি ও অবোধ মন, ঐ নাম কর সার,
দ্বিজচন্দ্র বলে, হরি বলে পাগল হও এবার।"

প্রভাতী।

(রাগিণী ভাইরো)

"পোহাল যামিনী, উদয় দিনমনি, উঠ হে সকলে এই বেলা
দেখ আঁখি মেলি, এই ঊষাকালে, জগৎপতির কি খেলা
মৃদুল হিল্লোলে, মলয়ানিলে, বহে ধরাতল করিয়া শীতল
কাননে কুসুম কলিকা ফুটিল, নলিনী সলিলে করে খেলা। (২)
শান্তিময়ী ঊষা প্রকৃতির কোলে, বসিয়া করে খেলা
হের কুতূহলে, পখীগণ সব, করি নানা রব, নাশিছে মনেরই জ্বালা
ভ্রমর ভ্রমরী মিলিয়া সবে, ডাকিছে তাহারা, গুণগুণ রবে
দ্বিজচন্দ্র বলে, দেখ হে সকলে, জগৎপতির এই খেলা।"

রাগিণী তাল খেমটা।

"ভজ রাধে গোবিন্দ, রাধে গোবিন্দ, রাধে গোবিন্দ হরি।
জয় ভবতারণ, জয় জনার্দ্দন, জয় জয় গোপীমনোহারি॥
জয় মধুসূদন, জয় নারায়ণ, জয় জয় রাস-বিহারী।
জয় রাধাবল্লভ গোপীপ্রাণ বল্লভ "দ্বিজ"চন্দ্র হৃদ-বিহারী॥
জয় নারায়ণ ভূতভাবন, বামন রূপ-ধারী।
জয় কংস-নিসূদন, হে ভবতারণ, নৃসিংহরূপধারী॥"

নব্য কবিদার মধুসূদন—মধুসূদন (কাড়ার) কবিগান রচনা করিয়া সাহিত্য সেবার পরিচয় দিতেছেন। ইনি আমাদের সুপরিচিত কবিরসরাজ ৺তারকচন্দ্র কাড়ারের ছাত্র ও পরমাত্মীয়। আমরা "সেকাল-একাল" মধ্যে বারোয়ারী পূজা উপলক্ষে তাঁহার রচিত কবিগান সন্নিবিষ্ট করিয়াছি। শুধু পাঠক-পাঠিকার চিত্ত-বিনোদনের জন্য নিম্নে একটী ছত্র উদ্ধৃত হইল।

"ভবে সকল আশা অর্থের উপর অর্থ কি হয় সুখের আকর
অর্থ বলং ভারি
অর্থে করে ঘর দরজা অর্থে জমিদারী—"

অবশেষে যাঁহারা আমাদের পল্লীমাতার সাহিত্যসম্পদ বৃদ্ধি করিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে শ্রীযুক্ত অবিনাশ চন্দ্র সরকার বি, এল, ও শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রগোপাল সরকার বি, এল, মহাশয়দ্বয়ের নাম উল্লেখ-যোগ্য। লোহাগড়া রায়-সরকার বংশের ইতিবৃত্ত লিখিয়া অবিনাশচন্দ্র পল্লী ইতিহাসের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করাইয়াছেন। ইহার পূর্ব্বে ব্রজেন্দ্রগোপাল স্কুলপাঠ্য 'রাজভাষা' পুস্তক প্রণয়ণ করিয়া দেশের ছাত্রমণ্ডলীর হিতসাধন করিয়াছেন।

কলাবিদ্যা।

আনন্দই জীবের লক্ষ্য, সাধনা ও কাম্য। এই বিশ্বময় আনন্দধারা কত অগণিত অনন্তকাল হইতে অনন্তধারা নিয়ে অনন্তের দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে কেবল দ্রষ্টাই তাহা লক্ষ্য করিতে পারে। স্রষ্টার এই বিরাট বিশ্বের নিয়ন্ত্রিত পর্য্যালোচনার মধ্যে যে কত আনন্দ উৎস প্রবাহিত হইয়া জীবের মনঃপ্রাণ আকর্ষণ করিতেছে, তাহা এই ভ্রান্ত মোহোন্মাদ জীব কখনই অনুভব করিতে পারে না, তাই প্রকৃত আনন্দের আস্বাদনে বিমুখ হইয়া ক্ষণিক ভোগ তৃষ্ণার মমতায় নিজের ঐশ্বর্য্যের অহঙ্কারে মানব বিশ্বস্রষ্টার নিয়ন্ত্রিত নিয়মপালনে পরাঙ্মুখ হইয়া অপ্রাকৃতিক আনন্দে ক্ষণিক আত্মহারা হয়। কিন্তু ঘাতপ্রতিঘাতে ঐশ্বর্য্যের অট্টালিকা চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গর্ব্বোন্নত মস্তক স্রষ্টার চরণতলে অবনত হইবার জন্য সদাই যত্নবান। এই বিশ্ব রঙ্গমঞ্চে অহরহ এইরূপ অভিনব পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইতেছে। এই বিরাট বিশ্বই স্রষ্টার নাট্যশালা—সৃষ্টজীব তাঁর ক্রীড়াপুত্তলিকা।

হাসি অশ্রুর অপূর্ব্ব সংমিশ্রন এই রঙ্গমঞ্চের দৈনিন্দিন অভিনয়ে পরিলক্ষিত হইতেছে। ঈপ্সিত আনন্দের আস্বাদন লাভের জন্যই ভ্রান্ত জীব কল্পিত আনন্দে বিভোর হইয়া এই বিরাট রঙ্গমঞ্চে কত অভিনব অভিনয় করিতেছে। স্রষ্টার নিয়ন্ত্রিত সৃষ্টির নিয়মে নিত্য নূতন নূতন পরিবর্ত্তন হইয়া আসিতেছে, কেবলমাত্র এক আনন্দধারা অনাদি অনন্তকাল হইতে এই বিরাট বিশ্বের বুকের উপর দিয়া ঢেউ খেলিয়া চলিতেছে; তাই এই আনন্দ আস্বাদনের জন্যই সৃষ্ট-জীবের বিশ্ব রঙ্গমঞ্চে এই বিরাট অভিনয়। আজ বিশ্ব রঙ্গমঞ্চের অভিনয় দেখিবার দৃষ্টিশক্তি আমাদের নাই, তাই মানব সমাজে আনন্দোৎসবে নূতন নূতন কল্পিত অভিনয়ের সৃষ্টি হইয়াছে। স্রষ্টার গুণকীর্ত্তনই সঙ্গীত—সেই সঙ্গীতের ভিতর দিয়াই অভিনয় প্রস্ফুটিত। সঙ্গীতে সুমধুর স্বর সংযোজিত করিয়া তান ও লয় সমন্বিত হয় বলিয়াই সঙ্গীত এত মধুর ও প্রাণস্পর্শী। শিক্ষিত সমাজ মাত্রই অভিনয় উৎসবে যোগদান পূর্ব্বক আনন্দ উপভোগ করেন।

লোহাগড়া গ্রামে পূজা-পার্ব্বন—গান-বাজনা—আমোদ-প্রমোদের মধ্যে নাটকাভিনয় বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য। নানারূপ সদনুষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গে 'থিয়েটার' বহুদিন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহারও বহুপূর্ব্বে মজুমদার বংশোদ্ভব স্বর্গীয় তারাপ্রসন্ন মজুমদারের যত্ন ও উদ্যোগে স্বগ্রামবাসী ৺রামচন্দ্র স্বর একটি সখের যাত্রার দল সংগঠন করিয়া প্রতিবৎসর ৺শারদীয়া পূজায় ৺তারাপ্রসন্নের বাটীতে যাত্রাগান করিতেন। এই যাত্রাদলের পোষাকাদি সমস্ত ব্যয়ভার তারাপ্রসন্নই বহন করিতেন। বহুকাল এই দল যাত্রাভিনয় করিয়া দেশের ভিতর সুযশ অর্জ্জন করেন। লোহাগড়া নিবাসী রাধানাথ চক্রবর্ত্তী নামক জনৈক ব্রাহ্মণ এই দলে একজন অভিনেতা ছিলেন। কোন নাটকে ভিস্তিদারের ভূমিকায় তিনি একদা গাহিয়াছিলেন "আমি ব্রাহ্মণ কুমার—

হ'লাম ভিস্তিদার

এমন পোড়া বাতিক কার"।

তৎপর কামঠানা নিবাসী ৺গৌরচন্দ্র প্রামাণিক ৺রামচন্দ্র স্বরের যাত্রার দল ভাঙ্গিয়া নূতন করিয়া গড়িয়া উহাকে গৌর প্রামাণিকের যাত্রার দল নামে অভিহিত করেন। গৌর দেশ বিদেশে গান করিয়া

বিশেষ খ্যাতিলাভ করেন। ইহার কিছুকাল পরে অর্থাৎ পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে লোহাগড়ায় সর্ব্বপ্রথম নাটকাভিনয় (থিয়েটার) আরম্ভ হয়। বর্ত্তমান সময়ের মত সাজ-পোষাক, দৃশ্য-পট না থাকিলেও অভিনয় ব্যাপারে গ্রামবাসী অনেকেই বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন। তখন এই নাট্যসমিতি "দক্ষযজ্ঞ" "রামাবনবাস" প্রভৃতি নাটকগুলি অভিনয় করেন। "দক্ষযজ্ঞ" অভিনয়ে যাহারা অভিনেতা ছিলেন তন্মধ্যে সতীর ভূমিকায় ৺প্রসন্নগোপাল রায় বি, এল, শান্তিরামের ভূমিকায় শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র দত্ত, দক্ষের ভূমিকায় ৺মথুরানাথ সরকার ও মহাদেবের ভূমিকায় শ্রীযুক্ত মতিলাল দত্ত প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইহা ব্যতীত নগরপালের ভূমিকায় ৺লালমোহন দাস (সর্ব্বপ্রথম হাস্যরসিক), সভাপাল ৺শশীভূষণ মজুমদার, অশ্লেষা শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র দত্ত, মঘা ৺তারিণীচরণ মজুমদার, চাষা ৺শ্রীনাথ চক্রবর্ত্তী, অশ্বিনী শ্রীযুক্ত প্রহ্লাদচন্দ্র দত্ত ও নন্দী ৺মাণিকলাল চক্রবর্ত্তী। "রামবনবাস" অভিনয়ে রামের ভূমিকায় শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ ভৌমিক উকিল, সীতার ভূমিকায় ৺প্রসন্নগোপাল রায় বি, এল, ও কৈকেয়ীর ভূমিকায় শ্রীযুক্ত প্রহ্লাদচন্দ্র দত্ত অভিনয় করিয়া প্রশংসাভাজন হন। ৺অম্বিকাচরণ সরকার, ৺কেদারনাথ রায়, ৺যোগেন্দ্রগোপাল রায় এল, এম, এস, ৺নিবারণচন্দ্র সমাদ্দার প্রভৃতিও এই নাটকাভিনয় ব্যাপারে যোগদান করিয়াছিলেন, কিন্তু কে কোন ভূমিকায় অবতীর্ণ হন তাহা জানা যায় নাই। এই নাট্যসমিতি বহুদিন স্থায়ী হয়। ক্রমান্বয়ে ৺মহেন্দ্রনাথ মজুমদারের অধিনায়কত্বেও লোহাগড়ায় নাটকাভিনয় বিশেষ প্রশংসার সহিত সম্পাদিত হয়। এই সময় নাটকাভিনয়ে গ্রামবাসীর নিরুৎসাহ অবলোকন করিয়া ৺নিবারণচন্দ্র রায় গ্রামবাসী লইয়া যাত্রাভিনয়ের আয়োজন করিয়া পুনরায় একটি যাত্রার দল গঠন করেন। নিবারণই এই দলের পৃষ্ঠপোষক ও অধিকারী ছিলেন। তিনি বহুদিন এই যাত্রার দল লইয়া দেশ বিদেশে গান করিয়া একেবারে সর্ব্বস্বান্ত হন। তৎপর ৺নিবারণচন্দ্র সমাদ্দার মহাশয়ের অধিনায়কত্বে তৎকালের যুবকগণের ঐকান্তিক চেষ্টায় অল্পদিনের জন্য নাটকাভিনয়ের আয়োজন হয়। "অভিমন্যু" ও "জয়দ্রথ বধ" নাটকদ্বয় ইহাদের অভিনীত নাটক মধ্যে প্রধান বলিয়া পরিচিত। দুর্য্যোধনের

ভূমিকায়—রাজেন্দ্রনাথ কুণ্ড ; সুভদ্রার ভূমিকায়—মহেন্দ্রনাথ ভৌমিক ; ভীমের ভূমিকায়—কালিচরণ দত্ত ; অভিমন্যুর ভূমিকায়—প্রমোদাভূষণ ভট্টাচার্য্য ; ধৃতরাষ্ট্রের ভূমিকায় জটাধর মজুমদার প্রভৃতির অভিনয় সত্য সত্যই প্রশংসনীয় হইয়াছিল। পরে বাবু জানকীনাথ সরকার, বাবু কাশীনাথ সরকার ও বাবু মহেন্দ্রনাথ ভৌমিকের উদ্যোগ ও চেষ্টায় লোহাগড়া গ্রামে থিয়েটারের পুনরুদ্ধার হয়। ইঁহারা বহু অর্থ ব্যয় করিয়া দৃশ্য-পট, সাজ-সরঞ্জাম ক্রয় করিয়া প্রতিবৎসর নাটকাভিনয় করেন। প্রমোদাভূষণ ভট্টাচার্য্য, কালিচরণ দত্ত, হৃদয়নাথ সমাদ্দার, তারাপদ চক্রবর্ত্তী ও পুলিনবিহারী সরকার প্রভৃতি অভিনয় ব্যাপারে যোগদান করেন। এই সময় হইতে দৃশ্য-পট ও সাজ-সজ্জার ক্রমোন্নতি হইতে আরম্ভ করে। ইহারা লোহাগড়া নাট্যসমিতিকে—"বীণাপাণি থিয়েটার" নামে অভিহিত করেন। এই সময়ের অভিনীত নাটক প্রহসনের মধ্যে "হরিশ্চন্দ্র" "বিল্বমঙ্গল" "নরমেধ যজ্ঞ" "রাতকাণা" প্রভৃতি প্রধান। এই দল কিছুকাল স্থায়ী হইয়া অবশেষে সিন্ পোষাক নষ্ট হওয়ায় অভিনয় ব্যাপার মন্থর গতিতে চলিতে থাকে।

তখন এই লুপ্ত ষ্টেজের শেষাবস্থায় লেফটেন্যান্ট্ কুমার অধিক্রম মজুমদার বি, এল, মহাশয়ের অধিনায়কত্বে "পরপারে" নাটক সুন্দরভাবে অভিনীত হয়। মহিমের ভূমিকায়—কুমার অধিক্রম, সরযূর ভূমিকায়—সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এ, এস, আই (পাগল), পার্ব্বতীচরণের ভূমিকায়—প্রফুল্লকুমার রায় বি, এল, কালিচরণের ভূমিকায়—ভোলানাথ মজুমদার, শাস্তার ভূমিকায়—চিন্তাহরণ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি অভিনয় কৌশলে প্রকৃত কৃতিত্বের পরিচয় দেন। তৎপর "সতীলক্ষ্মী" নাটকে সতীলক্ষ্মীর ভূমিকায় —সতীশ চক্রবর্ত্তী (পাগল), বিনোদলালের ভূমিকায়—নগেন্দ্রকুমার দত্ত এম, এ ; বি, এল, নরেনের ভূমিকায়—তারাপদ চক্রবর্ত্তী, মানদার ভূমিকায়—৺সূর্য্যকান্ত মৌলিক (পচা) রাজকিশোরের ভূমিকায়—ভোলানাথ মজুমদার, বাঙ্গা ভৃত্যের ভূমিকায়—ডাঃ দীনবন্ধু মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি কলা কৌশল প্রদর্শন করেন। এই যুগে দীনবন্ধু মুখোপাধ্যায় হাস্যরসিক অভিনয়ে প্রধান বলিয়া পরিচিত। এই সময় ষ্টেজের সিন্ একেবারে নষ্ট হইয়া যাওয়ায় থিয়েটার প্রায় চার-পাঁচ বৎসরের জন্য বন্ধ থাকে। তখন মনোরঞ্জন গাঙ্গুলীর ঐকান্তিক চেষ্টায় স্কুলের বালকগণ কর্ত্তৃক "বিল্বমঙ্গল"

নাটক অভিনীত হয়। বিল্বমঙ্গলের ভূমিকায়—মনোরঞ্জন অভিনয় করিয়া দর্শকমণ্ডলীকে মুগ্ধ করত বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেন। ইহার পরও নাটকাভিনয় কিছুদিনের জন্য বন্ধ থাকে। পরে ১৩২৯ সালে ধীরেন্দ্রনাথ মজুমদারের ঐকান্তিক চেষ্টা ও যত্নে এবং অনাদিনাথ দত্ত বি, এ, ও হৃদয়নাথ সমাদ্দারের সহানুভূতিতে "জয়দেব" নাটক অভিনীত হয়। জয়দেবের ভূমিকায়—ভোলানাথ মজুমদারের মুখে কৃষ্ণনাম, শুনিতে শুনিতে শ্রোতা ও শ্রোত্রীগণ দরবিগলিত ধারায় প্রেমাশ্রু সংবরণ করিতে পারেন নাই। অদ্যাবধি লোকে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর অভিনয়ের কথা স্মরণ করিয়া পরম আনন্দ উপভোগ করেন। পরাশরের ভূমিকায়— অমূল্যভূষণ মৌলিক এস, আই, ও হরিগুণগান করিয়া সকলকে পরিতৃপ্ত করেন। আজও লোকে তাঁহার সঙ্গীতের ঝঙ্কার বিস্মৃত হয় নাই। শ্রীকৃষ্ণের ভূমিকায় শ্রীমান তারাপদ মুখোপাধ্যায় (তারা) সুমধুর স্বরে জয়দেবের সেই সুললিত প্রেমরসপূর্ণ সঙ্গীত

(স্থল কমল গঞ্জনং
মম শিরসি মণ্ডণং
দেহি পদপল্লব মুদারম)

শ্রবণ করাইয়া শ্রোতাগণকে আনন্দধারায় বিগলিত করিয়াছিলেন। তৎসঙ্গে প্রসিদ্ধ (clarionet) বংশীবাদক কুমার অধিক্রমের সুমধুর স্বর সংযোজনায় সঙ্গীতের ঝঙ্কার, শ্রোতা ও শ্রোত্রীগণের হৃদয়, প্রেম-মন্দাকিনীর বিগলিত ধারায় প্লাবিত করিয়া নাট্যগৃহে এক অভিনব মাধুরী লীলা সৃষ্টি করিয়া তুলিল, যাহা গ্রামবাসীর হৃদয় নিভৃতে চিরদিন ভক্তকবি জয়দেবের প্রেমামৃত বর্ষণ করিবে। বিমলার ভূমিকায় শশীভূষণ মৌলিকও বিশেষ দক্ষতার পরিচয় প্রদর্শন করেন। এই জয়দেব নাটকই লোহাগড়ায় অভিনয় ব্যাপারে যুগান্তর আনয়ন করে ও সঙ্গে সঙ্গে উৎকর্ষ পরিলক্ষিত হয়। এই সময়ের অভিনীত নাটক মধ্যে "দেবলাদেবী" "বলিদান" "বঙ্গেবর্গী" প্রভৃতি নাটকগুলি প্রধান। দেবলাদেবীতে খিজির খাঁর ভূমিকায়—মনোরঞ্জন গাঙ্গুলী, মতিয়ার ভূমিকায়—মাখন মৌলিক বি, এ, প্রভৃতির অভিনয় প্রশংসনীয়। বঙ্গেবর্গীতে ভাস্করের ভূমিকায়—মনোরঞ্জন, ছিদেম চক্রবর্ত্তীর ভূমিকায়—কিরণচন্দ্র বিশ্বাস এ, এস, আই (কেনা), তানোজীর ভূমিকায়—অমূল্যভূষণ মৌলিক এস, আই, আলিবর্দ্দীর ভূমিকায়—ভোলানাথ মজুমদার প্রভৃতির অভিনয় সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর

হয়। বলিদানে করুণাময়ের ভূমিকায়—ভোলানাথ মজুমদার, কালিঘটকের ভূমিকায়—হৃদয়নাথ সমাদ্দার, দুলালচাঁদের ভূমিকায় (কেনা) কিরণচন্দ্র বিশ্বাস প্রভৃতি কলাকৌশল প্রদর্শন পূর্ব্বক দর্শক মণ্ডলীকে চমৎকৃত করেন। •১৩৩০ সালে এই লুপ্ত ষ্টেজ গ্রামবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ১৩৩১ সালে হরেন্দ্রনাথ মজুমদার বি, এ, মহাশয়ের ঐকান্তিক চেষ্টা ও যত্নে রায় বাহাদুর যদুনাথের সহানুভূতিতে নূতন রঙ্গমঞ্চের দৃশ্যপট, সাজ-সরঞ্জাম প্রস্তুত হয়। তখন হইতে অদ্যাবধি গ্রামের শিক্ষিত যুবকবৃন্দ পূর্ণোদ্যমে অভিনয় করিয়া আসিতেছেন। ১৩৩১ সালে হরেনবাবুর অধিনায়কত্বে, ধীরেন্দ্রনাথ মজুমদারের ঐকান্তিক চেষ্টা ও যত্নে, অনাদিনাথ দত্ত বি, এ, ও হৃদয়নাথ সমাদ্দারের সাহায্যে "কর্ণার্জ্জুন" নাটক অভিনীত হয়। কর্ণার্জ্জুন নাটকে যাঁহারা অভিনেতা ছিলেন তন্মধ্যে কর্ণের ভূমিকায়—মনোরঞ্জন গাঙ্গুলী, অর্জ্জুনের ভূমিকায়—কুমার গুরুক্রম মজুমদার বি, এল, শ্রীকৃষ্ণের ভূমিকায়—বিনয়ভূষণ গাঙ্গুলী, শকুনির ভূমিকায়—ধীরেন্দ্রনাথ মজুমদার, দুর্য্যোধনের ভূমিকায়—অমূল্যভূষণ মৌলিক এস, আই, বিকর্ণের ভূমিকায়—হীরেন্দ্রনাথ মজুমদার বি, এল, ভীমের ভূমিকায়—সুরেন্দ্রকুমার সরকার বি, এ, নিয়তির ভূমিকায়—মাখনলাল মৌলিক বি, এ, ভীষ্মের ভূমিকায়—ভোলানাথ মজুমদার ও দ্রোণাচার্য্যের ভূমিকায় অনাদিনাথ দত্ত বি, এ, প্রভৃতির অভিনয় কৌশল দেখিয়া দর্শকমণ্ডলী মুগ্ধ হইয়াছিলেন। ইহা ব্যতীত যুধিষ্ঠিরের ভূমিকায়—বীরেন্দ্রনাথ সরকার, বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের ভূমিকায়—হৃদয়নাথ সমাদ্দার, ধৃতরাষ্ট্রের ভূমিকায়—প্রমথনাথ সরকার, দুঃশাসনের ভূমিকায়—কিরণচন্দ্র বিশ্বাস (কেনা), ধৃষ্টদ্যুম্নের ভূমিকায়—প্রদ্যোৎকুমার সরকার বি, এ, ও সহদেবের ভূমিকায় শচীন্দ্রকুমার দত্ত বি, এ, প্রভৃতির অভিনয়ে সকলেই তৃপ্তিলাভ করিয়াছিলেন। এই যুগে 'কেনা' সর্ব্বপ্রধান হাস্যরসিক বলিয়া পরিচিত।

কর্ণার্জ্জুন নাটকাভিনয়ই লোহাগড়া 'বীণাপাণি থিয়েটার পার্টির' সর্ব্বোৎকৃষ্ট অভিনয়। জয়পুর, লক্ষ্মীপাশা, কুন্দশী, মল্লিকপুর ও কাশীপুর প্রভৃতি গ্রাম সমূহের ভদ্রমণ্ডলী এই 'কর্ণার্জ্জুন' নাটকাভিনয় দেখিয়া লোহাগড়া বীণাপাণি থিয়েটার পার্টির বিশেষ প্রশংসা করেন। গ্রামের উচ্চশিক্ষিত যুবকগণের ঐকান্তিক চেষ্টা, যত্ন ও পরিশ্রমে লোহাগড়ার অর্দ্ধশতাব্দীর নাট্যসমিতি পুনর্জ্জীবিত হইয়া আজও অতীত গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিতে সক্ষম হইয়াছে।

'কর্ণার্জ্জুন' নাটকাভিনয়ের পরও এই গ্রামে "বাঙ্গালী" "প্রফুল্ল" "রঘুবীর" প্রভৃতি নাটকগুলি অভিনীত হইয়াছে।

গ্রামবাসী কেহ কেহ হয়ত মনে করিয়া থাকেন বা তাহাদের এইরূপ ধারণা আছে যে প্রতি বৎসর এই নাটকাভিনয় ব্যাপারে গ্রামের যুবকদের নৈতিক অধঃপতন হইতেছে কিন্তু সে ধারণা তাঁহাদের ভ্রান্তিমূলক। এই অভিনয়ের মধ্য দিয়া দেখিতে গেলে আমরা অতি সহজেই বুঝিতে পারি যে ইহার ভিতর অনেক দেখিবার ও শিখিবার বিষয় আছে।

সমাজ শিক্ষার জন্যই এই অভিনয়, কল্পিত ঘটনাকে বাস্তবতায় পূর্ণ করিয়া সমাজ সমক্ষে প্রতীয়মান করাই চরম লক্ষ্য ও দর্শকগণের হৃদয়ের প্রবল প্রবৃত্তিগুলিকে সূক্ষ্মদৃষ্টির মধ্য দিয়া প্রকৃতপথে ধাবিত করাই অভিনয়ের কলা-কৌশল। গ্রামের শিক্ষিত যুবক-সম্প্রদায় প্রতিবৎসর ৺শারদীয়া পূজার সময় অভিনয় ব্যাপারে লিপ্ত থাকিয়া পরম আনন্দ উপভোগ করেন ও সকলের মধ্যে ঐক্য ও ভ্রাতৃভাব পরিলক্ষিত হয়। এই অভিনয় ব্যাপারে লিপ্ত থাকিয়া বাবু ধীরেন্দ্রনাথ মজুমদার বর্ত্তমানে একজন নবীন নাট্যকার হইয়া উঠিয়াছেন। তিনি চার পাঁচখানা নাটক প্রণয়ন করিয়াছেন তন্মধ্যে "প্রমীলা" ও "বিজয়া" নাটক দুখানি সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর। বোধহয় এই অভিনয় ব্যাপারে লিপ্ত না হইলে ধীরেনবাবুর কখনও এই স্পৃহা জন্মিত না। আমরা আশা করি পাবলিক ষ্টেজে এই নবীন লেখকের কোন কোন বই শীঘ্রই অভিনীত হইবে। তিনি নিজেও একজন উপযুক্ত অভিনেতা ; পূর্ব্বে তাঁহার অভিনয় কৌশল দেখিবার সুযোগ ঘটে নাই কিন্তু 'কর্ণার্জ্জুন' নাটকে "শকুনির" ভূমিকায় ধীরেনবাবুর বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। স্থানীয় ও পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম সমূহের ভদ্রমণ্ডলী যাঁহারা 'কর্ণার্জ্জুন' নাটকাভিনয় দেখিতে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা রঙ্গমঞ্চে 'শকুনির' ভূমিকায় ধীরেন্দ্রনাথের প্রথম প্রবেশ দেখিয়াই বিস্ময়ান্বিত হইয়াছিলেন কিন্তু অভিনয় কৌশল দেখিয়া দর্শকমণ্ডলী সকলেই তাঁহার প্রশংসা করিয়াছিলেন। ধীরেনবাবুর ঐকান্তিক চেষ্টা ও যত্নে এই গ্রাম্য নাট্যসমিতির উৎকর্ষ সাধন হইয়াছে এবং অনাদিবাবু ও হৃদয়বাবুর সহানুভূতিতে তিনি ১৩২৯ সালে লোহাগড়া বীণাপাণি রঙ্গমঞ্চের লুপ্ত গৌরবকে জাগরিত করিয়া দৃঢ়তর ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। বর্ত্তমান সময়ও শিক্ষিত যুবক সম্প্রদায় এই রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করিয়া গ্রামবাসীর আনন্দ বর্দ্ধন করিয়া থাকেন।

দুর্গোৎসব।

ভাঙ্গা গড়া জগতের নিয়ম—এই নিয়ম সকলেরই মানিতে হইবে। পরিবর্ত্তনশীল জগতে প্রতিদিনই কত নিত্য নূতন পরিবর্ত্তন অহরহ হইয়া আসিতেছে কে তাহার লক্ষ্য রাখে! সত্য সত্যই যদি প্রতি মানব এই বিশ্ব মানব সমাজের প্রকৃততত্ব পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করিত তবে এই ধরায় নিত্য নূতন পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে সময়োচিত সর্ব্বপ্রকার পরিবর্ত্তনের দ্বারা নিজের সর্ব্বোন্নতির পথ কণ্টকশূন্য, সহজ ও সরল করিয়া দিয়া যশোমণ্ডিত প্রতিভার উজ্জ্বল দীপ্তি-পতাকা হস্তে সর্ব্বসমক্ষে দণ্ডায়মান হইয়া দেশের ও জাতির মহাকল্যাণ অনুষ্ঠান করিতে পারিত ও অশেষবিধ পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়াও নিজের সত্বাকে উপলব্ধি করিবার প্রয়াস পাইত; কিন্তু সেই চিরন্তন প্রাকৃতিক নিয়মের মূলতত্ব অবগত না থাকায় এই বিরাট বিশ্বের পরিবর্ত্তন অসম্ভব জ্ঞানে অহঙ্কারোন্মাদ মানব যখন নিজের প্রতিষ্ঠা স্থাপন করিতে অগ্রসর হইয়া জগতের ভাঙ্গা গড়া নিয়মের মহা সন্ধিক্ষণে আসিয়া উপস্থিত হইল তখন এই মহা আবর্ত্তনের ঘোর ঝঞ্ঝাকে অতিক্রম করিতে না পারিয়া হতাশ ও নৈরাশ্যের ঘোর অন্ধকারে নিমজ্জিত হইয়া কেবল মহা আর্ত্তনাদ—তখন এই মানব দুঃখের অবসানের জন্যই আত্মজ্ঞানী মহাপুরুষের মহাসাধনায় বিরাট বিশ্বের চিন্ময়ী মহাশক্তিই মানস-কল্পনা-সম্ভূত চিরপ্রিয় মনোরম দেবীমূর্ত্তি বাঙ্গলার প্রতিগৃহের জয়শ্রী।

রোগশোক অনশনে প্রপীড়িত বাঙ্গালীর মহাদুঃখের পরিত্রাণের জন্যই প্রতি গৃহের প্রতি আঙ্গিনায় মাতার এই আবির্ভাব, তাই এই সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা বাঙ্গলা মায়ের প্রাঙ্গনে এই—শক্তিপূজা—দুর্গোৎসব। বৈদেশিক শক্তির প্রবল শোষণে দেশ যখন অন্তঃসার শূন্য হইয়া রোগ শোক ও দারিদ্র্যের কঙ্কাল মূর্ত্তি ধারণ করিল তখনই দেশের দুঃখ বিদূরিত করিবার জন্য জাতীয় জীবন গঠনোদ্দেশ্যে মহাশক্তির আরাধনা আরম্ভ হয়। কিন্তু আজ দেশের এমনই দুরবস্থা যে জাতীয় জীবন গঠন করাত দূরের কথা, বাঁধা ধরা আচার বিচারের দ্বারা সেই মহা উদ্দেশ্য লুপ্ত, জাতীয় জীবন খণ্ড খণ্ড ভাবে বিভক্ত, কেবল অসারতা জাতির সর্ব্বাঙ্গে।

বাঙ্গলাদেশে এই মহাযজ্ঞের প্রতিষ্ঠাতা মহারাজ কংসনারায়ণ বাদশাহ

আকবরের সমসাময়িক। দিল্লীর সম্রাট সাজাহানের শেষ রাজত্বকালে বাঙ্গলার নবাব কাশীমখাঁর সময়ে ধর্ম্মপ্রাণ কৃষ্ণচন্দ্র ও তদীয় ভ্রাতা চন্দ্রশেখর মজুমদারের দ্বারা এই লোহাগড়া গ্রামে প্রথম শক্তিপূজা প্রচারিত হয়। উভয় ভ্রাতাই নবাব সরকারে চাকুরী করিয়া নবাব প্রদত্ত খেতাব 'মজুমদার' উপাধি প্রাপ্ত হন। অদ্যাবধি কৃষ্ণচন্দ্রের বংশধরগণ তদ প্রচারিত শক্তিপূজা মহাসমারোহে সুসম্পন্ন করিয়া আসিতেছেন। কৃষ্ণচন্দ্রের পরবর্ত্তী সময়ে ক্রমে ক্রমে এই লোহাগড়া গ্রামে চৌদ্দখানি পূজা প্রচারিত হয়। কিন্তু কালপ্রবাহের ঘুর্ণীয়মান চক্রের নিষ্পেষণে চিরকাল কিছুই স্থায়ী হয় না, পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী। এই পরিবর্ত্তনের মহাপ্রলয়ের মধ্য দিয়া যাঁহারা নিজের অস্তিত্বকে অটুট রাখিয়াছেন তাঁহারাই পূর্ব্বপুরুষ প্রচারিত এই মহাযজ্ঞ দুর্গোৎসব বর্ত্তমানেও সম্পাদন করিয়া আসিতেছেন। রায়, সরকার ও মজুমদার বাড়ীতেই প্রতিবৎসর এই দেবীপূজা হইয়া আসিতেছে। অবশিষ্ট সমস্তই ভাঙ্গাগড়া নিয়মের মহাসন্ধিক্ষণে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বৈদেশিক শক্তির প্রভাবে পাশ্চাত্যভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া দেশ কেবল বিলাসের দাস হইয়া পড়িয়াছে। ধর্ম্ম ও নিষ্ঠা, সত্য ও সংযম যেন মস্তিষ্কের ধূমায়িত কল্পনা বলিয়া মনে হয়। ভোগতৃষ্ণার প্রবল আকাঙ্ক্ষাই বর্ত্তমান মানব সমাজের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে। পুরাকালে প্রতিমানবই ধর্ম্মকে মহাসম্পদ জ্ঞান করিয়া তৎপ্রদর্শিত রীতি-নীতির অনুসরণ করিত ও অতি সাধারণ সহজ ও সরল জীবন যাপন করিয়া নৈমিত্তিক পূজা উপাসনা—আরাধনা ও আধ্যাত্মিক ক্রিয়া-কর্ম্মাদির অনুষ্ঠান করিত। অতি সাধারণ গৃহী হইয়াও ধর্ম্মকর্ম্মে নিজেকে নিযুক্ত করিয়া অত্যন্ত তৃপ্তি লাভ করিত। নিঃস্ব দরিদ্রের পক্ষে বৃহৎ অনুষ্ঠান দুঃসাধ্য হইলেও তাহাদের উৎসাহ ও সহানুভূতির কোমল স্পর্শ অন্যান্য ধনাঢ্য বা মধ্যবিত্ত ব্যক্তিগণের হৃদয়ে কি এক অপূর্ব্ব উদ্দীপনার সৃষ্টি করিয়া দিত যদ্দারা ক্ষুদ্র হইতে বৃহৎ বা বৃহত্তর অনুষ্ঠান পর্য্যন্ত অতি সহজে-ও সুসম্পন্ন হইত। তৎকালে ধর্ম্মই ছিল সাধারণের একমাত্র মহাসম্পদ। সামান্য তৃণাচ্ছাদিত গৃহে বাস করিয়াও পূজা অর্চ্চনার জন্য পৃথকভাবে পাকা গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া পরিতৃপ্ত হইত



রায়বাহাদুর যদুনাথের ঊর্দ্ধতন ৭ম পুরুষ
স্বর্গীয় কৃষ্ণ চন্দ্র মজুমদার প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রী৺ দুর্গোৎসব।
(৺কৃষ্ণ চন্দ্রের অধস্তন ৭ম পুরুষ শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ মজুমদার
পৌত্রাদি সহ উপবিষ্ট)

বাদশাহ ঔরংজেবের রাজত্বকালে নির্ম্মিত কতিপয় পুরাতন মন্দির এই গ্রামের পূর্ব্ব পুরুষের ধর্ম্মানুরাগের যথেষ্ট প্রমাণ দিতেছে।

বর্ষার বারিপাতের সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালী হৃদয়ে এক নূতন জাগরণের সাড়া পাওয়া যায়। খাল-বিল, নদী-পুষ্করিণী সমস্তই কানায় কানায় ভরা যেন কার প্রতীক্ষায় সকলেই অস্থির। প্রকৃতি দেবীর সরল মধুর হাস্য বাঙ্গালী হৃদয়ে কি এক উদ্দীপনার সৃষ্টি করিল যদ্বারা বাঙ্গালী নব ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া শারদোৎসবের আগমনে অস্থির হইয়া ছুটিল— সম্মুখে শরতের সচন্দ্র-শর্ব্বরী, শেফালিকার মিষ্ট মধুর মৃদু গন্ধ। ভাবোন্মাদ বাঙ্গালী আনন্দে আত্মহারা হইল, সঙ্গে সঙ্গে মাতৃপূজার বোধনশঙ্খও বাজিয়া উঠিল। শারদোৎসব বাঙ্গালীর জাতীয় মহোৎসব। ধনী-দরিদ্র, রাজা-প্রজা সকলেই একত্রে মিলিত হইয়া জাতীয় জীবন গঠনোদ্দেশ্যে মহাশক্তির আরাধনায় অগ্রসর হইল। ধর্ম্মপ্রাণ কৃষ্ণচন্দ্রের ও তৎপরবর্ত্তী সময়ে এই গ্রামে মহাসমারোহে দুর্গোৎসব পূজা সম্পন্ন হইয়াছে। গ্রাম-বাসী সকলেই এই উৎসবে যোগদান করিয়া পরস্পর পরস্পরের আনন্দোৎসাহ বর্দ্ধন করিত। তৎকালে ঘৃত, ময়দা বা নানাপ্রকার মিষ্টান্নের প্রচলন না থাকিলেও চিড়া, দধি, গুড় প্রভৃতি পুষ্টিকর খাদ্যই সকলের নিকট বিশেষ সমাদরে গৃহীত হইত। কিন্তু বর্ত্তমানে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত বাঙ্গালীর নিকট সে প্রথা অসভ্যতার নিদর্শন বলিয়া মনে হয়।

ক্রমে সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমী পূজা অতিবাহিত হইলে পর দশমীতে বিজয়োৎসব। বিজয়া বাঙ্গালীর একটি মহোৎসব। বাঙ্গলার বিরাট প্রাণ এই উৎসবে অখণ্ডরূপে প্রকাশিত হয়। বিশ্বকবির আশাবাণীর "বাঙ্গালীর প্রাণ...এক হউক এক হউক হে ভগবান" প্রতিমূর্ত্তি বাঙ্গলার গ্রামে গ্রামে আমরা দেখিতে পাই। স্ত্রী-পুরুষ, নর-নারী, যুবা-শিশু, প্রৌঢ় ও বৃদ্ধ সকলেই আনন্দে এমনি ভাবে যোগদান করেন যেন সকলের ভিতরই প্রাণের ঐক্যতান স্পন্দিত হইতে থাকে। রুদ্ধ-দ্বার খুলিয়া প্রাণের প্রবাহ যেন বিশ্বকে আপনার করিতে চায়। এই উৎসব শুধু মানবের উৎসব নহে, ইহা প্রকৃতির ও উৎসব।

বর্ষাপগমে শারদফুল্লশ্রী প্রকৃতির ভিতর দিয়া নানা ধারায় প্রকাশিত হয়। নীল আকাশে সাদা মেঘের খেলা, আপন-ভোলা পবনের পাগলপরা

হাওয়া মনপ্রাণকে আনন্দে বিভোর করে। কুমুদ-কহ্লার পরিশোভিত সরোবর, বিহগকূজন-খচিত কান্তার, তাল-তমাল বেষ্টিত অরণ্যের ভিতর দিয়া শারদ-সৌন্দর্য্যরাণী অপূর্ব্ব মহিমায় প্রতিষ্ঠিতা হন। শিশিরসিক্ত শেফালিমাল্য পল্লীশ্রীর গলদেশে মুক্তাহারের ন্যায় বিরাজিত হয়। স্থলজ জলজ কুসুমরাশি নিঃসৃত পরাগপুঞ্জ চতুর্দ্দিক মধুগন্ধ বিকীরণ করিয়া পল্লী-রাণীকে সুবাসিত করিয়া তুলে।

প্রকৃতির এই অখণ্ড আনন্দোৎসবে মানবের আনন্দ আরও বর্দ্ধিত হয়।

বিজয়া এক অখণ্ড আনন্দে মানুষে এবং প্রকৃতির ভেদ দূরীভূত করিয়া দেয়। মানুষ অন্তরে ও বাহিরে এক অখণ্ড দেবসত্বার সংবাদ পাইয়া এক মহামিলনের অপূর্ব্ব আনন্দ উপভোগ করে।

দুর্গোৎসব জ্ঞান দৃষ্টিতে এই প্রকৃতিরই পূজা। সিংহবাহিনী প্রকৃতিরই প্রতিমা। মানব—সন্তান, প্রকৃতি—মাতা। দুর্গোৎসব মহামাতৃযজ্ঞ। এই মাতৃযজ্ঞে যদি ভেদের আবরণ অপসারিত না হয় তবে মাতৃযজ্ঞ সম্পূর্ণ হয় না এবং আনন্দের উৎসব ও হয় না।

বাঙ্গালী বিজয়াকে এই যজ্ঞের পূর্ণাহুতিরূপে গণ্য করে। মাতৃপ্রতিমা বিসর্জ্জনান্তে সেই মাতৃশক্তিকে বিশ্ববিকশিত জীবনের ভিতর দিয়া আহ্বান করে—তাই দেখিতে পাই এই বিজয়াতে হিন্দু মুসলমানের কলহ নাই—ব্রাহ্মণ চণ্ডালের ভেদ নাই, যে যেখানে থাকে পিতা-পুত্রে, মাতা-সন্তানে, ভাই এ ভাই এ, শত্রু মিত্রে সকলে আলিঙ্গনবদ্ধ হইয়া এক অখণ্ড আনন্দে মগ্ন হয়। সমাজ, প্রকৃতির ভেদ কোথায়ও থাকে না। মানব মাতৃ ক্রোড়ে শিশুর ন্যায় সমস্ত বিশ্বকে পূর্ণ দেখে—সৌন্দর্য্যে পূর্ণ—মাধুর্য্যে পূর্ণ—ঐশ্বর্য্যে দীপ্ত মহিমায় উদ্ভাসিত। বিজয়ার এই দৃষ্টি বাঙ্গালীর সাধনার ধন। পূর্ণাহুতির পর বিসর্জ্জনের বাজনার সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালীর অন্তর দুরু দুরু করিয়া কাঁপিতে থাকে। বাঙ্গালীর সর্ব্বস্ব ধন, সমস্ত আশার আশ্রয়, মরণের অভয়, জীবনের শক্তি যে তার মা। সেই মাতৃ বিসর্জ্জন বাঙ্গালীর নিকট বিসর্জ্জন নয় তাই মাতৃপ্রতীককে ধ্যানমগ্নচিত্ত মায়ের সসীমরূপের ভিতর দিয়া অরূপ অসীমরূপে বিজয়ার দিন তাকে বরণ করে—বিজয়া বিসর্জ্জন নয়।

বোধনে যে শক্তি অন্তরে জাগরিত হইয়াছিল, বিজয়ার প্রভাতে সে

বিশ্বের ভিতর দিয়া, সমাজের ভিতর দিয়া, প্রকৃতির ভিতর দিয়া মূর্ত্তিমতী হইয়া সাধককে আলিঙ্গনবদ্ধ করে।

বিজয়া তাই বিরাটের উপাসনা। বিজয়ায় হিন্দুর প্রাণ বিরাটে প্রতিষ্ঠিত হয়। বিজয়ায়ই আমরা অনুভব করিতে পারি—মনুষ্যের বিরাটত্ব প্রকৃতির মহামহিমত্ব।

হিন্দু! তুমি তোমার বিজয়ার বিরাটকে ভুল না। বিজয়ার দিনে তোমার ত্যাগ, তোমার সংযম, তোমার আবেগময় প্রাণ, তোমার কল্পনাময় ধ্যান, তোমার অন্তরের দীপ্তি অক্ষয় হউক, অক্ষয় হউক, অক্ষয় হউক। তুমি এই বিরাটের ব্রত উদ্যাপন কর। তোমার জীবন ও মৃত্যুর ভিতর দিয়া বিজয়া হিন্দুর ঘরে ঘরে প্রতিষ্ঠিত হউক। বিজয়া বিজয়া হউক।

কালের স্রোতে বিজয়ার এই বিরাটের অনুভূতি হইতে হিন্দু সমাজ ক্রমে ক্রমে চ্যুত হইতেছে। সমাজের প্রাণ আজ শিথিল হইয়াছে। এই বিরাটের মহিমাস্পন্দনে আর আমরা স্পন্দিত হইতেছি না। তাই শারদাগমে আমরা পল্লী জননীর সুখময় ক্রোড় ত্যাগ করিয়া দীপমালাখচিত নগরের বিলাসকুঞ্জে মোহমদিরায় জ্ঞানহীন হইয়া পড়ি। পল্লীর শ্যামল শ্রী তার অনন্ত সৌন্দর্য্য আমাদের ভিতর কোন সাড়া জাগাইয়া তুলে না। রুদ্ধ জীবনের রুদ্ধ গতিতে এতই মগ্ন আমরা, যে বিজয়ার সংবাদ হৃদয়ের রুদ্ধ দ্বার ভাঙ্গিয়া প্রবেশ করিতে পারে না। আজ আমরা এতই স্থুল দৃষ্টি সম্পন্ন যে মায়ের আনন্দ পরিবেশনে আমরা যোগদান করিতে পারি না। বাঙ্গালী, ভুল তোমার ক্ষুদ্রত্ব। ভাঙ্গ তোমার বৈদেশিক ভাববদ্ধ চিত্ত-নিগড়। সন্তান তুমি, মাতার আহ্বানে আবার জাগ্রত হও—চিত্তশুদ্ধ ক'রে মাতৃ আসন চিত্তে প্রতিষ্ঠিত কর। সন্তান! ভুলনা মাতৃমন্ত্রের সঞ্জিবনী ও উদ্দীপনী শক্তি।

ব্যবসায় ও বাণিজ্য।

মধুমতী ও নবগঙ্গার কূলে মটর, খেসারী, ছোলা, মুগ প্রভৃতি কলাই এবং ধনে, সরিষা, রাধুনী, কালজিরা, মৌরী প্রভৃতি যথেষ্ট উৎপন্ন হইয়া সর্ব্বত্র হাট বাজারে যাইয়া থাকে একথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এই লোহাগড়ায় পূর্ব্বে যে প্রধান প্রধান বাণিজ্য দ্রব্য ছিল তন্মধ্যে তুলা ও বস্ত্র, চিনি ও নীল—

তাহারই কথা বিশেষভাবে বর্ণনা করিব। ইংরাজ আমলে সমগ্র যশোর জেলায় নীলের চাষ হইত এবং ঐ ব্যবসায় লইয়া দেশে প্রজা বিদ্রোহ ঘটিয়াছিল। ১২৪৬ অব্দে হরিশ্চন্দ্র মজুমদারের জীবিত অবস্থায় লোহাগড়া গ্রামে নীলের চাষ হইয়াছে। স্বনামধন্য বিদ্যাধর রায়ের প্রৌত্র রামপ্রসাদ রায় বর্ত্তমান চরমল্লিকপুরে "বানকানা"র কুঠী নামে নবগঙ্গার শাখা বানকানা নদীর উপরে এক নীলের কুঠী নির্ম্মাণ করেন। বহুকাল ঐ কুঠী অবস্থিত ছিল পরে উক্ত কুঠী দেনায় বিক্রীত হইলে মকিমপুর জমিদার উহা দখল করেন। এই কুঠী এননকোহেন ডনলপ্ সাহেবের এদেশে আগমনের পূর্ব্বে স্থাপিত।

বর্ত্তমানে জীবিত অতিবৃদ্ধ শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ভৌমিকের পিতামহ ৺নিমানন্দ ভৌমিক ও ৺সর্ব্বেশ্বর ভৌমিক ৺পদ্মলোচন রায় মহাশয়ের সহিত ছাগল ছিড়ার নিকটবর্ত্তী মধুমতী নদীতীরে কৃষ্ণপুরে এক নীলকুঠী নির্ম্মাণ করেন। সর্ব্বেশ্বর বহুবার নীল বিক্রয়ার্থ কলিকাতা গমন করেন। ডনলপ সাহেব যখন এতদ্দেশে নীলের ব্যবসায় আরম্ভ করেন তখন নিমানন্দ তাহার নিকট কৃষ্ণপুরের কুঠী বিক্রয় করেন। ১২২৬।২৭ সালের নীল বিক্রয়ের হিসাব অদ্যাবধি ইঁহাদের গৃহে যত্নে সংরক্ষিত আছে।

মোগল আমলে যথেষ্ট নীল প্রস্তুত হইত কিন্তু ইংরাজ আমলেই নীল প্রস্তুত করিবার বিশেষ প্রণালী এদেশে আসে। সর্ব্বপ্রথমেই (১৭৯৫ খৃঃ) যশোহরে রূপদিয়ার নিকট প্রথম কুঠী প্রস্তুত হয়। ক্রমে ক্রমে যশোহরে নানাস্থানে কুঠী হইতে থাকে। প্রজারা নিজের জমিতে নীল বুনিলে খাজনা ও মজুরী বাদে প্রতি বিঘায় দুএক টাকার বেশী লাভ হইত না। প্রথম আমলে নীলকর সাহেবরা অনেকে প্রজাদের সঙ্গে ভাল ব্যবহারও করিতেন, কিন্তু শেষে অতিরিক্ত লাভে রাজার হালে বাস করিয়া আদালতের ভয় না করিয়া প্রজার উপর অত্যন্ত অত্যাচার আরম্ভ করিলেন। প্রজারা একবার দাদন লইলে সে টাকা কিছুতেই শোধ করিতে পারিত না। নানাবিধ অত্যাচারের তীব্র জ্বালা সহ্য করিতে না পারিয়া অবশেষে ১৮৫৮ অব্দে প্রজারা বিদ্রোহী হইয়া উঠিল—এই বিদ্রোহের নাম নীল-বিদ্রোহ; তখন মহারাণী ভিক্টোরিয়া ভারতেশ্বরী। সমগ্র যশোরে এই সময় এই বিদ্রোহের অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল। দেশের মধ্যে এই সময়ে কত লোক যে প্রকৃত বীরের মত নিঃস্বার্থ-ভাবে স্বজাতি ও স্বদেশের ধন-প্রাণ ও সম্মান রক্ষা করিয়াছিলেন তাঁহাদের

সকলের কথা জানিবার উপায় নাই। তবে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মাগুরার মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ, চৌবেড়িয়া নিবাসী "নীলদর্পণ" প্রণেতা রায়বাহাদুর দীনবন্ধু মিত্র ও লোহাগড়া নিবাসী যশোহরের কর্ম্মবীর রায়বাহাদুর যদুনাথ মজুমদার। নীলকর সাহেবরা ক্রমে ক্রমে নীলের ব্যবসায় উঠাইয়া দিয়া যশোহর ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে থাকেন (১৮৬০)। এই সময় ১৮৬৪ খৃঃ লোহাগড়ায় এক সৈন্যদল বা পল্টন (Regiment) অবস্থিত ছিল। নীল বিদ্রোহ নিবারণের জন্যই এই পল্টনের আগমন হয়। যদুনাথ যখন প্রজার পক্ষে দণ্ডায়মান হন, তখন ১৮৮৯ খৃঃ যশোহরের উত্তর ভাগে দ্বিতীয়বার বিদ্রোহ হয়। ফলে একটী সালিশী কমিটী স্থাপন হয়। ইহাতে প্রজার পক্ষে যদুনাথ, নীলকরের পক্ষে টুইডী সাহেব এবং সরকার পক্ষে কমিশনার স্মিথ সদস্য হইয়া সমস্ত গোলমাল মীমাংসা করেন। সমগ্র যশোহরে ১৭৯৫ হইতে ১৮৯৫ পর্য্যন্ত একশত বৎসর নীলের ব্যবসায় ছিল।

গুড় ও চিনি—সমগ্র যশোহর জেলা তাল খেজুরের দেশ। এই লোহাগড়ায় খেজুরের রস হইতে গুড় এবং সেই গুড় হইতে দেশীয় প্রথায় যথেষ্ট চিনি প্রস্তুত হইত। এই চিনি খাইতে বড় সুস্বাদু ও যশোর, খুলনা, ফরিদপুর ও বরিশাল জেলায় বিখ্যাত ছিল। শুধু দেশীয় গাছিরা গাছ কাটিয়া যে রস বাহির করিত তাহাতে কারখানার কার্য্য আদৌ চলিত না কাজেই যশোহরের অন্যান্য গ্রাম হইতে গুড় আনাইয়া স্থানীয় কারখানায় চিনি প্রস্তুত হইত এবং সেই চিনি সর্ব্বত্র হাট বাজারে পাইকারীগণ বিক্রয়ার্থ লইয়া যাইত। ৬০।৭০ বৎসর পূর্ব্বে এই গ্রামে এক সময় ৬।৭টী বড় বড় চিনির কারখানা চলিত। গুড় চাপিয়া নিঙড়াইয়া মাৎগুড় বাহির করিয়া উপরে সেওলা চাপা দিয়া অতি সুন্দর সুস্বাদু চিনি প্রস্তুত হইত। উক্ত কারখানাগুলির স্বত্বাধিকারিগণের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল। ৺পঞ্চানন সাহার কারখানা শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের বাটীর উত্তরে, ৺ফটিক মুদির কারখানা নবগঙ্গা তীরে শ্রীযুক্ত জটাধর মজুমদার দিগের বর্ত্তমান আম্রকানন, ৺গোবিন্দ কর্ম্মকারের কারখানা তাহার বাটীর নীচে নদীর পাড়ে, ৺ভোলানাথ রায়, ৺শ্রীভাগবৎ রায়ের কারখানা নবগঙ্গা নদীর পাড়ে, ৺জগৎচন্দ্র দত্তের কারখানা ও স্বনামধন্য ৺গিরিধর রায়ের কারখানা লোহাগড়া বাজারে ভৌমিকদের

দালানের দক্ষিণে অবস্থিত ছিল। এই সময় লোহাগড়ার লোকে চিনি কিনিয়া খাইত না। বর্ত্তমানে কালের স্রোতে একে একে সব লোপ হইয়া গিয়াছে। আধুনিক যুগে ওরূপ কোন ব্যবসায় এখানে কাহারও নাই। গ্রামের লোক অনেকেই স্থানীয় বাজারে নানাবিধ ব্যবসা করিয়া আসিতেছেন কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় যে কেহই এ পর্য্যন্ত বিশেষ লাভবান হইতে পারেন নাই। বড় বড় যৌথ-কারবার সবই প্রায় লোকসান পড়িয়া লুপ্ত হইবার উপক্রম হইয়াছে। এই সমস্ত কারবার ধ্বংসের এক মাত্র কারণ মহাজনেরা অবিবেচনা করিয়া কতকগুলি তস্করের হস্তে সমস্ত ভার অর্পণ করিয়া নিজেরা নিশ্চেষ্ট থাকিতেন।

তুলা ও বস্ত্র—অতি প্রাচীন কাল হইতে তুলাই এদেশের প্রধান বাণিজ্য দ্রব্য। যশোর জেলা এজন্য বিখ্যাত ছিল। এই গ্রামে তুলার চাষ হইত কিনা সত্য করিয়া বলা যায় না, তবে অধিকাংশ গৃহস্থ স্ত্রীলোক ঘরে ঘরে চরকায় উৎকৃষ্ট সূতা কাটিয়া তাঁতিকে সামান্য মজুরী দিয়া বস্ত্র বুনাইয়া তাহাই অনেকে ব্যবহার করিতেন। তাঁহারা নিজেদের ব্যবহারোপযোগী কাপড় ব্যতীত চরকায় কাটা সূতা বিক্রয় করিয়া বিশেষ লাভবান হইয়া গিয়াছেন। তুলা কিনিয়া এই সূতা কাটিতেন। ইহা ব্যতীত সাধারণতঃ লোকে বোয়ালমারীর 'ক'টকে' ধুতি ব্যবহার করিত। ইংরাজ আমলে বিদেশী সূতার কল আসিয়া সুলভ মূল্যে বস্ত্র প্রস্তুত করিয়া দেশীয় চরকায় কাটা সূতায় প্রস্তুত বস্ত্রের ব্যবসায় ক্রমে ক্রমে দখল করিয়া লইয়াছে। আধুনিক যুগে পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মানব মহাত্মা গান্ধী চরকার প্রচলন করিয়া পুনরায় দেশের হাওয়া পরিবর্ত্তন করিয়াছেন। বর্ত্তমান সময়ে স্থানীয় ব্যবসায়-বাণিজ্যের বিস্তৃতির বিবরণ নিম্নে প্রদান করিলাম।

পাট—লোহাগড়া সদরে পাটের চাষ বেশী না হইলেও পার্শ্ববর্ত্তী স্থানে প্রচুর পরিমাণে পাট উৎপন্ন হইয়া থাকে। প্রতি বৎসর এই লোহাগড়া মোকাম হইতে লক্ষাধিক মন পাট কলিকাতা রপ্তানী হইয়া থাকে। কলিকাতায় ব্যবসাদার মহলে বিশেষতঃ যাঁহারা পাটের ব্যবসায় অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন লোহাগড়ার পাট 'লোহাগড়া পাট' (quality) বলিয়া প্রসিদ্ধ।

পাট ব্যবসায়ীদের মধ্যে ৺দ্বারকানাথ পোদ্দার, ৺হরিশ্চন্দ্র কুণ্ড, ৺বিশ্বনাথ

সরকার, রায়বাহাদুর যদুনাথ মজুমদার, মতিলাল সরকার, মাখনলাল সমাদ্দার ও আব্দুলকাদের ফকিরদিগর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

রবিশস্য—পাট ভিন্ন ইহারা এই লোহাগড়া মোকাম হইতে রাই-সরিষা, খেসারী-মটর, ধনে-তিষি, ছোলা-মুগ প্রভৃতি যাবতীয় রবিশস্য ও শিমুল তুলা প্রচুর পরিমাণে খরিদ করিয়া কলিকাতায় বিক্রয়ার্থ প্রেরণ করেন। এই লোহাগড়া মোকামে প্রতি বৎসর আনুমানিক ন্যূনকল্পে পঞ্চাশ লক্ষ টাকার দ্রব্যাদি আমদানী ও রপ্তানী হইয়া আসিতেছে।

বস্ত্র—বস্ত্র ব্যবসায়ীদের মধ্যে দ্বারকানাথ পোদ্দার এণ্ড সন্স, মহাদেব চন্দ্র দে (পোদ্দার) ও সরকার দিগর নাম উল্লেখ যোগ্য।

বেনেতি ও মনিহারী—ঘৃত-চিনি-ময়দা, মনিহারী ও মসল্লা ব্যবসায়ীদের মধ্যে মজুমদার ব্রাদার্স, সীতানাথ দত্ত-বনিক, দুর্গাচরণ মালাকার-জগচ্চন্দ্র রায় ও অযোধ্যামাধব সাহার নাম উল্লেখ যোগ্য।

কাষ্ঠ গোলা—কাঠ গোলার ভিতর মতিলাল সরকার, রায় এণ্ড কর কোং, জগচ্চন্দ্র রায়-দুর্গাচরণ মালাকার ফার্ম বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। বহু প্রকার দ্রব্যাদির আমদানী-রপ্তানী ও বড় বড় ধনী ব্যবসায়ীর সমাগমে লোহাগড়া একটি বড় বন্দর বলিয়া দেশ বিদেশে সুপরিচিত। এই ধনী ব্যবসায়ীদের মধ্যে রায় বাহাদুর যদুনাথ মজুমদার ও ডি, এন্ পোদ্দার গত ত্রিশ বৎসর যাবৎ কলিকাতা উল্টাডাঙ্গায় আড়তদারী ও চালানি ব্যবসায় করিয়া আসিতেছেন। এতদ্ব্যতীত রায়বাহাদুর ১৩২৬ সাল হইতে চাউল কল (রাইস মিল) চালাইতেছেন। পূর্ব্বে রায় বাহাদুরের কলিকাতা দাস-পাড়ায় ধানের আড়ত, বেলগাছিয়ায় দেশী পাটের আড়ত, উল্টাডাঙ্গা আড়তে পাটের বেলের কাজ ও ডকে নুন ও চিনির খরিদ বিক্রয়ের কাজ ছিল। কলিকাতা ভিন্ন রায় বাহাদুরের বড়দিয়া মোকামে কেরোসিন ডিপোঃ, চালানি কারবার; যশোহরের ছাতিয়ান তলা মোকামে চিনি-গুড়ের ব্যবসায়; লোহজং পাটের ব্যবসায় ও লোহাগড়া মোকামে বস্ত্র ও চালানি কারবার ছিল। বর্ত্তমানে ব্যবসায় বাজার মন্দা হওয়ায় কোন কোন কাজ বন্ধ আছে। ডি, এন্ পোদ্দারেরও কলিকাতা ভিন্ন দৌলতপুর পাটের বেলের কাজ, নলদী, গাজনালে, কামারখালি বোয়ালমারী, ভাটিয়াপাড়া ও লোহাগড়ায় নানারূপ ব্যবসায় ছিল। বর্ত্তমানে ব্যবসায়

বাজার মন্দা বলিয়া ইহারও কোন কোন স্থানের কাজ বন্ধ আছে। লোহাগড়া বাজার স্থানীয় রায় বংশের জমিদারীর অন্তর্ভূক্ত একথা পাঠকপাঠিকা পূর্ব্বেই অবগত আছেন। এই লোহাগড়া বাজারের ব্যবসায়ীদের নাম ধাম সমেত তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

চালানি কারবার—

১। দ্বারকানাথ পোদ্দার এণ্ড সন্স (লোহাগড়া)
২। শ্রীনাথ মজুমদার-দেবনাথ কুণ্ডু ঐ
৩। মতিলাল সরকার ঐ
৪। রাজেন্দ্রনাথ ভৌমিক-বিশ্বনাথ সরকার ঐ
৫। কৈলাশচন্দ্র সাহা ঐ
৬। হরিশচন্দ্র কুণ্ডু-আব্দুলকাদের ফকির প্রথম ঐ ২য় (আড়েরা
৭। মাখনলাল সমাদ্দার (কচুবাড়িয়া)
৮। অবিনাশচন্দ্র মজুমদার-পূর্ণচন্দ্র দত্ত ঐ
৯। পঞ্চানন সাহা (ছাতড়া)
১০। হৃদয়নাথ সাহা (কামঠানা)
১১। ভাগ্যধর মণ্ডল (নারান্দিয়া)

বস্ত্র ব্যবসায়ী—

১। ডি, এন্ পোদ্দার এণ্ড সন্স (লোহাগড়া)
২। রায় বাহাদুর যদুনাথ মজুমদার ঐ
৩। বিশ্বনাথ সরকার ঐ
৪। মতিলাল সরকার ঐ
৫। মহাদেবচন্দ্র দে (পোদ্দার) ঐ
৬। জগচ্চন্দ্র-শশীভূষণ রায় ঐ
৭। মাখনলাল সমাদ্দার (কচুবাড়িয়া)
৮। কেদারেশ্বর পাড় এণ্ড ব্রাদার্স (কুন্দশী)
৯। আব্দুল করিম শেখ (মঙ্গলহাটা)
১০। ভাগ্যধর মণ্ডল (নারান্দিয়া)

ঘৃত, চিনি, ময়দা, তৈল, বেনেতি ও মনিহারী ব্যবসায়ী—

১। মজুমদার ব্রাদার্স (লোহাগড়া)
২। জগচ্চন্দ্র রায়-দুর্গাচরণ মালাকার ঐ
৩। অযোধ্যামাধব সাহা ঐ
৪। ক্ষিরোদচন্দ্র সাহা ঐ
৫। বিপিনবিহারী সাহা ঐ
৬। সীতানাথ দত্ত বনিক (মোচড়া)
৭। লালবিহারী বনিক (নলদী)

মনিহারী ব্যবসায়ী—

১। সুরেন্দ্র গোপাল মজুমদার (লোহাগড়া)
২। রমেশচন্দ্র মজুমদার ঐ
৩। অমূল্যধন কাপুড়িয়া ঐ
৪। কেশবলাল সাহা ঐ
৫। ফণীন্দ্রনাথ সাহা (কুন্দশী)
৬। গৌরচন্দ্র সাহা ঐ
৭। সতীশচন্দ্র-যদুনাথ সাহা (ছাতড়া)

কাঠ গোলা—

১। মথুরানাথ সরকার (লোহাগড়া)
২। ভুবনমোহন সরকার ঐ
৩। গিরিধর মুখোপাধ্যায় (কুন্দশী)
৪। মতিলাল সরকার (লোড়াগড়া)
৫। রায় এণ্ড কর কোং ঐ
৬। জগচ্চন্দ্র রায়-দুর্গাচরণ মালাকার ঐ
৭। মহাদেব চন্দ্র দে (পোদ্দার) ঐ

চাউল ব্যবসায়ী—

১। ডি, এন পোদ্দার এণ্ড সন্স (লোহাগড়া)
২। শ্রীনাথ মজুমদার-দেবনাথ কুণ্ডু ঐ
৩। রাজেন্দ্রনাথ কুণ্ডু ঐ
৪। কালিচরণ ভৌমিক ঐ
৫। অযোধ্যামাধব সাহা ঐ
৬। লালমোহন সাহা (ছাতড়া)
৭। জগদ্বন্ধু কুণ্ডু ঐ
৮। ত্রৈলোক্যনাথ সাহা ঐ
৯। যদুনাথ নস্কর (কামঠানা)
১০। আব্দুল কাদের ফকির—ক্ষুদিরাম কুণ্ডু প্রথম আড়েরা ২য় ছাতড়া
১১। হীরালাল মণ্ডল (লোহাগড়া)
১২। রাইচরণ সাহা—অবিনাশচন্দ্র সাহা (কামঠানা)

তেল ও নুন ব্যবসায়ী—

১। নকুলচন্দ্র রায় (লোহাগড়া)
২। বিপিনচন্দ্র সাহা ঐ
৩। শশীভূষণ সাহা ঐ
৪। ফেলুরাম মণ্ডল ঐ
৫। রামচন্দ্র সাহা ঐ
৬। ক্ষুদিরাম পোদ্দার ঐ
৭। যদুনাথ গুড়ে (ছাতড়া)

মিষ্টান্ন বিক্রেতা—

১। দেবনাথ কুণ্ডু (ছাতড়া)
২। ভুবনমোহন কুণ্ডু ঐ
৩। চৈতন্য কুণ্ডু (নড়াইল)
৪। বঙ্ক-কল্পবিহারী সাহা (লোহাগড়া)
৫। যদুনাথ-কুঞ্জবিহারী সাহা
৬। ভগীরথ-শশীভূষণ দত্ত (লোহাগড়া)

জুতার দোকান—

১। অহেদ মোল্লা (গোবিন্দপুর)
২। আজিজ মিঞা (মল্লিকপুর)
৩। তাহের মিনে (পিঙ্গলিয়া)

তামাক ব্যবসায়ী—

১। যদুনাথ নস্কর (কামঠানা)
২। আব্দুল কাদের ফকির (আড়েরা)
৩। ত্রৈলোক্যনাথ সাহা (ছাতড়া)

ঔষধ ব্যবসায়ী—

১। মজুমদার এণ্ড ভৌমিক ফার্ম্মেসী (লোহাগড়া)
২। জগন্নাথ ফার্ম্মেসী ঐ
৩। ডাঃ সাহা ফার্ম্মেসী ঐ
৪। ইউরেকা ফার্ম্মেসী (জয়পুর)
৫। কল্যানী ফার্ম্মেসী (মল্লিকপুর)

৬। কালি ফার্ম্মেসী (ফতেপুর)
৭। ডাঃ সরকারস্ হোমিও-
প্যাথি ষ্টোর (মল্লিকপুর)
৮। ডাঃ মুখার্জ্জিস্ হোমিও-
প্যাথি ষ্টোর (কুন্দশী)
৯। ডাঃ দত্তস্ হোমিওপ্যাথি
হল (লোহাগড়া)
১০। ডাঃ মল্লিকস্ হোমিও-
প্যাথি হাউস ঐ

আয়ুর্ব্বেদ ঔষধালয়—

১। কবিরাজ নলিনীকান্ত সেন (ইতিনা)
২। " কেদারনাথ গুহ ঐ
৩। " চন্দ্রকান্ত সেন
৪। " কালিচরণ দত্ত (লোহাগড়া)
৫। " রাইচরণ দত্ত ঐ

চাঁদসীর ক্ষত চিকিৎসালয়—

১। কেশবচন্দ্র বিশ্বাস
২। মনোরঞ্জন বিশ্বাস

ফল বিক্রেতা—

১। কেশবলাল সাহা (লক্ষ্মীপাশা)
২। নিত্যানন্দ—গৌরচন্দ্র সাহা (কুন্দশী)
৩। অমূল্যধন কাপুড়িয়া (যশোহর)
৪। ফণীন্দ্রনাথ সাহা (কুন্দশী)

সোডা-লিমনেড প্রস্তুতকারক—

১। নিত্যানন্দ—গৌরচন্দ্র সাহা

পামরুটী বিস্কুট প্রস্তুতকারক—

১। কৃষ্ণচন্দ্র—মতিলাল দাস

ঘি-মাখন বিক্রেতা ঘোষ

১। চুনীলাল ঘোষ
২। গোপীনাথ ঘোষ (রাজাপুর)

স্বর্ণ-রৌপ্যের অলঙ্কার প্রস্তুতকারক—

১। নিবারণচন্দ্র কর্ম্মকার
২। শরৎচন্দ্র কর্ম্মকার ঐ
৩। বেনোয়ারীলাল
কর্ম্মকার (লোহাগড়া)
৪। অশ্বিনীচন্দ্র—নরেন্দ্রনাথ
কর্ম্মকার (ইতিনা)
৫। ভুবনমোহন কর্ম্মকার (লোহাগড়া)

লৌহের কর্ম্মকার—

১। মহেন্দ্রনাথ কর্ম্মকার (লোহাগড়া)
২। কেশবলাল কর্ম্মকার ঐ
৩। গুরুদাস কর্ম্মকার ঐ
৪। ত্রৈলোক্যনাথ কর্ম্মকার ঐ
৫। হরিশ্চন্দ্র কর্ম্মকার ঐ
৬। সীতানাথ—দেবনাথ কর্ম্মকার ঐ
৭। কালিচরণ কর্ম্মকার (লক্ষ্মীপাশা)
৮। সুরেন্দ্রনাথ কর্ম্মকার (কলাগাছি)

টিন-স্ক্রু-বল্টু-লোহালক্কর ব্যবসায়ী—

১। কর এণ্ড রায় কোং (লোহাগড়া)
২। দুর্গাচরণ মালাকার—
জগচ্চন্দ্র—শশীভূষণ রায় ঐ
৩। মহাদেব চন্দ্র দে (পোদ্দার) ঐ

পিত্তল কাঁসা ব্যবসায়ী—

১। রাধানাথ কর (লোহাগড়া)

২। হৃদয়নাথ মণ্ডল (নারান্দিয়া)

শাঁখা ব্যবসায়ী—

১। রাধানাথ কর (লোহাগড়া)

২। নিবারণচন্দ্র পোদ্দার ঐ

৩। প্রতাপচন্দ্র পোদ্দার ঐ

দর্জ্জীর দোকান—

১। পঞ্চানন দত্ত (ইতিনা)

২। আব্দুল আজিজ শেখ

৩। তোফাজ্জেল মোল্লা (গোবিন্দপুর)

৪। মুগুল মিঞা

৫। নুরল হক মিঞা

সাইকেল বিক্রেতা—

১। তারাপদ চক্রবর্ত্তী (কাশিয়ানী

২। তোফাজ্জেল মোল্লা (গোবিন্দপুর)

৩। ফ্রেণ্ডস্ ষ্টোর (লোহাগড়া)

ঘড়ি-হারমোনিয়াম ও গ্রামোফন্ মেরামত কারক—

১। যতীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী (লোহাগড়া)

২। উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (কুন্দশী)

ঝালাইকর—

১। যজ্ঞেশ্বর সাহা দেওয়ান (লোহাগড়া)

২। উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (কুন্দশী)

হরেক মাল ব্যবসায়ী—

১। ত্রৈলোক্যনাথ—বিধুভূষণ সরকার (লোহাগড়া)

ফটোগ্রাফার—

১। জিতেন্দ্রনাথ সাহা (লক্ষ্মীপাশা)

আবগারী—

১। ননীগোপাল মুখার্জ্জী (গোবরডাঙ্গা)

ব্যাঙ্ক—

১। দি লোহাগড়া কমারশিয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেড্ (বাজার)

এতদ্ব্যতীত 'ট' বাজারে যথেষ্ট ব্যবসায়ী নানাবিধ ব্যবসায়ে লিপ্ত আছেন তাহাদের নাম ধাম দেওয়া সহজ সাধ্য নহে। একারণ উপরোক্ত তালিকা দ্বারা পাঠক-পাঠিকা লোহাগড়া বাজারের গুরুত্ব উপলব্ধি করিবেন।

অবশেষে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি যথা—মৎস্য, দুগ্ধ ও তরিতরকারীও যথেষ্ট পরিমাণে আমদানী হইয়া থাকে। দৈনিক দুগ্ধ নিম্নে ৩০ মণ হইতে উর্দ্ধে ৫০ মণ পর্য্যন্ত সময় সময় আমদানী হইতে দেখা যায়। আমরা দিন দিন এই বাজারের শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।

ক্রীড়া-কৌতুক।

(মাসিক বসুমতী হইতে সংগৃহীত)

খেলা-ধুলা না করিলে শরীর সবল ও সুস্থ হয় না একথা সকলেই অবগত

আছেন। বর্ত্তমান যুগে ক্রীড়াকৌতুক সমগ্র শিক্ষিত সমাজেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে ইহা আমরা দেখিতে পাই। সমগ্র বাঙ্গলায় এমন কোন স্থান বা পল্লী নাই যেখানে ক্রীড়াকৌতুকের জন্য পৃষ্ঠপোষকতা না চলিতেছে। বাঙ্গালীর জাতীয় খেলা উঠিয়া গিয়া বিজাতীয় খেলায় বাঙ্গালী আজ ঝুকিয়া পড়িয়াছে। কালস্রোতের গতি রোধ করিবার সাধ্য কাহারও নাই, তাই আজ বাঙ্গালী ফুটবলের নেশায় মাতিয়াছে। এই ফুটবল খেলা একরূপ সংক্রামক ব্যাধিরূপে বাঙ্গালীকে আক্রমণ করিয়াছে। যখন ইহার হাত হইতে বাঙ্গালীর আর নিস্তার লাভের উপায় নাই তখন ইহা হইতে যাহাতে বাঙ্গালী কিঞ্চিৎ লাভ করিতে পারে তাহার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। ফুটবল খেলা বিজাতীয় বিদেশীয় খেলা এবং বহু ব্যয়সাধ্য হইলেও বর্ত্তমান যুগে উহার উপর সকলের যেরূপ আগ্রহ দেখা যায় তাহাতে এই খেলা যে বাঙ্গালীর জাতীয় খেলায় পরিণত হইয়াছে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। বর্ত্তমানে আমাদের দেশে এমন কোন জেলা বা গ্রাম নাই যেখানে ছেলেরা ফুটবল না খেলে। এমন কোন পল্লী বা কেন্দ্র নাই যেখানে শিল্ড্—কাপ্ বা একটা মেডাল খেলা না হয়। সুতরাং এখন আর এই খেলাকে 'বিদেশী' ও বিজাতীয় বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া চলে না। কাজেই কোথা হতে এই খেলার উৎপত্তি এবং কিরূপে বর্ত্তমানে ইহার প্রসার লাভ করিয়াছে তাহা পাঠককে যৎকিঞ্চিৎ অবগত করাইব।

ফুটবল অতি প্রাচীন ক্রীড়া। প্রাচীন মিশরীয়রা ফুটবল খেলায় বড়ই আনন্দ লাভ করিতেন, ইতিহাসে ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। তখনকার দিনে ইহারা হাত ও পায়ের দ্বারাই ফুটবল খেলিতেন বলিয়া জানা যায়। ফুটবল কথার অর্থ ই হইতেছে পায়ে খেলিবার বল ইহা অবশ্য সকলেই বুঝিতে পারেন। সুতরাং উহা যে পায়ের দ্বারাই প্রধানতঃ খেলিবার নিয়ম ছিল একথা বলিতে পারি। তবে ফুটবলের প্রথমাবস্থায় যখন বিজ্ঞান সম্মত প্রতিযোগিতা খেলার প্রচলন হয় নাই তখন বোধহয় কোন রকমে মারামারি বা ঠেলাঠেলি করিয়া বল লইয়া বিপক্ষকে জয় করাই নিয়ম ছিল।

ইংলণ্ডে রোমানদিগের পরাজয়ের উৎসবে সর্ব্বপ্রথমে ডার্ব্বি সহরে ফুটবল খেলার প্রতিযোগিতা পরীক্ষায় জনগণ আনন্দ উপভোগ করিয়াছিল। ইংলণ্ডের ইতিহাসে ইহাই প্রথম ফুটবলের উল্লেখ। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে

ইহা কিংবদন্তী বলিয়া মনে হয়। ইতিহাসে পাওয়া যায় যে ১৩৪৯ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে ইংলণ্ডে জাতীয় খেলারূপে ফুটবল দেখা দেয় নাই। তদানীন্তন ইংলণ্ডের রাজা তৃতীয় এডওয়ার্ড ফুটবল খেলার ভক্ত ছিলেন না বলিয়া তিনি তাহার রাজ্যমধ্যে ফুটবল খেলা নিষিদ্ধ করিয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার নিষেধাজ্ঞা ফলবতী না হইয়া ফুটবল খেলা ইংলণ্ডে উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিতে থাকে এবং ক্রমে ক্রমে উহা অত্যন্ত জনপ্রিয় হইয়া উঠে।

খৃষ্টীয় পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে ফুটবল খেলা অধিকতর জনপ্রিয় হয়। রাণী এলিজাবেথ আইন বাঁধিয়া দেন যে ফুটবল খেলা করিলে লোকের জেল হইবে। কিন্তু তাহাতে ও ফুটবল খেলার প্রভাব ও প্রসার বিন্দুমাত্র উপশমিত হয় নাই। পার্লামেণ্ট ও রাজার কৃত কঠোর আইনের সৃষ্টি সত্ত্বেও এই খেলা উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি ও জনপ্রিয়তা লাভ করিতে থাকে। এই সময় হইতেই ফুটবল খেলার নিয়ম কানুনের সৃষ্টি হয়।

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে যে সকল ফুটবল প্রতিযোগিতা পরীক্ষার খেলা হইয়াছিল তন্মধ্যে স্কটলণ্ডের ক্যাটেনহ নামক স্থানের খেলাই সর্ব্বাপেক্ষা বিখ্যাত। এই সময় হইতেই বৃটেনের সম্ভ্রান্ত বংশীয়রা ফুটবল খেলায় বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন এবং ফুটবল খেলা তখন হইতে ধীরে ধীরে 'নীচ' আখ্যা হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়া ইংরাজের 'জাতীয়' খেলায় পরিণত হইতে আরম্ভ করে।

১৮৬৩ খৃঃ ইংলণ্ডে প্রথম ফুটবল এসোসিয়েশানের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। ইহাই এসোসিয়েশান খেলা নিয়ন্ত্রণের প্রথম সূত্রপাত। এই সময়ে লণ্ডন ও সেফিল্ড সহরের মধ্যে ফুটবল এসোসিয়েশানের কাপখেলা হয়। উহাই বোধহয় জগতে প্রথম এসোসিয়েশান ফুটবল খেলার প্রতিযোগিতা পরীক্ষা। সে সময় ফুটবল খেলার আইন-কানুন সরল ও সহজ ছিল। কিন্তু দিনের পর দিন যাইতে লাগিল আর নিত্য নূতন সমস্যা উপস্থিত হইয়া খেলার আইন-কানুন কঠিন ও জটিল হইয়া উঠিল। ক্রমশঃ সহরে-সহরে, গ্রামে গ্রামে এই খেলা প্রসার লাভ করিয়া ইহার পদ্ধতি, আইন-কানুন ও আদর্শের উন্নতি হইতে লাগিল। এবং কালক্রমে লণ্ডনের ফুটবল এসোসিয়েশান খেলার আইনের হাইকোর্ট হইয়া দাড়াইয়াছে।

ইণ্টার্ন্যাশানাল অথবা আন্তর্জাতিক খেলার নাম অনেকেই শুনিয়া

থাকিবেন। এই খেলা সর্ব্বপ্রথম ইংলণ্ডেই প্রবর্ত্তিত হয়। এই খেলার বিশেষত্ব এই যে ইহাতে এক জাতির বিপক্ষে অন্য এক জাতি খেলিয়া থাকে। ইংলণ্ডে প্রথমে ১৮৮৩ খৃঃঅব্দে ইংলণ্ড ও ওয়েলশ্ দেশের মধ্যে এই খেলা হয়। ঐ খেলায় ওয়েলশ্ জয়লাভ করে। ক্রমে ক্রমে ইণ্টার্ন্যাশানাল খেলা সমগ্র ইউরোপে প্রসার লাভ করিল।

ইংরাজ জাতির উৎকৃষ্ট ফুটবল খেলোয়ারের আর একটি জন্মভূমি সৈন্য-শ্রেণী! হাইল্যাণ্ড লাইট ইনফ্যান্টি, ব্লাকওয়াচ, হাইল্যাণ্ডারস্, রয়ালস্কটস, বর্ডারারস, রয়াল-আইরিশ, আইরিশ রাইফ্‌ল্‌স্, ওয়েলশফুজিলিয়াস, ডারহাম লাইটইনফ্যান্ট্রি, সারউড্ফরেষ্টারস্, চেসায়ারস্, মিডল্‌সেক্স, হ্যামসায়ার, ওয়েষ্টকেণ্ট্, কিংস্ওন্ স্কটিস বর্ডারার, গর্ডনস্ প্রমুখ বৃটিশ সেনাদলের খেলা যাহারা দেখিয়াছেন তাহারাই জানেন যে ফুটবল খেলা কতদূর মনোহর ও চিত্তাকর্ষক হইতে পারে। হার-জিত সবারই আছে, সব সময়ই যে ভাল খেলোয়াড় জয়লাভ করিবে তাহা নহে, কেননা ফুটবল খেলা অনেকটা দৈবের উপর—ভাগ্যের উপর নির্ভর করে।

বাঙ্গালী মোহনবাগান দলের কথা অনেকেই শ্রবণ করিয়া থাকিবেন। তাহাদের খেলা উপভোগ্য ও বর্ণনাতীত। মোহনবাগান সময় সময় সর্ব্বোৎকৃষ্ট খেলা দেখাইয়াও অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট দলের নিকট পরাজিত হইয়া থাকে। প্রাচ্যের মধ্যে সুনাম অর্জ্জন করিয়াছে আমাদের এই মোহনবাগান। ১৯১১ খৃঃ কলিকাতার আই, এফ, এ শিল্ড্ জয় করিবার পূর্ব্বে তাঁহারা উপর্য্যুপরি তিনবার ট্রেডস্ কাপ জয় করিয়াছিল এবং যেখানে খেলিতে গিয়াছে সেইস্থানে বাঙ্গালী অবাঙ্গালী সকলেরই প্রাণে আনন্দদান করিয়াছে। দ্বিতীয়বার শিল্ড্ জয় করিতে না পারিলেও তাহারা সকল খেলাতেই বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করিয়াছে এবং সর্ব্বত্রই বাঙ্গালীর শুভেচ্ছা ও আশীর্ব্বাদ বহন করিয়াছে। তখনকার দিনে মোহনবাগান দলে স্বনাম প্রসিদ্ধ খেলোয়াড় ছিলেন—শিবু ভাদুড়ী, বিজয় ভাদুড়ী, অভিলাষ, শুককুল, সুধীর, কানু ও রাজেন। বর্ত্তমান যুগে গোষ্ঠ পাল, আর দাস, বলাই চাটুয্যে, সুধাংশু, রবি গাঙ্গুলী, কুমার, নরেন বাঁড়ুয্যে, মোনা দত্ত ও মন্মথ দত্ত মোহনবাগান দলের অস্তিত্ব বজায় রাখিয়াছেন। ইহারা শিমলায় সারউডের সহিত এবং বোম্বাইতে ডারহামের সহিত খেলিয়া দেশ বিদেশে সুযশ অর্জ্জন করিয়া বাঙ্গালীর ক্রীড়াকৌশলের পরিচয় প্রদানে সমর্থ হইয়াছেন।

এদেশের ফুটবলের ইতিহাস ধরিতে গেলে ১৮৮৯ খৃঃ হইতে আরম্ভ। তৎপূর্ব্বে ইংলণ্ডেই এসোসিয়েশান খেলা বৈজ্ঞানিকভাবে আরম্ভ হইয়াছিল কিনা সন্দেহ। ১৮৮৩ খৃঃ কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় Combination খেলার প্রথম নিদর্শন দেখাইয়াছিল। বোধহয় ১৮৮৬—৮৭ খৃঃ হইতে কলিকাতায় গড়ের মাঠে য়ুরোপীয়রা প্রথম এসোসিয়েশান খেলা আরম্ভ করেন। ১৮৮৯ খৃঃ ট্রেডস্ কাপের সৃষ্টি হয়। এদেশে বোধহয় সাধারণের মধ্যে উহাই প্রথম কাপ প্রতিযোগিতা খেলা। ১৯০৬ খৃঃ আমাদের প্রসিদ্ধ মোহনবাগান ক্লাব ট্রেডস্‌কাপ জয় করে এবং পর পর ১৯০৭ ও ১৯০৮ খৃঃ ঐ কাপ জয় করিয়া সকলকে চমৎকৃত করিয়া দেয়। ১৯০৬ খৃঃ ৩২টী, ১৯০৭ খৃঃ ২৮টী এবং ১৯০৮ খৃঃ ৩৫টি দল প্রতিযোগিতা পরীক্ষা দিয়াছিল। তন্মধ্যে য়ুরোপীয় ও য়ুরেশীয় দলের সংখ্যা অল্প ছিল না। বিজয়দাস ও শিবদাস—দুই ভাদুড়ী ভ্রাতার Combination এক অপূর্ব্ব পদার্থ ছিল, উহা দর্শনে সকলেই আনন্দ উপভোগ করিতেন।

১৮৯৩ খৃঃ হইতে ইণ্ডিয়ান ফুটবল এসোসিয়েশানের প্রতিষ্ঠা হয় এবং উহার অন্তর্ভুক্ত সদস্য দলসমূহের মধ্যে খেলার প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হয়। ঐ বৎসরেই এসোসিয়েশান হইতে শিল্ড প্রতিযোগিতা খেলার প্রবর্ত্তন করা হয়; আর ট্রেডস্‌কাপটিকে জুনিয়ার বা ছোট প্রতিযোগিতা খেলার মধ্যে নামান হয়। ভারতীয়ের মধ্যে মাত্র মোহনবাগান ১৯১১ খৃঃ শিল্ড জয় করিয়াছিল। ঐবার মোট ২০টি দল প্রতিযোগিতা পরীক্ষায় যোগ দিয়াছিল। বড় বড় নামজাদা অভিজ্ঞ গোরা সেনাদলকে একেরপর একে হারাইয়া মোহনবাগান য়ুরোপীয় সমাজকে চমৎকৃত করিয়া বাঙ্গালীর মুখোজ্জ্বল করিয়াছিল। দুঃখের বিষয় সে মোহনবাগান বর্ত্তমানে নাই! বর্ত্তমানে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা খেলায় ভারতীয় দল য়ুরোপীয় দলকে একাধিক বৎসর পরাজিত করিয়াছে। বর্ত্তমানে ভারতীয়দের মধ্যে মোহনবাগান ব্যতীত ইষ্টবেঙ্গল, এরিয়ান্স, কুমারটুলি, ওয়ারি প্রভৃতি অনেক খেলোয়াড় দল য়ুরোপীয় দলের বিপক্ষে সমান তেজে খেলিতে অভ্যস্ত হইয়াছে। তাই আজ এই ফুটবল খেলা বাঙ্গালী বৃদ্ধ হইতে শিশুকে পর্য্যন্ত আকর্ষণ করিয়াছে এবং উহা বাঙ্গালীর জাতীয় খেলায় পরিণত হইয়াছে।

এখন স্থানীয় পল্লী ও পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের ফুটবল খেলার কিঞ্চিৎ বিবরণ

দিয়া এই প্রসঙ্গ সমাপ্ত করিব। ইতিনা, মল্লিকপুর, কাশীপুর, লোহাগড়া, লক্ষ্মীপাশা প্রভৃতি স্থানে বহুদিন হইতে প্রতিযোগিতা খেলা আরম্ভ হইয়াছে। লোহাগড়ার কাশীনাথ সরকার মহাশয়ের নাম অনেকেই শুনিয়া থাকিবেন। তিনিই স্থানীয় ক্লাবের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহারই যত্নে উত্তরোত্তর এই গ্রামে খেলোয়াড় তৈয়ারী হয়। বহু অর্থ ব্যয়ে কাশীবাবু উক্ত ক্লাবকে অদ্যাবধি জীবিত রাখিয়াছেন। তিনি এতদ্দেশের মধ্যে তৎকালে সুপ্রসিদ্ধ ব্যাক্ ছিলেন। তাঁহার গগনভেদী সুট চমকপ্রদ ছিল। যাহারা তাহার খেলা, স্বচক্ষে দেখিয়াছেন তাহারা আজ ও তাহা স্মরণ করিয়া আনন্দ উপভোগ করেন। এই লোহাগড়া ক্লাবে বীরেন মজুমদার, বীরেন সরকার, ৺নরেন মজুমদার বি, এ, সতীশ চক্রবর্ত্তী ও হরিপদ মজুমদার প্রভৃতি স্বনাম প্রসিদ্ধ খেলোয়াড় ছিলেন। ইঁহারা কাশীপুর ও মল্লিকপুর কাপ প্রতিযোগিতা খেলায় বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইয়া কাপ জয় করেন।

গত পাঁচ বৎসর অতীত হইল স্থানীয় বাবু ভুবনমোহন সরকার একখণ্ড রৌপ্যবিনির্ম্মিত শিল্ড প্রস্তুত করিয়া দিয়া প্রতিযোগিতা খেলায় উৎসাহ আরও বৃদ্ধি করিয়াছেন। দুঃখের বিষয় স্থানীয় ক্লাব অদ্যাবধি উহা জয় করিতে সমর্থ হয় নাই। ১৩৩৫ সালে মল্লিকপুর কাপ প্রতিযোগিতা খেলায় পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসমূহের নামজাদা খেলোয়াড় দলকে হারাইয়া অবশেষে শেষ-খেলায় দিঘলিয়া ক্লাবকে পরাজিত করিয়া এই লোহাগড়া ক্লাব সকলকে চমৎকৃত করিয়া দিয়া কাপ জয় করে। যাহারা এই প্রতিযোগিতা খেলায় খেলোয়াড় ছিলেন তন্মধ্যে শচীন দত্ত বি, এ, হীরেন মজুমদার বি, এল, মনি দত্ত, সুরেশ বিশ্বাস বি, এ, বঙ্কু পোদ্দার, সুরেন স্বর্ণকার ও বলাই মিস্ত্রির নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখ যোগ্য। এই ক্লাব হইতে কয়েকটী ভাল খেলোয়াড় চলিয়া যাওয়ায় ক্লাবের কিঞ্চিৎ শক্তিহীন হইয়াছে। যথা কিরণ বিশ্বাস (কেনা), হরিপদ রায় বি, এ, ও সন্মথ দত্ত। অবশ্য সন্মথ দত্তের নাম আজকাল সকলেই সংবাদপত্রে দেখিয়া থাকিবেন। মোহনবাগান ক্লাবে খেলিয়া খেলায় বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইয়া ইনি সর্ব্বত্রই এস, দত্ত বলিয়া পরিচিত। এই সম্পর্কে শচীন দত্তেরও নামোল্লেখ প্রয়োজন। ইনিও ল'কলেজে এস, দত্ত বলিয়া সুপরিচিত। শচীন দেশ-বিদেশে খেলিয়া খেলায় কৃতিত্ব দেখাইয়া



শ্রীযুক্ত কাশীনাথ সরকার।

পৃঃ ২৪৫

বহু মেডাল ও সুযশ অর্জ্জন করিয়াছেন। পূর্ব্বে বীরেন মজুমদার মুর্শিদাবাদে খেলিয়া এবং বর্ত্তমানে সম্মথ ও শচীন কলিকাতায় খেলিয়া লোহাগড়ার গৌরব বৃদ্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছেন। আমরা দিন দিন স্থানীয় খেলার প্রসার ও শ্রীবৃদ্ধি আশা করি।

এই ফুটবল খেলা ব্যতীত গ্রামের যুবক সমিতির উদ্যোগে এবং অনিলকুমার সরকারের তত্ত্বাবধানে সাধারণ পাঠাগারের প্রাঙ্গনে একটী ব্যায়ামাগার স্থাপিত হইয়াছে। এই স্থানে গ্রামের যুবকগণ নিয়মিতভাবে ব্যায়ামাভ্যাস ও তৎসঙ্গে কুস্তী, লাঠি ও মুগুর ভাজিয়া শরীরের উন্নতি সাধন করিয়া থাকেন। ইহা ব্যতীত স্কুলের ছাত্রদিগের জন্য সতন্ত্র লাঠিখেলার সুবন্দোবস্ত আছে।

সমাজ।

যে ধর্ম্ম মানবজাতির সর্ব্বপ্রকার অজ্ঞান ও অভিমানমূলক অশান্তি দূর করিয়া বিরাট বিশ্বমানব সমাজে প্রেমমৈত্রীময় শাশ্বত শান্তির প্রতিষ্ঠা করিয়া থাকে সেই ধর্ম্মই প্রকৃত হিন্দুধর্ম্ম। আর সেই ধর্ম্মের সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত যে প্রথা বা নিয়ম চিরাগত আচার ও সংস্কারবদ্ধ জাতিকে বাঁধা-ধরা আচার-বিচারের আভ্যন্তরিক অজ্ঞানতা, মলিনতা, বৈরীতা, বিদ্বেষ ও কলহসমূহের প্রবল পীড়ন হইতে রক্ষা করিয়া সমাজের উচ্চ নীচ ভেদজ্ঞান রহিত সমতা ও সমদৃষ্টির কিনারায় পৌছিয়া দিয়া জাতীয় জীবন গঠন করিয়া দেয়, সেই প্রথাই সমাজপ্রথা। মানবজাতির কল্যাণের জন্যই সমাজের সৃষ্টি। মানবজীবন সুখময় করিবার জন্যই এই সমাজ। সমাজ চিরকালই গতিশূন্য বিকাশবর্জ্জিত এবং কুসংস্কারে আচ্ছন্ন অচলায়তনরূপে বিরাজ করিতে পারে না। মানবের ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সমাজের উন্নতি ও আভ্যন্তরিক শিষ্টতা সাধন হয়, কিন্তু আভিজাত্যগর্ব্বী দাম্ভিক কুসংস্কারগ্রস্ত ব্যক্তিগণের অপরিনামদর্শিতায় সমাজ আজ গতিশূন্য।

অতীতের সঙ্গে তুলনা করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়, যে বর্ত্তমানে সমাজে সুশৃঙ্খলার অভাবে বিশৃঙ্খলা সর্ব্বত্রই পরিলক্ষিত হইতেছে। প্রতিঘরে আজ পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তির অভাব নাই, প্রত্যেকেই নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করিতে যত্নবান, কেহ কাহারও প্রাধান্য স্বীকার

বা অনুশাসন মানিয়া লইতে চাহে না। সমাজনীতিতে যাহারা অনভিজ্ঞ তাহাদের দাম্ভিকতা ও অর্ব্বাচীনতার ফলে সমাজের এই ঘোর পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইতেছে। শ্রেষ্ঠত্ব অভিলাষের উন্মাদনায় আজ কিনা ছোট-বড় জ্ঞান নাই, উচ্চ-নীচ ভেদ নাই, আত্মমর্য্যাদা রক্ষার ক্ষমতা নাই—আছে শুধু সম্মানীকে অসম্মান করা।

পূর্ব্বে যাঁহারা সমাজের নেতৃ-স্থানীয় ছিলেন তাঁহারা পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত না হইলেও সমাজনীতিতে তাঁহাদের যথেষ্ট অভিজ্ঞতা ছিল। তাঁহারা বৈধভাবে সমাজ অনুশাসনের দ্বারাই সর্ব্বপ্রকার অন্যায়-অত্যাচারের প্রবল পীড়ন হইতে গ্রামবাসীকে রক্ষা করিয়াছেন।

পূর্ব্বে লোহাগড়া গ্রামে ৺দুর্গাচরণ চক্রবর্ত্তী, ৺তারিণীচরণ মুখোপাধ্যায়, ৺মধুসূদন ভট্টাচার্য্য, ৺সত্যমন্ত সরকার, ৺হরানন্দ দাস, ৺তারাপ্রসন্ন মজুমদার, ৺প্রহ্লাদচন্দ্র সরকার, ৺গিরিধর রায়, ৺রামচাঁদ দাস, ৺বিশ্বনাথ সরকার, ৺পঞ্চানন সাহা, ৺হারানচন্দ্র সাহা, ৺গোবিন্দচন্দ্র সাহা প্রভৃতি ব্যক্তিগণ স্ব স্ব সমাজে বহুকাল নেতৃত্ব করিয়া গিয়াছেন। তৎকালে তাহাদের সম্মুখে কেহই দাম্ভিকতার পরিচয় দিতে সাহসী হইত না। সকলেই তাহাদিগকে ভয় ও ভক্তি করিত। বর্ত্তমানে যাঁহারা সমাজের শীর্ষস্থানীয় এবং সমাজশাসনের উপযুক্ত—তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই পল্লীর কথা বিস্মৃত হইয়া সহরের সুখময় ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। দুএকজন সঙ্গতিসম্পন্ন ও সমাজনীতিতে বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান, পল্লীশ্রীর মায়া যাঁহারা পরিত্যাগ করিয়া সহরের সুখভোগে আকৃষ্ট হন নাই, তাঁহাদের অনুশাসন গ্রামের অনভিজ্ঞ, দাম্ভিক অর্ব্বাচীনের নিকট অগ্রহনীয়। কালের গতিতে সর্ব্বত্রই এই ঘোর পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইতেছে।

আজকাল সর্ব্বত্রই জাতিতে জাতিতে এক মহাসংঘর্ষ উপস্থিত। পরস্পর পরস্পরের বিরুদ্ধে ঈর্ষা, দ্বেষ পোষণ করিয়া সামাজিক অশান্তি সৃষ্টি করিতেছে। বৈদ্য, কায়স্থ ও বৈশ্য শ্রেণীভুক্ত সম্প্রদায়ের উপবীত গ্রহণ ও অশৌচ পালনই এই সামাজিক বিপ্লবের কারণ বলিয়া ধরা যাইতে পারে। বৈদ্যজাতি আজ ব্রাহ্মণত্বের দাবী করিতেছেন, কায়স্থ উপবীত গ্রহণ করিয়া ব্রাহ্মণের ন্যায় অশৌচরীতি পালনে উদ্যত আর বৈশ্যান্তর্গত বিভিন্ন সম্প্রদায় অল্পবিস্তর উপবীত গ্রহণে অগ্রসর।

লোহাগড়া গ্রামে বহুকাল হইতে কোন বৈশ্য বা কায়স্থ জাতির বসবাস দৃষ্ট হয় না। এখানে ব্রাহ্মণ, বৈশ্যবারুজীবি, তিলি, সুবর্ণবণিক, সাহা, কর্ম্মকার, কুম্ভকার, মালাকার প্রভৃতি সম্প্রদায় বাস করেন। কি শিক্ষা, কি আর্থিক বল সর্ব্ববিষয়েই বৈশ্যবারুজীবি জাতি অগ্রণী ও সর্ব্বাপেক্ষা উন্নত। অবশ্য আজকালও ব্রাহ্মণগণ নিজেদের আভিজাত্যের গর্ব্ব করিয়া থাকেন। কি বৈশ্য—কি কায়স্থ—কি বৈশ্যবারুজীবি কাহাকেও তাহারা শূদ্র আখ্যা দিয়া শ্লেষ করিতে দ্বিধা বোধ করেন না। আভিজাত্যের কিছুই না থাকিলেও ব্রাহ্মণ-বংশধর বলিয়া সমাজের উপর নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপন করিয়া ব্রাহ্মণত্বের গৌরব ও মহিমা প্রকাশ করিতে সর্ব্বদাই অভিলাষী।

আজ সমাজের সর্ব্বশ্রেণীর উপবীতের ঢেউ অন্যান্য গ্রামের ন্যায় লোহাগড়ায় আসিয়া পৌছিয়াছে। লোহাগড়ায় বৈশ্যবারুজীবি জাতির উপবীত গ্রহণে ব্রাহ্মণ-সমাজে কোন আন্দোলন বা গোলযোগ দৃষ্ট হয় নাই। ইহারা পূর্ব্বের ন্যায় অশৌচরীতি পালন করিতেছেন বলিয়া বৈশ্য বা কায়স্থ সম্প্রদায়ের ন্যায় ব্রাহ্মণের সহিত ইহাদেরও তুমুল সংঘর্ষ ঘটিবার অবকাশ হয় নাই। সন ১৩২৬ সালে লোহাগড়া গ্রামে বারুজীবি জাতির প্রথম উপবীত সংস্কার হয়। প্রায় শতাধিক বারুজীবি সন্তান উপবীত গ্রহণ করেন। এই কার্য্যে গ্রামের ব্রাহ্মণগণ প্রকাশ্যে যোগদান না করিলেও, কোনরূপ বাধা প্রদান করেন নাই। পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য স্বামী শ্রীশ্রীবিষ্ণুতীর্থ ও বেদান্তবাচস্পতি যদুনাথ এই কার্য্যে আচার্য্যপদ গ্রহণ করিয়া উপনয়ন কার্য্য সুসম্পন্ন করেন। বৈশ্যবারুজীবি জাতির মধ্যে লোহাগড়াই উপবীত গ্রহণে অগ্রণী। ক্রমে ক্রমে বর্ত্তমানে যশোহর, খুলনা, ফরিদপুর, ঢাকা, নওয়াখালি প্রভৃতি জেলার গ্রামসমূহে উহা প্রসার লাভ করিয়াছে।

লোহাগড়ার বৈশ্যবারুজীবি সমাজ চিরকালই উন্নত। ইহাদের শিক্ষা-দীক্ষা, আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতিতে স্থানীয় নলদী ব্রাহ্মণসমাজ আকৃষ্ট ও বহুকাল হইতে সামাজিক বন্ধনে আবদ্ধ। বৈশ্যবারুজীবি জাতি সনাতন হিন্দুসমাজের একটী শাখা। ব্রাহ্মণ্য সংস্কারের দ্বারাই অনুপ্রাণিত হইয়া গায়ত্রী সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা ইঁহারা মানিয়া লইয়াছেন। গায়ত্রী মন্ত্র—জ্ঞানমন্ত্র, জ্ঞান শক্তিকে

উজ্জীবিত করিয়া তোলে ও আমাদের সূক্ষ্ম শক্তিকে জাগরিত করিয়া অন্তর্নিহিত ইচ্ছাশক্তি, জ্ঞানশক্তি ও কর্ম্মশক্তিকে আশাতীতরূপে প্রস্ফুটিত করিয়া দেয়। দ্বিজাতির আচারের ভিতর গায়ত্রী গ্রহণই প্রধান। কিন্তু এ জাতি গায়ত্রী উপাসনা করিয়া থাকেন। শিক্ষা-দীক্ষা, আচার-বিচার, রীতি-নীতিতে সমতুল্য হইলেও ব্রাহ্মণত্বের দাবী না করিতে পারেন তথাপি এজাতি ব্রাহ্মণ্য সংস্কার ভাবাপন্ন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। শক্তি যদি অন্তরে প্রবাহিত হয় তবে কে তাহাকে রুদ্ধ করিতে পারে? লোহাগড়া বৈশ্যবারুজীবি সমাজের কীর্ত্তিকলাপ, বৈদিক ক্রিয়াকর্ম্ম সমগ্র বঙ্গে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের নিকট অবিদিত নহে।

লোহাগড়া বারুজীবি সমাজের সহিত যশোহর, খুলনা, নদীয়া ও চব্বিশ-পরগণার যে সমস্ত বারুজীবি বংশ বিবাহাদি সূত্রে বিশেষভাবে আবদ্ধ তন্মধ্যে দশানির বিশ্বাস ও দাস; দৈবজ্ঞহাটীর বিশ্বাস; করগুীর সরকার; আলামপুরের কুণ্ডু ও সরকার; কচুবাড়িয়ার দাস ও সমাদ্দার; সিদ্ধিপাশার ভদ্র ও দাস; বারাকপুরের বিশ্বাস; চন্দনীমহালের ভৌমিক; খালিস্পুরের দাস ও দত্ত; দামোদর, মানসা ও মুলটির সেন প্রভৃতি বংশগুলির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

সেকাল ও একাল।

প্রাচীন সময় হইতে দেখিতে পাই যে লোহাগড়া প্রায় চতুর্দ্দিকেই বড় বড় নদী যথা মধুমতী, নবগঙ্গা, বানকানা প্রভৃতির দ্বারা পরিবেষ্টিত। সেকালে এই সমস্ত নদীতে বারমাসই প্রচুর পরিমাণে মৎস্য পাওয়া যাইত। বর্ষাকালে গ্রামের চতুর্দ্দিক জলাকীর্ণ হইয়া যাইত। তখন আমাদের গ্রামের ভিন্ন ভিন্ন পল্লী বা পাড়া এক একটি ছোট দ্বীপে পরিণত হইত। একপাড়া হইতে অন্য পাড়ায় নৌকাযোগে যাতায়াত করা ভিন্ন গত্যন্তর ছিল না। একারণ প্রতিপাড়ায় গৃহস্থদের ডিঙ্গীর ব্যবস্থা থাকিত। বর্ষার জল নামিয়া গেলে চারিদিকে ডোবা গর্ত্তেও বিস্তর মাছ পাওয়া যাইত। অবশ্য সেকালের তুলনায় একালে রাস্তা ঘাটের প্রাচুর্য্যে সাধারণের পক্ষে গমনাগমন বিশেষ সুবিধাজনক ও সহজসাধ্য হইয়াছে। সেকালে আমাদের গ্রামে গৃহস্থদের দুধ-ঘি-মাখন বড় একটা কিনিয়া খাইতে হইত না কারণ প্রতি ঘরে ঘরে গরু থাকিত। এই গরু যে দুধ দিত তাহাতেই ঘৃত, মাখন ও নানাবিধ খাদ্য

প্রস্তুত হইত। ধান চাউল খুব সস্তা ছিল। তখনকার দিনে এক টাকার ধান খরিদ করিলে তাহা সমস্ত দিন বহিয়া লওয়া যাইত না। ১০০।১২৫ বৎসর পূর্ব্বেও লোহাগড়া গ্রামে ১৲ টাকায় ৬০ পৈকা অর্থাৎ দশ-বার মণ ধান্য পাওয়া যাইত। এসময় ১০০/ মণ কলিচুণের মূল্য ছিল ২৫৲ টাকা বর্ত্তমানে যাহার মূল্য ১০০৲ টাকা। ৭০।৭৫ বৎসর পূর্ব্বেও ১৲ টাকায় ৪।৫ মণ ধান্য মিলিত, দুধ প্রতি সের পয়সা পয়সা, উৎকৃষ্ট গব্য ঘৃত /১ সের দু আনা দশ পয়সা, ইলিশ মৎস্তের হালি (৪) চার পাঁচ পয়সা; বর্ত্তমানে দুধ প্রতি সের দুআনা-দশপয়সা, গব্য ঘৃত একরূপ দুষ্প্রাপ্য বলিলেও চলে; আর ইলিশ মৎস্তের এক একটির মূল্য আট দশ আনা।

সেকালে প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থাকে সকল বর্ণের লোকই বিনা ওজর আপত্তিতে মানিয়া লইতেন। ব্রাহ্মণেরা ব্রাহ্মণত্বের অভিমান কখনও করিতেন না। কাজেই ইঁহাদিগকে প্রণাম করিয়া ইঁহাদের পদধূলি গ্রহণ করিতেও কখনও অন্য বর্ণের লোকের কোন দ্বিধা বোধ হইত না। যাঁহাদের জল চলিত না, তাঁহারা সেজন্য কোন দুঃখ করিতেন না। আর জল চল নহে বলিয়া অন্য বর্ণের লোকেরাও ইহাদিগকে কোনরূপ অমর্য্যাদা বা ঘৃণা করিতেন না। আমাদের গ্রামে ৫০ বৎসর পূর্ব্বেও দলাদলি ছিল শুনিতে পাই। রায় বাহাদুর যদুনাথই কৃতবিদ্য হইয়া সমস্ত দলাদলির মীমাংসা করিয়া শান্তি স্থাপন করেন। শুনিতে পাই প্রাচীনকালে বয়োজ্যেষ্ঠদের নাম ধরিয়া কেহ ডাকিতে পারিত না। অতি নিম্নশ্রেণীর প্রতিবেশী বা ভৃত্যদের সঙ্গেও সম্বন্ধ পাতাইয়া দাদা-কাকা-মামা ইত্যাদি বলিয়া সম্বোধন করিতে হইত। বর্ত্তমানে সেদিন আর নাই। আজকাল সর্ব্বত্রই ভদ্র হিন্দু সমাজে আহার-বিহারে জাতি বিচার উঠিয়া গিয়াছে বলিলেও চলে। আমাদের অঞ্চলে সেকাল-একালে এ বিষয়ে এতটা উদারতা দেখা যায় নাই। তবে বর্ত্তমানে কালের আবহাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমাজে অনেকটা সরলতা দেখা যায়।

সেকাল-একালে বৈশাখ মাসের প্রারম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত 'বৌ শস্ত কোটু' পাখীর রবে গ্রাম কানন মুখরিত হইতে থাকে। আর ঐ সুমধুর রব পুরনারীর কর্ণকুহরে 'কাসুন্দি' বা কাসুন প্রস্তুত করিবার সময় আগত একথা স্মরণ করাইয়া দেয়। শুভ বৈশাখের প্রথমেই পুরস্ত্রীরা বিশুদ্ধ হইয়া ঢেঁকিতে রাই বা সরিষা চূর্ণ করিয়া সিদ্ধ গরম জলে উহা মিশ্রিত করেন পরে নুন হলুদ ও

সর্ব্বপ্রকার মসল্লাদি সংযোগে উহা এক অপূর্ব্ব আস্বাদের বস্তু প্রস্তুত হয়। আমাদের গ্রামে সেকাল একালে এই কাসুন্দি তৈয়ারী শুধু মেয়েদের একটি আমোদের পর্ব্ব নহে, ধর্ম্ম-কর্ম্মের অঙ্গ বলিয়া ও বিবেচিত হয়। এই বৈশাখ মাসে সেকালে আমাদের গ্রামে বৃদ্ধেরা ব্রাহ্মণ ভোজনের ব্যবস্থাও করিয়া যান। দত্ত-মজুমদার, রায়-সরকার প্রভৃতি বাড়ীতেই ১লা বৈশাখ হইতে ৩০শে বৈশাখ পর্য্যন্ত নিত্য একজন করিয়া ব্রাহ্মণ ভোজন হইত, কাজেই বৈশাখী ব্রাহ্মণ পাওয়া বড়ই দুর্লভ ছিল। অতি অল্পদিনের কথা আমরাও এ. ব্রাহ্মণ ভোজন দেখিয়া আসিয়াছি। কালের বিচিত্র গতি তাই হিন্দু সমাজ হইতে এ সব প্রথা ক্রমে ক্রমে উঠিয়া যাইতেছে। জ্যৈষ্ঠ মাসে আমোৎসর্গ—সেকালে ঘরে ঘরে ৺শ্রীশ্রীলক্ষ্মীনারায়ণকে ও পিতৃপুরুষদের উদ্দেশ্যে নিবেদন না করিয়া পাকা আম কেহ ভক্ষণ করিতেন না। সুপক্ক আম্র ও দুগ্ধ একত্রে গৃহস্বামী পুরোহিত দ্বারা মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক নিবেদন করিতেন। হিন্দুর যে কোন কার্য্য ধর্ম্মের সহিত মিশ্রিত এবং ধর্ম্মের উদ্দেশ্যেই সাংসারিক অধিকাংশ কার্য্য সম্পন্ন হইত। একালে আর উহার অস্তিত্ব নাই। কালের বিচিত্র গতিতে যুগধর্ম্ম পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্য শিক্ষার বাহুল্যে এ সমস্ত ক্রিয়া কলাপ লোপ হইয়া গিয়াছে। এই জ্যৈষ্ঠ মাসে জামাই ষষ্ঠী। জামাই এর উদ্দেশ্যে বারপ্রকার ফল দ্বারা ষষ্ঠী দেবীর পূজা হয়। শুধু জামাই এর চিত্ত বিনোদনের জন্যই এই উৎসবে জামাইকে গৃহে আনিয়া ধুতি-চাদর ও খাদ্যসামগ্রীর দ্বারা তাহাকে আপ্যায়িত করিবার যে বিধি ছিল তাহা একালে নাই বলিলেও চলে।

আষাঢ় মাসে রথযাত্রা। সেকালে (প্রায় ২০০ শত বৎসর পূর্ব্বের কথা) অনুমান ১১৪০ সালে লোহাগড়ায় রথ প্রতিষ্ঠা হয়। রায় বংশোদ্ভব ধর্ম্মপ্রাণ ৺বিদ্যাধর রায় বর্দ্ধমান রাজ সরকার হইতে সুন্দর ৺জগন্নাথ মূর্ত্তি আনয়ন করিয়া স্বীয় আলয়ে উহা প্রতিষ্ঠা করেন। আজও সেই স্বর্গীয় কীর্ত্তিমান পুরুষের পুণ্যকীর্ত্তি লোহাগড়া ও পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম সমুহের সেকাল একালের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলকেই এক অভিনব আনন্দ ধারায় আপ্লুত করিয়া আসিতেছে। রথ টান হইবার সময় গিরিধর রোডে এক বিরাট লোক. সমাগম হয়। স্ত্রী-পুরুষ সকলেই অসঙ্কোচে এই আনন্দোৎসবে যোগদান করেন। এই রথযাত্রা উপলক্ষে আড়ং (মেলা) বসিবার নির্দ্দিষ্ট স্থান অদ্যাবধি 'রথ খোলা'

বলিয়া অভিহিত হইতেছে। বহু দূরদেশ হইতে লোকে নানাপ্রকার দ্রব্যাদি বিক্রয়ার্থে এই রথের মেলায় আসিয়া থাকে। আমাদের অঞ্চলে ঝাকা, ধামা, ডালা, কুলা, চালন, ঝাঝর-তস্থা (মুড়ি ভাজিবার যন্ত্র) প্রভৃতি সাংসারিক প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি কিনিবার প্রশস্ত সময়ই এই রথের মেলা। বরিশাল, ঢাকা জেলা হইতেও অনেক কারিকর কুম্ভকার নানাপ্রকার খেলনা ও পুতুল লইয়া রথ উপলক্ষে লোহাগড়া আসিয়া থাকেন। সেকালের প্রাচীনদের পক্ষে যে শুধু 'রথেচু বামনং দৃষ্ট্বা পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে' কথা প্রযোজ্য তাহা নহে, একালেও তাহার প্রমাণ অবশ্য পুরীর রথ যাত্রী হইতে পাওয়া যায়। যশোহর জেলায় সেকাল একালে নড়াইলের ৺রামরতন রায় জমিদার মহাশয়ের রথ আর লোহাগড়ার স্বনামধন্য ৺বিদ্যাধর রায় প্রতিষ্ঠিত দানবীর ৺গিরিধর রায় মহাশয়ের রথ প্রসিদ্ধ বলিয়া খ্যাতি আছে। এই রথ উপলক্ষে ৺গিরিধর রায় মহাশয়ের বাটীতে গ্রামশুদ্ধ লোক নিমন্ত্রণ খাইতেন ও ব্রাহ্মণ ভোজন হইত। বহুদূর দেশ হইতে বহু ব্রাহ্মণ আসিয়া ভোজন করিয়া ১৲ টাকা দক্ষিণা লইয়া রথের আড়ং করিয়া গৃহে ফিরিতেন।

শ্রাবণ সংক্রান্তিতে ৺মনসা পূজা। আমাদের দেশীয় প্রচলিত কথায় ইহাকে 'ঘটপূজা' বলা হইয়া থাকে। এই 'ঘটপূজা' উপলক্ষে সেকালে একালে আমাদের গ্রামে মেয়ে মহলে 'ছাতু নেড়াই' প্রভৃতি খাদ্য সামগ্রী প্রস্তুত হয় ও মা মনসাকে নিবেদন করিয়া সকলে প্রসাদ ভক্ষণ করেন। পূর্ব্বে আমাদের গ্রামে মনসাপূজার কিরূপ প্রাদুর্ভাব ছিল তাহা জানিনা তবে ৺বিপিনচন্দ্র সাহার বাড়ী যেখানে বর্ত্তমানে সীতানাথ ভট্টাচার্য্য বাড়ী প্রস্তুত করিয়াছেন ঐ বাটীতে খুব জাঁক জমকের সহিত মূর্ত্তি গড়াইয়া মনসা পূজা হইত এবং পাঠা বলি পড়িত। বর্ত্তমানে মনসার মূর্ত্তি গড়িয়া পূজা বড় দেখা যায় না। সকলেই 'ঘটে' পূজা করেন। ঐ ঘটে মা মনসার মূর্ত্তি আঁকা, সম্মুখে বিস্তৃত ফণা সাপ তাঁহার বাহন।

সেকালে ভাদ্র মাসে ৺বিশ্বকর্ম্মা পূজার দিনের আমোদ-প্রমোদ, নৌকা বাইচ প্রভৃতি স্মরণ করিলে একালে আমাদের স্বপ্ন বলিয়া মনে হয়। এই ভাদ্র মাসে জন্মাষ্টমী ব্রতোৎসবে পুরনারীরা উপবাস করিয়া ব্রতচারিণী থাকিতেন এবং পূজান্তে শ্রীভগবানের জন্ম কথা শ্রবণ করিয়া নিজেরা ধন্যা হইতেন। একালে অনেকেই প্রকৃত কর্ম্মে অবহেলা করিয়া তাল-বড়া

(কলিকাতা বাসী যাহাকে ফ্লুরী বলিয়া থাকেন) লইয়াই ব্যস্ত থাকেন। জন্মাষ্টমীর দিনে লোহাগড়া ও কালনা আখড়ার বৈরাগীরা একত্রে মিলিত হইয়া বাড়ী বাড়ী সংকীর্ত্তন ও শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মন্দিরের সম্মুখে মহা-সমারোহের সহিত কাদামাটী খেলা করিতেন এবং বহুলোক তথায় উপস্থিত থাকিয়া আমোদপ্রমোদ উপভোগ করিতেন।

সেকালের হিসাবে লোহাগড়ায় যথেষ্ট সমৃদ্ধি ছিল। ব্রাহ্মণ বাড়ী ভিন্ন দত্ত-মজুমদার, রায়-সরকার প্রতি বাড়ীতেই অদ্যাবধি তাহার প্রমাণ স্বরূপ নিত্য শালগ্রাম শিলা পূজা পাইয়া আসিতেছেন। ইহা ব্যতীত শারদীয়া পূজার সময়ও তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। যদিও পনর খানি পূজার স্থানে পাঁচ সাত খানি পূজায় পরিণত হইয়াছে তথাপি ২৫০ শত বৎসর পূর্ব্বের বার্ষিক দেবীপূজা বর্ত্তমানেও দত্ত-মজুমদার, রায়-সরকার বাটীতে অদ্যাবধি প্রচলিত আছে। আমাদের গ্রাম হইতে বিজয়ার দিনে অল্প বিস্তর সমারোহ সহকারে পনর খানি প্রতিমা বাহির হইত। প্রায় ঘরে ঘরে ৺শ্যামা পূজা হইত। ৺রামচাঁদ দাসের বাটী ও তপস্বী বাটীতে ৺জগদ্ধাত্রী পূজা হইত। দেল দোল যদিও আজকাল প্রচলিত আছে তথাপি পূর্ব্বের ন্যায় আমোদ-প্রমোদ নাই। সেকালে কোজাগর লক্ষ্মীপূজার রাত্রিতে চিড়া-মুড়ি-বাতাসা প্রভৃতি জলখাবারের ব্যবস্থা—একালে অসভ্যতার নিদর্শন বলিয়া সকলে মনে করেন।

এই সমস্ত পূজা পার্ব্বণে ভূরি ভোজনেরও সুব্যবস্থা ছিল। হয় ভাত না হয় চিড়া দধি খাওয়ানই পদ্ধতি ছিল এবং তাহাতেই সকলে পরিতৃপ্ত হইতেন। আজকাল লুচি মণ্ডা হইলেও আমাদের তৃপ্তি হয় না। সেকালে আমাদের দেশে সন্দেশ, রসগোল্লা মিলিত না। আত্মীয় কুটুম্ব বাড়ীতে আসিলে তাহাকে মুড়ি বাতাসা দিয়া যত্ন করা হইত। যাঁহারা একটু অবস্থাপন্ন ছিলেন তাঁহারা তৎসঙ্গে নারিকেলের চিড়া, জিরা, আতা, ক্ষীরশে প্রভৃতি দিতেন; অবশ্য এগুলি সেকালে ক্রিয়াকর্ম্মোপলক্ষে পূজাপার্ব্বণেই ব্যবহার হইত। সেকাল একালে আমাদের গ্রামে এ সকল গৃহে নির্ম্মিত মিষ্টান্নে সুনিপুণ স্ত্রী শিল্পের পরিচয় পাওয়া যায়। লোহাগড়ার নারিকেলের খাদ্য সামগ্রী আমাদের অঞ্চলে চিরকালই খ্যাত আছে। ইহা ব্যতীত একালে লোহাগড়ার গুড়ে-সন্দেশ যশোহর খুলনা জেলায় সর্ব্বত্রই প্রসিদ্ধ।

লোহাগড়া কাহিনী

লোহাগড়া গ্রামে দুর্গোৎসব পূজা, লক্ষ্মীপূজা, শ্যামাপূজা ও বিশ্বকর্ম্মা পূজায় দেশময় নৌকার বা'ছ খেলা হইত। এ সকল নৌকা ৭০।৮০ হাত লম্বা ও হালকা। ইহাকে ছিপ্ নৌকাও বলিত। ইহার গলুই অন্ততঃ ১০।১২ হাত করিয়া লম্বা, পিত্তল দিয়া মোড়াই করা। এ সকল নৌকাতে দুই সারিতে ৭০।৭৫ জন পাশাপাশি বসিয়া তালে তালে বৈঠা ফেলিয়া বাহিয়া চলিত তখন এ সকল নৌকা তীরের মত ছুটিত। নৌকা দৌড়ের সময় সারিগান হইত। প্রত্যেক নৌকাতে গলুই এ দাঁড়াইয়া সারিগানের মূল গায়ক গান ধরিত। প্রত্যেক সারিগানেই একটা মূল দোহা ছিল—সকলে সেটাই গাহিত। আর প্রত্যেক নৌকার সম্মুখ ভাগে হাটুগড়া দিয়া বসিয়া একজন করিয়া বাবড়ি চুলো লোক থাকিয়া নৌকার তাল রক্ষা করিত। ইহা হইতে আমরা বুঝিতে পারি যে এই সমস্ত পূজাপার্ব্বন, ভাসান ও নৌকা বা'ছ এ সকলের ভিতর দিয়া সেকালের আমাদের গ্রাম্য জীবন কত আনন্দ উল্লাসে কাটিত। এই সকল নৌকা যখন শ্রান্ত দেহে ভাটিয়াল সুরে—

"মনমাঝি তোর বৈঠা নেরে
আর তো বাইতে পারলাম না,
(আমি) সারা জীবন বাইলাম তরী
তবু কূলের নাগাল পালাম না
মন মাঝি তোর বৈঠা নেরে"

ইত্যাদি সারি গাহিতে গাহিতে বাড়ী ফিরিত তখন ঘাটে ঘাটে পুরস্ত্রীরা আসিয়া দাঁড়াইতেন ও আনন্দ উপভোগ করিতেন। দুর্গোৎসব, শ্যামাপূজা, লক্ষ্মীপূজা, বিশ্বকর্ম্মাপূজা হিন্দুদিগেরই পূজা। ভাসানের দিনে হিন্দু-মুসলমান সকলে মিলিয়া এই নৌকা বা'ছের আনন্দোৎসবে মাতিয়া যাইতেন। এই বা'ছ খেলায় কোন সাম্প্রদায়িক ভাব বা ভেদ ছিল না। হিন্দুর নৌকাতে মুসলমান, মুসলমানের নৌকাতে হিন্দু উঠিয়া বৈঠা ধরিতেন। একে অন্যকে নিজের আত্মীয়ের ন্যায় দেখিতেন। পাঠক পাঠিকার অবগতির জন্য আমাদের দেশের আরও দু একটি সারি গান নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

(১)

"মথুরার কৃষ্ণরাজা কাঙ্গালিনী হ'ল রাই
(ওগো) বৃন্দে বল দেখি আজ কোন পথে মথুরায় যাই।
তালবন তমাল বন ভাই, সকল বন আছে
বৃন্দাবনের বনমালী সেওতো ছেড়ে গেছে।
আঙ্গুল কাটিয়ে গো কলম বানাই
চক্ষের অঞ্জন দিয়ে লেখন পাঠাই (গো)।"

(২)

"কোন্ বনে বাজাও হে বাঁশী ও বাঁশী সহন না যায়,
জয় রাধা শ্রীরাধা বলে বাশরী বাজায় (গো)।
ঐ যে ঝাড়ের বাঁশী তুমি, তরল বাঁশের আগা,
(ওরে) বিনা ফুকে বাজে বাঁশী, বলে রাধা রাধা।"

(৩)

"তুমিনি আমার হে বঁধূ, আমি হে তোমার
তোমার জন্য গোকুলেতে কলঙ্ক রাধার।
ঐ উজান বাঁকে থাক বঁধূ, ভাটেল বাকে থানা,
ঐ চোখের দেখা মুখের কথা কে করেছে মানা (গো)।
হেথায় হোথায় থাক বঁধূ দাসীরে রেখো মনে
অভাগিনী দাসীর নামটী রোখা শ্রীচরণে।"

(৪)

"(ও) শ্রীরাম কেঁদে কয় আমার প্রাণ বিদরে যায়,
রঘুনাথ কয় কুশের বাণে প্রাণ হারালাম তপোবনে
ওরে আমার অযোধ্যার আর যাওয়া হ'ল না
ও শ্রীরাম························বিদরে যায়।
ওরে সীতে গেলি সীতে পাব নিত্যি ঘরে ঘরে
আজ প্রাণের ভাই লক্ষ্মণ মরলি ভাই বলিব কারে
ও শ্রীরাম কেঁদে····················বিদরে যায়।
কি ক্ষণে করিলাম যাত্রা ঘরে মরল পিতা
রণেতে হারালাম প্রাণের ভাই আর সীতা।"

৺শ্যামা পূজায় গ্রাম দীপান্বিত হইত। পুরস্ত্রীরা স্ব স্ব বাটিতে, পুষ্করিণীতে, কেহ কেহ বা নদীতে কলার ভেলায় দীপ দিয়া ভাসাইয়া দিতেন। এই কার্ত্তিক মাসে একমাস আকাশ-প্রদীপও দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। অনেকে বলেন যে আশ্বিন মাসে তর্পণান্তে পিতৃপুরুষকে আকাশ প্রদীপ সাহায্যে পথ প্রদর্শন করা হইত। (Homage to our forefathers)। ৺শ্যামা পূজার পূর্ব্ব দিন চতুর্দ্দশীতে চৌদ্দ দীপ দিবার ব্যবস্থা (To ward off evil spirits), ৺শ্যামা পূজার রাত্রিতে গৃহ দীপান্বিত করিবার ব্যবস্থা ও এই মাসব্যাপী আকাশ প্রদীপের ব্যবস্থা যিনি যে ভাবেই ব্যাখ্যা করুন না কেন আমার মনে হয় যে ঐ সময় (কার্ত্তিক মাসে) পোকার প্রাদুর্ভাব হয় এবং ঐ পোকা বিনষ্ট করিবার জন্যই এই সমস্ত দীপান্বিত করার ব্যবস্থা চলিয়া আসিতেছে। ৩০শে আশ্বিন আমাদের দেশময় আর এক পরব ছিল তাহার নাম গার্শ্বি। এ সময় নূতন হিম পড়িতে থাকে। সর্দ্দি কাশি হইতে নিস্তার লাভের জন্য পুরবাসী সকলেই গার্শ্বির রাত্রিতে নিদ্রা হইতে উঠিয়া হলুদ, তেল, কজ্জল, তেঁতুল, ঘৃত প্রভৃতি তৈলাক্ত দ্রব্য ব্যবহার করিতেন। হাতে পায়ে ঐ সমস্ত তৈলাক্ত দ্রব্য মর্দ্দন করিবার বিধি ছিল কেননা শীতের সময় মুখ, ঠোঁট, হাত, পা ফাটিবে না তাই পূর্ব্ব হইতে সাবধানতার জন্যই এই পরব। গার্শ্বির পর দিন গ্রাম্য যুবকেরা একত্রে মিলিত হইয়া কুস্তী, গোল্লাছুট, হাডুডু প্রভৃতি খেলা করিয়া আমোদ প্রমোদ করিতেন। ৺শ্যামা পূজার পর দ্বিতীয়াতে আর এক আমোদ ভ্রাতৃদ্বিতীয়া। যদিও সেকালের তুলনায় একালে অনেকটা হ্রাস হইয়াছে তথাপি ভ্রাতৃদ্বিতীয়া হিন্দু গৃহে একটি মঙ্গলসূচক পরব। প্রতি গৃহে ভগ্নীগণ ভ্রাতাদিগের ললাটে চন্দন ও মস্তকে ধান দুর্ব্বা দিয়া শুভ কামনা করেন। আমাদের গ্রামে ভগ্নীগণ "ভাইএর কপালে দিয়ে ফোঁটা যমের দুয়ারে দিলাম কাঁটা" উচ্চারণ পূর্ব্বক বাম হস্তের কড়ে অঙ্গুলি দ্বারা ললাটে চন্দনের ফোঁটা দিয়া থাকেন।

সেকালে আমাদের গ্রামে প্রাচীনগণ মূর্ত্তি রচনা করিয়া রাসলীলা করিতেন। রাসের এক অপূর্ব্ব দৃশ্য ছিল। একালে একরূপ উঠিয়া গিয়াছে বলিলেও চলে। দত্ত-মজুমদার বাটীতে শ্রীশ্রীকৃষ্ণের ঝুলনযাত্রা ও কুঞ্জযাত্রাতে খুব আমোদ-প্রমোদ হইত। অধিকারী ঠাকুরের বাটীর রাস, উত্তম সাহার বাটীর রাস—সে সব দিন আর নাই। ৩০শে কার্ত্তিক কার্ত্তিক পূজার ও খুব ধুমধাম

পড়িত, অবশ্য এটা একালেও কিছু কিছু সাহাদিগের বাটীতে দেখা যায়। কার্ত্তিক ঠাকুরের নৈবেদ্যের উপর ক্ষিরশে ও সিঙ্গে সাচের ছড়াছড়ি পড়িয়া যায়।

এই কার্ত্তিক মাসে আমাদের গ্রামে একমাস ধরিয়া প্রভাতী সঙ্গীতের প্রচলন দেখিতে পাই। ভোরের বেলায় যখন গোপাল দাস বৈরাগী প্রতি ঘরের কোণ দিয়া প্রভাতী সুরে প্রাণ মাতাইয়া—

"ভোর বেলায় যশোমতী বোলাওয়ে
উঠতো নন্দ লালাজী
উঠত লালা মদন গোপালা
সঙ্গে লয়ে ব্রজবালাজী
কেহ কেহ উঠত কেহ মুখ ধোয়ত
কেহ কেহ যমুনা পানে ধাওজী" ইত্যাদি

গাহিতে গাহিতে টহল দিয়া গ্রামবাসিগণের 'তন্দ্রাজড়িতঅলস শ্রবণে' সুমধুর সঙ্গীতধারা বর্ষণ করিয়া নবজাগরণের পুলক শিহরণ আনিয়া দিত। সেকালে লোহাগড়া গ্রামে পূজাপার্ব্বন উপলক্ষে বিশেষতঃ বড় বড় শ্রাদ্ধোপলক্ষে ভাট ব্রাহ্মণ আগমন করিতেন। ভাটের কর্ম্মই ছিল গুণকীর্ত্তন করিয়া বেড়ান। সাধারণতঃ দেশ-কাল-পাত্রানুযায়ী ছড়া প্রস্তুত করিয়া দেশে দেশে উহা কীর্ত্তন করিয়া বেড়াইতেন। একালে ভাট কচিৎ দৃষ্ট হইয়া থাকে। হয় ৺শারদীয়া পূজা উপলক্ষে বা বিশেষ কোন বড়-শ্রাদ্ধ উপলক্ষে ভাট আসিয়া সভায় বসিয়া গৃহস্বামীর গুণ-কীর্ত্তন করিয়া বার্ষিক প্রাপ্য লইয়াই প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

অগ্রহায়ণ মাসে নবান্নোৎসব। নূতন ধান্যে নবান্ন হইত। নূতন ধানের চাউল করিয়া তাহার গুঁড়া কুটিয়া পল্লী মহিলারা ডাবের জল, গুড়, আদা, নারিকেল ও কলার দ্বারা মিশ্রিত করিয়া এক সুস্বাদু খাদ্য প্রস্তুত করিতেন। পরে ভগবানকে নিবেদন করিয়া সকলেই নূতন ধান্য ব্যবহার করিতেন। এপ্রথা বর্ত্তমানও প্রচলিত আছে।

পৌষের সংক্রান্তিতে (পৌষপার্ব্বন) বড্ড ধুমধাম পড়িয়া যাইত। বৃদ্ধেরা অনেকেই সংক্রান্তির দিনে ব্রাহ্মণদিগকে গুড়দান করিতেন। এই পদ্ধতি বর্ত্তমানেও আমরা দত্ত-মজুমদার, রায়-সরকার বাটীতে দেখিতে পাই।

সেকাল-একালে আমাদের গ্রামে 'কাঁচি খোচা' 'আন্দশা' 'পাটিসাপ্টা' 'কুলি' 'মুখসামালি' 'চুসি' 'দোলো' 'রাঁধাপিঠা' প্রভৃতির প্রচলন দেখা যায়। একালে 'বকুল পিঠা' প্রভৃতি পিঠা পায়শের সৃষ্টি হইয়াছে। এই পৌষ সংক্রান্তির সাত দিন পূর্ব্ব হইতে আমাদের গ্রামে 'হুলই' গানের ধুম পড়িত; এখনও পড়িয়া থাকে। সন্ধ্যার পর পাড়ায় পাড়ায় চারিদিকেই হুলই গানের রব শুনা যায়।

(ওরে) "শুন সবে ভক্তি ভাবে করি নিবেদন
রাধাকৃষ্ণ লীলার কেস্তা শুন দিয়ে মন।
(ওরে) পার কর পার কর কানাই বেলার দিক চেয়ে
দই দুধ নষ্ট হ'ল নিশি যায় পোহায়ে।
(ওরে) তুমি ত সুন্দর কানাই তোমার ভাঙ্গা নাও
কোথায় থোব দুধের বাসন কোথায় থোব পাও।
(ওরে) আগা যেতে থোওগে বাসন গুরো যেতে বস
ছেওচ্ ভ'রে ফেল জল লজ্জা কিসের কর।
(ওরে) তুমি ত সুন্দর কানাই আমি তোমার মামী
কোন সম্বন্ধে কর চাতুরী বুঝিতে না পারি।
(ওরে) মধ্যগাঙ্গে যেয়ে কানাই নৌকায় দেন ঝাঁকি
রাধিকার প্রাণ গেল উড়ে না'র ভাঙ্গিল মধ্যি।
(ওরে) নায় দিব জোড় পাঠা গঙ্গায় দিব ফুল
তোমার সঙ্গে ক'রবো প্রেম ধরায়ে দেও কুল"।
(ওরে) "শুন সবে ভক্তিভাবে করি নিবেদন
শ্রীরাম অবতারের কথা করহে শ্রবণ।
(ওরে) কাল হবে রামরাজা আজ অধিবাস
কেকৈ মন্ত্রনা ক'রে রামে দিলেন বনবাস।
(ওরে) মা জানকী বলেন প্রভু আমি তোমার দাসী
তোমার সঙ্গে আমি এখন হব বনবাসী।
(ওরে) তুমি আর আমি যাব সঙ্গে দেবর লক্ষণ
পঞ্চবটী বনে যাইয়া দিলেন দরশন।

(ওরে) পঞ্চবটী বন হইল ফুলের শয্যা

* * * * *

(ওরে) মায়ামৃগ রথখানি সাজালেন রাবণ
এই মৃগ ধরে দেও ঠাকুর লক্ষ্মণ।
(ওরে) তাহা শুনি রামরাজা ধনুক জুড়িলেন
যা যা বলে মায়ামৃগ ধাওয়াইয়া নিলেন।
(ওরে) রাবণ এসে যোগীর বেশে ভিখ দাও বলিলেন
হাতে হাতে দিতে ভিক্ষা কুণ্ডলীর বাহির নিলেন।
(ওরে) অতি কৌশলে রাবণ রাজা সীতা হরণ করিলেন
রাম রাম ব'লে সীতাদেবী কান্দিতে লাগিলেন।
(ওরে) রামের ভক্ত জটায়ু ছিল তাই যুদ্ধ আরম্ভ হইল,
খরসান্‌বানে জটায়ুর পাখা কাটিয়া দিল,
(ওরে) রাম রাম বলে তখন জটায়ু ভূমিতে পড়িল ॥"

মুসলমান, নমঃশূদ্র, বেহারা, ধোপী ও সর্দার রা দলে দলে সাতদিন এই গান করিয়া থাকেন আর সঙ্গে সঙ্গে চাউল ও পয়সা সংগ্রহ করেন। সংক্রান্তির দিনে কি হিন্দু কি মুসলমান সকলেই বাস্তু পূজা করিয়া আমোদ-প্রমোদে উৎসব কাটাইয়া থাকেন। এই শীতকাল ধরিয়া প্রধানতঃ পৌষ মাসে সেকাল-একালে লোহাগড়ায় ৺সত্যনারায়ণ ও শনির পূজা করিয়া পাকাসিন্নি ও কাঁচাসিন্নি দিয়া থাকেন। এই কাঁচাসিন্নি রস, দুধ, কলা, চাউলের গুড়া বা আটা, ময়দা ও গুড় প্রভৃতির দ্বারা প্রস্তুত হয়। ইহা খাইতে বড়ই সুস্বাদু। পল্লীগ্রামে ইহা একটি লোভনীয় উৎসব। অবশেষে প্রতি পাড়ায় বন ভোজনের যে পদ্ধতি ছিল তাহাও আজ লোপ হইতে বসিয়াছে।

মাঘমাসের শুক্লা পঞ্চমীতে শ্রীশ্রীসরস্বতী পূজা। "এই সময়ে প্রকৃতি জড়তা পরিহার করিয়া বসন্তের মৃদুচাঞ্চল্যে স্পন্দিত হইতেছে। হিমান্তে কোকিল পঞ্চমে কুহুতানে শীতের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া বনভূমিকে মধুরতানে মুখরিত করিতেছে। ধরণীতে আজ পরিবর্ত্তনের চিহ্ন প্রকাশমান। বৃক্ষ শাখায় নব নব কিশলয় উদ্গত, চূতবৃক্ষ মুকুলিত, যবোষধি শীর্ষশোভিত। শীতের ধ্বংসলীলা শেষ হইয়াছে, আবার বসন্তের সৃষ্টির লীলা আরব্ধ

হইয়াছে। ইহাই সরস্বতী পূজার অনুকূল সময়। শ্রী বলিলে শুধু সৌন্দর্য্য বুঝায় না। শ্রী, হ্রী, তুষ্টি, পুষ্টি। শ্রী জ্ঞানের প্রতীক—তাই শুভ্র বর্ণা কুন্দধবলা প্রস্ফুটিত শতদল বক্ষে চরণ রাখিয়া অমলধবল জ্যোতি বিকীরণ করিয়া যিনি আবির্ভূতা হন, তিনিই বাণী বীণাপাণি—সরস্বতী। সরস্বতী বাগধিষ্ঠাত্রী দেবী। তিনি শব্দের অধিষ্ঠাত্রী। শব্দেই বিশ্বের সৃষ্টি। শুক্ল বর্ণে সকল বর্ণের সমাবেশ, তাই সৃষ্টির আদি-দেবতা স্রষ্টার মানসী কন্যা সরস্বতী শুক্লবর্ণা। তাঁহার সমস্তই শুভ্র। তাই সরস্বতীর স্তবে বলা হয়—

শ্বেতপদ্মাসনা দেবী শ্বেত পুষ্পোপশোভিতা।
শ্বেতাম্বরধরা নিত্যা শ্বেতগন্ধানুলেপনা॥
শ্বেতাক্ষি 'শুভ্র' হস্তা চ শ্বেতচন্দন চর্চ্চিতা।
শ্বেতবীণা ধরা শুভ্রা শ্বেতালঙ্কারভূষিতা॥

দেবীর আসন শ্বেত পদ্ম, আভরণ শ্বেতপুষ্প, পরিচ্ছদ শ্বেতাম্বর, গন্ধদ্রব্য শ্বেতচন্দনাদি; হস্তের অক্ষমালা শ্বেতবর্ণ, হস্তের বীণাও শ্বেতবর্ণ, গাত্রের অলঙ্কার ও শ্বেতবর্ণ। তাঁহার গলায় গজমতি, বাহন শুভ্র মরাল। এই শ্বেত বর্ণের আর একটি কারণ আছে। হিন্দুর কল্পনা জ্ঞান শ্বেতবর্ণ। সরস্বতী জ্ঞানাধিদেবী এবং সত্ত্বগুণা; সুতরাং তিনি শ্বেতবর্ণা। বৈচিত্র্য না হইলে জ্ঞানের বিকাশ হয় না। বৈচিত্র্যকে অবলম্বন করিয়াই জ্ঞানের বিকাশ ঘটে। যখন প্রলয়ে প্রকৃতি বর্ণচিহ্ন-রেখা-বিহীন একাকার অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল, তখন জ্ঞান ছিল না; কারণ জ্ঞান তুলনামূলক। অন্ধকারে জ্ঞান সুপ্ত হয়। জ্ঞান জ্যোতিরূপা। সেই জন্য সরস্বতী শুক্লবসনা। পূর্ণ জ্যোতিঃ শুক্ল বর্ণেই নিহিত। তাই তিনি শুক্লবর্ণা। তাঁহার হস্তে বীণা—বেদ বিজ্ঞানের উদ্গাতা। বীণা ওঙ্কার ধ্বনিরই প্রতীক্। বীণার তন্ত্রী হইতেই ওঙ্কার ধ্বনি পূর্ণ মাত্রায় প্রকাশ পায়।

বিকশিত শ্বেত কমলই সরস্বতী দেবীর আসন। সৃষ্টির যেমন ক্রম বিকাশ হয়, জ্ঞানেরও সেইরূপ ক্রম বিকাশ হইয়া থাকে, জ্যোতিঃও সেইরূপ ক্রম বিকাশের অধীন। ক্রমবিকাশের উপর সৃষ্টিও জ্ঞান অধিষ্ঠিত বলিয়া সরস্বতী শ্বেতপদ্মের উপর অধিষ্ঠিত।

সরস্বতীর বাহন মরাল। মরাল জলমিশ্রিত দুগ্ধ হইতে ক্ষীর গ্রহণ

পূর্ব্বক নীর পরিত্যাগ করিয়া থাকে। জ্ঞান ভ্রান্তি পরিহার করিয়া প্রকৃত সিদ্ধান্তই গ্রহণ করিয়া থাকে। তাই সরস্বতী মরালবাহনা।

সরস্বতী দেবীর হস্তে পুস্তক। পুস্তক জ্ঞানেরই আকর। আবার পুস্তকে জ্ঞানেরও স্মৃষ্টি। জ্ঞানই শক্তি, জ্ঞানই মুক্তি। তাই আজ বিদ্যার্থী হিন্দু মাত্রেই তাঁহাকে এই বলিয়া স্তব করে :—

সরস্বতী মহাভাগে বিদ্যে কমললোচনে।
বিশ্বরূপে বিশালাক্ষি বিদ্যাং দেহি নমোঽস্তুতে ॥"

এই হইল সরস্বতীর স্বরূপ। বিদ্যার্থী মাত্রকেই এই স্বরূপ বুঝিতে হইবে। লোহাগড়া গ্রামে এই মাঘমাসে সরস্বতী পূজার আমোদই প্রশস্ত। সেকালের কথা জানিনা তবে একালে ১৯০২ খৃঃ (যে বৎসর লোহাগড়া উচ্চ ইংরাজী স্কুল স্থাপন হয়) লোহাগড়া হাইস্কুলে অতি জাঁকজমকের সহিত সরস্বতী দেবীর অর্চ্চনা হয়। ঐ বৎসর পূজার ব্যয় ১১০০৲ টাকা। স্কুলের ছাত্র ও স্থানীয় ভদ্রমণ্ডলীর নিকট হইতে চাঁদা আদায় ৪০০৲ টাকা; বাদবাকী সমস্ত ব্যয়ভার আমাদের কাশীনাথ সরকার মহাশয় বহন করেন। তাঁহারই আন্তরিকতায় গান-বাজনা, ব্যাণ্ড-প্রসেসন্, বাজি, কাঙ্গালিভোজ ও নিমন্ত্রিত ভদ্রমণ্ডলীর জলযোগের ব্যবস্থা অতি সুন্দর ও সুশৃঙ্খলার সহিত সুসম্পন্ন হয়। এ সময় কাশীবাবু উক্ত স্কুলের একজন প্রধান ছাত্র। তিনি ১৯০৫ খৃঃ স্কুলের ছাত্রবৃন্দ লইয়া মৃতা নবগঙ্গা নদী কাটিয়া উহার সংস্কারও করেন। বর্ত্তমানে উক্ত লোহাগড়া স্কুলে, লোহাগড়া রামনারায়ণ সাধারণ পাঠাগারে, লোহাগড়া তরুণ লাইব্রেরীতে, লোহাগড়া শ্রীভাগবৎ লাইব্রেরীতে ও লোহাগড়া বালিকা বিদ্যালয়ে মহাসমারোহে শ্রীশ্রী৺সরস্বতী পূজা হইয়া থাকে।

শ্রীপঞ্চমীর দিন শুধু জাঁকজমকের সহিত উৎসবে মাতোয়ারা হইলে চলিবে না। বাণীর স্বরূপকে চিনিতে হইবে। ঐ দিন গ্রামের বালক-কিশোর, যুবক-প্রৌঢ় সকলে মিলিয়া শুদ্ধ অন্তঃকরণে জ্ঞানদায়িনী জননীর চরণে ভক্তি পুষ্পাঞ্জলি দিয়া নিজেদের প্রসুপ্ত জ্ঞান জাগরিত করিতে হইবে, তবেই আমরা ঐশ্বর্য্য সম্পদে পূর্ণ—জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত হইব।

ফাল্গুনী পূর্ণিমায় দোললীলা। কেন দোললীলায় হোরী খেলিতে হয়, কুঙ্কুমে আবীরে শ্রীভগবানকে রঞ্জিত করিতে হয় তাহার রহস্য পাঠকপাঠিকা

অবগত আছেন কিনা জানি না। "মৃত্যাসুর বিনাশের পর বৃন্দারণ্যের গোপ গোপিকারা শ্রীকৃষ্ণকে আবীর কুঙ্কুমে অনুরঞ্জিত করিয়া যে হর্ষপুলক অভিব্যক্তি করিয়াছিল তাহাই দোললীলার রহস্য। যাঁহারা ভ্রান্ত তাঁহারা মনে করেন দোল একটা বাসর বিলাস। শ্রীকৃষ্ণের দোললীলা একটী বিজয়োৎসব। অসুর বিনাশের সার্থকতার সুখ-বিহ্বলতা। সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে এই ফাল্গুনী পূর্ণিমার দিনে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দেব যমুনা পুলিনে তাঁহার লীলা সঙ্গিনী শ্রীরাধা এবং অন্যান্য ব্রজবালাদের লইয়া দোল খেলিয়াছিলেন। আমরা আজও সেই দোলের উৎসব করি; হোলির খেলা খেলি, পিচকারীতে করিয়া সদরে অন্দরে রং ছিটাই, আবীরের রঙ্গে চরিদিক রাঙ্গিয়া দেই।"

আমাদের দোল সে দোল নহে। সে ছিল এক অনির্ব্বচনীয়-অনুপম আনন্দ। "ভক্তির বর্ণ রক্তিম। তাই আবীর কুঙ্কুম রক্তবর্ণাভ। ভক্তের সাধ মিটাইবার জন্যই এই হোরী খেলার বিধান। হোরী শ্রদ্ধাভক্তির রক্তরাগ। আবীর-কুঙ্কুম অনুরক্ত ভক্তের ভক্তির উপঢৌকন। অনুরাগের ও ভক্তির আতিশয্যে রক্তরঞ্জিত। দোল—সৃষ্টি ও স্থিতির শাশ্বত ছন্দ। আর যিনি এই দোলে সেই অনন্ত সুন্দরকে শোভিত করিতে পারেন—তিনি পরম ভাগ্যবান।"

অতি প্রাচীনদের কথা জানিনা তবে মধ্যযুগে সেকালের বৃদ্ধেরা দোলের উৎসব করিতেন। দোললীলার প্রকৃত রহস্য তাহারা অবগত ছিলেন বলিয়া বিশ্বাস হয় না কারণ একালে শিক্ষার প্রাচুর্য্যেও আমরা প্রকৃত উৎসবের রহস্য না জানিয়া হোলির আমোদ করি।

লোহাগড়া গ্রামে এই ফাল্গুন মাসে দোলের আমোদ। রং খেলিবার ধুম পড়িত। অধিকারী ঠাকুরের বাটীর দোল, শ্রীভাগবৎ রায়ের বাটীর দোল প্রসিদ্ধ ছিল। এই আবীর খেলার একটি বৈজ্ঞানিক কারণ আছে। বৈজ্ঞানিক কারণ এই যে শরীরে আবীর দিলে ঘাম নিবারণ হয় ও সংক্রামক ব্যাধি হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। জয়পুরের চরে লোহাগড়ার শ্মশানে ১৯১০—১৯২০ খৃঃ পর্য্যন্ত ৺প্যারীমোহন গোঁসাইএর উদ্যোগে দোলযাত্রা উৎসব মহা-সমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছিল। সেকাল-একালে লোহাগড়ায় এই দোলযাত্রা উৎসবে দত্ত-মজুমদার, রায়-সরকার বাটীতে দোলের মেলায় লাঠিখেলা, জারি-ধুয়া প্রভৃতি গান বাজনায় স্থানীয় লোকের আনন্দ বর্দ্ধন হইত।

'দোহা'

চলিত কথায় 'ধুয়া-জারি'

"বৃন্দে কহে রাইকিশোরী মিছে কেন কর ছলনা।
যেদিন পায়ে ধরে সাধিল নাগর মান করে কথা বল্লে না॥
মান করলে দুর্জ্জয় ভারি রাইকিশোরী—
ওলো মান নিয়ে বসে থেকো না,
পুরুষ পরশ অমূল্যধন তাও কি ধনি জেনে জাননা॥
এমন যতনের ধন করলি অযতন চিনলি নে রাই অঙ্কে সোনা,
যৌবন ফুরালে পরে ভাঙ্গবে কলি ধনি তোকে ঘৃণায় কেউ ছোবে না॥
আর তুই লো ধনি রাজার মেয়ে কঠিন তোদের হিয়া,
যে দিন কান্দ্‌তে কান্দ্‌তে নাগর গেল দেখলি না রাই চাহিয়া;
তোদের বামা জাতির কঠিন হিয়া তাই দেখলি নে রাই চেয়ে,
তোর কথা শুনলে পরে রাগ করে ধনি নাগর আনবো কেমন ক'রে॥"

"শুন মদন মোহন বংশীবাদন করি একটি নিবেদন
রাধার প্রেমে হয়ে বিসর্জ্জন মথুরায় রাজা হয়েছ এখন
বলি বিবরণ—
তুমি যখন ছিলে বৃন্দাবনে প্রেম ছিল সেই রাধাসনে
সে কথা পড়ে না মনে জনার্দ্দন কার মায়ায় ধ'রেছ এই যোগীর বেশ এখন
তোমার মানের দায় দয়াময়, যুগল কর ধরি ঐ চরণ।
ছিল রাই রাজা আমরা প্রজা করিতাম রাইয়েত গিরী
ওয়ে বাকী করে ক'রেছে ডিক্রী পলায়ে গিয়েছে মধুপুরী
ক'রে চাতুরী॥
তোমার ধড়াচূড়া মোহন বাঁশী শুন ওহে কালশশী
চল যাই মোরা দেখে আসি শ্রীহরি।
হয়েছ নূতন রাজা পেয়ে সুন্দরী
আহা কি শোভা নামে কুব্জা তিন ভিমড়া নারী॥

প্রেম কবুলতি লিখে দিয়েছ তুমি আপন হাতে সই করেছ
আপনারই নাম।
অগ্রে রাধার নাম লিখে মনের সুখে পিছে লিখলে আমার নাম
ওরে আমরা ত আছি তার প্রমাণ।
করবা কি, ক'রে গিয়েছ পলান, শুন ওহে বাঁকা শ্যাম॥
তোমার মথুরা বাটী লুট করিব হাত-পায়ে রসি লাগাব
ব্রজপুরি বেন্ধে নেব কালাচাঁদ।
রাই রাজার পরোয়ানা রাখ বিদ্যমান
তুমি চেন বা না চেন হরি
আমি রাধা সখির বৃন্দে দূতী নাম॥"

"বৃন্দে কহে দয়াময় চিনবে কেমনে
চিনতে যখন ছিল মনে চিনতে তখনে,
তুমি মাথায় বাগ বেন্ধেছ, বন্ধু বসেছ সিংহাসনে
বাম ভাগে কুব্জা নারী দেখলে নয়নে॥
তুমি ছিলে রাখাল, হয়েছ গোপাল
তোমার কপালের জোরে।
আমি রাজার রাজযুবতী রাজার রাজ্যেশ্বর,
রৌদ্র মধ্যে গোষ্টে মোষ্ঠে সুখ সুখদে তোমার,
ছিল তাহার শিরে রাজছত্র একি দেখি অনবিচার,
শ্রীমতীর দশমদশা ঘটিল তোমার,
তুমি দয়া করে যাও ব্রজপুরী শনি ও শ্যাম নটবর॥
আর বিপদকট মধুকট, সব নীরব হয়েছে,
সাধের কমল কলি ত্যজ্য ক'রে, শিমুল ফুলে মজেছে।
আ ছিছি লাজে মরি, বলি কার কাছে,
সাধের চিনি ছানা ত্যাগ ক'রেরে—চিটের আদর বেড়েছে॥"

সেকালে শিবচতুর্দ্দশীতে লোহাগড়া গ্রামে কি হইত না হইত জানি না, তবে একালে স্বর্গীয় বিশ্বনাথ সরকার কর্ত্তৃক ৺শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা হইবার পর

হইতে গ্রামবাসী অনেকেই উপবাস—ব্রতপালন—রাত্রিযাপন ও প্রহরে প্রহরে পূজা সমাপন করিয়া শিবরাত্রি ব্রত উদযাপন করেন।

এই ফাল্গুন মাসের শেষ তিন দিন আমাদের দেশে বনদেবীর পূজা হইয়া আসিতেছে। আমাদের দেশীয় প্রচলিত কথায় এই পূজাকে 'হ্যাঁচড়া পূজা' বলে। কলিকাতাবাসী সম্ভবতঃ ইহাকে 'ঘেঁটু' পূজা আখ্যা দিয়া থাকেন। যাবতীয় চর্ম্মরোগের শান্তির জন্যই এই হ্যাঁচড়া পূজার ব্যবস্থা। খোস-পাঁচড়া যাহাতে আক্রমণ না করিতে পারে তজ্জন্যই বনদেবীকে পূজা করা হয়। আমাদের গ্রামে পূজার বিবরণ নিম্নে প্রদান করিলাম। কুলার উপর ছেড়া চুল, ভাঙ্গা চাড়া, বাসি উনুনের ছাই, গাবের পাতা প্রভৃতি নোংরা দ্রব্য রাখিয়া মন্দার, বন্ধা, অশোক, ভাটি, হাচড়া প্রভৃতি নানা বন্যপুষ্পে উহা সজ্জিত করিয়া পল্লী মেয়েরা অশ্বত্থ বৃক্ষের নিম্নদেশে দণ্ডায়মান হইয়া বৃক্ষগাত্রে সিন্দুর ও কজ্জলের ফোঁটা দিয়া কুলা হস্তে করিয়া মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক বনদেবীকে পূজা করেন। (নিজ নিজ বাটীতে যত লোক আছে তন্মধ্যে পুরুষদের উদ্দেশ্যে কাজলের ফোঁটা ও মেয়েদের উদ্দেশ্যে সিন্দুরের ফোঁটা দেওয়া হইয়া থাকে)। আমাদের অঞ্চলে একটি কথা আছে যে লোহাগড়ার ফুল না হইলে 'হ্যাঁচড়া পূজা' সুসম্পন্ন হয় না। অত্যন্ত কাঁটাযুক্ত একপ্রকার বনফুল আছে তাহাকে আমাদের দেশের লোকে লোহাগড়ার ফুল বলিয়া থাকে। যশোহর জেলার নড়াইল মহকুমার অন্তর্গত সমস্ত গ্রামেই লোহাগড়ার ফুল পরিচিত। অবশ্য অন্যান্য জেলায় ইহাকে সম্ভবতঃ শিয়ালকাঁটা আখ্যা দিয়া থাকে। আমরা এই বনদেবী পূজার মন্ত্রের দু'এক ছত্র নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

"হ্যাঁচড়া লো মাগি তার ক্যাঁচড়া লো চুল
তাইতে হ'লো বন্ধারও ফুল
বন্ধারও ফুল না হয় অশোকেরও ফুল" ইত্যাদি।

চৈত্র মাসে দেল পূজায় সেকাল একালে লোহাগড়া গ্রামে খুব আমোদ প্রমোদ দেখা যায়। চক্রবর্ত্তী পাড়ায়, নমঃশূদ্র পাড়ায়, ৺গোবিন্দস্বরের বাটী, তপস্বী ঠাকুরের বাটী, পাড়দের বাটী ও ৺গোবিন্দ সাহার বাটীর চড়ক পূজা প্রসিদ্ধ। যেস্থানে বর্ত্তমান লোহাগড়া বালিকাবিদ্যালয় আছে, ঐ স্থানে সেকালে নমঃশূদ্রদের চড়কের গাছ পুতিয়া তাহাতে মানুষের পিঠে কাঁটা বিঁধাইয়া ঘুরান হইত। একালে দেল পূজায় বালারা সিংহাসন (পাটবান)

সম্মুখে করিয়া সদলবলে অষ্টক গান করিয়া থাকেন। অষ্টকের তাৎপর্য্য—
(Vide যশোহর-খুলনার ইতিহাস দ্বিতীয় খণ্ড ৮৬৫পৃঃ)

অষ্টক।

"(ও) সতী নিমাই কোলে লয়ে
ছিলেন ঘুমায়ে,
(ও) রাণী প্রভাতে উঠিয়া দেখেন
আমার নিমাই নাই ঘরে,
কেঁদে রাণী বলেন হায় রে হায়॥"

নিম্নে আমরা আরও দু'একটি অষ্টকের নমুনা প্রদান করিলাম।

নিমাই সন্ন্যাস।

(ক)

"(ও) নিমাই সংসার ছাড়িয়ে, চলে সন্ন্যাসী হ'য়ে,
শচী সজল চক্ষে মনোদুঃখে, বলে পুত্র মুখ চেয়ে,
কি সাধন করবি মাকে ফাঁকি দিয়ে।

(খ)

(ও) ঘরে বিষ্ণুপ্রিয়া রয়েছে, ও তার কি উপায় আছে,
(ও) নিমাই কেশ মোড়ালি বেশ দেখালি, কোটি কোপ্‌নী ডোরে সেজে,
সোণার মুখ ও-রূপ দেখে প্রাণ কি বাঁচে।

(গ)

(ও) যদি ছেড়ে যাবি বক্ষের ধন, আমায় করিয়ে এমন,
(ও) করি প্রাণ হত্যা এ মুহূর্ত্তে, থেকে স্বচক্ষে কর দরশন,
পরে যাস সন্ন্যাসী হ'স ইচ্ছা যেমন।"

কৃষ্ণ অষ্টক।

(ক)

"কৃষ্ণ নিম-তরু ডালে, দেহ ত্যজিবার কালে,
অকস্মাৎ জরা ব্যাধ, বাণ হেনে পদমূলে,
বিষের জ্বালায় কৃষ্ণ প'ড়ল ঢুলে।

(খ)

(ও) ক'রে মরা-পতি দরশন, যত বধূগণ,
(ও তারা) উর্দ্ধশ্বাসে হীন বাসে, এসে চরণে করে শয়ন,
ধূলায় লুটায় অঙ্গ অঙ্গনাগণ।

(গ)

(ও) কাঁদে শোকের অনল তুলে, আজ দাঁড়াই কোন্ কুলে
নাথ এতকাল পা'লে পুষে, এখন অনায়াসে যাও ফেলে,
এ শোকের শান্তি হবে ত্রেতায় গেলে।"

রাম অষ্টক।

(ক)

"ভরত এসে অযোধ্যাভবন, করে মাতৃ সম্বোধন,
বলে কিবা শুনি ও জননী, কেন বনে দিলে রাম-লক্ষ্মণ,
পিতা ম'রেছেন ষরে বুঝলেম কারণ।

(খ)

ও তুমি বস গিয়ে রাজপাটে, যতদিন আশা না মেটে,
আমি জটাশিরে বাকল প'রে, যাই শ্রীরামের নিকটে,
যদি অপরাধ ঘুচে এ সঙ্কটে।

(গ)

ও তুমি পতি পুত্র নাশিনী, যেন কাল ভুজঙ্গিনী,
ওমা তোমার কারণ রাজার মরণ, আরও বনে যায় রঘুমণি,
কৈকেয়ীমা তোমার মত কৈবা শুনি।"

রাই অষ্টক।

(ক)

"কৃষ্ণ গেলে মথুরায় বিচ্ছেদে রাই কয়, শুন শুন বৃন্দে সখি,
যারে ভাবি আপন সপি কুলমান, সে দিল আমারে ফাঁকি।

(খ)

সখি প্রণয় রতন সুজনেরই ধন, কখন রাখালে কি সাজে,
ঐ যে যে-ছিল রাখাল এবে মহীপাল, অবাক হ'লেম দেখে শুনে।

(গ)

পোড়া মনেরে বুঝাই কালায় কার্য্য নাই, যদি প্রেমের হ'ল হানি,
ঐ যে ছেড়ে গেছে শ্যাম শূন্য ব্রজধাম, বিচ্ছেদের কেন টানাটানি।"

এই সিংহাসন লইয়া চৈত্র সংক্রান্তির পূর্ব্বে শেষহাটে লোহাগড়া বাজারে বরাবর 'হাটসন্ন্যাস হইয়া থাকে। হাটসন্ন্যাসের দিন কালনা, লোহাগড়া, জয়পুর, কুন্দশী, মোচড়া, কৃষ্ণপুর প্রভৃতি গ্রাম হইতে ৮।১০ খানি সিংহাসন বহির হয়। বালারা ঐ সিংহাসন মাথায় করিয়া ঢাকবাজনার তালে তালে নাচিতে থাকেন আর সঙ্গে সঙ্গে সিংহাসনের সম্মুখে ধূপ-ধুনা লইয়া আরতি হয়। এই হাটসন্ন্যাসে প্রতিদ্বন্দ্বিতাও চলে। সময় সময় ভীষণ গোলযোগ এমন কি রক্তারক্তি হইয়া থাকে। কাহার সিংহাসন পূর্ব্বে যাইবে ইহা লইয়াই তুমুল মারামারি হয়। লোহাগড়া নিবাসী ৺মানিকলাল চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের বাটীর সিংহাসন যাহাকে আমাদের দেশে 'বুড়োঠাকুর' বলা হয়, তিনি সর্ব্ব-প্রথম হাটসন্ন্যাসে বাহির হইতেন।

কালনা গ্রাম নিবাসী ৺যশমন্ত সাহার সিংহাসন যাহা আজকাল 'যশমন্ত' নামে পরিচিত—তিনি একালে সর্ব্বপ্রথম হাটসন্ন্যাসে বাহির হন। দ্বিতীয় শ্রীকেদারনাথ তপস্বী মহাশয়ের পাটবান ও তৃতীয় স্থানে ৺গোবিন্দ সাহার বাটীর পাটবান ও পাড়দের বাটীর পাটবান একত্রে মিলিত হইয়া হাটসন্ন্যাসে বাহির হন। এই দেলপূজা উপলক্ষে লোহাগড়া মধুমিলন মন্দিরের সম্মুখে আড়ং বসিয়া থাকে। দেলপূজান্তে সেকালে সং দেওয়ার বহর পড়িত। এই সংএর আমোদ বর্ত্তমানে নাই বলিলেও চলে। ১০।১৫ বৎসর পূর্ব্বেও সং দেওয়ায় খুব আমোদ হইত। কয়েক বৎসর ধরিয়া পাড়েরা দেলপূজান্তে 'বস্ত্রহরণ' 'বৃষকেতুবধ' 'রাইরাজা' 'হরপার্ব্বতী' ও নদীতে নৌকার উপর 'কমলে কামিনী' প্রভৃতি সংএ বহু অর্থ ব্যয় করেন।

লোহাগড়া গ্রামে সেকাল-একালে বারোয়ারী পূজায় আমোদের কথা শুনা যায়। এই বারোয়ারী পূজা উপলক্ষে কবি, দোহা-জারি প্রভৃতি গান বাজনাও খুব হইত। আমাদের তারকচন্দ্র কবি-রসরাজ (কাড়ার), যশোহরের ইছু বিশ্বাস, পাগলা কানাই ও কালম গাজির কবি, জারি ও গাজির গীত বাঙ্গলাদেশে সর্ব্বত্রই পরিচিত। একালে আমাদের গ্রামের

মধুসূদন সরকার (কাড়ার) একজন নব্য কবিদার। এই প্রসঙ্গে আমাদের তারকের ও মধুসূদনের দুএকটী কবিগান নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

(তারকচন্দ্র কবি রসরাজ)

স্বরচিত

"দুর্গে, জীবের সর্ব্বস্ব-ধন ঐ শ্রীচরণ, শিবের বক্ষে দিলে।
আমি একা ঘরে বসত করি চোরের সঙ্গে সদাই ফিরি,
রিপু ছয় চোর সাথে।
এবার ভক্তি সিঁধ্-কাঠি দিব মা ঐ ছয় চোরের হাতে
সিঁধ্ ক'রবো অষ্টপাশ কেটে শিবের হৃদ গারদে উঠে
শিবের হৃদপদ্মের ধন নিব লুটে, জয় কালি জয় কালি বলে॥
শিবের ঘরে ক'রবো চুরি মা যা-থাকে কপালে
মাগো চোরে যদি তোরে ডাকে চুরি ক'রতে যেতে
যাত্রা সিদ্ধি তোর নামেতে
কালি-মন্ত্র জ'পে মুখে এবার চণ্ডীপুরে ঢুকে
মোহ ক'রবো মহেশ্বরকে
মা তোর সম্মোহন মন্ত্রেতে।
ভোলা পারবে না আর নাড়তে গাত্র হাতে ল'য়ে বিল্বপত্র
মোহিব যোগে
ব'লবো কার আজ্ঞে কালি-মার আজ্ঞে
লাগ গিয়ে শিবের বক্ষস্থলে॥
১নং ব্রহ্মরূপ ব্রহ্মবিদ্যা মাগো আদ্যা সবাকার।
তুমি সারাৎসারা কালিতারা মহাবিদ্যা অনাদ্যা বিশ্বমূলাধার।
মা তোর শ্রীচরণ ধন সাধনার ধন
শত্রুভাবে ধ'রে চরণ, দিলেম মহিষাসুরে
সাধনার ধন ভক্তিতে পায় আমার নাই মা কোন উপায়
ভক্তও নই, শত্রুও নই, চরণ পাই মা কেমন করে।
যেমন পিতৃ সত্ব পায় সন্তানে থাকতে পিতা বর্ত্তমানে
না দিলে কি পায়।

পিতা মহাকাল ধন, দেবার বেলায়
কাল হয়ে বয় এককালে ॥”

মধুসূদন সরকার (কাড়ার)

স্বরচিত কবি।

“শিবে তোমার আশাময় সংসারে এসে আশা না মিটিবে ॥
ভবে সকল আশা অর্থের উপর অর্থ কি হয় সুখের আকর
অর্থ বলং ভারি
অর্থে করে ঘর দরজা অর্থে জমিদারী।
অর্থ বেশী হ’লে পরে গয়া কাশী যেতে পারে
প্রচুর অর্থ থাকে যাহার ঘরে
সেই কি ভবে সুখী হবে ॥
অর্থ বেশী হ’লে লোকে মানভরে চলিবে ॥
সুখের শরৎকাল এলে পরে ধনীলোকে অর্থের যোগাড় করে
টাকা দিয়ে চিত্রকরে
মূর্ত্তি গ’ড়ে দশভূজা ষষ্ঠী কল্পে ক’রবেন পূজা
কিনে আনবে কতই অজা
মহামায়ের বলিদানের তরে।
কত বসন ভূষণ নৈবেদ্যাদি দিবেন যত্ন ক’রে
শেষে পূজান্তে পুরোহিতে, দক্ষিণা মুদ্রা দিবে ॥
১নং স্বার্থময় এই ব্রহ্মাণ্ড মাগো আশায় জগত বান্ধা
জীবকে সংসার মেয়াদে সুখ সম্পদে
মায়ার ফাঁদে লাগালে ধাঁধা।
ভবে রাজার আশা রাজ্য শাসন
ধনী লোকের আশা বেশী ধনে
দেখি আশা ত্রিভুবনে ॥
যে জন ভবে অর্থ শূন্য তার থাকে না মান্যগণ্য
কেঁদে ফেরে অর্থের জন্য
দিবা নিশি অতি দুঃখিত মনে।

সে যে অর্থলাভ বাণিজ্য আশে ভ্রমে দেশ-বিদেশে
এবার কি ক'রে উন্নতি হবে
দিবানিশি তাহাই ভাবে ॥

কি দিয়ে করিবে পূজা দশভূজা
গরীব হ'লে
ক'র্ব্বে দুর্গাপূজা শ্যামাপূজা
সব দেখি মা টাকার বলে।
নাম ধর রাজরাজেশ্বরী রাজার পূজা খাও শঙ্করী
দেখি না নাম তোমার কাঙ্গালেশ্বরী
কাঙ্গাল কি তোর নয়গো ছেলে ॥
সাধক তোমার করিবেন পূজা মাগো সাত্বিক ব্রহ্মজ্ঞানে
ক'রে রেচক্, পূরক কুম্ভকাদি
মাগো ষটচক্রে ষষ্ঠী আরাধনে ॥
পরে সপ্তমীতে সুসম্মাতে যোগী ঋষি করে যোগ সাধন
হৃদিপদ্মে সিংহাসন
উঠায়ে সে হৃদিখাটে ভক্তিপুষ্প দেয় জ্ঞান ঘটে
মাতৃকান্যাস ধ'রবেন এটে
মা তোমাকে করিতে অর্চ্চন।
অনুরাগের চণ্ডী করিবে পঠন হ'য়ে নিষ্ঠ মন
মা-তোর গরীব ছেলে মধুসূদন
কি দিয়ে তোমায় পূজিবে ॥"
"দুর্গে জীবের কি দুর্গতি ঘটাইলে এ ঘোর কলিকালে।
এই কি ভবে সুখের আকর কলের ছাতি কলের কাপড়
কলের জামা জুতা
আবার কলের-ঘড়ি বাবুগিরী বুকপকেটে ভরা
তার উপরে ওয়েষ্ট কোট মনিব্যাগে লুকায়ে নোট্
দিয়ে রুমালেতে আতরের ফোট্
নষ্টটানে সন্ধ্যাকালে ॥

লোহাগড়া কাহিনী

১। সুখদাত্রী নামটী ধর মাগো ভারতভূমেতে

দিয়ে সুখ ঐশ্বর্য্য করাও কার্য্য

মাগো ভুলায়েছ মোহমায়াতে ॥

কেহ ইংলিশ প'ড়ে চাকরী করে বেদ-গায়ত্রী ভুলে

মুখে দুর্গানাম না বলে সদাই দেখেন নভেল খুলে

না হয় সংবাদ পত্র মেলে শাস্ত্র-গীতা গ্রন্থ ফেলে

মন মিশায় তাহাতে।

বসে বৈঠক খানায় হারমোনিয়াম বাজায় আনন্দেতে

এমন শ্যামাকীর্ত্তন বর্জ্জন ক'রে টপ্পা সঙ্গীত কৌতূহলে ॥"

বারোয়ারী পূজা উপলক্ষে এই সমস্ত কবি-গান হওয়ার একমাত্র উদ্দেশ্যই শক্তির আরাধনা। বর্ত্তমানে লোহাগড়া গ্রামে ছয়খানা বারোয়ারী পূজার প্রচলন আছে। দত্ত-মজুমদার পাড়ায় একখানা, রায়পাড়ায় একখানা, সরকারপাড়ায় একখানা, সাহাপাড়ায় একখানা, ঋষিপাড়ায় একখানা ও লোহাগড়া বাজারে ব্যবসাদার মহলে একখানা।

লোহাগড়া বাজার একটি ছোটখাট বন্দর একথা বোধহয় পাঠক পাঠিকা লোহাগড়ার ব্যবসায় বাণিজ্যের বিস্তৃতি হইতে যৎকিঞ্চিৎ অবগত আছেন। এই বাজারের ব্যবসায়ীরা ঘাট হইতে মাল বোঝাই চালানি নৌকা খুলিবার সময় শ্রীশ্রী৺গঙ্গাদেবীর পূজা করেন ও গাজির উদ্দেশ্যে মানত করিয়া গাজির সিন্নি ও গাজির গীত দিয়া থাকেন। এই গাজির-গীত আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে যে বন্দনা হয় তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

বন্দনা

"(আঃ ও) চল যাইরে আরে ও গুণের ভাইরে

গেলে নাকি পাব দরশন।

৭০০ গাড়ল নিয়ে দড়ার ঘাট পার হয়ে

গাজি চল্লেন খুনিয়া নগরী।

খুনিয়া নগরী ধন্যা মুকুট রাজার কন্যা

বিবাহ ক'রলেন কৌশল্যাসুন্দরী ॥

কৌশল্যাকে বিবাহ ক'রে চম্পাবতী নাম ধ'রে
লয়ে আসেন আপন মন্দির।
চারি কোনে চারিকুঠুরী উপর আল্লার দরগার মাটি
আসন দিলেন দরিয়ার কিনার॥
বার বাজারে ঘর বাচালেন শিমুলের গাছ
পীর বলে হইল জাহির।......"

এই সমস্ত 'কবিগান', 'দোহা' (ধুয়াজারি), 'সারি', 'গাজির গীত', 'ছলই ও অষ্টক' স্থান ও কাল বিশেষে তাল, লয় ও সুর সংযোজনায় শ্রুতিমধুর হয়। শুধু পদাবলীর দ্বারা পাঠক পাঠিকা বিশেষ কিছু উপলব্ধি করিতে পারিবেন কিনা সন্দেহ। তবে যিনি কখনও উহা শ্রবণ করিয়াছেন তিনি কিঞ্চিৎ উপভোগ করিতে সক্ষম হইবেন।

পূর্ব্বোক্ত পূজাপার্ব্বনে নানাবিধ আমোদপ্রমোদ ব্যতীত সেকাল হইতে একালেও লোহাগড়া গ্রামে পুরস্ত্রীরা অল্পবিস্তর শুভচণ্ডী, মঙ্গলচণ্ডী ও কুলইচণ্ডী প্রভৃতি নানাব্রত করিয়া থাকেন। সেকালের কুলার মাগুন মেয়েদের আর এক উৎসব। দেব-দেবীর উদ্দেশ্যে মানত করিয়া পুরস্ত্রীরা কুলা বাহির করিয়া ভিক্ষায় বাহির হইতেন। জয়পুর, লোহাগড়া, লক্ষ্মী-পাশা, কাশীপুর, কুন্দশী, মল্লিকপুর প্রভৃতি গ্রামের কুলার মাগুনে এমন কি বন্দ্যোপাধ্যায় মুখোপাধ্যায় কুলীন ঘরের মহিলারা পরস্পর পরস্পরের গ্রামে এই উপলক্ষে বাহির হইতেন। সেকালে এই কুলার মাগুন উপলক্ষে নমঃশূদ্র স্ত্রীদের নাচ গানের বহর পড়িত। একালে এই কুলার মাগুন সাধারণতঃ নিম্ন শ্রেণীর ভিতরই দেখা যায়।

সেকালে প্রাচীনরা প্রতি ঘরে ঘরে পিতৃপুরুষের বাৎসরিক শ্রাদ্ধ করিতেন। যিনি তাহা না করিতেন তিনি পরম অধার্ম্মিক বলিয়া বিবেচিত হইতেন। এই ভয়ে সকলেই ভক্তি সহকারে উহা সম্পাদন করিতেন। বর্ত্তমান শিক্ষার বন্যায় এ সমস্ত ভাসিয়া যাইয়া তাহার স্থলে অবাধ বিলাসিতার স্রোতে পাঁড়াগেয়ে লোক আজ ভাসিয়া চলিয়াছেন। ইহার পরিণাম কোথায় কে জানে? সাধারণতঃ শ্রাদ্ধান্তে সেকাল এবং একালেও লোহাগড়ায় 'রামায়ণ গান' প্রচলিত দেখা যায়।

প্রাচীনকালে লোহাগড়ায় কোঠাবাড়ী একেবারে ছিল না তাহা নহে—

এখনও দত্ত-মজুমদার, রায়-সরকার বাটীতে ২৫০।৩০০ বৎসরের জোড় বাংলা, মন্দির ও কোঠাবাড়ী দেখিতে পাওয়া যায়। তখনকার দিনে খুব সম্পত্তিশালী না হইলে কেহ পাকাবাড়ী প্রস্তুত করিতে যাইতেন না। আজকালের মত কোঠাবাড়ী প্রস্তুত করিবার মাল মসলাও সহজে পাওয়া যাইত না, একারণ খরচাও খুব বেশী ছিল। এই সমস্ত মন্দির, কোঠা-বাড়ী ও অন্যান্য ভগ্নাবশেষ হইতে আমরা এ গ্রামের পুরাতন সমৃদ্ধির প্রমাণ পাই।

লোহাগড়া গ্রামে এখন যেমন সেকালেও সেরূপ সাধারণ লোকে বাঁশ ও ছন খড় দিয়া ঘর প্রস্তুত করিত। কোন কোন বাড়ীতে চারিদিকে ঘর ও মাঝখানে একখানি খোলা আট-চালা ঘর থাকিত। এ সকল ঘরকে নাটমন্দির বলা হয়। পূজার সময় এ সমস্ত ঘরে নাচ গান হইত। বিবাহাদিতে সভা-সমিতি বসিত। বর্ত্তমানে করগেটের প্রাচুর্য্যে কোন কোন বাড়ীতে ঐ সমস্ত আটচালা করগেট নির্ম্মিত হইয়াছে। সেকালে অবস্থাপন্ন গৃহস্থের বাড়ীতেও আসবাবপত্রের বাহুল্য ছিল না। আজকালকার হিসাবে আসবাব ছিল না বলিলেও হয়। তখন শাল সেগুণ বড় দেখা যাইত না। কাঁঠালই শ্রেষ্ঠ কাঠ বলিয়া পরিচিত ছিল। তখন আমকাঠ ও উচ্চ শ্রেণীর কাঠ বলিয়া পরিগণিত হইত। আলমারী দেরাজ খুব ধনীর বাড়ীতেও পাওয়া যাইত না। বড় বড় কাঁঠালের সিন্দুকে বাসনাদি থাকিত। বড় বড় আমকাঠের বাক্সে পুঁটুলী বাঁধা কাপড়-চোপড় রাখা হইত। শুধু ধনীর গৃহে বৃদ্ধেরা শীতকালে বিবাহাদি কর্ম্মোপলক্ষে শাল জামিয়ার প্রভৃতি গায়ে দিতেন। তার নীচে এক একটা মেরজাই থাকিত। ক্রিয়া-কর্ম্ম শেষ হইলেই উহা ভাজ করিয়া অতি যত্ন সহকারে পুনরায় তুলিয়া রাখিতেন। অনেকেই দোলাই দিয়া শীত নিবারণ করিতেন। সাধারণতঃ ধুতি-চাদর-চটিজুতায় সভ্যতা রক্ষা হইত। সঙ্গতি সম্পন্না মহিলারা ক্রিয়া-কর্ম্মোপলক্ষে কদাচিৎ তসর বা গরদ ব্যবহার করিতেন। একালের ন্যায় বেণারসী সাড়ী প্রভৃতি রেশম পশমের হরেক প্রকার পোষাক পরিচ্ছদ পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বেও বৃদ্ধেরা সচরাচর দেখিতেন না। তবে একালের ন্যায় সেকালের লোকের আকাঙ্ক্ষাও ছিল না—অভাব ও হইত না। শুধু ধনীদিগের বাড়ীতেই সতরঞ্চী, গালিচা, ঝাড়, আসা-

ছোটা, রূপার আতর-দান, গোলাপ-পাস, বাঁধা-হুকা ও গড়গড়া প্রভৃতি থাকিত। সেকালে কেশ বিন্যাসের জন্য আর্সি পাওয়া যাইত না। একালের ন্যায় অলঙ্কারেরও বাহুল্য ছিল না। সোণার অলঙ্কার অতি অল্পই ব্যবহৃত হইত। শাঁখা এবং লাল শাড়ীই ছিল সধবাদিগের অঙ্গের সর্ব্বপ্রধান অলঙ্কার ও আভরণ। গরীবদিগের কথা লেখা বাহুল্য। বিশেষ সম্পন্না মহিলারাও রূপার বালা ও বাউটী পরিতেন। নাকে অনেকেই নথ ব্যবহার করিতেন। সময় সময় তাহার সঙ্গে কাহারও কাহারও কান পর্য্যন্ত টানা ও থাকিত। সোণার বাজু ও মালা বিশেষ ধনবানের গৃহেই থাকিত; হয়ত পূজার সময় বা কোন বিবাহোপলক্ষে দু-চার দিনের জন্য ব্যবহার করিয়াই কাঠের সিন্দুকে তুলিয়া রাখিতেন। যশোহরে বেতের বাক্স বা পেটরা প্রস্তুত হইত তাহাই অধিকাংশ লোকে ব্যবহার করিত। বর্ত্তমানে ষ্টীলট্রাঙ্ক সেই স্থান অধিকার করিয়াছে। সাধারণতঃ লোকে সর্ব্বদা ব্যবহারোপযোগী কাপড়-চোঁপড় ঐ সমস্ত পেটরায় পুরিয়া রাখিতেন।

সেকালের প্রাচীনরা চা-বিস্কুট খাওয়া, চুলকাটা, গোফ ছাঁটা প্রভৃতি ফ্যাসান বিপাকে পড়েন নাই। একালের ন্যায় চা-বিস্কুটের বন্যা, চুল ছাঁটাই, হেয়ার লোসনের ব্যবহার, গোফ কামান, স্নো-পমেটম্ মাখা, এসেন্সের ছিট দেওয়া আবার মেয়েদের সেমিজ, জ্যাকেট, ব্লাউচ্ প্রভৃতি বিলাসিতার স্রোত সেকালে বৃদ্ধদের কল্পনাতীত ছিল। "সেকালের লোকে স্নানান্তে শুদ্ধ বস্ত্রে কোশাকুশী, টাট, তাম্রকুণ্ড লইয়া বসিতেন, তাহাতে পূজার উপকরণ—গঙ্গাজল, ফুল, বিল্বপত্র, তুলসী, চন্দন থাকিত; আর একালের যুবক-যুবতীরা স্নানের পরেই আয়না, চিরুণী, ব্রাস্ লইয়া বসেন, পাউডার, রুজ, পমেটম্, এসেন্সের সদ্ব্যবহার করেন। একেই কি বলে সভ্যতা?"

সেকালে ইংরাজী শিক্ষার প্রচলন না থাকিলেও যাহারা ভদ্রলোক বলিয়া পরিচিত ছিলেন তাহারা যত্ন করিয়া পার্শী শিক্ষা করিতেন। এখন যেমন ইংরেজী আইন-আদালতের ভাষা হইয়াছে, নবাবী আমলে পার্শীও সেইরূপ আমাদের দেশের রাজভাষা ছিল। তখন পার্শী শিক্ষা করিয়া রাজসরকারে ভাল ভাল উচ্চ পদস্থ চাকুরী জুটিত। অনুমান ১০৩০

সালে দত্ত-মজুমদার বংশের প্রতিষ্ঠাতা ৺কমললোচন দত্তের জ্যেষ্ঠপুত্র বংশীধর মিরবহর পার্শীভাষায় অদ্বিতীয় পণ্ডিত হওয়ায় নবাব আমলে তিনি 'মিরবহর' অর্থাৎ নৌসেনাপতি হইয়াছিলেন একথা সত্য। এই দত্ত-মজুমদার বংশে খ্যাতনামা কৃষ্ণচন্দ্র ও চন্দ্রশেখর জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহারা উভয় ভ্রাতা ১০৫৯ বঙ্গাব্দে আউরঙ্গজেবের রাজত্বকালের প্রাক্কালে রাজমহল নবাবসরকারে বিশেষ সম্মানজনক চাকুরী করিয়া কতকগুলি মৌজার ভূম্যধিকার লাভ করেন ও নবাব প্রদত্ত খেতাব "মজুমদার" উপাধি প্রাপ্ত হন। 'মজুমদার' অর্থে রাজস্বের হিসাব রক্ষক (Revenue accountant) বুঝায়। দুর্ব্বোধ্য পার্শী বয়াদ সমূহ ইহাদের কণ্ঠস্থ ছিল এবং রাজস্ব সংক্রান্ত বিষয়ে তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন ছিলেন বলিয়াই ইহারা নবাব সরকার হইতে 'মজুমদার' উপাধি ও মৌজার ভূম্যধিকার লাভ করিয়া যান। আউরঙ্গজেবের রাজত্বকালের শেষভাগে রায়-সরকার বংশের প্রতিষ্ঠাতা সর্ব্বেশ্বর দাসের পুত্র রূপরাম দাস চৌধুরী সভায় বসিয়া উপস্থিতমত পার্শী কবিতা রচনা করিয়া সভাস্থ আপামর সাধারণকে মোহিত করিতেন। তিনি তখন ঢাকা নগরীতে গমন করিয়া স্বীয় বিদ্যাবলে নবাবের কৃপাপথে পতিত হইয়া নবাব সরকার হইতে চারিপরগণার মালেকানা ও "চৌধুরী" উপাধি প্রাপ্ত হন। কথিত আছে, সরকার বংশের প্রতিষ্ঠাতা হরিনাথ সরকার রাজা সীতারাম রায়ের দেওয়ান ছিলেন। সীতারামের রাজত্বের শেষাবস্থায় তদীয় রাজ্যভুক্ত "রামপুর-শ্যামপুর মোতালকে" হরিনাথ নায়েবী পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। হিন্দুরাজ্যের ধ্বংসের অল্পকাল পূর্ব্বে হরিনাথ মহম্মদপুরে রাজসরকারের দেওয়ানের পদে অধিষ্ঠিত হন ও "সরকার" উপাধি-প্রাপ্ত হন। অবশেষে রায় বংশের প্রতিষ্ঠাতা স্বনামধন্য বিদ্যাধর রায়ও পার্শী ভাষা শিক্ষা করিয়া বিদ্বান্ বলিয়া সুপরিচিত ছিলেন। প্রৌঢ়াবস্থায় আমরা বিদ্যাধরকে বর্দ্ধমান রাজসরকারে দেওয়ানের পদে প্রতিষ্ঠিত দেখিতে পাই। বর্দ্ধমানে তিনি সম্পত্তি বন্দোবস্তের কর্ত্তা ছিলেন, বোধ হয় Financial বা legislative minister ছিলেন। তাঁহার কৃত "বিদ্যাধরী বন্দোবস্ত" এখনও বর্দ্ধমানে অনেকস্থানে প্রচলিত আছে। এই বর্দ্ধমান রাজসরকারে মন্ত্রিত্ব করিয়াই বিদ্যাধর 'রায়' উপাধি প্রাপ্ত হন। রায় অর্থে রাজা বা রাজার

ন্যায় সম্মানিত ব্যক্তি বুঝায়। সেকালে লোহাগড়ার লোকে রাজসরকারে উচ্চপদস্থ চাকুরী করিয়া 'তহবিলদার' 'মজুমদার' 'রায়' 'সরকার' 'ভৌমিক' 'চৌধুরী' এমন কি 'মিরবহর' আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং ঐ সমস্ত নবাবী আমলের রাজসরকার প্রদত্ত খেতাব জাতীয় পবদীতে পরিণত হইয়া বংশ পরম্পরায় চলিয়া আসিতেছে। বংশ-পরিচয়ে পাঠক-পাঠিকা বোধ হয় বিশেষরূপে লক্ষ্য করিয়াছেন যে, যখনই বংশের কেহ উন্নত হইয়াছেন তখনই তিনি সম্ভ্রমবাচক কোন উপাধি গ্রহণ করিয়া পাকা বাড়ী নির্ম্মাণ করতঃ পূজাপার্ব্বণে অর্থের সদ্ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন।

বর্ত্তমানের ন্যায় সংস্কৃত চর্চ্চার বিস্তার না হইলেও ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বাটীতেই সংস্কৃত অধ্যয়ন হইত। সেকালে লোহাগড়া গ্রামে পার্শী পাঠশালা ও সংস্কৃত টোল ছিল এ কারণ অনেক অধ্যাপকের আবির্ভাবও হইয়াছিল। অতি প্রাচীনদের সময় এই গ্রামে যে সাধারণ লোকের কোন শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল না তাহা নহে, তবে একালের ন্যায় সেকালের লোকে লেখাপড়া শিখিতেন না, একথা সত্য। মুখে মুখে সেকালের লোকে নানা জ্ঞান অর্জ্জন করিতেন আর সমাজের শিক্ষিত লোকদিগের সংসর্গে সাধারণ লোকের বুদ্ধিও মার্জ্জিত হইত। প্রতিপাড়ায় প্রতি সন্ধ্যায় রামায়ণ ও মহাভারত পাঠ হইত। যিনি পড়িতে জানিতেন, তাঁহার চারিদিকে প্রতিবেশী স্ত্রী-পুরুষেরা আসিয়া ঘিরিয়া বসিতেন। অনেকে পড়িতে না জানিয়াও এইরূপ মুখেমুখে প্রাচীন পুরাণ-কাহিনী অবগত হইতেন। ইহা ব্যতীত প্রায় ঘরে ঘরে কথকতা হইত। ৺রামধন ভট্টাচার্য্য, ৺রঘুনাথ শিরোমণি, ৺বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি লোহাগড়া গ্রামে কথকতা করিয়া গিয়াছেন। এইরূপে লোক-শিক্ষা প্রচার হইত। একালে এসব শিক্ষা-পদ্ধতি দেশ হইতে একেবারে উঠিতে বসিয়াছে।

একালের ন্যায় পাঠশালার ছড়াছড়ি না থাকিলেও সেকালের সাধারণ লোকেরাও নিতান্ত অজ্ঞ ছিলেন না। সেকালের পাঠশালায় সাধারণতঃ গুরুমহাশয় একখানি লম্বা বেত হাতে—জলচৌকির উপর উপবিষ্ট থাকিতেন। তালপাতার প'ড়োরা কতকটা লেখা অভ্যাস করিলে চিলতে (কলাপাতা) লিখিবার অনুমতি পাইত। পরে হাতের লেখা পাকিয় উঠিলে কাগজ ধরিত। আজকালের ন্যায় কাগজ এত সস্তা ছিল না এবং পয়সাও এত সচ্ছল ছিল না সুতরাং কলাপাতাতেই হাতের লেখা

পাকিয়া উঠিত। যদি কোন বালক পাঠশালায় অনুপস্থিত হইত, তবেই গুরুমহাশয় তেলে বেগুনে জ্বলিয়া উঠিয়া তাহাকে ধরিয়া আনিবার জন্য আর চারি পাঁচ জন ছাত্র পাঠাইতেন। এদিকে লাল মাঝালি (আমাদের দেশীয় প্রচলিত কথায় নালিসা) আনিবারও আদেশ হইত। যেমনই ঐ বালক গুরুমহাশয়ের সম্মুখে উপস্থিত করা হইত, অমনি হুকুম হইত "চৌদ্দপোয়া দিয়া নালিসা ভাঙ্গিয়া দাও" এবং সঙ্গে সঙ্গে হুকুম তামিল হইত। সেকালের পাঠশালার এই কঠোর পদ্ধতিতে অনেক সময় বালকগণকে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিতে হইত এবং তাহারা প্রতিশোধ লইবার জন্য ব্যস্ত হইত। সুযোগ পাইলেই গোপনে আলকুশী (দয়ার গুড়া) জল চৌকির উপর ছড়াইয়া দিয়া গুরুমহাশয়কে সময় সময় বিব্রত করিয়া তুলিত। পাঠশালার কথা বলিতে বলিতে এদেশের ফেন্‌ভাতের কথা স্মরণ হইল। সেকাল একালে লোহাগড়া গ্রামে প্রাতঃকালে গরম গরম ফেন্ ভাত ও ঘি খাইবার ব্যবস্থা চলিয়া আসিতেছে। যশোহর খুলনা জেলার সর্ব্বত্রই এই প্রথা প্রচলিত আছে। এই ফেন্‌ভাত খুব পুষ্টিকর খাদ্য। ইহাতে শরীর সুস্থ ও সবল হয়। বালকেরা মহানন্দে ইহা ভক্ষণ করিয়া থাকে, অবশ্য সহরের ন্যায় চা বিস্কুটের ঢেউ এখনও পৌছায় নাই। তাহা পৌছিলে ফেন্‌ভাত ও ঘিকে কোথায় ভাসাইয়া লইয়া যাইবে—কে জানে?

সেকালের স্ত্রীলোকেরা লেখাপড়া শিখিতেন না। কিন্তু তাই বলিয়া তাহারা মূর্খ ছিলেন না। তখন এই গ্রামে মহিলারা অনেক ব্রত উপবাস করিতেন। বৈশাখ মাসে প্রতি সপ্তাহে প্রতি মঙ্গলবারে মঙ্গলচণ্ডী ব্রত করিতেন। পুরোহিত আসিয়া এই ব্রত উপলক্ষে তাহাদিগকে মঙ্গলচণ্ডীর ব্রত কথা শুনাইতেন। এই ব্রত কথা শুনিয়া আমাদের প্রাচীন মহিলাদের আচার ব্যবহার মার্জ্জিত হইত—ভাবও ভক্তি গড়িয়া উঠিত। এই মঙ্গলচণ্ডী, শুভচণ্ডী ও কুলইচণ্ডী ব্রত একালের মেয়েদের মধ্যেও দেখিতে পাই। গত পঞ্চাশ বৎসর হইতে লোহাগড়া গ্রামে মেয়েরা অল্পবিস্তর বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষা পাইয়া আসিতেছেন।

যদিও একালের ন্যায় সেকালের মেয়েদের শিল্পোন্নতি ছিল না তথাপি তাহারা যে, ও বিষয়ে একেবারে বোকা ছিলেন তাহাও নহে। লোহাগড়া

গ্রামে সেকালে মেয়েদের সূচি শিল্পের ভিতর কাঁথাই প্রধান ও প্রসিদ্ধ। আল্‌পনা, সরা ও কুলা চিত্র, বিবাহের পিড়ি চিত্র ও গৃহ নির্ম্মাণ মিষ্টান্ন প্রস্তুতের ছাঁচ্ কাটা অল্পবিস্তর একালের পুরস্ত্রীরাও বহাল রাখিয়াছেন। ইহা ব্যতীত একালের মেয়েরা সূচী শিল্পের যথেষ্ট উন্নতি সাধন করিয়াছেন।

সেকালের কুলবধুগণ প্রত্যুষে শয্যা পরিত্যাগ করিয়া স্ব স্ব প্রাঙ্গণে গোবর ছড়া ও ঝাঁট দিতেন। সন্ধ্যায় তুলসী-মঞ্চে ধূপ-ধূনা ও দীপ জ্বালিতেন। তাহাদের সরল স্বভাব, ভক্তি বিনম্র ব্যবহার, পতিভক্তি ও অতিথি-সৎকার তাঁহাদের শোভাবর্দ্ধন করিত। বর্ত্তমান শিক্ষার বন্যায় এ সমস্ত প্রথা বিশেষতঃ গোবর ছড়া ও ঝাট একরূপ লোপ পাইতে বসিয়াছে। রন্ধন বিষয়েও সেকালের মহিলারা একাল অপেক্ষা সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠা ছিলেন। একালে পাক-প্রণালীর বিশেষ উন্নতি হইলেও সেকালের গৃহিণীরা রন্ধনে সুনিপুণা ছিলেন। সেকালের লোকে শুধু বংশ রক্ষার জন্যই দার পরিগ্রহ করিতেন। পিতৃলোকের পিণ্ডলোপ পাইবে এ ভাবনা সেকালের বৃদ্ধেরা সহ্য করিতে পারিতেন না। "আমাদের প্রাচীনেরা পুত্রার্থে ভার্য্যা গ্রহণ করিতেন। দাম্পত্য সম্বন্ধের প্রয়োজন ছিল, ভোগ নহে, কিন্তু প্রয়োজন, কুলধারা রক্ষাকরা, সমাজস্থিতিভঙ্গ নিবারণ করা। পুত্র লাভে পিতৃ-লোকের ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা হয়। ইহাই প্রাচীনদিগের সংস্কার এবং আদর্শই ছিল। সমাজ রক্ষার সহায় বলিয়াই দারা সহধর্ম্মিণী হইয়াছিলেন। এই জন্য বিবাহ আমাদের প্রাচীন সাধনায় "সংস্কার" ছিল। আর, এই জন্যই কুলপাবন সৎপুত্র লাভ করিবার জন্য সৎ গৃহস্থেরা সর্ব্বদা এত লালায়িত হইতেন।" সেকালে প্রাচীনেরা স্ব স্ব পুত্রলাভের জন্য যেরূপ তপস্যা করিয়াছিলেন আধুনিক যুগে বোধ হয় কেহই তাহা কখনও করেন নাই, আর করেনও না।

একালের লোকে সেকাল অপেক্ষা নৈতিক বিষয়ে উন্নত না অবনত এ প্রশ্নের সম্যক্ উত্তর দেওয়া লেখকের পক্ষে সহজসাধ্য নহে, সুতরাং এ বিষয়ের আলোচনা হইতে বিরত থাকাই সর্ব্বতোভাবে সমীচীন মনে করি।

অবশেষে স্বাস্থ্য বিষয় যৎকিঞ্চিৎ বর্ণনা করিয়া আমার লোহাগড়া কাহিনী শেষ করিতেছি। লোহাগড়া স্বাস্থ্যহীন বলিয়া ইদানীং বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। কিন্তু সেকালে লোহাগড়ার এরূপ দুর্গতিপূর্ণ

অবস্থা ছিল না। এক সময় লোহাগড়া স্বাস্থ্য ও সমৃদ্ধির আলয় ছিল—ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রশস্ত ক্ষেত্র ছিল—লোকের অভাব অভিযোগ ছিল না। তখন এই লোহাগড়ায় স্বাস্থ্য ছিল, সুখ ছিল, আনন্দ ছিল। ব্যাধি কাহাকে বলে লোহাগড়াবাসী তাহা জানিতেন না। আজ্ লোহাগড়ার সে দিনের অবসান হইয়াছে। লোহাগড়ার সে স্বাস্থ্য নাই; সে সমৃদ্ধি নাই; সে আনন্দ নাই—আছে শুধু দ্বেষ, হিংসা, সঙ্কীর্ণতা ও ব্যাধির প্রকোপ। প্রাচীন সমৃদ্ধির স্মৃতি এখন অতীত স্বপ্নের স্মৃতির ন্যায় ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছে। সেই অতীত যুগের সুখ-সমৃদ্ধির কথা শুধু আলোচনা করিলে আর লাভ নাই। বর্ত্তমানে যাহাতে সেই প্রাচীন সুখ সমৃদ্ধি আংশিক ভাবে ফিরিয়া পাওয়া যায়, তজ্জন্য গ্রামবাসীর চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। অতীত গৌরব ফিরাইয়া আনিতে হইলে একতা ও বল সংগ্রহের একান্ত প্রয়োজন। বল সংগ্রহ করিতে হইলে স্বাস্থ্যের উন্নতি সাধন করা আবশ্যক। নষ্ট স্বাস্থ্য ফিরিয়া পাইতে হইলে, যে কারণে লোহাগড়ার এই ব্যাধি বিড়ম্বনা ঘটিয়াছে, তাহার যথাসাধ্য প্রতীকার করা গ্রামবাসী সকলেরই কর্ত্তব্য। অসুস্থ ব্যক্তির দ্বারা কোন কার্য্যই সাধিত হইতে পারে না। যে ব্যক্তি রুগ্ন সে ব্যক্তি কখনই স্বীয় সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিতে পারে না। বর্ত্তমান সময়ে লোহাগড়ার স্বাস্থ্য রক্ষার ব্যবস্থা সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান তজ্জন্য শিক্ষারও প্রয়োজন। শিক্ষা ও জ্ঞানের দ্বারা মানুষ সুখ স্বচ্ছন্দে বাঁচিতে পারে—জীবন সার্থক করিতে পারে। কিন্তু জীবনে বাঁচিয়া থাকিলে শেষে ভালভাবে বাঁচিয়া জীবন সার্থক করিতে হয়। সুতরাং যাহাতে জীবনে বাঁচিয়া থাকা যায়, স্বাস্থ্যের উন্নতি সাধন হয়, তাহা লোহাগড়াবাসীর সর্ব্বাগ্রে চিন্তা করা একান্ত কর্ত্তব্য। লোহাগড়ার এই স্বাস্থ্যহীনতা অধিক দিন সংঘটিত হয় নাই। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে এদেশে প্রথম ম্যালেরিয়া দেখা যায়। সাবেক নবগঙ্গা নদী মরিয়া যাওয়াই লোহাগড়ার ব্যাধি বিড়ম্বনার সর্ব্বপ্রধান কারণ। বর্ষাকালে নবগঙ্গার জল লোহাগড়া গ্রামের ভিতর ঢুকিয়া গ্রামের বীজাণুবীজ ধৌত করিয়া দিত—বর্ত্তমানে ডোবাগর্ত্তে আবদ্ধজল থাকিয়া তাহাতে গ্রামবাসীর মলমূত্র সম্বৎসর ধরিয়া পঁচিতে থাকে একারণ আজ শুধু ম্যালেরিয়া নহে, টাইফয়েড্, কলেরা প্রভৃতি ব্যাধির আক্রমণে এগ্রাম ধ্বংসমুখী হইতে বসিয়াছে। একালে

গ্রামবাসীর স্বার্থপরতা, ঔদাসীন্য ও অবিবেচনাই লোহাগড়ার স্বাস্থ্যহীনতা বা ব্যাধি-বিড়ম্বনার কারণ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। গ্রামের স্বাস্থ্যোন্নতির বিষয়ে গ্রামবাসী যদি পরস্পরের সহযোগিতা করেন, তাহা হইলে লোহাগড়া একটি আদর্শ গ্রামে পরিণত হইতে পারে।

বিপ্লব।

(ঝড়, অগ্নিকাণ্ড, বান, দুর্ভিক্ষ, মড়ক ও ভূমিকম্প)

দেশে সময় সময় একটি বিপ্লব উপস্থিত হইয়া ঘোর পরিবর্ত্তন ঘটাইয়া থাকে। ঝটিকাবর্ত্ত, জলপ্লাবন, দুর্ভিক্ষ, মড়ক, ভূমিকম্প ও অগ্নিকাণ্ড এই বিপ্লবের বিভিন্ন অঙ্গ। কখনও কখনও ভীষণ ঝটিকা উঠিয়া বহু বৃক্ষ উন্মূলিত করিয়া দেয়। এই সকল ঝটিকার ফলে কোন কোন প্রকাণ্ড নদী প্রবাহশূন্য হয় এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খাল কখনও কখনও প্রবল নদীতে পরিণত হয়। অতি মূল্যবান বন ধ্বংসের প্রধান কারণ এই ঝটিকাবর্ত্ত ও জলপ্লাবন। অতি প্রাচীনকালে দেশে কি হইয়াছে তাহা জানিবার উপায় নাই। তবে গত চারি পাঁচ শত বৎসরের মধ্যে কয়েকবার ঝটিকা ও জলপ্লাবন হইয়া সমগ্র বঙ্গদেশের নানা স্থানে যে অসংখ্য প্রাণি-হত্যা ও অত্যন্ত অনিষ্টসাধন করিয়াছে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। বাদশাহ আকবরের রাজত্বের ২৯শ বর্ষে অর্থাৎ ১৫৮৫ খৃঃ ভীষণ জলপ্লাবন হয় ও সঙ্গে সঙ্গে ৫ ঘণ্টা ধরিয়া ভয়ানক ঝড় বৃষ্টি ও বজ্রপাত হইয়াছিল। ইহার ফলে প্রায় দুই লক্ষ লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয় *। এই জলপ্লাবন ও ঝটিকাবর্ত্ত দ্বারা খুলনা জেলায় সুন্দরবনেরও বিশেষ ক্ষতি সাধিত হয়। পরবর্ত্তী ভীষণ ঝটিকা ১৬৮৮ খৃঃ হয়। উহাতে সাগর দ্বীপে ৬০ হাজারেরও অধিক লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয় †। তৎপর ১৭০৭ খৃঃ এক প্রকাণ্ড সাইক্লোন বা ঝটিকাবর্ত্ত সুন্দরবনের উপর দিয়া প্রবাহিত হয়। উহাতে বৃক্ষাদি ও মনুষ্য জীবনের ভীষণ ক্ষতি করিয়াছিল। পুনরায় ১৭৩৭ খৃঃ ভূমিকম্পের সঙ্গে সঙ্গে আর এক ভয়ানক ঝড় হয়। উহাতে কলিকাতা অঞ্চলের কল-কারখানা সমূহের বিশেষ ক্ষতি হয়। এই ভূমিকম্প ও ঝড়ে প্রায় ত্রিশ হাজার লোক মারা যায় এবং গঙ্গার জল প্রায় ৪০ ফুট উচ্চে

---

* Ain-i-Akbari, Book III—Gladwin's Edition, P. 304.

† Imperial Gazetteer, Vol. XII, P. 110.

উঠে ‡। উপরোক্ত ঝড় ও জলপ্লাবনের বিষয় লোহাগড়া প্রভৃতি স্থান সমূহে কিরূপ ইষ্ট বা অনিষ্ট সাধিত হইয়াছিল তাহা সঠিক জানা যায় না, তবে নিম্নলিখিত বিপ্লব সমূহ লোহাগড়া প্রভৃতি স্থানে পৌছিয়াছিল।

১৮৬২ খৃঃ ১৪ই মে অর্থাৎ ১২৬৯ সালের ২রা জ্যৈষ্ঠ যশোহর, খুলনা ও সুন্দরবনে প্রবল ঝড় উত্থিত হইয়া দেশের বিশেষ ক্ষতি করে। ইহার নাম বিখ্যাত "জ্যৈষ্ঠ ঝড়"। দুই বৎসর পরে ১৮৬৪ খৃঃ ৫ই অক্টোবর একটি ঝড় ও তৎসহ প্রবল জলোচ্ছ্বাস হইয়া কলিকাতা ও নিকটবর্ত্তী জেলা সমূহের ভীষণ ক্ষতি করিয়াছিল। ইহাতে বহুসংখ্যক বড় জাহাজ, লক্ষ লক্ষ নৌকা ও অগণিত মনুষ্য-জীবন নষ্ট হয় *। ১৮৬৭ খৃঃ ১লা নবেম্বর অর্থাৎ ১২৭৪ সালের ১৬ই কার্ত্তিক আর একটি বিখ্যাত ঝড়ে সাগর-দ্বীপ হইতে পাবনা পর্য্যন্ত সমস্ত দেশের সর্ব্বনাশ সাধন করিয়া যায়। এই কার্ত্তিকে ঝড়ে সুন্দরবনেরও বিশেষ ক্ষতি হয়। ইহার ২ বৎসর পরে ১৮৬৯ খৃঃ ৩১ অক্টোবর অর্থাৎ ১২৭৬ সালে সুন্দরবনের পূর্ব্বাঞ্চল হইতে আরম্ভ করিয়া বরিশাল পর্য্যন্ত এক ভয়ঙ্কর ঝটিকা ও সমুদ্র প্লাবন প্রবাহিত হয়। বাখরগঞ্জ ও নোয়াখালি অঞ্চলেই ২ লক্ষের অধিক লোক মরিয়া যায়, কিন্তু প্রকৃত মৃত্যু সংখ্যা অগণিত। এই ১২৭৬ সালে অনাবৃষ্টি হইয়া দেশে ফসল অজন্মা হওয়ায় 'ছিয়াত্তরে মন্বন্তর' নামে ভীষণ দুর্ভিক্ষ সমস্ত দেশ গ্রাস করিয়া ফেলে † ফলে বঙ্গের এক তৃতীয়াংশ লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়। সুন্দরবন ও খুলনা প্রভৃতি জেলা বঙ্গসাগরের নিকট থাকিয়া সর্ব্বদাই ঝড়ের অত্যাচার সহ্য করে।

১২৮৬, ৯৬ ও ১৩০৬ সালে ঝড় ও প্লাবনের কিরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছিল তাহা সঠিক জানা যায় না। তবে ১৯০৯ খৃঃ ১৭ই অক্টোবর অর্থাৎ ১৩১৬ সালের ৩০শে আশ্বিন ভীষণ ঝড় হইয়াছিল। এ ঝড় খুলনা ও যশোহরের স্থানে স্থানে অন্যান্য জেলা অপেক্ষা অধিক হইয়াছিল। এতদ্বারা সমগ্র দেশের বিশেষতঃ সুন্দরবনের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছিল। লোহাগড়া প্রভৃতি স্থান সমূহের যে দুর্দ্দশা হইয়াছিল তাহা স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছি। বৃক্ষাদি উৎপাটন, গৃহাদির পতন, বন্য জীবজন্তু ও গৃহপালিত পশুপক্ষীর বিনাশ সাধিত হইয়াছিল। অবশেষে ১৩২৬ সালের ৭ই আশ্বিন ময়মনসিংহ, ঢাকা,

* Gentleman's Magazine of 1838-39; Proceedings of the Asiatic Society of Bengal for September 1868.

† Bengal under Lieutenant Governors, Vol. I, Pp. 298-302.

ফরিদপুর, যশোহর ও খুলনা জেলায় পুনরায় এক প্রকাণ্ড ঝড় উত্থিত হয়। এ ঝড়ের কথা পাঠক-পাঠিকার স্মরণ আছে। প্রাতঃকাল হইতে টুপুর টাপুর বৃষ্টিপাতের সঙ্গে সঙ্গে একটু একটু বাতাস প্রবাহিত হইতে থাকে। ক্রমে সন্ধ্যা ঘনীভূত হইয়া আসিতে লাগিল আর আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া থাকিয়া থাকিয়া দমকা বাতাস প্রবাহিত হইতে লাগিল। মধ্যে মধ্যে বিদ্যুচ্চমক দৃষ্ট হইতে লাগিল। চারিদিকে শুধু হাহাকারের শব্দ ভিন্ন অন্য কিছুই কর্ণগোচর হয় নাই। রাত্রি যতই অগ্রসর হইতে লাগিল ততই বাতাসের প্রচণ্ড বেগ অনুভূত হইতে লাগিল। এই ঝটিকা প্রায় সমস্ত রাত্রি ধরিয়া ধ্বংসের লীলা বিস্তার করিয়া ক্রমে ক্রমে রাত্রিশেষে কমিয়া আসিল। কত শত-শত মাল-বোঝাই নৌকা, কত শত-শত আরোহী পরিপূর্ণ নৌকা, কত ষ্টীমার এই ঝড়ে নিমজ্জিত হইয়াছে কে তাহার বর্ণনা করিবে? প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বৃক্ষ ভূতলশায়ী হইয়াছিল, কত-শত গৃহ পতিত হইয়াছিল, কত শত-শত মনুষ্য জীবন বিনষ্ট হইয়াছিল তাহা অগণিত। এই ঝটিকাবর্ত্তের ফলে খাদ্য শস্যের মূল্য বৃদ্ধি পাইয়াছিল এবং কলেরা, ম্যালেরিয়া প্রভৃতি নানাবিধ রোগের প্রাদুর্ভাব হইয়া জনমানব বিনষ্ট হইয়াছিল। এইরূপ বারংবার ঝটিকাপ্লাবন প্রভৃতি আকস্মিক উৎপাতে দেশের সমগ্র জনমানব ক্রমশঃই ধ্বংস হইতে বসিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে ভূমিকম্প ও দেশের সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছে। ১৭৩৭ খৃঃ ভূমিকম্পের কথা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। ১৭৬২ খৃঃ ২রা এপ্রিল তারিখে একটি ভূমিকম্প আরাকান হইতে চট্টগ্রাম ও ঢাকা দিয়া কলিকাতা পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল ইহার দ্বারাও সুন্দরবনের অনেক পরিবর্ত্তন ঘটে। ইহাতে সুন্দরবন এক-প্রকার ডুবিয়া গিয়াছিল, কলিকাতা গঙ্গার জল ৬ ফুট উচ্চ হইয়া উঠে *। ১৮১০ ও ১৮২৯ খৃঃ ভূমিকম্পদ্বয় তত গুরুতর নহে। ১৮৪২ খৃঃ ১১ই নভেম্বর যে ভূমিকম্প হয় তাহা অত্যন্ত গুরুতর, উহা দ্বারা গঙ্গোপদ্বীপ হইতে আফগানিস্থান পর্য্যন্ত সমস্ত উত্তর ভারত আলোড়িত হইয়াছিল। যশোহরের মধ্যে কোন স্থানে এই ভূমিকম্প প্রথম আরম্ভ হয় †। বরিশাল প্রভৃতি স্থানে

---

* Report of the Rev. William Hirst, M.A., F.R.S. sent to the Royal Society, 1762.

† Opinion of Lieutenant Baird Smith. See *Friend of India*, 17-11-1842.

ভীষণ শব্দের সহিত জমি উচ্চ হইয়া উঠে। ইহার দ্বারা সুন্দরবনেও বিশেষ ক্ষতি ও পরিবর্ত্তন সাধিত হয়। পরে ১৮৯৭ খৃঃ ১২ই জুন তারিখে সর্ব্বাপেক্ষা ভীষণ ভূমিকম্প হয়। ইহাতে সমস্ত বঙ্গ বিলোড়িত হয়। ইহার দ্বারা রাজসাহী বিভাগ, কুচবিহার ও ঢাকা-ময়মনসিংহে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ক্ষতি হইয়াছিল *।

লোহাগড়া প্রভৃতি স্থানে প্লাবন বা ভূমিকম্পের দ্বারা বিশেষ ক্ষতি দেখা যায় না তবে ঝটিকাবর্ত্তের ধ্বংসপ্রভাব বিস্তার করিতে দেখা যায়। অগ্নিকাণ্ড দুর্ভিক্ষ ও মড়ক সমগ্র বাংলায় কোন স্থানে না কোন স্থানে লাগিয়াই আছে।

ছিয়াত্তরে মন্বন্তরের কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এই দারুণ দুর্ভিক্ষের ঢেউ লোহাগড়া প্রভৃতি স্থানেও আসিয়াছিল। ১২৫৯ সালে একবার মড়ক লাগিয়া কলেরা কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া লোহাগড়া গ্রামের অর্দ্ধেক লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এই মহামারীর বিভীষিকা প্রত্যক্ষ যিনি দেখিয়াছেন, তাঁহার নিকট হইতে অবগত হইয়াছি। অবশেষে লোহাগড়া অঞ্চলের অগ্নিকাণ্ড বর্ণনাতীত। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অগ্নিকাণ্ডের কথা বলা যায় না। তবে নিম্নলিখিত অগ্নিকাণ্ডগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ১৩০৩ সালে অগ্নিকাণ্ড হইয়া মজুমদার-পাড়ায় বিশেষ ক্ষতি করিয়া যায়। ১৩১৪ সালের ১৩ই মাঘ রাত্রি প্রায় ১১টার সময় লোহাগড়া বাজারে ভীষণ অগ্নিকাণ্ড হয়। ঐ আগুণ প্রায় তিন দিন ধরিয়া চলিয়া এক লক্ষটাকার ক্ষতি সাধন করে। পরবর্ত্তী বৎসর ১৩১৫ সালের ফাল্গুন মাসে পুনরায় বাজারে অগ্নিকাণ্ড হয়। ১৪ সালে যাহারা রক্ষা পাইয়াছিলেন, ১৫ সালে তাহাদিগকে একেবারে সর্ব্বস্বান্ত করিয়া যায়। পরপর এই দুইবৎসর অগ্নিকাণ্ড হইয়া একুনে প্রায় ৩ লক্ষ টাকার ক্ষতি করে। গত বিশ বৎসর ধরিয়াও উহা পূরণ হয় নাই; নতুবা আজ বাজারের অনুরূপ শ্রীবৃদ্ধি হইত। ১৩২৩ সালের ২৩ ফাল্গুন তারিখে দত্ত পাড়ায় অগ্নিকাণ্ড হইয়া একাদিক্রমে ২৫।৩০ খানি গৃহ দাহ হয়। উহাতে দত্তদের একেবারে নিঃস্ব করিয়া যায়। পরবর্ত্তী বর্ষে ১৩২৪ সালে বেলা দ্বিপ্রহরে গন্ধবাড়িয়া অগ্নিকাণ্ডে ৫০।৬০ খানি গৃহ দাহ হইয়া গৃহস্থদের বিশেষ ক্ষতি সাধিত হয়। ১৩২৭ সালে সাহা

* The Earthquake in Bengal and Assam, 1897; Bengal Under Lieutenant Governors, Vol. II, P. 1001.

পাড়ায় অগ্নিকাণ্ড হইয়া অনেককে একেবারে দরিদ্র করিয়া দিয়া গিয়াছে। লোহাগড়া প্রভৃতি স্থানে মধ্যে মধ্যে এইরূপ অগ্নিকাণ্ডের প্রাদুর্ভাব পরিলক্ষিত হয়। এই অগ্নিকাণ্ডের অত্যাচার হইতে রক্ষা পাইতে হইলে সাধারণের বিশেষ সতর্ক ও যত্নবান হইতে হইবে। অবশেষে ১৩৩৬ সালের মাঘ মাসে লোহাগড়া বাজারে অগ্নিকাণ্ডের পুনরাভিনয় হইয়া প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকার ক্ষতি হইয়াছে।

উপসংহার।

আমার এই ক্ষুদ্র পুস্তিকার ভূমিকায় পূর্ব্বেই প্রকাশ করিয়াছি যে, ইহা আমাদের ক্ষুদ্র পল্লীর দৈনন্দিন জীবনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। যদিও ইহাতে ইতিহাসের উল্লেখযোগ্য মহত্তর ঘটনার সমাবেশ নাই, তথাপি এই পুস্তকে পল্লীমায়ের শ্রীসম্পদ, শিক্ষা ও সাহিত্যের প্রসার, ব্যবসায়-বাণিজ্য, সমাজ প্রভৃতি সম্বন্ধে নিরপেক্ষভাবে যাহা বুঝিয়াছি তাহা অতি সরল অনাড়ম্বর ভাষায় প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছি। এই পুস্তকে রাজনীতির কোন স্থান নাই বটে, কিন্তু বর্ত্তমান যুগে পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যুগমানব, ভারতের সর্ব্বজন-মান্য বরেণ্য প্রতিনিধি, অহিংসা মন্ত্রের দীক্ষাগুরু মহাত্মা গান্ধী আসমুদ্র হিমাচলব্যাপী যে স্বাধীনতা বাণী প্রচার করিয়া নর-নারীকে নূতন প্রেরণায় অনুপ্রাণিত করিয়াছেন—সেই আন্দোলনের ঢেউ আমাদের এই সুদূর পল্লীর অধিবাসিগণকেও স্পন্দিত করিয়া তুলিয়াছে। এই ভারতব্যাপী অহিংস অসহযোগ আন্দোলনে আমার পল্লীবাসিগণ কি ভাবে সাড়া দিয়াছেন তাহার আংশিক বর্ণনা না করিলে এই ইতিহাস অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে ও অকপট ভাবে সত্যেরও প্রকাশ হইবে না মনে করিয়া এ সম্বন্ধে দু'একটি কথা উল্লেখ করিয়া আমার ইতিহাস সমাপ্ত করিব।

সন ১৯০৫ খৃঃ স্বদেশী আন্দোলনের সময়ও এই পল্লীর তৎকালীন যুবকগণ অল্পবিস্তর যোগদান করিয়াছিলেন। সন ১৯১৯ খৃঃ মহাত্মা গান্ধী প্রবর্ত্তিত অসহযোগ আন্দোলনের সময় যখন সর্ব্বপ্রথম খদ্দর প্রস্তুতের চেষ্টা

হইয়াছিল, তখনও এই পল্লীতে বহু চরকার প্রচলন হয়। কিন্তু আন্দোলন মন্দীভূত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই চরকায় সূতা কাটা একরূপ বন্ধ হইয়া যায়।

বর্ত্তমান সময়ে সন ১৯৩০ খৃঃ ৬ই মার্চ্চ তারিখে, মহাত্মা পুনরায় যখন পূর্ণোদ্যমে সত্যাগ্রহ ও নিরুপদ্রব আইন অমান্য করিবার জন্য ডাণ্ডী অভিমুখে তাঁহার ঐতিহাসিক অভিযান আরম্ভ করেন, তখন হইতে এই পল্লীতে পুনর্জাগরণের সূচনা প্রকাশ পাইয়াছে। গ্রামবাসিগণ স্বদেশী ব্রতে দীক্ষিত হইয়া বিদেশী পণ্য বর্জ্জনে কৃত সংকল্প হইয়াছেন। অনেক বাটীতেই চরকা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। স্বদেশী বাণী প্রচার করিবার জন্য স্থানীয় স্কুল প্রাঙ্গণে কয়েকটী বিরাট জনসভার অধিবেশন হয়। ইহার ভিতর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা এই যে স্থানীয় গৌরাঙ্গ মন্দির প্রাঙ্গণেও এক মহতী মহিলা-সভার অধিবেশন হয়। এই সমস্ত সভাসমিতিতে জনসাধারণ ও মহিলাগণকে পৃথিবীর মানচিত্রে ভারতবর্ষের স্থান ও তাহার বর্ত্তমান শাসন প্রণালী, অন্যান্য দেশের শিক্ষা-দীক্ষা-স্বাস্থ্য এবং ঐশ্বর্য্যের সহিত ভারতের বর্ত্তমান দুঃখ-দৈন্যের তুলনা করিয়া বিশদভাবে বুঝান হইয়াছে। অবশেষে বিলাসিতা বর্জ্জন—স্বদেশী গ্রহণ ও অবসর সময় চরকা কাটিবার জন্যও অনুরোধ করা হয়।

আর একটী উল্লেখযোগ্য ঘটনা এই যে মহাত্মা গান্ধীর গ্রেপ্তারে তাহার প্রতিবাদ করিবার জন্য লোহাগড়ায় আর এক বিরাট জনসভার অধিবেশন হয়। উক্ত সভায় যশোহরের লব্ধপ্রতিষ্ঠ এড্‌ভোকেট্ শ্রীযুত অবিনাশচন্দ্র সরকার বি, এল, সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসমূহ হইতে প্রায় ৩ হাজার লোক সভায় উপস্থিত হইয়াছিল। লোহাগড়া ইউনিয়ন বোর্ডের সুযোগ্য প্রেসিডেণ্ট শ্রীযুত মতিলাল সরকার বোর্ডের মেম্বরগণসহ মহাত্মার গ্রেপ্তারের প্রতিবাদকল্পে পদত্যাগ করেন। উক্ত সভায় অন্যান্য প্রস্তাবের মধ্যে সর্ব্বসম্মতিক্রমে বিলাতি বস্ত্র বর্জ্জনের প্রস্তাব গৃহীত হয়।

লোহাগড়া বাজারের ব্যবসায়ীরা ভবিষ্যতে আর বিলাতী দ্রব্যের আমদানী করিবেন না বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন বিশেষতঃ বস্ত্র ব্যবসায়ীরা বর্ত্তমানে বিলাতী বস্ত্র বিক্রয় বন্ধ করিয়াছেন। সিগারেট দেশ হইতে উঠিয়া গিয়াছে। মদের দোকানে মদ অপেক্ষাকৃত কম বিক্রয় হইতেছে; গাঁজা ও অহিফেন বিক্রয় বেশ কমিয়াছে। হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায় সাম্প্রদায়িক বিরোধের

তীব্র নিন্দা করিয়া দেশের জন্য একযোগে কার্য্য করিবার নিমিত্ত বদ্ধপরিকর হইয়াছেন।

এই সময় বঙ্গে ছাত্র চাঞ্চল্যের ফলে লোহাগড়া স্কুলে পিকেটিং করিবার একটা জনরব রটে এবং ছাত্র মহলে বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। স্কুলে ষাণ্মাষিক পরীক্ষার দিন কতিপয় ছাত্র পরীক্ষা না দিয়া স্কুল হইতে বাহির হইয়া বাজারের মধ্য দিয়া 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি সহ শোভাযাত্রা করিয়া বেড়ায়। শোভাযাত্রার পর শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর মন্দিরে আসিয়া বিশ্রাম করিবার সময় স্থানীয় পুলিশ তাহাদের মধ্য হইতে ১৯ জনকে স্কুলে পিকেটিং করিবার অভিযোগে গ্রেপ্তার করে। ইহার ফলে সাধারণের মধ্যে বিশেষ চাঞ্চল্য দেখা যায়। আন্দোলনের প্রথম হইতেই স্থানীয় মদের দোকানে পিকেটিং চলিতেছিল। গ্রেপ্তারের পর হইতে আরও জোরে পিকেটিং আরম্ভ হয়। প্রথম যে ১৯ জন গ্রেপ্তার হয় তাহাদের মধ্য হইতে ৮ জনকে ছাড়িয়া দিয়া ১১ জনকে পুলিশ বিচারার্থ নড়াইল চালান দেয়। বিচারে ৩ জনের কারাদণ্ড হয়। তাহার মধ্যে রঘুনাথ পোদ্দার ৬ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। তাহাকে "এ" ক্লাসের কয়েদিরূপে রাখা হইয়াছে। ইহার পরেও মদের দোকানে পিকেটিং করিবার অভিযোগে কতিপয় ছাত্র গ্রেপ্তার হয়।

মহিলাগণও, যাহারা কোনওকালে অন্তঃপুরের বাহিরে আসিতে সাহস পান নাই, পুরুষদিগের সম্মুখে আসিতে সর্ব্বদা সঙ্কোচ বোধ করিতেন, তাহারা পর্য্যন্ত গ্রেপ্তারের পর সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া লোহাগড়া ষ্টীমারঘাটে যাইয়া যুবকগণকে পুষ্প, মাল্য ও চন্দনাদির দ্বারা অভিনন্দিত করেন। শোভাযাত্রা করিয়া জাতীয় পতাকাসহ পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম সমূহে পরিভ্রমণ করিয়া তত্রত্য মহিলাবৃন্দকেও এই আন্দোলনে সহায়তা করিতে অনুরোধ করেন। ইহার ফলে লোহাগড়া, জয়পুর, কুন্দশী, ছাতড়া, কালনা, কামঠানা প্রভৃতি গ্রাম সমূহের মহিলাবৃন্দ সমবেত হইয়া লোহাগড়া শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর মন্দির প্রাঙ্গণে এক বিরাট মহিলাসভার অধিবেশন করিয়া তাহাতে বিদেশী বর্জ্জন, বিশেষতঃ বিলাতি বস্ত্র বর্জ্জন, স্বদেশী গ্রহণ এবং প্রত্যেক বাটীতে চরকায় সূতা কাটার প্রচলন করিবার প্রস্তাব গৃহীত করান্। চরকায় সূতাকাটা, তাঁত বসাইয়া খদ্দর প্রস্তুত করা এবং খদ্দর প্রচারের উদ্দেশ্যে লোহাগড়া

বাজারে এক খাদিবোর্ড স্থাপন হয়; উক্ত বোর্ডের কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতেছে। লোহাগড়া বাজারে ব্যবসায়িগণ যাহাতে কোনও প্রকার বিলাতি-মাল আমদানী করিতে না পারেন, তাহা নিয়ন্ত্রণ করিবার উদ্দেশ্যে এবং তাঁহাদের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সাধনের জন্য উক্ত বাজারে সমস্ত ব্যবসায়িগণের মধ্য হইতে ১২ জন প্রতিনিধি লইয়া এক বণিক-সমিতি স্থাপিত হইয়াছে। শ্রীযুত মতিলাল সরকার উক্ত সমিতির প্রেসিডেন্ট্ এবং শ্রীযুত বাঞ্ছারাম কর সেক্রেটারী নিযুক্ত হইয়াছেন। স্থানীয় পুলিশ, শ্রীযুত শ্রীনাথ মজুমদার, শ্রীযুত বীরেন্দ্রকুমার সরকার ও শ্রীযুত অনন্তকুমার পোদ্দারের বন্দুক ৩টী লইয়া গিয়াছে। ছাত্র-চাঞ্চল্যের ফলে অনেক ছাত্র স্কুলে যাওয়া বন্ধ করে, কিন্তু শ্রীযুত শ্রীনাথ মজুমদার ও শ্রীযুত মতিলাল সরকার গ্রামবাসিগণের সহায়তায় যাহাতে ছাত্রগণ স্কুলে যায় তাহারও বিশেষ চেষ্টা করেন।

বর্ত্তমানে এই সুদূর পল্লীবাসিগণের মধ্যেও দেশাত্মবোধ জাগরিত হইয়াছে। ভারতের এই দুর্দ্দিনে আমাদের অর্থ-নৈতিক অবস্থার যেরূপ বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে তাহাতে আমাদের জীবন-সংগ্রাম দিন-দিন ক্রমশঃই কঠিণ হইতে কঠিণতর হইয়া উঠিতেছে—এই সমস্যার দিনে বিলাসিতা বর্জ্জন ব্যতীত এ সমস্যার সমাধানে কোন সহজ উপায় দেখিনা। আর এ বিষয়ে ইচ্ছা করিলে মাতৃ-জাতি আমাদিগকে যথেষ্ট সহায়তা করিতে পারেন—তাই আজ তাঁহাদের নিকট আমার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ—আমাদের পল্লীমায়ের হীনাবস্থা চিন্তা করিয়া তাঁহারা যেন তাঁহাদের সন্তান সন্ততিকে বিলাসব্যসন্ ত্যাগ করাইয়া ভবিষ্যতে স্বাধীনভাবে জীবন যাপন করিবার উপযোগী করিয়া গড়িয়া তুলেন। উপসংহারে পুরুষগণের উদ্দেশ্যেও আমি বলিতে চাই যে, তাঁহারা প্রত্যেকেই যেন নিজের জীবনের উন্নতি সাধনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের পল্লীমাতার দুঃখ-দৈন্যের কথা বিস্মৃত না হন।

পরিশিষ্ট।

নিম্নলিখিত পত্র দুইখানি সময়মত হস্তগত না হওয়ায় যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিতে পারি নাই। নিম্নে প্রদত্ত হইল।

রায় বাহাদুর যদুনাথের সি, আই, ই, উপাধি পাইবার সময় বঙ্গের

তদানীন্তন গভর্ণর লর্ড্ রোনাল্ড্শে (বর্ত্তমানে মারকুইস্ অব্ জেট্ল্যাণ্ড) মহোদয় স্বহস্তে তাঁহাকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহার অবিকল নকল।

PERSONAL

Government House
Calcutta,
31-12-20.

My Dear Rai Bahadur,

I have received the news of the honour which His Majesty has bestowed upon you with the utmost satisfaction. And I hasten to offer you my warmest congratulations upon having been made a Companion of the most eminent order of the Indian Empire.

I am, indeed, glad that this recognition of your services to the State should have been made during my term of office in Bengal.

With my best wishes,
Believe Me
Yours sincerely,
RONALDSHAY.

নেপালের ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী স্বর্গীয় মহারাজ চন্দ্রশম্শের জঙ্গবাহাদুর রাণা, রায়বাহাদুর যদুনাথের নিকট যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহার অবিকল নকল নিম্নে প্রদত্ত হইল।

State Seal.

Nepal,
21st January, 1929.

My dear Jadunath Babu,

I am much obliged to you for your kind letter of the 1st Instant. Its perusal has given me the same pleasure as when having a talk with you in person, freely speaking out our minds with sympathetic consideration of and discussions in our mutual thoughts and ideas. I very much appreciate the goodness which prompted you to write to me as you have so very kindly done.

Many thanks for your greetings and expression of good wishes with which the letter begins. Coming from the very heart of a good old friend they stand high in my estimation and gratefully as I acknowledge them I desire to express most cordial reciprocation of the same to you and your worthy son Lt. Kumar Adhikrama

whose acquaintance I was so very good to make last winter while I was in Calcutta,

With the waves of new thoughts dashing in or splashing everywhere against what is or what was, the religion of the Hindus seem to be passing through a very critical period. Different sects and diverse schools of thought are being seen at work, each wanting to have its own way. Such distracting forces at work cannot but throw everything into a jumble, and the way out of that lies on a clear course broad based on the unanimity and unanimous support of all concerned. Improvements in such cases cannot come from outsides but must come from within. The Stalwart followers of that faith will, it is hoped, direct their efforts to that end without giving the least political tinge to the religious move. Unfortunately religious activity in India, however pure and simple the intentions and wishes of it may be, is invariably drawn into the vortex of political arena. And I am sure you will agree that more harm than good is likely to result from Nepal's greeting mixed up in such matter and under such conditions.

Deeply though I sympathise with your views and much as I should like to see the Hindu religion out of the chaos which it is now in, I feel that I can, under the circumstances, do no better than say what I have said above.

The other point dealt within your letter has my attention. Indeed I am grateful to you for all that you have said so feelingly in that connection. Slow but steady should be our motto and I shall be very glad of your advice from time to time should you be inclined to favour me with that.

Mr. Percival Landon has written a book on Nepal. You may have heard of it or perhaps seen it too. In case you have not, I thought its perusal may interest you, and with that idea, am sending a copy under a separate cover for your acceptance.

With best wishes that you may have yet many more years of useful life before you attended always with happiness and prosperity.

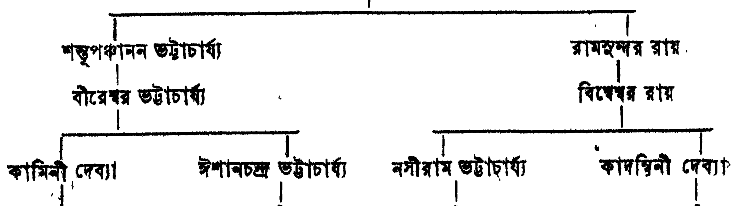
I remain,
Yours sincerely,
CHANDRA.

মজুমদার বংশের কুলগুরুর বংশতালিকা (নলদী)

- ষষ্ঠীদাস গাঙ্গুলী
  - মুকুন্দরাম
    - পুরুষোত্তম গোস্বামী
      - সর্ব্বেশ্বর
      - জগন্নাথ
        - নন্দকুমার
          - আনন্দচন্দ্র
            - মহিমাচন্দ্র
            - বৃন্দাবন
              - রসিক
            - রামচন্দ্র
              - মাতঙ্গিনী
            - গোপালচন্দ্র গোস্বামী
              - হীরালাল গোস্বামী
                - ললিতারঞ্জন
                - প্রফুল্লরঞ্জন
                - বিমলরঞ্জন
                - চিত্তরঞ্জন
              - বিনোদ
          - গোলকচন্দ্র
        - কৃষ্ণচন্দ্র
          - মৃত্যুঞ্জয়
          - মোহন
            - কালাচাঁদ
            - মতিলাল
              - রূপলাল
              - শ্যামলাল
          - নিবারণ
        - বংশীবদন
          - পঞ্চানন
          - লালমোহন
          - গোপীমোহন
          - ব্রজমোহন
            - কন্যা
              - কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়
                - প্রমথনাথ
          - ভারতচন্দ্র
      - বলরাম
        - নবকৃষ্ণ
          - রামকৃষ্ণ
            - কিশোরী দেবী
              - নিবারণ মুখোপাধ্যায়
              - উমেশ
                - ভূপতিনাথ
                - পশুপতি
          - হরিহর
        - চিরঞ্জীব
          - প্যারীমোহন
            - শশীভূষণ
            - উমাসুন্দরী
              - উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
              - মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

দাশবংশের কুলগুরুদিগের কুলজিনামা (নসিবপুর)

কালীচরণ বিদ্যাবাগিশ



স্বর্গীয় প্রভুপাদ হীরালাল গোস্বামী।

প্রভুপাদ হীরালাল গোস্বামী একজন সুগৃহী। প্রাতঃ সূর্য্যের ন্যায় পবিত্র ছিল তাঁহার হৃদয়,—অসীম ও উদার। ন্যায়, নিষ্ঠা, সত্য ও সংযম ছিল তাঁহার চরিত্রের মাধুর্য্য। যাগ-যজ্ঞ, তপ-যপ, পূজা-অর্চ্চনা ছিল তাঁহার নিত্যকর্ম্ম। তিনি একজন পরম বৈষ্ণব, ভগবৎ প্রেমে পরিতৃপ্ত ছিল তাঁহার অন্তর। সত্য সত্যই তিনি আচার-ব্যবহার-রীতি-নীতিতে আদর্শ মানব। বাহিরে গৃহী হইলেও অন্তরে তিনি সন্ন্যাসী। শাস্ত্র-পুরাণাদি পাঠ করিয়া আধ্যাত্মিক জীবনে তিনি যথেষ্ট উৎকর্ষ লাভ করেন। বিশেষতঃ বহু তীর্থ পর্য্যটনের দ্বারা সাধুসঙ্গ লাভ করিয়া আধ্যাত্মিক জীবনের পথ উন্মুক্ত পাইয়াছিলেন। ১৩৩৪ সালে গঙ্গাতীরে কলিকাতা নগরীতে দেহ-রক্ষা করিয়া পরমপদ প্রাপ্ত হন।

ত্রুটী স্বীকার।

বহু বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া গত দেড় বৎসর যাবৎ পরিশ্রম করিয়া আপনাদের সম্মুখীন হইবার সুযোগ পাইয়াছি বলিয়া নিজেকে ধন্য মনে করিতেছি। যথেষ্ট ভ্রম থাকিলেও নিজের ত্রুটী স্বীকার করিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা বোধ করিতেছি না। বিশেষ সাবধানতা সত্ত্বেও এই পুস্তকের ১৩পৃঃ সপ্তদশ "শতাব্দীর" স্থানে "খৃষ্টাব্দ," ২৫পৃঃ "উত্তরাধিকারিগণ" স্থানে "উত্তরাধিকারিণীগণ," ৩৭পৃঃ দশম শতাব্দীর "শেষ ভাগে" স্থানে দশম শতাব্দীর "প্রারম্ভে" ও ১৪৭পৃঃ "প্রস্তুত করেন—" স্থানে "প্রস্তুত করিয়া" ভ্রম দৃষ্ট হয়। সময়ের সল্পতা, বন্ধুবান্ধবগণের ব্যাকুলতা ও গ্রামবাসিগণের আগ্রহাতিশয্যের জন্যই প্রুফ সংশোধনে দ্রুততা হেতু বানান ভুলও দুই একটী থাকিতে পারে। ভবিষ্যতে ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রয়োজন হইলে এই বিষয়ে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিব। কর্ম্মজীবনের প্রারম্ভে লোহাগড়া কাহিনীর প্রথম সংস্করণ বাহির হইল। বাসনা থাকিল যদি ভগবান পুনরায় সুযোগ দেন তবে শেষ জীবনে ভবিষ্যৎ বংশীয়গণের কীর্ত্তিকাহিনী যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া ইহার দ্বিতীয় অংশ বাহির করিব।

গ্রামবাসীর পুণ্য আশীর্ব্বাদ মস্তকে ধারণ করিয়াই এই গুরুভার বহন করিতে সক্ষম হইয়াছি। জানিনা পাঠক-পাঠিকার মনোমত উপাদানে এ পুস্তক প্রণয়নে সক্ষম হইয়াছি কিনা? আশা করি সহৃদয় পাঠক-পাঠিকা নিজ গুণে এই পুস্তকের ত্রুটী মার্জ্জনা করিয়া লেখককে নবীন উৎসাহে উৎসাহিত করিয়া বাধিত করিবেন।

বিনয়াবনত গ্রন্থকার।



লোহাগড়ার শ্মশান।